উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশী ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
মুহাম্মদ আবদুল মালেক
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
সাঈদ-উর-রহমান
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোঃ সাইফুলণ্ডাহ বিন আনোয়ার
রেজিঃ নং-৬৩/২০১২-২০১৩ (নতুনভাবে)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

মার্চ-২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোঃ সাইফুলণ্ডাহ বিন আনোয়ার কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশী ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমাদের জানামতে, ইতঃপূর্বে কোথাও কোনো ভাষাতেই এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমরা এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(সাঈদ-উর-রহমান)
যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(মুহাম্মদ আবদুল মালেক)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশী ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা"** শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক স্যার ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সাঈদ-উর-রহমান স্যারের যৌথ প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি।

আরও ঘোষণা করছি যে, অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি। এ গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে কোনো গবেষক কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য বা প্রকাশের জন্য উক্ত শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

ঢাকা, বাংলাদেশ
মার্চ, ২০১৬

(মোঃ সাইফুলণ্ঢাহ বিন আনোয়ার)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং-৬৩
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নানামুখী প্রতিকূলতা ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও পিএচি.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশী ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম কর"ণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আলণ্ঢাহ্ রবক্ষুল আলামীনের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মে যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুর" করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ড় অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্ড়িত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। হাজারও ব্যস্ড়তা ও শারীরিক অসুস্থতার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্নে পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্পন্ন করতে নিরন্ড়র সহায়তা করেছেন। তাঁর ঐকান্ড়িক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে। আমি স্যারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

গবেষণা কর্মের যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রথিতযশা গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক ড. সাঈদ-উর-রহমান। আমি তাঁর প্রতিও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনিও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আমার এ গবেষণার সার্বিক ব্যাপারে বিশেষ করে অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়ে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে ঋণী। আমি তাঁর নিরোগ শান্ড়িময় দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

কর্মময় জীবনে নানাবিধ ব্যস্ড়তার মাঝেও যাঁর আন্ড়রিক উৎসাহ, প্রেরণা ও গুর"ত্বপূর্ণ উপদেশের ফলে এ গবেষণা কর্ম ত্বরান্বিত হয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর কাছে আমি সব সময় ঋণী ও কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্যারকে স্মরণ করি ও মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি। সাথে সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ বিশেষভাবে স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে এ গবেষণাকর্মকে যথেষ্ট ত্বরান্বিত করেছেন।

এছাড়া আরও অনেকে যাঁরা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উলেণ্টখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তন্মধ্যে অধ্যাপিকা আনিস ফাতেমা (সাবেক উপাধ্যক্ষ), সরকারি তিতুমীর কলেজ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফার ক আহমদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ মাহবুবুল করিম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ মোস্ড় াফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আজিজুল ইসলাম। সকলকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

অবশেষে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আবক্ষা-আম্মা, স্ত্রী শাহিদা সুলতানা, পুত্র শুয়াইব আনোয়ার এবং পরিবারের অন্যান্য আপনজন যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাভাবে আন্ড়রিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন যার ফলে গবেষণকর্মটি শেষ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের আন্ড়রিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হল–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং পিএইচ.ডি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে গবেষণাকর্মের জন্য দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। মহান আলণ্টাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এ কামনা করি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি ইসলামের প্রাথমিক যুগ, উমাইয়া-আবক্ষাসীয় ও বাংলাদেশ পুলিশি ব্যবস্থার উপর রচিত যেসব দেশি-বিদেশি লেখকের রচনা, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা নিয়েছি, যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকারের নাম সসম্মানে উলেণ্টখ করেছি এবং আমি তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ড় করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করার জন্য মোহাম্মদ ওমর ফার ক ভূঁএ্রা ও এ. বি. এম নূর ল্লণ্টাহ-এর কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে আলণ্টাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ বান্দার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। –আমিন।

মোঃ সাইফুলণ্টাহ বিন আনোয়ার
পিএইচ.ডি গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

(رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
أ ء	অ	ض	দ	ـَ	া	وُ	উ
ب	ব	ط	ত্ব	ـِ	ি	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُ	ু	وِيْ	বি/ভী
ث	ছ	ع	‘	ـَا	া	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـِيْ	ী	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـُوْ	ূ	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أَ	আ	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	آ	আ	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ই	عَ	‘আ/‘য়া
ر	র	م	ম	إِيْ	ঈ	عَا	‘আ/‘য়া
ز	য	ن	ন	أُ	উ	عِ	ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ঊ	عِيْ	ঈ
ش	শ	و	ও	وَ/وَا	ওয়া	عُ	উ
ص	ছ	ي	য়	وِ	বি	عُوْ	ঊ

ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, تَأْجِيْرٌ = তা’জীর, تَأْثِيْرٌ = তা’ছীর, تَأْخُذُ = তা’খুযু প্রভৃতি।

ع সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, بيع = বায়‘, جامع = জামি‘, رعد রা‘দ প্রভৃতি। বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন- মুনাফা, কর্জ, আলেম, ফরজ মাযহাব প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

অনুঃ	:	অনুবাদ
অনূঃ	:	অনূদিত
আ.	:	‘আলায়হিস সালাতু ওয়াসসালাম
আঃ	:	আয়াত
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	:	ষষ্ঠ
৭ম	:	সপ্তম
৮ম	:	অষ্টম
৯ম	:	নবম
১০ম	:	দশম
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
খৃ.পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ Doctor of Philosophy)
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
পরি.	:	পরিশিষ্ট
পাণ্ডু.	:	পাণ্ডুলিপি
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
বি.	:	বিশেষ
মূ.পা.	:	মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
মু.	:	মুদ্রণ
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
তাং	:	তারিখ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
দঃ/দ.	:	দরূদ
লিঃ	:	লিমিটেড
র./রহ.	:	রহমাতুলণ্ঢাহি ‘আলায়হি
রা.	:	রাদিয়ালণ্ঢাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা
স.	:	সলণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলায়হি ওয়া সালণ্ঢাম
সং.	:	সংস্করণ
হি.	:	হিজরি সাল

Addl. DIG	:	Assistant Deputy Inspector General
Addl. SP	:	Additional Superintendent Of Police
Addl.IG	:	Additional Inspector General
AIG	:	Assistant Inspector General
ASI	:	Assistant Sub-Inspector
ASP	:	Assistant Superintendent Of Police
ATSI	:	Assistant town Sub-Inspector
DIG	:	Deputy Inspector General
ed.	:	edition
edt.	:	edited
GDP	:	Gross Domestic Product
HTML	:	Hyper Text Markup Language
HTTP	:	Hyper Text Transfer Protocol
Ibid	:	ibidem, which means ‘in the same place’
IGP	:	Inspector General of Police
Ltd.	:	Limited
M.Phil	:	Master of Philosophy
NK.	:	Naik
OIC	:	Organization of Islamic Cooperation
Op.cit	:	Opera Citato, The work cited/open cito
p.	:	Page
Ph.D	:	Doctor of Philosophy
pp.	:	Pages
SI	:	Sub-Inspector
SP	:	Superintendent of Police
Sr.ASP	:	Senior Assistant Superintendent Of Police
vol.	:	Volume
CP	:	Community Policing
CPC	:	Community Police Centre

সূচিপত্র

- প্রত্যয়নপত্র II
- ঘোষণা পত্র III
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার IV
- প্রতিবর্ণায়ন VI
- শব্দ সংক্ষেপ VII
- ভূমিকা ১
- পুলিশি ব্যবস্থার পরিচিতি ৭

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুলিশ বাহিনীর ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামপূর্ব আরবের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা	১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	হযরত মুহাম্মদ (স.) এর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা	৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পুলিশি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ	৪১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশের ভূমিকা	৫৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

উমাইয়া যুগের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	উমাইয়া শাসনকাল ও পুলিশ বিভাগ	৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	উমাইয়া যুগে পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যাবলী	১১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	উমাইয়া যুগে পুলিশ প্রতিষ্ঠান (দফতর) ও এর কাঠামো	১৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

আবক্ষাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আবক্ষাসীয় যুগের শাসন ব্যবস্থা	১৪৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো	১৬৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	উল্লেখযোগ্য শাসকদের আমলে পুলিশি ব্যবস্থা	২০৪

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশ পুলিশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো	২৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং ও ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা	৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশি ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশি ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক	৩৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	শুরতা, মুহতাসিব, কাযি ও কোতোয়াল সম্পর্কিত পর্যালোচনা	৩৭১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশি ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য	৩৮৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা	৩৮৭
উপসংহার	:		৩৯০
পরিশিষ্ট	:		৩৯৫
পরিশিষ্ট-১	:	মহানবী (স.)-এর সচিববৃন্দ	
পরিশিষ্ট-২	:	হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেহরক্ষীবৃন্দের তালিকা	
পরিশিষ্ট-৩	:	উমাইয়া যুগের পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা	
পরিশিষ্ট-৪	:	আবক্ষাসীয় যুগের পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা	
পরিশিষ্ট-৫	:	আবক্ষাসীয় যুগে রাউন্ড সিটিতে পুলিশের অবস্থান	
পরিশিষ্ট-৬	:	পাকিস্তান আমলে পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা	
পরিশিষ্ট-৭	:	বাংলাদেশ আমলে পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা	
পরিশিষ্ট-৮	:	বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের নাম	
পরিশিষ্ট-৯	:	বাংলাদেশ পুলিশের পদবী পরিচিতি	
গ্রন্থপঞ্জি	:		৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা এ ধরণীকে অপরূপ সাজে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে, পর্যায়ে পর্যায়ে। তিনি সুবিন্যস্ত করেছেন; করেছেন শৃঙ্খলাবদ্ধ। সমস্ত জগতটাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে মানব জাতির বসবাসের উপযোগী করে তাতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছাপোষণ করেন। তিনি তাঁর এ ইচ্ছার কথা ফেরেশতাকুলের নিকট প্রকাশ করলে ফেরেশতাকুল বলেছিলেন, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না।'-(আল-কুরআন, ২:৩০)

অতপর তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে মানবকুলকে প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করলেন, শিখালেন আত্মরক্ষার কৌশল, ভালমন্দ, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"-(আল-কুরআন, ৪:২৯)

এছাড়া সুরা বনি ইসরাঈলের ৩১ থেকে ৩৭ পর্যন্ত মোট ৭টি আয়াতে নবজাতক কন্যাসন্তান হত্যা না করা, ব্যভিচার না করা, অন্যায়ভাবে হত্যা না করা, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ না করা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, মাপে কম না দেওয়া এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে না চলার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন– "তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে আমি রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না; কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই। ইয়াতীমরা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়াত তলব করা হবে। মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। কান, চোখ ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনোই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।"

পৃথিবী বাস উপযোগী হতেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা মানবকুলকে এ ধরণীর বুকে প্রেরণ করেছেন। আর তখন থেকেই মানব জীবনের অস্তিত্ব রক্ষায় নিরাপত্তা বিধান, অপরাধমূলক তৎপরতা দমন করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অপরিহার্যরূপে চলে আসে। তারপর মানবকুলের বংশবৃদ্ধিতে নিরাপত্তার গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে যায়। শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদের সুরা বাকারা-এর ৮৪ নং আয়াতে বলেন–

لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُوْنَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ.

"তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না।"

আল্লাহ তা'আলা সুরা শূরা-এর ৪০নং আয়াতে আরও বলেন–

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى اللهِ ط إِنَّه لاَ يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।"

কালের পরিক্রমায় কোনো না কোনোরূপে বা নামে শুরু হয় পুলিশি কার্যক্রম। বিস্তৃত হতে থাকে এর পরিধি। ব্রিটিশ রয়েল আইরিশ কন্সস্টেবিউলারি এর আদলে ১৮৬১ সালে প্রণীত আইনে ভারতীয় উপমহাদেশে যাত্রা শুরু হয় সংগঠিত পুলিশ বাহিনীর। আর বাংলাদেশ পুলিশ ১৮৬১ সালে গঠিত পুলিশ বাহিনীর উত্তরাধিকারীরূপে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর ৮ম জনসংখ্যা অধ্যুষিত ও দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। বর্তমানে এদেশের জনগণের প্রায় ৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) জনের বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্যের পক্ষে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর নেতৃত্বে জনগণ নিজ থেকে যেরূপ পুলিশের ভূমিকা পালন করত তার সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ 'জনগণই পুলিশ, পুলিশই জনগণ' এ স্লোগানকে ধারণ করে বর্তমানে শুরু হওয়া কমিউনিটি পুলিশের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহানবী (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদিনা। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তিনি বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা বিভাগ গঠিত হয়। মদিনা রাষ্ট্রে নিয়মিত কোন পুলিশ বাহিনী ছিল না। স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক সাহাবি এ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে যারা আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব ছিলেন, বায়তুলমাল থেকে তাঁদের ব্যয়ভার বহন করা হত। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন কায়েস ইবন সায়াদ (রা.)।

প্রাণদণ্ডে অপরাধীদের শিরশ্ছেদ করার কাজে রসুলুল্লাহ (স.)-এর বিশিষ্ট সাহাবি হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত আলি (রা.), হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা.), হযরত মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (রা.), হযরত আসেম ইবন সাবিত (রা.) এবং হযরত দাহহাক ইবন সুফিয়ান কালবি (রা.) প্রমূখ দায়িত্ব পালন করেন।

খিলাফতে রাশিদার প্রাথমিক যুগে সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী ছিল না। গোড়ার দিকে জনসাধারণ সাধারণভাবে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করত। তবে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, দুর্নীতি দমনে সমগ্র রাজ্যে পাহারাদার ও নগররক্ষীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি চুরি-ডাকাতি নিবারণ, ওজন পরীক্ষা ও মদ বিক্রয় বন্ধের জন্য 'দিওয়ানুল আহদাস' প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, হযরত উমর (রা.) এর প্রাদেশিক ওয়ালির (শাসনকর্তা) শাসনকার্যে সহায়তা করেন 'সাহিব আল-আহদাস' (পুলিশ প্রধান)। হযরত আলি (রা.) সর্বপ্রথম সুসংগঠিতভাবে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। তাঁর সময় পুলিশ বাহিনীকে 'আশ-শুরতা' নামে অভিহিত করা হত এবং পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে 'সাহিব আল-শুরতা' বলা হত। তাঁর সময়ে প্রত্যেক প্রদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হয়। তৎকালীন পুলিশ বাহিনী শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও আধুনিক পৌরসভার কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করত। কারা বিভাগও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হত।

উমাইয়া যুগেও পুলিশি ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগে প্রদেশের অন্যতম ঊর্ধ্বর্তন কর্মকর্তা ছিলেন 'সাহিব আল-আহদাস' বা পুলিশ প্রধান। উমাইয়া যুগে পুলিশের দায়িত্ব ছিল নাগরিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা, অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করা। এছাড়া প্রয়োজনে রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীকে নিয়োগ করা হত। গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল অনেকটা কমিউনিটি পুলিশের আদলে গ্রাম প্রধানের উপর। উমাইয়া শাসনামলে পুলিশ এত তৎপর ছিল যে, কোথাও কোন শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত না। তারিখ-ই-ইসলাম গ্রন্থ প্রণেতা মঈনউদ্দীন আহমদ-এর ভাষ্য অনুযায়ী উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর শাসন আমলে কুফায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজর) পুলিশ নিয়োগ করেন। মুয়াবিয়া (রা.) দুস্কৃতিকারী ও গুণ্ডা-বদমায়েশদের তালিকা প্রস্তুত করেন ও তাদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদ ও প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানী এমনকি প্রতিটি শহরে 'শুরতা' বাহিনী তথা পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত থাকত। 'দি রেইন অব আল-মুতাওয়াক্কিল' গ্রন্থে এম. শামসুদ্দিন মিঞা উল্লেখ করেন, আবক্ষাসীয় যুগে সাহিব আল-শুরতা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনের পাশাপাশি দু-একটি জায়গায় প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। খলিফা আল-মাহদির শাসনকালে তিনি বসরার গভর্নরকে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে প্রেরণ করেন। আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশ বাহিনী ৪টি শাখায় বিভক্ত ছিল।

(১) শুরতা (সাধারণ পুলিশ বাহিনী)। যা বর্তমান বাংলাদেশের সাধারণ পুলিশ বাহিনীর সাথে তুলনীয়।

(২) মা'উনা (সামরিক পুলিশ বাহিনী)। যা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের সাথে তুলনীয়।

(৩) হারাস (প্রহরী পুলিশ বাহিনী)। যা প্রটেকশন ও প্রটোকল পুলিশের সাথে তুলনীয়।

(৪) আহদাস (বিশেষ পুলিশ বাহিনী)। যা সিআইডি ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) পুলিশের সাথে তুলনীয়।

আবক্ষাসীয় যুগে ফৌজদারি বিচারের ভার মাযালিম বিচারক, সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান ও মুহতাসিব নামক সরকারি কর্মকর্তার উপর ন্যাস্ত ছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান কোনো অপরাধের সংবাদ পাওয়া মাত্রই ঘটনা স্থলে দ্রুতগতিতে উপস্থিত হয়ে তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা উদঘাটন করে সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দোষ স্বীকারে বাধ্য করতে পারতেন। এ যুগে মুহতাসিব (বাজার পরিদর্শক) নামক কর্মকর্তার কিছু কাজের সাথে পুলিশি কাজের কিছু তুলনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, এ যুগে সৎ, ধার্মিক ও ন্যায় নিষ্ঠাবান লোকদের পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হত। তাদেরকে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করতে হত। উৎকোচ গ্রহণ ও কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি অসদাচরণ থেকে দূরে রাখতে আকর্ষণীয় বেতন প্রদান করা হত।

দিল্লির মুসলিম শাসনামলে কোতোয়াল ও মুহতাসিব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নৈতিক চরিত্র রক্ষায় কাজ করতেন। আরব খিলাফতকালে পুলিশ প্রধান সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত ছিলেন। কিন্তু দিল্লির সুলতানদের শাসনকালে পুলিশ প্রধানকে কোতোয়াল বলা হত। সর্বপ্রকার অপরাধমূলক তৎপরতা দমন করে নাগরিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কোতোয়াল ও তার পুলিশ বাহিনীর কর্তব্য। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শহরে কোতোয়াল ও পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত থাকত। কোতোয়াল বেসামরিক কর্মকর্তা হলেও কোনো কোনো লেখক কোতোয়ালকে সামরিক কর্মকর্তা হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল তার কর্তব্য। কোতোয়ালের পুলিশ বাহিনী রাত্রিকালে শহরে পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকতেন এবং রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বজায় রাখতেন। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কোতোয়াল জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। শহরের প্রত্যেক অঞ্চলে তিনি একজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিকে সে অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করতেন। তিনি শহরের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের নামের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের কার্যকলাপ এবং জীবিকার উপায় সম্বন্ধে অবহিত হতেন। তিনি শহরের প্রত্যেক নবাগত ব্যক্তি ও বিদায়ী ব্যক্তির খোঁজ-খবর

Dhaka University Institutional Repository

রাখতেন। কোতোয়ালের ক্ষমতা শুধুমাত্র শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার ক্ষমতার কার্যকারিতা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রাম অঞ্চলে তিনি গ্রাম প্রধানদের সহযোগিতায় অপরাধ দমনে তৎপর থাকতেন।

দিল্লির সুলতানগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। পুলিশের কার্যক্রম কোতোয়াল কর্তৃক সম্পাদিত হত। কোতোয়ালের সদস্যগণ রাত্রিকালীন টহল দিত এবং জনপদকে পাহারা দিত। কোতোয়াল তাঁর দায়িত্ব পালনে জনগণের সহযোগিতা পেতেন। তিনি কোয়ার্টারে বসবাসরত নাগরিক সম্পর্কে রেজিষ্ট্রার রাখতেন ও তাদের জীবনযাত্রা, কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজ- খবর এবং নতুন আগন্তুকের আগমন ও প্রস্থান লিপিবদ্ধ করতেন। তার অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন। ফৌজদারি বিধি ও শাস্তি ছিল কঠিন। বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তিস্বরূপ রাস্তায় ঘোরানো হত। দস্যুদের জীবন ও সম্পত্তি সুলতানের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি দস্যুদের পরিবারকেও শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি চালু করেন।

জনস্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে মুহতাসিব হাটবাজার পরিদর্শন করতেন, ওজন ও মাপ পরীক্ষা করতেন এবং যেসব ব্যবসায়ী ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করত ও ত্রুটিপূর্ণ দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করত তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করতেন। সুলতানি আমলে বাজার তত্ত্বাবধানের ভার অবশ্য মুহতাসিব অপেক্ষা নিম্নপদস্থ এক কর্মচারীর (রইস) উপর ন্যস্ত থাকত। রইস উৎপাদনকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করতেন। রইসের দফতর দিওয়ান-ই-রিয়াসত বা আদল নামে অভিহিত ছিল। সালতানাতের প্রারম্ভ থেকেই দিওয়ান-ই-রিয়াসত কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাফল্যের পশ্চাতে এ বিভাগের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ, লোদি ও শুর শাসনামলেও এ বিভাগ চালু ছিল। আদিল শাহের প্রধান সেনাপতি হিমু এক সময়ে রইসের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দিল্লির সুলতানগণ হিসবাহ ব্যবস্থা কার্যকরীকরণে অত্যন্ত সতর্ক ও তৎপর ছিলেন। সুলতান বলবন উপযুক্ত হিসবাহ ব্যবস্থাকে দক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান শর্ত মনে করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন হিসবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজজীবন থেকে মদ, জুয়া ও অন্যান্য অশালীন কার্যকলাপ দূরীভূত করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কঠোরতার সাথে সমাজজীবন থেকে সমুদয় অশালীন কার্যকলাপ বন্ধ করেন। পর্যটক ইবনে বতুতা মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজদরবারে ধর্মীয় অনুশাসনের কড়াকড়ি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক মাঝে মাঝে স্বয়ং মুহতাসিবের দায়িত্ব পালন করতেন এবং মুসলিমরা ইসলামের রীতিনীতি মেনে চলত কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতেন ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি মাতালকে আশি বেত্রাঘাত ও তিন মাসের নির্জন কারাবাসের শাস্তি দিতেন। ধর্মপ্রাণ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং সিকান্দার লোদির আমলেও হিসবাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল।

জনপ্রশাসনে পুলিশ সব সময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত হলেও পুলিশকে অনেক মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে হয়। পারিবারিক শান্তি থেকে রাষ্ট্রের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে পুলিশের তৎপরতা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে পুলিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে মুক্তি পায়নি। পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। বিভিন্ন যুগে শাসকগণ

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময় জনপ্রত্যাশার বিপরীতে পুলিশকে অনুগত বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করেছে। তবে বাংলাদেশ পুলিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পুলিশের কাঠামো এবং সার্বিক কর্মকাণ্ড অতি পুরাতন ও ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি পুলিশ আইন ১৮৬১ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। একটি পরাধীন দেশের অন্তর্গত বিবিধ রাজ্যসমূহের উপযোগী করে ১৮৬১ সালে সে সময়ের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা এবং অপরাধ প্রবণতা ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই মূলত আইনটি প্রবর্তন করা হয়েছিল। যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৮৬১ সালের এ পুলিশ আইন-এর প্রায়োগিকতা ও উপযোগিতা বর্তমানে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ঔপনিবেশিক বৃত্তাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে একটি জনবান্ধব, প্রতিশ্রুতিশীল, আধুনিক, গণতান্ত্রিক পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা আজ সকলের প্রত্যাশা।

প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার জন্য এটাকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অতঃপর আলোচনার বিষয়গুলো চিত্তাকর্ষক করে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য অধ্যায়গুলো ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে এবং একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম "ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুলিশ বাহিনীর ক্রমবিকাশ।" এ অধ্যায়ে ইসলামপূর্ব আরবের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পুলিশি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, মহানবী (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "উমাইয়া যুগের পুলিশি ব্যবস্থা।" এ অধ্যায়ে উমাইয়া শাসনকালের পরিচিতি, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পুলিশ বিভাগ, বিভিন্ন প্রদেশে পুলিশি ব্যবস্থাপনা, পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যাবলি, খলিফা ও গভর্নরের সাথে পুলিশের সম্পর্ক, বিচার বিভাগের সাথে পুলিশের সম্পর্ক, পুলিশের বেতন কাঠামো এবং উমাইয়া যুগে পুলিশ প্রতিষ্ঠান (দফতর) ও এর কাঠামো সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে "আবক্ষাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা।" এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে আবক্ষাসীয় শাসনামলের পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আবক্ষাসীয় যুগের শাসন ব্যবস্থা, আবক্ষাসীয় যুগের পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো, বিভিন্ন প্রদেশে পুলিশি ব্যবস্থা, পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিয়োগ ব্যবস্থা, বেতন কাঠামো, পুলিশের সাথে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সম্পর্ক, আবক্ষাসীয় উল্লেখযোগ্য শাসকদের শাসনামলের পুলিশি ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে "বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থা।" এ অধ্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মৌর্যযুগ, মোগল যুগ, ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলের পুলিশি ব্যবস্থা, স্বাধীনতা যুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলাদেশে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো, পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বাংলাদেশ পুলিশ যেসব আইন দ্বারা পরিচালিত, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচিতি, পুলিশের জনবল, অস্ত্রশস্ত্র এবং বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং ও ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে "উমাইয়া ও আবব্বাসীয় যুগে পুলিশি ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশি ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়।" এ অধ্যায়ে (ক) উমাইয়া ও আবব্বাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ পুলিশি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, (খ) শুরতা, মুহতাসিব, কাযি ও কোতোয়াল সম্পর্কিত পর্যালোচনা, (গ) উমাইয়া ও আবব্বাসীয় যুগে পুলিশি ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং (ঘ) গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার পর অভিসন্দর্ভের শেষ পর্যায়ে একটি উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে। উপসংহারের পর নয়টি পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে। পরিশিষ্টগুলোর শিরোনাম হলো– (ক) মহানবী (স.)-এর সচিববৃন্দ (খ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেহরক্ষীবৃন্দের তালিকা (গ) উমাইয়া যুগের পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা (ঘ) আবব্বাসীয় যুগের পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা (ঙ) আবব্বাসীয় যুগে রাউন্ড সিটিতে পুলিশের অবস্থান (চ) পাকিস্তান আমলে পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা (ছ) বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের নাম। (জ) বাংলাদেশ পুলিশের পদবী পরিচিতি।

অভিসন্দর্ভের সর্বশেষে গবেষণায় ব্যবহৃত এবং বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীর সুবিস্তৃত একটি তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জি' শিরোনামে সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা উমাইয়া ও আবব্বাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা ও বর্তমান বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থার প্রসঙ্গগুলো এ অভিসন্দর্ভে সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনা করেছি। এর ফলে পাঠক উমাইয়া ও আবব্বাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা ও বর্তমানে বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থার তথ্যগুলো একত্রে পাঠ করার সুযোগ পাবেন। পাঠক উল্লিখিত যুগের পুলিশি ব্যবস্থা ও বর্তমান বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা থেকে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাবেন। উল্লিখিত যুগে শান্তি-শৃঙ্খলার অতন্দ্র প্রহরী পুলিশের সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য দিকগুলো পাঠকের সামনে সাবলীলভাবে তথ্যনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক সূত্রধারা সমর্থিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান পুলিশ বাহিনীকে আরও জনকল্যাণমুখী, সেবামূলক ও যুগোপযোগী সংস্থা হিসেবে যারা গড়তে চান তারা অত্র গবেষণাকর্ম থেকে পথনির্দেশনা পেতে পারেন এবং কাঙ্ক্ষিত পুলিশ বাহিনী গড়তে সমর্থ হন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। গবেষকবৃন্দ ও সাধারণ পাঠক সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

মহান আল্লাহ আমাকে ও পাঠককূলকে এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।–আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশি ব্যবস্থার পরিচিতি

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পুলিশ নানা নামে বা ধরনে (Style) মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে আসছে। পুলিশ ইতিহাস সভ্যতার মতই প্রাচীন। মানব সভ্যতা রক্ষার একটি অন্যতম উপাদান (Component) হলো যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আর পুলিশ বিভাগের প্রধানতম দায়িত্ব হল জনজীবনে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বলয় গড়ে তোলা। ইসলামি যুগের শাসকগণ যেমন মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তদ্রূপ বাংলাদেশ সরকারও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করণে ভূমিকা রাখছে। পুলিশের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শাসক শ্রেণির ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী পুলিশ বাহিনী কখনো (ক) উদাসীন বা প্যাসিভ (Passive) পুলিশিং অর্থাৎ অভিযোগ বা অপরাধ গুরুতর না হলে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা; (খ) কখনো শাস্তিমূলক পুলিশিং (Punitive) (গ) দমনমূলক পুলিশিং এতে প্রতিপক্ষকে দমনের জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা হয়; (ঘ) কমিউনিটি পুলিশিং অর্থাৎ স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গৃহীত পুলিশি ব্যবস্থা; (ঙ) প্রতিরোধ-নিরোধমূলক (Pro-active) পুলিশিং অর্থাৎ গতিশীল এ পুলিশি ব্যবস্থায় অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পুলিশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরও দেখা যায় যে, পুলিশ সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে খলিফা, শাসক ও গভর্নরের অধীনে কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো মুহতাসিবের সাথে, কখনো সামরিক বাহিনীর সাথে আবার কখনো বিচারকের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ল্যাটিন শব্দ Police শব্দটি গ্রীক শব্দ Polis থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ নগর।[১] Police শব্দটি সমষ্টিবাচক পদ, সর্বদা একবচনে ব্যবহৃত হয়; কখনও বহুবচন হয় না। নগরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও উদঘাটনের (detection) জন্য এ বেসামরিক সংগঠনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।

Encyclopedia of Britanica তে Police শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– "The department of government concerned primarily with maintaining public order and with investigation branches of the law."[২]

The World Book Encyclopedia তে Police সম্পর্কে বলা হয়েছে– পুলিশ হল সরকারি কর্মকর্তা যারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তারা কমিউনিটির অপরাধ দমন ও জনগণের জানমালের রক্ষায় কাজ করে থাকে।[৩]

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে শৃঙ্খলা-বাহিনী অর্থ:[৪]

(ক) স্থল, নৌ বা বিমান-বাহিনী; (খ) পুলিশ বাহিনী;

(গ) আইনের দ্বারা এই সংজ্ঞার অর্থের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষিত যে কোনো শৃঙ্খলা-বাহিনী।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইংরেজি ভাষায় পুলিশ শব্দটি গ্রহণ করা হয়। এ শব্দটি দ্বারা একটি বেসামরিক বাহিনীকে বুঝানো হয়। জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধান, অপরাধ দমন ও উদঘাটন, অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি প্রদানের জন্য অপরাধীকে ধরে এনে বিচারের সম্মুখীন করাই পুলিশের প্রধান কাজ।[৫]

---

১. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Dhaka: Polwel Printing Press, 1st published, 1999, p. 13

২. Dr. M. Enamul Haq, *Criminal justice system administration,* Dhaka: Ahsania Mission, Oct., 2001, p. 9

৩. Police are government officers who enforce the law and maintain order. They work to prevent crime and to protect the lives and property of the people of a community. see: *The World Book Encyclopedia*, Chicago: World Book, Inc., vol-15, 1989, p. 622

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অক্টোবর-২০১১, পৃ. ৬১

৫. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, আগস্ট-২০০৩, পৃ. ১৩

হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন চীনে এক ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। বিশেষ করে সম্রাট তাইজং তার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটানোর জন্য যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার মধ্যে পুলিশি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আভাস পাওয়া যায়। চীনের সম্রাটের কাছ থেকে নিয়োগ পেয়ে কয়েক ডজন প্রিফেট সে সময় চীন সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার দেখভাল করত। প্রাচীন চীনের পুলিশি ব্যবস্থা চীনের সীমানা ছাড়িয়ে জাপান এবং কোরিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

এরপর প্রাচীন চীনের পুলিশি ব্যবস্থার বিভিন্ন আদলের সন্ধান মেলে প্রাচীন গ্রিসে। তবে প্রাচীনকালের পুলিশি ব্যবস্থা কখনোই তেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়নি কারণ সমাজব্যবস্থা তখনো গায়ের জোরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সে সময়ের রাজ-রাজরারা সিভিল পুলিশের ওপর ভরসা না রেখে জয় থেকে শুরু করে ছিঁচকে চোরের শাস্তির বিধান সব কাজই সেনা সদস্যদের দিয়ে সারতেন। সত্যিকার অর্থে সুসংগঠিত পুলিশি ব্যবস্থার জন্ম প্যারিসে ১৬৬৭ সালে রাজা লুইসের হাতে। রাজা লুইস প্যারিসের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রেনিকে পুলিশের লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে নিয়োগ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পুলিশি ব্যবস্থার সূচনা করেন। ফ্রান্সে পুলিশি ব্যবস্থা ভালো জনপ্রিয়তা পাওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপ্তি প্যারিস ছাড়িয়ে সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিফরম পরে পুলিশের দায়িত্ব পালনের রীতিও ফ্যান্সেই প্রথম শুরু হয়।

স্কটিশ কাপড় ব্যবসায়ী প্যাট্রিক কলকুহান তার জীবনের একটা অংশ আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছিলেন। বেশ কয়েক বছর স্বজাতি থেকে দূরে আরেক মহাদেশে আরেক জাতের মানুষের সঙ্গে বসবাস করে তার মাথা খুলে গিয়েছিল। তিনি দেখলেন, টেমস নদীতে ভিড় থাকা বাণিজ্য জাহাজে বারো মাস ছিঁচকে চোরের উপদ্রব লেগেই আছে। ছিঁচকে চোরের দল ঘাটে ভিড়ে থাকা জাহাজ থেকে বছরে প্রায় পাঁচ লাখ পাউন্ডের মালামাল চুরি করে কোম্পানিগুলোকে আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলে দিচ্ছে। ঘাটে ভেড়া জাহাজ থেকে ছিঁচকে চোর তাড়ানোর কাজে প্রথমে তিনি টেমস রিভার পুলিশ সৃষ্টি করলেন।[১] উল্লেখ্য যে, ফ্রান্স রেভ্যুলেশন শুরু হলে পুলিশ বিদ্রোহিদের বিরুদ্ধে যায়নি। ১৭৯৬ সালে ফ্রান্সে Joseph Fouche অধীনে Ministry of General Police of the republic গঠন করা হয়।[২]

সংসদ ইংরেজী-বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে–"Police is the system of preservation of order and peace and enforcement of law- শৃঙ্খলা, শান্তি ও আইন রক্ষা করার ব্যবস্থা; Police is the internal government of a state-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা; Police is the body of men employed to maintain order, peace and law-পুলিশ হল শৃঙ্খলা, শান্তি ও আইন রক্ষার্থে ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত মানব সদস্য, পুলিশ বাহিনী।"[৩]

পুলিশ সম্পর্কে Police and Community with Concept of Communit Policing এর গ্রন্থকার বলেন যে, পুলিশ বলতে সরকারের সে সংস্থার সদস্যদেরকে বুঝায় যারা রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে এবং অপরাধের সনাক্ত ও দমন করে থাকে। আর পুলিশ হল criminal justice system এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। [৪]

---

১. ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: গোলাম সারওয়ার, আমাদের সময়.কম: ঢাকা, বাংলাদেশ, ২২.০২.২০১৬

২. *The World Book Encyclopedia*, London: World Book, Inc-1989, vol-5, p. 663

৩. Compiled by Late Sailendra Biswas, revised by Sri Subodhchandra Sengupta and Late Sudhangshukumar Sengupta, *Samsad English-Bengali Dictionary*, Calcutta : Shahitya Samsad, 50th ed., 2000, p. 850

৪. The police are those who are the members of a government organization which is responsible for enforcing law and maintaining peace and order, prevention and detection of crime. The Police are one of major

Dhaka University Institutional Repository

Police শব্দটির ব্যবহার: Police force (পুলিশ বাহিনী); Police constable (পুলিশের হাবিলদার); Police man (পুলিশ বাহিনীর পুরুষ সদস্য); Police woman (মহিলা পুলিশ); Police officer (পুলিশ কর্মকর্তা); Police office (পুলিশ দফতর); Police state (রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুলিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র); Police station (থানা); Military police (সামরিক পুলিশ) ইত্যাদি।

আল্লামা যামাখশারি (রহ.) এর মতে, Shurta শব্দটি মূলত Shurata শব্দ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। أشرط সাধারণত على অব্যয় সহযোগে ব্যবহৃত হয়। যেমন– أشرط عليه এর অর্থ– to send forward an emissary অর্থাৎ গোয়েন্দা বা গুপ্ত সংবাদবাহককে অগ্রে প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

ইবনে মাসউদ (রা.) শুরতার কর্তব্যকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন– "The Shurta are bound by the condition that they will not return (from a battle) unless Victorious."[২]

মুহাম্মদ আল রাযি এর মতে, أشرط শব্দটি আলামত, চিহ্ন বা টোকেন এর সাথে সম্পর্কিত। যেমন বলা হয়– شرط السلطان যার অর্থ সুলতানের বিশেষ সেনাবাহিনী যাদেরকে বিশেষ চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।[৩]

সাধারণত شرطة (শুরতা) শব্দটি অপরাধী শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত।[৪] আধুনিক আরব পণ্ডিত M.Jawad এর মতে, শুরতা শব্দটি ল্যাটিন সিকিউরিটি থেকে এসেছে।[৫]

সাধারণত জাহিলি যুগে শুরতা বা পুলিশ নামক কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ছিল না। উত্তর এবং কেন্দ্রীয় আরব এলাকায় যেমন– মক্কা বা তার আশেপাশের এলাকায় পুলিশি দায়িত্ব পালনের মত কোনো বেতনভোগী কর্মচারীর অস্তিত্ব ছিল না। জননিরাপত্তা বিধান, অপরাধীর শাস্তি প্রদান বা প্রচলিত বা স্থানীয় আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে বিচার করার মত কোনো পুলিশ বা কোর্ট ছিল না।[৬]

লিসানুন আরব গ্রন্থে أشرط শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়– أشرط فلان نفسه لقضى অর্থাৎ কেউ এরূপ উদ্দেশ্যে নিজেই কার্যসম্পন্ন করেছেন। আরবিতে পুলিশকে الشُّرْطَةُ বলা হয়। লিসানুল আরব ও আল-মু'জামুল ওয়াসিত অভিধানে বলা হয়েছে, আশ-শুরতা অর্থ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান করা। যিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত তাকে আরবিতে একবচনে الشُّرْطِيُّ বহুবচনে الشُّرَط বলা হয়। পুলিশ প্রধানকে صَاحِبُ الشُّرْطَةِ বলা হয়। পুলিশকে 'পুলিশ' বলে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, তাদেরকে অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইন রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ইউনিফর্মের মাধ্যমে তাদের পরস্পরকে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়ে থাকে পুলিশের সব কর্মকর্তা পছন্দনীয় ও রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা কর্তৃক তাঁর বাহিনীতে পুলিশ নিয়োজিত হন বিধায় পুলিশকে পুলিশ অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়।[৭]

---

components of criminal justice system. see: A K M Shahidul Hoque, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Dhaka : Jatiya Mudran, 1st publication, June-2014, p. 13

১. Jarallah Mahmud b. Umar, Al-Zamakhsahri, *Asas al-Balagha*, Cairo: 1922, vol. 1, p. 486

২. Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahi Muslim*, Cairo: 1930, vol. 18, p. 24; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, Cairo : 1951, vol. 6, pp. 91-92

৩. Abu Sadat al-Mubarak b. Muhammad Ibn al Athir, eds M. M. Tinahi and T. Ahmad, *Gharib al-Hadith wa'l Athar*, Cairo: 1963, vol. 2, p. 460

৪. Muhammad b. Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Cairo: 1301 A.H., vol. 9, pp. 202-204

৫. Mustafa Jawad, *Majallat al-Shurta Wa'l Amn*, Baghdad: 1963, vol. 1, pp. 15-17

৬. Jawad Ali, *Al-Mufassal Fi tarikh al-Arab Qabl al-Islam*, Beirut: 1970-76, vol. 5, p. 246

৭. "الشُّرْطة: حفظة الأمن في البلاد، الواحد شرطي، وصاحب الشرطة رئيسها، سُمُّوا بذلك لأنهم أعَدُّوا لذلك، وأعْلَمُوا أنفسَهم بعلامات يُعْرَفون بها، وقيل: لأن شُرْطة كل شيء خِيارُه، وهم نُخْبةُ السلطانِ من جُنده." لسان العرب لابن منظور، مادة شرط
المجلد السابع ص والمعجم الوسيط، مادة شرط.;
Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Ibid, p. 202

Dhaka University Institutional Repository

যেমন– আরবি বাকরীতিতে شرطة الحرب (শুরতাতুল হারব) শব্দটি যুদ্ধরত সৈন্যের প্রথম রেজিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হত।[১]

Concise Encyclopedia of Arabic Civilization গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুলিশ অর্থাৎ শুরতা হল নির্দিষ্ট সৈন্যদল, দেহরক্ষী। পুলিশ হল খলিফাদের জনপ্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান; বিশেষ করে আবক্ষাসীয় যুগে। তখনকার সময়ে পুলিশ বিভাগকে দিওয়ান আল-শুরতা বলা হত এবং পুলিশ প্রধানকে বলা হত সাহিব আল-শুরতা।[২] পুলিশ শব্দটিকে জনপ্রিয়ভাবে শুরতি বা শুরাতিন বলা হত।[৩]

শুরতা হল ইসলামি সভ্যতায় রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বিশেষ করে জননিরাপত্তা বিধান, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। شرطة (শুরতা) শব্দটি মূল অক্ষর ش ر ط থেকে গঠিত। ইহা ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় একটি বিশেষ বিভাগ। যার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা। সাহিব আল-শুরতা হলো এর প্রধান বা অধিনায়ক।[৪]

Shurta-সম্পর্কে Wikipedia, the free encyclopedia তে উল্লেখ করা হয়েছে–

> Shurta (Arabic: is the common Arabic term for police, although its precise meaning is that of a "picked" or elite force. Bodies turned shurta were established in the early days of the Caliphate, perhaps as early as the caliphate of Uthman (644-656). In Umayyad and Abbasid times, it had considerable power, and its head, the sahib al-shurta (Arabic), was an important official, whether at the provincial level or in the central government. The duties of the shurta varied with time and place: it was primarily a police and internal security force and also had judicial functions, but it could also be entrusted with suppressing brigandage, enforcing the hisbah, customs and tax duties, rubbish collection, acting as a bodyguard for governors, etc. From the 10^{th} century, the importance of the shurta declined, along with the power of the central government. The army-now dominated by foreign military castes (ghilman or mamalik)-assumed the internal security role, while the cities regained a measures of self-government and appropriated the more local tasks of the shurta such that of the night watch.[৫]

---

১. Zamakhsahri, *Asas al-Balagha*, Op.cit. vol. 1, p. 486

২. Shurtah (orginally designation of a selected troop, a body-guard). Among the most important services of the public administration in the caliphate, especially at the 'Abbasid' period, figured the police department (diwan al-shurtah). The Chief of Police (sahib al-surtah). see. Stephan and Nandy Ronart, *Concise Encyclopedia of Arabic Civilization*, Amsterdam: Djambatan, 1959, p. 427

৩. Ibid, p. 427

৪. The term Shurta which is one of the root sh-r-t, is one of the terms related to the Islamic government. Regarding the meaning of this word's root, it has been referred to the special and elite units whose duty was executing the rules and law enforcement. Sahib Al-Shurta is a term which refers to the commanders of this institution. see. Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan: Canadian Centre of Science and Education, March-2013, vol. 5, No. 2, p. 66; www.ccsenet.org/ach, visited on 01.11.2014; URL: http://doi.org/10.5539/ach.v5n2p66

৫. http://en.wikipedia.org/wiki/shurta, visited on 26.02.2015

The Reign of al-Mutawakkil গ্রন্থে পুলিশের সম্পর্কে বলা হয়েছে, Shurta হল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের সময় এটি gendarmerie এর অধীনস্থ ছিল। Sahib al-Shurta হল দেহরক্ষীদের প্রধান। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাদেশিক গভর্নর বা শহরের প্রধান স্ব-স্ব এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ববান ছিলেন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এ দায়িত্ব পুলিশ প্রধানের উপর ন্যস্ড় করা হয়। যাকে "Chief Constable" বলা হয়ে থাকে।[১]

Cahen উল্লেখ করেন যে, সাহিব আল-শুরতা ও সাহিব আল-মা'উনা মূলত একটি অপরটির সমার্থক।[২] Lokkegaard এর মতে, সাহিব আল-মা'উনা হল মিলিটারি পুলিশের প্রধান।[৩] Sahib al-shurta কে Sahib al-Mauna, Sahib al-Haras, Sahib al-Balad বলা হত।[৪]

ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ আছে, "শুরতা-(আ) একদল লোকের সংঘ, খলিফার শাসনাধীনে প্রদেশসমূহের প্রশাসকগণকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সাহায্য করতেন। শুরতা-পুলিশ অফিসার শব্দটি কদাচিৎ শুরাতা বলে উচ্চারিত। বহুবচনে শুরাতা এর মৌলিক অর্থ বাছাইকৃত লোক যারা যুদ্ধ করেন।[৫] 'দেহরক্ষী' তারপর এটা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। এরূপ অর্থে কোনো পুলিশ অফিসারকে শুরতা অর্থাৎ শুরতি (শুরাতী) বলা হয়। ইবনে খালদুনের কালে, সাহিব আল-শুরতা পদটিকে স্পেনে সাহিব আল-মদিনা, তিউনিসে হাকিম এবং মিসরে মামলুকদের মধ্যে ওয়ালি বলা হত।"[৬] খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পুলিশকে বলা হত 'শুরতা'। প্রথমদিকে পুলিশ বাহিনী বলতে আহদাসকেও বলা হত।[৭] আর পুলিশ প্রধানকে বলা হত সাহিব আল-শুরতা।[৮] আর মুসলিম স্পেনে পুলিশ প্রধানকে যাহাযোরতা বা সাভাসোরদা (আ.) আসহাবুশ শুরতাহ বলা হত। পুলিশ প্রধান দাপ্তরিকভাবে সাহিব আল-শুরতা পরিচিত হলেও জনগণের নিকট সাহিব আল-মদিনা, 'যাহবাল মেদিনা' বা 'সাহিব আল-লাইল', 'যাহবালেইল' (নৈশ প্রহরী প্রধান) নামে অভিহিত হতেন। তিনি নৈশ পরিদর্শক ছিলেন এবং ফৌজদারি ও অন্যান্য মামলার বিচার করতেন।[৯]

ঐতিহাসিক Levy এর মতে, Shurta প্রাথমিকভাবে পুলিশের সদস্যের মতই।[১০] ঐতিহাসিক N. J. Coulson তার প্রণীত A History of Islamic Law গ্রন্থে Shurta কে পুলিশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[১১] ঐতিহাসিক J. R. Dennett ও Amir Ali এর মতেও Shurta অর্থ পুলিশ।[১২]

ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, shurta al-khamis শব্দের পরিভাষাটি shurta থেকে উদ্ভুত হয়েছে। যা সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসেবে গঠন করা হয়। shurta al-khamis হল একটি বিশেষ ইউনিট। যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য ইউনিটের পূর্বে প্রেরণ করা হয়। এ বাহিনী চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) এর সময় কার্যকর ছিল। এ বাহিনী কয়েক হাজার অনুগত যোদ্ধা নিয়ে গঠিত হয়েছিল যারা হযরত আলি (রা.) এর জন্য জীবন দিতে প্রস্ড়ুত ছিলেন। অধিকন্তু হযরত উসমান ও

---

১. The word Shurta means police or bodyguard, police gendarmerie. Shaib al-shurta means commander of the body guard. In the early history of Islam, the Governor of a province or a town was fully responsible for law and order and for security of the state. These responsibilities developed gradually on an officer called Sahib al-Shurta or "Chief Constable. see. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of Al-Mutawakkil,* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1969, p. 226
২. Ibid.
৩. Ibid.
৪. Ibid. p. 231
৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মুরতজা আল হুসাইনি আল জাবিদি, *তাজুল আরূস*, কুয়েত: মাতবাতু হুকুমাতু কুয়েত, ১৯৬৯ খ্রি., ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫
৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ১৯৯৮, খণ্ড ২৪, ১ম ভাগ, পৃ. ১৩-১৪
৭. S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Dacca: Najmah & Sons Ltd., 1967, p. 238
৮. সৈয়দ আমীর আলী, অনূঃ শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: ঢাকা বুকস্ ইন্টারন্যাশনাল, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৫৩
৯. মোঃ আবু তাহের, *স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৮, পৃ. ১৪৩
১০. Reuben Levy, *An Introduction to the Sociology of Islam*, London: Williams and Norgate Limited-1933, Vol. II, p. 364
১১. Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: 1964, p. 121
১২. Daniel J.R. Dennett, *Marwan b. Muhammad : The Passing of The Umayyad Caliphate*, London: 1978, p. 126; Amir Ali, *A Short History of the Saracens*, London: Macmillan and Co. Limited, reprint, 1916, p. 188

Dhaka University Institutional Repository

আলি (রা.) এর সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য shurta এর এই বিশেষ কমবেট ইউনিটটি ছিল। পরবর্তীতে তাদেরকে মদিনা, কুফা, ফুসতাত, বসরার গভর্নদের অধীনে ন্যস্ড় করা হয়। উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় খলিফাদের শাসনামলে যুদ্ধে অংশগ্রহণের এ ধারা বলবৎ ছিল।[১]

Sasanid Soldiers in Early Muslim Societies গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

> "The definitions of the shurta reveal its evolution from the ranks of the military. Its employees were 'the choice men of the army: and such as compose the first portion of the army that is present in the war of fight, and prepare for death. As It is applied in a tradition to part making it a condition to die, and not return, unless victorious in war."[২]

পরিভাষাগতভাবে jalaqiza শব্দটি jalwaz-এর বহুবচন। যা শুরতা (Police) কর্মচারীর জন্য প্রয়োগ করা হয়। অবলুপ্ত পারসিয়ান শব্দ janbazan (সাহসী মানব) যারা সাসানিয় সাম্রাজ্যের দেহরক্ষীরূপে কাজ করত এবং তাদের এস্কর্ট দিত। এরা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিল। Ibn Battuta তার Rihla গ্রন্থে উল্লেখ করেন jandar (pl. jandira) শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা শুরতা (Police) প্রধান বা রক্ষী প্রধানকে বুঝায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এ শব্দ দ্বারা শুরতা (Police) প্রধান বা রক্ষী প্রধানকে বুঝাত। আল-নুয়ামি মনে করেন jandar শব্দটি jundar থেকে এসেছে। এর অর্থ হল– General of the army।[৩]

যুগে যুগে পুলিশি ব্যবস্থায় ব্যবহৃত পদ-পদবি ও প্রতিশব্দসমূহ

যুগ		প্রতিশব্দ
রসুলুল্লাহ (স.) এর যুগ	:	সাহিব আল-শুরতা। যদিও তখন কোনো সংগঠিত ও বিন্যস্ড় পুলিশ বাহিনী ছিল না।[৪]
খলিফা আবু বকর (রা.) এর যুগ	:	শুরতা। এ যুগেও কোনো সংগঠিত ও বিন্যস্ড় পুলিশ বাহিনী ছিল না।

---

১. The term shurta al-khamis is found, i.e. the shurta which formed the vanguard part of the army. The shurta al-khamis was an elite unit sent to battle before other units, and it seems to have existed under the fourth Caliph 'Ali b. Abi Talib (35/656-40/6610). This unit consisted of a few thousand loyal warriors who were prepared to sacrifice their lives for 'Ali. In addition to this type of shurta, namely an elite combat unit participating in battle, there existed during 'Ali's reign, and even earlier at the time of 'Uthman b. 'Affan (23/644-35/656), another type of shurta. The latter was placed under the command of the Caliph in al-Madina and under the command of his governors in Fustat, Kufa, and Basra. During Umayyad period and the early 'Abbasid one, the shurta continued to exist both as an elite combat unit participating in battle and as an armed urban unit under the conmmand of the Caliph in Damascus. see. Michael Ebstein, *Shurta Chiefs in Basra in the Umayyad Period a Prosonpographical Study*, Jerusalem: Al-Qantara, No. XXXI 1, enero-junio 2010 pp. 106–107; http://www.academia.edu/545802/, visited on 17.06.2014

২. Mohsen Zakeri, *Sasanid Soldiers in Early Muslim Societies*, Wiesbaden: Harbard & Company, 1995, p. 171

৩. The techniacl word jalaqiza is a plural form of jalwaz which is explainded as having been applied to an employee of the shurta. Here we can recognize the concealed Persian word janbazan (daring men), who performed the function of bodyguard and escort for the Sasanid kings and men of high rank. It was perhaps this term which was still in use in later centuries. In the Rihla of Ibn Battuta the jandar and jandar (pl. jandira) are mentioned several times. These referred to the chiefs of the shurta and guards of the governonrs in many lands in the east and west of the Muslim world in the forteenth centry. Al-Nuaymi thinks that jandar may be a condensed form of jundar, literally, general of the army." see. Mohsen Zakeri, *Sasanid Soldiers in Early Muslim Societies*, Ibid, p. 176

৪. "ولقد عرف المسلمون نظام الشرطة منذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن ممنهجة أو منظمة؛ فقد ذكر البخاري في صحيحه (عن أنس رضي الله عنه قال أن قيس بن سعد رضي الله عنه، كان يكون بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير). صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الأحكام، باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. অনু: আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, কায়স ইবন সাদ নবী এর সামনে এরূপ থাকতেন যেরূপ আমিরের (রাষ্ট্রপ্রধান) সামনে পুলিশ প্রধান (সাহিব আস-শুরতা) থাকতেন।

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা উমর (রা.) এর যুগ	:	নিযামুল আস, আশ-শুরতা, আল-হারাস, আহদাস
খলিফা উসমান (রা.) এর যুগ	:	নিযামুল আস, আশ-শুরতা, আল-হারাস, আহদাস
খলিফা আলি (রা.) এর যুগ	:	আশ-শুরতা, সাহিব আল-শুরতা
উমাইয়া যুগ	:	আশ-শুরতা, সাহিব আল-শুরতা, সাহিব আল-হারাস
আবক্ষাসীয় যুগ	:	আশ-শুরতা, সাহিব আল-শুরতা, আল-হারাস, সাহিব আল-হারাস, আল-আহদাস, সাহিব আল-আহদাস, আল-মা'উনা, সাহিব আল-মা'উনা
স্পেনীয় উমাইয়া যুগ	:	'যাহাযোরতা' বা 'সাভাসোরদা' (সাহিব আল-শুরতা'র'[১] স্পেনিস উচ্চারণ), 'আশ-শুরতাতুস সুগরা', 'আশ-শুরতাতুল কুবরা', 'যাহবালেইল' বা 'সাহিব আল-লাইল', 'যাহবাল মদিনা' বা 'সাহিব আল-মদিনা'। ইবনে খালদুনের কালে, সাহিব আল-শুরতা পদটিকে স্পেনে 'সাহিব আল-মদিনা', তিউনিসে 'হাকিম' এবং তুর্কি বা মিসরে মামলুকদের মধ্যে 'ওয়ালি' বলা হত।[২]
বাংলার প্রাচীনযুগ	:	প্রাচীনযুগে সামরিক, আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব যারা পালন করত তাদের দাপ্তরিক পদবির প্রথমাংশ প্রায়শ ছিল 'দণ্ড' এবং দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ সে সঙ্গে অন্য কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধ যেমন 'নায়ক', 'পাশিক', 'শক্তি', 'অধ্যক্ষ', 'পাণিক', 'পাশাধিকরণিক' ইত্যাদি যোগে গঠিত পদ-পদবি। 'দণ্ডপাশাধিকরণিক' বলতে প্রাদেশিক স্তরে পুলিশ প্রধান (The Chief of Police)।[৩]
বাংলার মধ্যযুগ	:	ফৌজদার, থানাদার (কোনো কোনো নগরে স্থাপিত ডেপুটি ফৌজদার), কোতোয়াল (বৃহৎ নগরের পুলিশ অধ্যক্ষ), দারোগা-ই-দাগ (অপরাধীর সন্ধান প্রভৃতি কার্য)। কোতোয়াল প্রভৃতির অধীনে নিম্নশ্রেণির অনেক কর্মচারী ছিল।[৪] সর-ই-লস্কর (সীমান্ত রক্ষার ঘাঁটি প্রধান)[৫] নায়েব বা

১. প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৬ষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৭

২. "الشرطة ويسمى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم، وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة، وفي دولة الترك الوالي. وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة، وحكمه نافذ في صاحبها بعض الأحيان." المقدمة لعبد الرحمن ابن خلدون، الدار البيضاء، المغرب: خزانة ابن خلدون : بيت الفنون والعلوم والآداب، الطبعة الأولى المزينة ٢٠٠٥م، الجزء الثاني، ص

৩. Radhakumud Mookerji, *The Gupta Empire,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd. p. 152; কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-২০১২, পৃ. ২৩

৪. শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গলার ইতিহাস: নবাবী আমল, কলকাতা: দে'জ পাবালিশিং*-২০০৩, পৃ. ৩০৩

৫. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৪১৩; আবদুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২, পৃ. ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

		নায়েব-ই-সুলতান (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ), কোতোয়াল (সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ),[১] মুহতাসিব, বরকন্দাজ, পেয়াদা, পাইক, বকসী ইত্যাদি।[২]
বাংলার ইংরেজ যুগ	:	ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ (DIG), সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (SP), সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ASP), ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, ওভারসিয়ার।[৩]

সুলতানি আমলে পুলিশকে কোতোয়াল বলা হত। কোতোয়াল শব্দ থেকে কোতোয়ালি শব্দের উৎপত্তি। মুসলিম আমলে রাজধানীর সরকারি শিবিরে থাকত একজন গণ্যমান্য পুলিশ প্রধান। তার আরবি উপাধি ছিল শার্তা। এদেশে তাকে বলা হত কোতোয়াল। বর্তমানে পূর্বের সেই কোতোয়াল শব্দটির অস্তিত্ব না থাকলেও কোতোয়ালি শব্দটি এখনও এদেশে প্রচলিত রয়েছে।[৪] প্রতিটি প্রদেশে পুলিশ বিভাগ বা দিওয়ান-ই কোতোয়ালি একজন পুলিশ কর্মকর্তা বা কোতোয়াল-বকালির উপর অর্পিত থাকত। তার অধীনে অনেক কোতোয়াল ছিলেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাদের দায়িত্ব ছিল। তারা শহরে আগন্তুকদের গতিবিধির উপর নজর রাখতেন। অপরাধ সংক্রান্ত বিচারালয়ের সঙ্গেও পুলিশ বিভাগের যোগাযোগ ছিল।[৫]

মক্কা নগরীতে বসবাসরত বনু হাশিম, বনু উমাইয়া ও বনু মাখযুম গোত্রের নেতারা তাদের বংশধরকে রক্ষার জন্য নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেন। গোত্রগুলোর কোনো সদস্য কোনো নরহত্যা সংঘটিত করলে গোত্রপতিরা মৃত ব্যক্তির বংশধরদের রক্তপণ মূল্য বা আল দিয়াত পরিশোধের মাধ্যমে বিবাদের মীমাংসা করত।[৬]

এরূপভাবে মক্কায় আগত বিদেশিদের রক্ষাকল্পে যে রীতি বা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাকে তাহালুফ (a treaty of alliance) বলা হতো। উদাহরণস্বরূপ– মহানবী (স.) এর নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর ইয়াসির বিন আমির যখন বসবাসের জন্য মক্কা গমন করেন তখন তিনি নিজেকে রক্ষার জন্য আবু হুযায়ফা আল মাখযুমির সাথে তাহালুফ চুক্তিতে আবদ্ধ হন।[৭]

মক্কায় বসবাসরত জনগণের নিরাপত্তার জন্য কোনো পুলিশি ব্যবস্থা বা সংস্থা ছিল না। প্রত্যেক গোত্রের নেতারা তার অধীনস্থ নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। ঐতিহাসিক কালকাসান্দির মতে, আসাদ বিন কায়েস আল কিন্দি তার গোত্রের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেকে রক্ষার জন্য হারাস বা প্রহরী নিয়োজিত করেছিলেন।[৮]

---

১. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৩. কাবেদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৭২
৪. নটরাজন, *ওরা সেই পুলিশ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ১০
৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১
৬. Carl Brockelmann, *History of the Islamic Peoples*, London : 1949, p. 5
৭. Abu Muhammad Abdallah b. Muslim Ibn Qutayba, ed. Tharwat Ukasha, *Kitab al Maarif*, Cairo: n.d, p. 256
৮. Abu Abbas Ahmad b. Ali al-Qalqashandi, *Subh al-Asha fi Sinaat al-Insha*, Cairo: 1963, vol. 1, p. 416

Dhaka University Institutional Repository

ইয়ামেনের পরিস্থিতি মক্কা হতে ভিন্ন ছিল। এখানে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল বিধায় ইয়ামেনের রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হারাস বা দেহরক্ষী নিয়োজিত করতেন। ঐতিহাসি তাবারির মতে, ইয়ামেনের শাসনকর্তা Dhu Shanatir নিজেকে রক্ষাকল্পে হারাস বা প্রহরী নিয়োগ করেছিলেন।

R. Macmullen এর মতে, সাধারণ সৈন্যরাই পুলিশের দায়িত্ব পালন করত। নগরে পুলিশের সংখ্যা অপর্যাপ্ত হওয়ায় প্রেটোরিয়ান গার্ড এবং শহরের Cohorts এবং গ্রামবাসীরা পুলিশের কার্যক্রম সম্পন্ন করত।[১] সৈন্যরা সাধারণত প্রতারক বা জালিয়াতদের গ্রেফতার, গোয়েন্দাগিরির কাজ করত। এছাড়া তারা জনগণকে ভীতি প্রদর্শন, প্রহার, মজুতদারদের অনুসন্ধান, রায়টের সময় খ্রিস্টানদের গ্রেফতারে দায়িত্ব পালন করত।[২]

R. Macmullen আরও উল্লেখ করেন যে, মিসরে রোমান সৈন্যরাই পুলিশের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পন্ন করত।[৩] বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল বিধায় সেখানকার রীতি-ঐতিহ্য ছিল রোমানদের অনুরূপ। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেও সুসংসহত দেহরক্ষী বা Bodyguard ছিল।

এছাড়া সাসানীয় সাম্রাজ্যে দেহরক্ষী বা Bodyguard এর ব্যবস্থা ছিল। তাদের জন্য অন্য ধরনের পুলিশ ব্যবস্থা ছিল। ঐতিহাসিক তাবারির মতে, সাসানীয় সাম্রাজ্যে সম্রাটদের জন্য রাজপ্রাসাদ ও তাঁদের কক্ষে দেহরক্ষী বা Bodyguard ছিল।[৪]

ইসলামে সাহিব শব্দটি বিভিন্ন অফিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন-সাহিব আল সাদাকাত, সাহিব আল শুরতা এবং গভর্নর। ইবনে হাবিব আসহাব আল শুরতা অর্থাৎ পুলিশ প্রধানের একটি লম্বা তালিকা প্রকাশ করেন। যাতে হযরত উসমান (রা.) থেকে আবক্ষাসীয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল এর সময় পর্যন্ত পুলিশ প্রধানদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুরূপভাবে ইবনে হাযম আবক্ষাস বিন আব্দুল মুতাল্লিবের সাত বংশের একটি তালিকা প্রকাশ করেন, যাতে আবক্ষাসীয় বংশও অন্তর্ভুক্ত। এ তালিকায়ও তিনি 'সাহিব' শব্দ ব্যবহার করেন।[৫] স্পেন এবং মাগরিব প্রদেশে 'সাহিব আল মদিনা' এবং 'সাহিব আল শুরতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৬]

কর্ডোভায় ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আল মনসুর বিন আবি আমির আল হাযিব তার এক বন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তিনি ক্ষমতা লাভ করতে পারেন তবে তাকে 'খুত্তা' হিসেবে নিয়োগ করবেন। মাগরিব প্রশাসনে খুত্তাত আল ওযিরা, খুত্তাত আল কাদা, খুত্তা আল শুরতা এর শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। খুত্তা (Khutta) শব্দের অর্থ হল এক্সিকিউটিভ অফিস।[৭]

পুলিশ নামক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানটি ইসলামি সাম্রাজ্যের সাথে সংযোজিত হয় বাইজেন্টাইনদের অধীনস্থ প্রদেশ মিসর ও সিরিয়ার মাধ্যমে। এ বিষয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ উদাহরণ রয়েছে।

---

১. Ramsay MacMullen, *Soldier and civilian in the later Roman Empire*, Cambridge: Mass, 1963, p. 50
২. Opcit, p. 51
৩. Ramsay MacMullen, Opcit, p. 54
৪. Abu Jafar Muhammd b. Jarir al-Tabari, Ed. Muhammad A. F. Ibrahim, *Tarikh al-Rusul wa'l-Muluk*; Cairo: 1964; M. J. DeGoeje, Leiden:1880–1889, Serial 1-2, pp. 1013–1014
৫. Ahmad Ghabin, *Hisba, Arts and Craft in Islamic*, Wiesbade: Harrassowitz Verlag., 2009, p. 82
৬. Ibid, p. 83
৭. Ibid, p. 84

Dhaka University Institutional Repository

খলিফাগণ বেশিরভাগ জয়ী রাজ্যে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বহাল রাখেন। স্থানীয় পুলিশ প্রধান ও বিচারকগণ প্রাদেশিক প্রশাসক বা আমীর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং তারা স্থানীয় আইন, প্রথা ও রীতির মাধ্যমে বিবাদ বা বিরোধের মীমাংসা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, নতুনভাবে অধিকৃত এ সমস্ড় রাজ্য স্থানীয় প্রথা যেমন রোমান, বাইজেন্টাইন বা পারস্য আইন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কারণ বিচার ব্যবস্থার কোন ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ (hierarchy) আদালত ছিল না। যেখান থেকে বিচারকগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পেতে পারেন। এজন্য তাকে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হতো।[১]

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে জনজীবনে বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত কাজ সম্পাদনে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মূলত মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রয়োজনের তাগিদে পৃথকভাবে অথবা সংঘবদ্ধভাবে পুলিশি দায়িত্বগুলো পালন করে আসছে। ঠিক কখন থেকে সংগঠিত পুলিশি ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল তা জানা না গেলেও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রথম রাত্রিকালীন পাহারা ও দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধে পুলিশি কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি রাজ্যের অপরাধ দমন ও শান্তি নিশ্চিত করণের জন্য 'দিওয়ানুল আহদাস' (পুলিশ বিভাগ) নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের কাজ ছিল রাজ্যের বিভিন্ন অপরাধ তথা চুরি-ডাকাতি, হত্যা, জুলুম নিবারণ করা, ওজন ব্যবস্থার পরীক্ষা করা।[২] অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য হযরত আলি (রা.) সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। কয়েক হাজার অস্ত্রধারী লোক নিয়ে শুরতা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। তিনি এ বাহিনীর নামকরণ করেন 'শুরতা'। এ বাহিনীর প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বা ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বলা হত।[৩]

বর্তমান সৌদিআরবে (KSA: Kingdom of Saudia Arabia) দু'ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। (১) সিভিল পুলিশ (২) রিলিজিয়াস পুলিশ বা matawain। সিভিল বা সিকিউরিটি পুলিশ সাধারণত দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এটি Ministry of Interior এর অধীনে কাজ করে থাকে। আর রিলিজিয়াস পুলিশ বা matawain পুলিশ পাপ ও পুণ্যের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে থাকে।[৪]

ইরানে দু'ধরনের পুলিশ ব্যবস্থা চালু আছে। (১) ন্যাশনাল পুলিশ যা Ministry of Interior এর অধীনে কাজ করে থাকে। (২) বাসিজ (Basij) যারা ইরানি রেভ্যুলেশনারি গার্ডের অধীনে কাজ করে।

---

১. For the most part, the caliphs retained the administrative organization that existed in the territories that they conquered. The local chiefs of police and judges that were appointed by the provincial administrator and given the authority to hold a court to adjudicate local disputes were expected to utilized local law or custom to resolve issues. It should be noted that in addition to local customs, some of these new territories had been previously influence by Roman, Byzantine and Persian legal ideas. Moreover, because there was no hierarchy of courts from which a local judge could seek guidance, he was left to his own discretion in deciding disputes. see: Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems A Comparative Survey*, Waltham: Anderson Publishing-2013, Eight Edition, p. 543

২. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৩য় পুন:মুদ্রণ, জুন-২০০৪, পৃ. ১২৮–১২৯

৩. মাওলানা মুজীবুর রহমান, *হযরত আলী (রা.)*, ঢাকা: ইসলামিয়া লাইব্রেরী-১৯৬৮, পৃ. ৩৩৮

৪. Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems A Comparative Survey*, Waltham: Anderson Publishing-2013, Eight Edition, p. 600-601

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি রেভ্যুলেশন রক্ষা এবং স্থাপনাসমূহের সহযোগিতার জন্য আয়াতুল্লাহ খোমেনি এ বাহিনী তৈরি করেন। Basij মূলত সহায়ক মিলিশিয়া বাহিনী। এ ছাড়াও এ বাহিনী দেশের কৃষ্টি ও কালচার বিদেশী আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য কাজ করে থাকে।[১]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) পুলিশি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পরবর্তী খলিফাদ্বয় হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) ও হযরত আলি ইবন আবি তালিব (রা.) উক্ত পুলিশি ব্যবস্থাকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠা করেন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো বলিষ্ঠতর করেন। এর প্রেক্ষিতে দেখা যায় পরবর্তী উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় খলিফাগণের জন্য এ পুলিশি ব্যবস্থাকে সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে ঢেলে সাজাতে অনেক সহজ হয়েছে। দিল্লির সুলতান ও মোগল শাসকগণ আবক্ষাসীয় তথা ইসলামি শাসন ব্যবস্থার অনেক বিষয় অনুকরণ করেন। অনুকরণীয় এ বিষয়গুলোর মধ্যে পুলিশি ব্যবস্থাও অন্যতম। আর বাংলাদেশ পুলিশের আইনগত ভিত্তি **১৮৬১** সালের পুলিশ আইন (Act V of 1861) হলেও ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক সুবে-বাংলায় যে পুলিশি কাঠামো তৈরি হয়েছিল ইংরেজগণ তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেননি। এদেশে পুলিশের মূল ভিত্তি মুসলিম শাসনামলের আশীর্বাদপূর্ণ এটি জোর দিয়ে বলা যায়।

১. Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems A Comparative Survey*, Waltham: Anderson Publishing-2013, Eight Edition, p. 543

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুলিশ বাহিনীর ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামপূর্ব আরবের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	হযরত মুহাম্মদ (স.) এর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পুলিশি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুলিশ বাহিনীর ক্রমবিকাশ
প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামপূর্ব আরবের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলামের জন্মভূমি আরবদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপদ্বীপ। এটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। আরবের উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হতে এটি এশিয়া-ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আর তিন দিকে সাগর বেষ্টিত বলে একে 'জাজিরাতুল আরব' বলা হয়।[১]

ইসলামপূর্ব যুগকে সাধারণভাবে আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে এ যুগে আরবে কোনো নিয়ম-কানুন ছিল না, কোনো নবীর আবির্ভাবও ঘটে নাই এবং কোনো ঐশী কিতাব নাজিল হয়নি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দী কালকে সাধারণভাবে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়ে থাকে। এ যুগে সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও কুসংস্কারে আরবগণ আচ্ছন্ন ছিল এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিল। বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য ঘটনা হতে ঝগড়াঝাটি ও শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি হয়ে যেত।[২] কলহ বিবাদ, খুন-জখম, অন্যায় অবিচারে আরববাসী নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তবে বর্তমান ধরনের মত কোনো প্রকার সুষ্ঠু শিক্ষা পদ্ধতি আরবে প্রচলিত না থাকলেও বাগ্মিতা ও কাব্যচর্চায় আরবগণ বিখ্যাত ছিল। সে যুগে আরবি ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। তারা জমি ও তৃণভূমির মালিকানা নিয়ে একে-অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হত। খ্রিস্টিয় এক শতাব্দীতে আরবগণ অন্যান্য দেশের সাথে জীবিকার উপায় হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক তাদের নতুন সভ্যতা ও ধারণার সংস্পর্শে নিয়ে আসে। মূলত অধিকাংশ আরববাসী ছিল মুর্তিপূজারী। তাদের জন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো দার্শনিক মতবাদ ছিল না। আরবের সর্বত্র অজ্ঞতা বা কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল।[৩]

প্রাচীন আরবের অর্থনীতি মন্দা সত্ত্বেও আরব বেদুইনগণ উদ্দ্যম ও আনন্দফূর্তিতে জীবনযাপন করতেন। তাদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল (১) পশুপালন (২) ব্যবসা-বাণিজ্য ও (৩) দস্যুতা। তাদের জীবনযাপন ছিল খুবই সংগ্রামী ও সাহসিকতাপূর্ণ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিভিন্ন বংশ বা দল পাশাপাশি বসবাস করত। বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশি এসব বংশ বা দলকে উপাজাতি (Tribe) বলা হত। সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বয়সের বিবেচনায় শেখ নির্বাচিত করা হত। আরবগণ নিজস্ব বংশ বা গোত্রের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন।[৪]

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, ঢাকা: বাঁধন পাবলিকেশন, ২০১০, পৃ. ১৬

২. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, ঢাকা: নওরোজ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ প্রকাশ, ডিসেম্বর-২০০৯, পৃ. ৪২

৩. Before the rise of Islam, the people of Arabia were divided into many tribes whose main livelihood was animal husbandry. They used to quarrel with each other over the ownership of land and pastures. In the last hundred years of the century of Christ, trade with other countries also became an important means of livelihood. The foreign trade brought the people of Arabia into contact with new civilizations and ideas. Majority of the people in Arabia were idol-worshippers. They had no religious scriptures or mythology based on deep philosophical thinking. Everywhere in Arabia ignorance and superstitions reigned supreme. see: V.D. Mahajan, *History Of Medieval India*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd, 1st edt., 1991, pp.12-13

৪. Despite economic distress, the Arab Bedouin passes his life in enterprise, pleasure and gaiety. He has three means of livelihood: animal husbandry, trade and plunder. The community of friendly neighbouring clans is called a "tribe' is called the 'Seikh'. He gets this post of pride on grounds of bravery, intelligence and seniority in age. An Arab may sacrifice every thing for his clan or tribe for his life is impossible without it. see: V.D. Mahajan, *History Of Medieval India*, Ibid, p. 13

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামপূর্ব যুগে আরবে শেখ তন্ত্র প্রচলিত ছিল। শেখ বা গোত্র প্রধান তার আল-মালা (পরামর্শ পর্ষদ) নিয়ে বিবাদের মীমাংসা করতেন। প্রতিটি গোত্র তার সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে দায়ী থাকত। গোত্র প্রধান বা শেখ তাঁর গোত্রের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য দায়িত্বান ছিলেন। তিনি বিবাদের মীমাংসা ও তাঁর গোত্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন। নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর ছিল। কোনো দুর্বৃত্ত বা অপরাধী পলায়ন করলে সে কোনো আশ্রয় পেত না এবং সে সমাজচ্যুত বা গোত্রচ্যুত হিসেবে অভিহিত হত।[১]

প্রাচীন আরবে বিচারের ক্ষেত্রে হাকাম বলতে বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিষদ (Assembly) এবং শাসনকে বুঝাতো। হাকাম অর্থ-শাসন করা ও বিবাদের মীমাংসা করা। গোত্রপতিগণ নিজ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বিবাদ মীমাংসা করে দিতেন এবং আন্তঃগোত্রীয় ব্যক্তিদের বিবাদের ক্ষেত্রে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মীমাংসার দায়িত্ব প্রদান করা হত।[২]

এ সময়ে আরবদের অপরাধ সাধারণত সমস্ত গোত্রের উপর আরোপিত হত। কোনো গোত্রের কেউ আহত বা নিহত হলে আহত বা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণস্বরূপ দায়ী গোত্রের নিকট থেকে আত্মসমর্পণ ও রক্তপণ মূল্যসহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ছিল। এসব বিবাদের মীমাংসা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবি অনুযায়ী প্রমাণ ও শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত। আর শাস্তি প্রদানের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-রক্ত মূল্য পরিশোধ, চোরের হাত কর্তন, ব্যভিচারের জন্য মুখে কালিমা লেপনসহ অন্যান্য শাস্তি। ইহুদিদের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা হত তাদের নিজস্ব 'পবিত্র তাওরাত' গ্রন্থ অনুযায়ী। অন্যদের ক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী।[৩]

এ সময় আরবের পারিবারিক কাঠামো ছিল খুবই নাজুক এবং নারীরা ছিল খুবই অবহেলিত। পুরুষ সাধারণত যে সমস্ত নারী ক্রয় করতেন তাদের সন্তানের বাবা হতেন। এমনকি এসময় 'নিকাহ্ আল ইসতিবাদাহ্'-এর প্রচলন ছিল। অর্থাৎ কেউ বলিষ্ঠ ও সুদর্শন সন্তানের জন্য তার স্বীয় স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে শয্যাশায়ী করার জন্য আহব্বান করতেন।[৪]

যুদ্ধ ও কলহ

প্রত্যেক গোত্রই অপর গোত্রের প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকত। অতি খুঁটিনাটি বিষয়কে উপলক্ষ করে মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়ে পড়ত। মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত ছিল তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। শিশুকাল হতেই নিহত

---

১. S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslim,* Ibid, p. 227-228

২. In the field of justice, the word Hakam connoted the functions both of an assembly of elders and the goverment. Thus, it meant to govern and also to adjudicate on disputes. The chief of each tribe was its member to decide on individual disputes and in the case of inter-tribal disputes, an arbitrator was appointed who had to be a non-partisan person. see: Tauqir Mohammad Khan, *Jurisprudence in Islam*, New Delhi: New Elegant Printers, 1st Published-2007, p. 41

৩. In a tribal setup, offences were generally ascribed to a tribe as a whole and if a member of one tribe killed or wounded a member of another tribe, the Injured tribe had the right to demand the surrender of the offender failing which retaliation followed, or, as an alternative, compensation was to be paid. The disputes were resolved by proofs, and oaths formed an important method in procedural settlement of claims. The principal form of punishment for crimes against persons was retaliation commutable by payment of blood-money; cutting of the hands of a thief, of blackening the face of an adulterer were the other prevalent modes of punishment. Among the Jews, the revenge theory of punishment, as set in the Torah, was inflicted and, amongst others, the customs, the customs of the brotherhood was the determining factor. see: Tauqir Mohammad Khan, *Jurisprudence in Islam*, Ibid, *Jurisprudence in Islam*, p. 41

৪. The family structure was weak and the status of the female was inferior. A man was father of all the children of the woman of whom he had purchased the right to have offspring to be reckoned as his own kin. A usage known as Nikah al-Istibadah provided that if a man desired a goodly seed he might call upon his wife to cohabit with another man till she became pregnant by him. see. Tauqir Mohammad Khan, *Jurisprudence in Islam*, Ibid, p. 42

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজনের প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য স্পৃহা অন্তরে পোষণ করতে থাকত; যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই হন্তার প্রতি প্রত্যাঘাত করার উদ্দেশ্যে ঢাল-তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পরত।[১]

এরূপে অনুষ্ঠিত কোনো কোনো যুদ্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বংশানুক্রমে অব্যাহতভাবে চলতে থাকত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এই ধরনের শতশত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এই সকল যুদ্ধকে 'আয়্যামুল আরব' নামে অভিহিত করে থাকেন।[২]

এদের মধ্যে 'আব্স্ ও যুব্ইয়ান' এবং 'হরবুল বসূস্' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আব্স্ ও যুব্ইয়ান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। কোনো এক পক্ষ প্রতিযোগিতার নিয়ম লজ্ঘন করার দরুন অপরপক্ষ তাদেরকে আক্রমণ করে; এইরূপে প্রথমোক্ত যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই যুদ্ধ অবিরাম চলতে থাকে।[৩]

একটি চারণ ভূমিকে উপলক্ষ করে বনু বকর ও বনু তামিমের মধ্যে ধক্ষংসাত্মক যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তন্মধ্যে আইয়ামে বু'আস নামক যুদ্ধে উভয়পক্ষের অধিকাংশ সরদার নিহত হয়। উভয় গোত্রের লোকগণ রসুলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র হস্তে বায়াত করাতে এ যুদ্ধের অবসান হয়। কুরায়শদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধগুলি আয়্যামূল ফিজার নামে অভিহিত।[৪]

সম্পদ লুণ্ঠন ও দস্যুতাবৃত্তি

আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে অধিকাংশ গোত্রই লুটতরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। লুটতরাজ দূষণীয় কাজ বলে পরিগণিত হত না। প্রত্যেক গোত্রই অপর গোত্রের ধন-সম্পদ, গৃহপালিত পশু এমন কি স্ত্রী কন্যা পর্যন্ত লুণ্ঠন করে লয়ে যেত এবং বাঁদি-দাসীরূপে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করত। বনে-জঙ্গলে, পর্বত-গহক্ষরে দস্যুগণ দলে দলে লুকিয়ে থাকত। সুযোগ পেলে নিরীহ পথিক অথবা ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণ করে সর্বস্বান্ত করত। নিরীহ পথিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করার বীরত্ব উল্লেখ করে কবিতা আবৃত্তি করত।[৫]

মহানবী (স.) দস্যুতা ও লুণ্ঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। হাদিস শরিফে এসেছে–

ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি ডাকাতি ও লুটতরাজ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৬]

হাদিস শরিফে আরও উল্লেখ রয়েছে–

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানদের জান, মাল ও মান সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম।[৭]

চুরি (সারিকা)

আর্থিক অনটনের দরুন চুরির প্রসারও কম ছিল না। ইতর-সম্ভ্রান্ত নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই চোরের আধিক্য ছিল। যে সব বীরের সমাজে প্রতিপত্তি ছিল না তারাই চুরির ব্যবসায় অবলম্বন করত।

---

১. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, সম্পাদনা-ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফ়া (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮, পৃ. ৫১

২. মুল্লা মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফ়া*, দিল্লি : মাতবাআ উসমানিয়া 'মা'আরিফ, ১৯৫৭, পৃ. ৫৬; সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *সীরাতুন্নবী* 'আ'যমগড় : মাতবা 'মা' আরিফ, ১৯৫১, খ.৪, পৃ. ২৬৮

৩. মুল্লা মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফ়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

৪. মুল্লা মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফ়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৫. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, সম্পাদনা-ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফ়া (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী, সম্পাদনা: ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ঢাকা: ইফাবা, ২য়প্রকাশ-২০১৪, ৩য় খণ্ড, হাদীস-৩৯৩৬, পৃ. ৪৫৯

৭. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

চুরিবিদ্যায় প্রায় লোকই সুদক্ষ ছিল। এজন্যই ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে রসুলুলাহ (স.) স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকেই চুরি না করার অঙ্গীকার নিতেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এরূপ প্রতিশ্রুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ ط إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অনু: "হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট এসে বায়'আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা

সর্বদা মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতিতে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের অন্তরে মায়া মমতার লেশমাত্রও ছিল না। তারা ছিল মনুষ্যত্বহীন ও বিবেক বর্জিত মানুষ। জীবিত উট ও দুম্বার পাছার মাংস তাদের নিকট খুবই লোভনীয় ছিল। জীবন্ত উটের মাংস তারা কেটে নিত। এতে বাকশক্তিহীন নিরীহ প্রাণীগুলো যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকত। অপরদিকে তারা আমোদ-প্রমোদ করে উটের মাংস খেত।[২]

কোনো জীবিত প্রাণীকে গাছের সাথে বেঁধে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করত এবং তীর নিক্ষেপ-অনুশীলন করত। যুদ্ধে বন্দিনী গর্ভবতি স্ত্রীলোকের পেট ফেড়ে সন্তান বের করে হত্যা করত। যুদ্ধে নিহত শত্রুর নাক-কান ইত্যাদি অবয়বসমূহ কেটে হার বানায়ে মেয়েরা গলায় পরত।[৩]

নগ্নতা ও ব্যভিচার

ব্যভিচার অনাচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। হযরত ইবন আবব্বাস (রা.) বলেন-প্রকাশ্যভাবে যিনা করা যদিও অবৈধ ছিল, কিন্তু গুপ্তভাবে যিনা করাকে তারা অন্যায় মনে করত না এবং বলত যে, প্রকাশ্যভাবে যিনা করা ইতরামি; কিন্তু গুপ্তভাবে যিনা করাতে কোনো দোষ নাই।[৪]

পতিতা নারীগণ স্বীয় গৃহদ্বারে পতাকা টাঙ্গিয়ে বসে থাকত।[৫] তাদের জারজ সন্তানকে অন্য লোকের সমান মর্যাদা দেওয়া হত। এমনকি, ইসলামের পূর্বে মক্কা নগরীতেও এইরূপ পতিতা যৌন ব্যবসায়ী নারীর অভাব ছিল না।

বড় বড় আমির-উমরা স্বীয় দাসীদের বেশ্যা বৃত্তি করে অর্থ-কড়ি উপার্জন করার নির্দেশ দিত। 'আব্দুলাহ বিন উবাই মদিনার খ্যাতনামা সরদার ছিল। রসুল (স.)-এর হিজরতের পূর্বে মদিনাবাসীগণ তাকে রাজা বানিয়ে তার মাথায় পরানোর উদ্দেশ্যে একটা মহামূল্যবান রাজমুকুট তৈরি করেছিল।[৬]

১. আল-কুরআন, ৬০ : ১২, দ্র. কুরআনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত আল-কুরআনুল করীম, সেপ্টেম্বর-২০১৪ এর অনুসরণ করা হয়েছে।
২. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *সীরাতুন্নবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
৩. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৪. মুল্লা মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৫. সহিহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৯
৬. মুল্লা মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

মুসায়কা ও উমায়মা নামক তার দুইটি দাসী ছিল। সে তাদেরকে বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ-কড়ি উপার্জন করতে বাধ্য করত। এ বিষয়ে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ م بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অনু: "তোমাদের দাসীগণ, সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের ওপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

বিবাহের প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন আরও কয়েক প্রকারের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; যথা-

(১) সুঠাম ও বলিষ্ঠ সন্তান জন্মাইবার উদ্দেশ্যে স্বামী স্বীয় পত্নীকে কোনো বীর পুরুষের সঙ্গে সহবাস করার অনুমতি দিত। এই অনুমতি দেওয়ার নামই ছিল বিবাহ। উক্ত স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া পর্যন্ত এই বিবাহ বলবৎ থাকত।

(২) পাত্রী বিবাহের উপযুক্ত হলে কয়েকজন যুবককে তার সাথে সহবাস করার অনুমতি দেওয়া হত। এদের সংখ্যা দশের উর্ধের্ক হওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট মহর ধার্য করে বিবাহ করা হত। উক্ত সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যেত। এই সাময়িক বিবাহ 'মুত্'আ' নামে পরিচিত ছিল।[২]

নারীর প্রতি নির্যাতন

নারীদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তারা দায়ভাগের স্বত্বাধিকারিণী হত না। পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। তারা বলত, যে রণাঙ্গনে অসি ধারণ করতে পারে সে-ই দায়ভাগের অধিকারী। এজন্যই শিশুগণও দায়ভাগ হতে বঞ্চিত থাকত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নারীদেরকে ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দৌড়ের ব্যবস্থা করত। ফলে উক্ত নারী নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করত।[৩]

কোনো স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়ার পরও তালাকদাতার বিনানুমতিতে অন্য স্বামী গ্রহণ করার তার কোনো অধিকার ছিল না। বিবাহের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। যার যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারত। 'গায়লান সকফী' যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দশজন পত্নী ছিল।[৪] ওহাব আসাদী যখন মুসলমান হন তখন তাঁর আটজন স্ত্রী ছিল। সহোদর দুই বোনকে এক সঙ্গে বিবাহ করত।

মহর স্বরূপ যে অর্থ প্রদান করা হত তাতে স্ত্রীর কোনো অধিকার থাকত না। এই অর্থের অধিকারী হত তার পিতা।[৫]

মেয়েদেরকে কলঙ্ক ও অমর্যাদার উৎস মনে করত। মেয়ে সন্তান জন্মেছে বলে সংবাদ পেলে পিতা অপমানিতবোধ করত ও লজ্জায় মাথা অবনত হয়ে যেত।

---

১. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩
২. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Karachi: Nazma & Sons, 1976, p. 17
৪. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *সীরাতুন্নবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
৫. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *সীরাতুন্নবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُه مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِه ط أَيُمْسِكُه عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّه فِي التُّرَابِ ط أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অনু: "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট।"[১]

অভিভাবক এবং স্বামীগণ মহিলাদেরকে পশুর ন্যায় সম্পদ মনে করত। নিম্ন অর্থনীতি ও দারিদ্র্যের কারণে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করত এবং এমনকি বিধবাদেরকে তার সন্তানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হত। এমনকি কন্যা সন্তান ও দুর্বল আত্মীয়দেরকে উত্তরাধিকার বঞ্চিত করা হত।[২]

মহানবী (স.) কন্যা সন্তানের প্রতি উত্তম আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। হাদিস শরিফে এসেছে–

ইবন আবক্ষাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে লোকের দুটি মেয়ে থাকবে, আর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, যতদিন তারা তার সাথে বাস করে কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে তাদের সাথে বাস করে, তাহলে মেয়ে দুটি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে।[৩]

মাদকের প্রভাব

আরবে মদের প্রচলন ছিল সবচাইতে বেশি। মাদক তাদের সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ঘরে ঘরে মদের আড্ডা ছিল। মদ্যপান না করা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বন্ধুবান্ধব নিয়ে শরাবখানায় আড্ডা বসত। অনেক সময় মালিক মাদকাসক্ত অবস্থায় আস্তাবলে প্রবেশ করে উটগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করত।[৪]

মাদকের ধক্ষংসাত্মক পরিণতির বিষয়ে মহানবী (স.) উল্লেখ করে বলেন–

عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصر هاوحاملها والمحمولة إليه.

অনু: "হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– আল্লাহর লানত শরাবের উপর, তা পানকারীর উপর, যে পান করায় তার উপর, যে বিক্রি করে তার উপর, যে তা ক্রয় করে তার উপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার উপর, আর যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে, সকলের উপর।"[৫]

জুয়া খেলা

---

১. আল-কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯

২. The females as cattels were considered as an integral part of the estate of the husband or guardian. The low economic conditions and poverty led to the custom of burying female infants at their birth, and even it is reported that devolution of widows went to the sons as a patrimony. The tribal princples led to the exclusion of the weaker relatives from inheritance and thus women and infants and cognates were denied succession rights. The practice of adoption was a mode of affiliation. It was in addition to the affiliation of a prostitute's child ascribed by her to one of the summoned sexual enjoyers. see: Tauqir Mohammad Khan, *Jurisprudence in Islam*, Ibid, p. 42

৩. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

৪. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *সীরাতুন্নবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০

৫. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র), অনু: ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা-২০১৪, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮

Dhaka University Institutional Repository

মদ্যপানের ন্যায় আরবের ঘরে ঘরে 'জুয়া' খেলারও আড্ডা লেগে থাকত। ধন-সম্পদ বলতে উটই ছিল 'আরবের প্রধান সম্বল।' এ উট দ্বারাই তারা জুয়া খেলত।

জুয়ার মাধ্যমে মাংস গরীব, দুঃখী এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া গৌরবের বিষয় বলে মনে করত। সুতরাং যারা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ না করত তারা সমাজে ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হত; এমনকি তাদেরকে তুচ্ছ কৃপণ বলে আখ্যা দেওয়া হত।[১]

এছাড়া জুয়া খেলার আরও নানা প্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। জুয়া খেলায় তারা এরূপ মত্ত ছিল যে, জুয়ায় পরাজিত হয়ে সমস্ত ধন-সম্পত্তি নষ্ট করার পর স্বীয় স্ত্রী-কন্যার উপর বাজি রেখে জুয়া খেলত এবং পরাজিত হলে স্ত্রী কন্যাকে প্রতিপক্ষের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হত। সুতরাং মদ ও জুয়ার আড্ডায় এসকল বিষয় নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া-কলহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হত। 'আবস্' ও 'যুব্য়ানে'র ইতিহাস বিখ্যাত চল্লিশ বছর স্থায়ী ধক্ষংসাত্মক যুদ্ধও ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা হতেই সূত্রপাত হয়েছিল।[২]

সুদের ব্যবসা

আরবদেশে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সমস্ত সম্পদশালী লোক সুদের কারবার করত। রসুল (স.)-এর চাচা হযরত 'আবক্ষাস (রা.) ব্যবসা করে বহু সম্পদ লাভ করেছিলেন। তিনিও সুদের কারবার করতেন। তায়িফের প্রসিদ্ধ সরদার মাসউদ সকফি এবং তাঁর ভাই 'আবদ ইয়ালিল ও হাবিব মুগিরা বংশীয় লোকদের মধ্যে সুদের কারবার করতেন। তায়িফ বিজয়ের পর যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মুগিরা বংশীয় লোকদিগকে সুদের অর্থের জন্য তাগাদা করতে লাগলেন। তখন অবতীর্ণ হল–

يٰٓأَيُّهَا اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অনু: "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও যদি মু'মিন হও।"[৩]

সুদ সম্পর্কে মহানবী (স.) হাদিস শরিফে উল্লেখ করেন–

عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم
فقال خرمت التجارة في الخمر.

অনু: আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সুরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন নবী (স.) বের হয়ে বললেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।[৪]

হাদিসে আরও আরও উল্লেখ রয়েছে,

عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كله ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل.

---

১. ফখরুদ্দীন রাযী, *আত্‌তফসীরুল কবীর*, করাচি: মাকতাবা ইস্‌হাকিয়া, ৩য় সংস্করন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১
২. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮
৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা-অষ্টম সংস্করন-২০১৪, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

অনু: “হযরত সুলায়মান ইবন আমর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের দিন রসুলুল্লাহ (সা.) কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, জাহিলি যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা কারো উপর যুলুম করবে না এবং অন্য কেউ যেন তোমাদের উপর যুলুম না করে। জেনে রাখ! জাহিলি যুগের হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রত্যাহার করা হলো। আর প্রথম খুনের দাবি যা আমি প্রত্যাহার করছি, তা হলো হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের প্রাপ্য খুনের দাবি। উক্ত গোত্রের একটি পুত্র সন্তানকে লায়ছ গোত্রে দুধ পান অবস্থায় হুযায়ল গোত্রীয় লোকেরা হত্যা করেছিল।”[১]

তায়িফ ছিল তদানীন্তন আরবের শস্য-প্রধান অঞ্চল। সুতরাং তথাকার অধিকাংশ লোকই সুদের কারবার করত। এজন্যই যে সমস্ত শর্তাধীনে রসুলুল্লাহ (স.) তাদের সহিত সন্ধি করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি শর্ত এর ছিল যে, তারা সুদ গ্রহণ করবে না।[২] ইয়েমেন দেশের নাজরানি সওদাগরদের নিকট হতেও চুক্তিপত্রে অনুরূপ শর্ত নেওয়া হয়েছিল।

মেয়াদের মধ্যে টাকা আদায় করতে অসমর্থ হলে, মেয়াদ বাড়িয়ে আসল টাকা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ বলে ধরে নেয়া হত। ইহুদিগণই অধিকতর মহাজনী ব্যবসা করত। এ ধরনের সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةًۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অনু: “হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না ক্রমবর্ধমান এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”[৩]

হাদিস শরীফে সুদকে ধক্ষংসকারী কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন–

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

অনু: “হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– ধক্ষংসকারী সাতটি কাজ থেকে তোমরা বেঁচে থেকো। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন– ১) আল্লাহর সাথে শরিক করা, ২) যাদু করা, ৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, ৪) ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া, ৫) সুদ খাওয়া, ৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং ৭) সধক্ষা, সরলমনা ও ইমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।”[৪]

---

১. *আবু দাঊদ শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৭, মে-২০১৪, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

২. আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন জাবির বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, কায়রো : মাত্বাআতুশ্ শরকিল ইসলামিয়া, ১৯৭৭, পৃ. ৩১৮

৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৩০

৪. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা: ষষ্ঠ সংস্করন-২০১৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ

অতি প্রাচীনকাল হতেই 'আরবগণ আল্লাহু তাআলার প্রতি বিশ্বাস রাখত। অধুনা প্রাপ্ত প্রাচীন শিলালিপিসমূহেও আল্লাহর নাম পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো শিলালিপিতে মানুষের নামের সাথে আল্লাহর নাম সংযুক্তভাবেও পাওয়া যায়। যথা–যায়দুল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইত্যাদি।[১]

হযরত ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক 'আরবগণ একত্ববাদের শিক্ষা পেয়েছিল। কালক্রমে তাদের মধ্যে বহুত্ববাদের উৎপত্তি হয়ে পড়ে অর্থাৎ পয়গম্বরের শিক্ষা ভুলে তারা প্রকৃত প্রভু আল্লাহু তাআলা ব্যতীত আরও ছোট ছোট বহু উপাস্যের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। তারা মনে করত যে আল্লাহু তাআলা আসমান, জমিন সৃষ্টি করে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং যাবতীয় পার্থিব কাজ-আসমান, জমিন সৃষ্টি করে অবসর গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ

অনু: "তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ'।"[২]

তারা মনে করত যে, এই ছোট উপাস্যসমূহের পূজা করলে এবং তাদের নামে কুরবানি করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন এবং এরা তাঁর দরবারে সুপারিশ করবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِه أَوْلِيَاءَ م مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفٰى ط إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ.

অনু: "জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো তাদের পূজা এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।' তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৩]

তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثٰى. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى.

অনু: "তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।"[৪]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আরও উল্লেখ রয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالأٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثٰى.

অনু: "যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ফেরেশতাদের।"[৫]

---

১. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
২. আল-কুরআন, ৩১ : ২৫
৩. আল-কুরআন, ৩৯ : ৩
৪. আল-কুরআন, ৫৩ : ২১-২২
৫. আল-কুরআন, ৫৩ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদিগণ হযরত ‘উযায়র (আ.) কে এবং খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাঁদের পূজা করত তদ্রূপ আরবের পৌত্তলিকগণও ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা মনে করত। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًاؕ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

অনু: “ফেরেশতাদেরকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে পারে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরির নির্দেশ দেবে।”[১]

যে সকল স্থানে জিনের প্রভাব আছে বলে মনে করত সেই সকল স্থানে তাদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের নামে প্রাণী বলি দিত এবং তাদের পূজা করত।[২]

মূর্তিপূজা

প্রকৃত প্রভু আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যান্য যেই সমস্ত উপাস্যের প্রতি তারা বিশ্বাস রাখত, তাদের মূর্তি তৈরি করে তারা পূজা করত। উপাসনালয়সমূহ মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখত। অনেক সময় পাথরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করত ফলে পাথরের স্তুপটি উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়ে যেত।[৩]

মূর্তিদের মধ্যে হুবলই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং তৎপর ছিল মানাত্‌লাত এবং উয্‌যা।[৪] মানাত্‌ নামক মূর্তিটি মদিনা মুনাওয়ারা থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। মদিনার আউস ও খাযরাজ বংশীয় লোকগণ এবং এতদঞ্চলের অন্যান্য গোত্র মানাতের হজ্জ করত। কেউ কোনো সময় কাবা শরিফের হজ্জ করলেও এই স্থানে এসে হজ্জের ইহরাম সমাধা করত। যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কীয় কোনো চুক্তি করলেও মানাতের সম্মুখে এসে শপথ করত।[৫] লাত তায়িফ নগরে অধিষ্ঠিত ছিল। এটা সকিফ বংশীয় লোকদের দেবতা ছিল। তায়িফবাসী লোকগণ একে কাবার সমান মর্যাদা দান করত।[৬]

কুরায়শগণ যখন কাবা শরিফের তাওয়াফ করত তখন এই মন্ত্রটি পাঠ করত: “লাত্‌ ‘উয্‌যা এবং তৃতীয় দেবতা মানাত; এরা আল্লাহর মনোনয়ন প্রাপ্ত; আল্লাহ তাআলার দরবারে এদের সুপারিশ গৃহীত হওয়ার আশা করা যায়।”[৭]

পবিত্র কাবা গৃহে এবং তার চারদিকে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতে নয়টি মূর্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] অন্ধযুগের প্রাচীন ঐতিহাসিক, অভিধান লেখক এবং প্রাচীন শিলালিপির তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক আরও বহু মূর্তির নাম জানতে পারা যায়। মওলানা শিবলি ‘আরদুল কুরআন’ নামক পুস্তকে ষাটটি মূর্তির নাম উল্লেখ করেছেন।[৯]

আরবগণ চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও পূজা করত। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ
الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

---

১. আল-কুরআন, ৩ : ৮০
২. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৩. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৪. মুল্লা মজদুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৫. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *মু'জামুল বুলদান*, মানাত অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
৬. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *মু'জামুল বুলদান*, মানাত অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
৭. হিশাম আল-কালবী, *কিতাবুল আসনাম*, কায়রো : দারুল কুতুব, ১৩৪৩ হি., পৃ. ১৯; The idols they worshipped were al-Lat, al-Uzza and Wudd, etc. With different religious practices. see: Tauqir Mohammad Khan, *Jurisprudence in Islam*, Ibid, p. 39
৮. বা'ল (৩৭ : ১২৫), লাত, উযযা ও মানাত (৫৩ : ১৯-২০), ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর (৭১ : ২৩)
৯. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অনু: "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত কর।"[১]

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে-

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل... الآية.

অনু: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী রসুলুল্লাহ (স.) যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কাবা শরিফের চারপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী রসুলুল্লাহ (স.) নিজের হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন আর বলতে থাকেন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।[২]

লুণ্ঠন, আক্রমণ, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, জুয়া ইত্যাদি নানান অপরাধ বা অসামাজিক কার্যকলাপ সত্ত্বেও আরবদের কিছু গুণাবলী ছিল। যেমন-অতিথিপরায়ণতা, কাব্যপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতি ইত্যাদি। তৎকালীন সময়ে শহুরে জীবন মক্কাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। মক্কা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। মক্কা আরবের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। তীর্থযাত্রীগণ তাদের গোত্রীয় দেবতাগুলো এনে কাবার আঙ্গিনায় স্থাপন করে। তীর্থের অনুশাসনাদির পর আরবগণ পণ্য বিনিময় করে খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত এবং কবিতায় তাহাদের শৌর্যবীর্যগাঁথা আবৃত্তি করত। উষ্ট্র দৌড় এবং ঘোড় দৌড় এ প্রতিযোগিতার অন্যতম ছিল। কবি ছিলেন একাধারে চারণ, একজন জ্ঞানী লোক, ঐতিহাসিক, গীতিবাগীশ ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি। কৌতুক ও অভিশাপের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোকে তিরস্কার করতেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকদের তাদের বীরত্ব, সম্মান ও সাহসিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। প্রাক্ ইসলামি আরবের সেই কবিতাবলীর অতি অল্প নমুনাই বর্তমানে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাগুলো কাবার প্রবেশ দ্বারে ঝুলিয়ে দেওয়া হত এবং সেগুলোকে 'মুয়াল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত' বলা হত। বর্তমানে প্রাপ্ত কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় অন্তত তিনটি বিষয় ছিল আরবদের অত্যন্ত প্রিয়– মদ, ঘোড়া এবং নারী।[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৪১ : ৩৭

২. *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা-অষ্টম সংস্করন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০; *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৮

৩. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, অনু. এুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা: জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ৩য় সংস্করণ-২০০৮, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাব

মহানবী (স.) মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১২ রবিউল আউয়াল মাসে পবিত্র মক্কা নগরীতে আরবের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

আরবের চিরাচরিত প্রথানুসারে আবদুল মুত্তালিব প্রিয় নাতির 'আকিকা-উৎসবের আয়োজন করলেন। আত্মীয় স্বজন ও মক্কার নেতৃস্থানীয় কুরাইশগণ আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞাসা করলেন শিশুর নাম কি রাখলেন?

তিনি উত্তর দিলেন: তাঁর নাম মুহাম্মদ।[২] মুহাম্মদ শব্দটি বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে, রামাই পন্ডিতের 'শূন্য পুরান' কাব্যগ্রন্থের নিরঞ্জনের রুষ্মা কবিতায়। কবির উচ্চারণ:

ব্রহ্মা হৈল্যা মঁহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি
গনেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুনি॥[৩]

উল্লেখ যে, পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মদ' শব্দটি ৪টি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।[৪] এছাড়া একটি আয়াতে আহমদ শব্দটিরও উল্লেখ রয়েছে।[৫]

হযরতের পিতার নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা। তাঁর জন্মের কিছুকাল আগে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বাণিজ্যিক সফর থেকে ফেরার পথে মদিনার নিকট ইন্তিকাল করেন। মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়ের তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিশুকালে হযরত মুহম্মদ (স.)-কে মরুভূমির আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ার জন্য হালিমা নাম্নী একজন ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করা হয়। শিশু মুহাম্মদ (স.) পাঁচ বছর কাল হালিমা (রা.)-এর গৃহে তাঁরই স্তন্যে লালিত-পালিত হন।[৬] ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে, তিনি হালিমার গৃহে ছয় বৎসর প্রতিপালিত হন।[৭] হযরতের বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা আমিনা মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরতের দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দু'বছর পর তাঁর দাদাও পরলোকগমন করেন। তখন হযরতের পিতৃব্য আবু তালিব তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। আবু তালিব মহান ও দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সুখে-দুঃখে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন।[৮]

---

১. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
২. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
৩. ড. মুহাম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, *বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৪; আল-কুরআন, ৩৩ : ৪০
৪. আল কুরআন, ৩ : ১৪৪, ৩৩ : ৪০, ৪৭ : ২, ৪৮ : ২৯
৫. আল কুরআন, ৬১ : ৬
৬. ড. ওসমান গনী, *মহানবী*, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৯৬, পৃ. ১৩২; সম্পাদনা পরিষদ, *হযরত রাসূলে করীম (স.) জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ-২০০৪, পৃ. ৩৩
৭. আল্লামা শিবলী নোমানী, *সীরাতুন নবী*, সম্পাদনা: মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, ঢাকা: প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১ম খন্ড-১৯৭৪, পৃ. ১৬৬
৮. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যকাল থেকে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর বিশ্বস্ততা ও সততা সর্বজনবিদিত ছিল। খাদিজা নাম্নী মক্কার এক সদ্বংশজাতা ও ধনাঢ্যা বিধবা রমণী হযরতকে সিরিয়ায় তাঁর বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। পরিণত বয়সে হযরত পুনরায় সিরিয়ায় যাত্রা করেন। এতে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। তাছাড়া এ বাণিজ্যযাত্রায় খাদিজার অনেক অর্থাগম হওয়ায় তিনি হযরতের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন। খাদিজা হযরতের চাচা আবু তালিবের নিকট হযরতের সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এ সময় হযরতের বয়স ২৫ বছর ও খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর ছিল। যথারীতি তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১] মহানবী (স.)-এর তিনজন পুত্র ছিল, ২জন ছিল প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজার (রা.) গর্ভজাত এবং বিবি মারিয়া কিবতিয়া (রা.) গর্ভজাত আর একজন পুত্র ছিল। তাদের নাম হলো– কাসিম, আবদুল্লাহ ও ইবরাহিম। মহানবী (স.) দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ নবুওয়াত লাভের পর জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাকে ‘তৈয়ব’ ও ‘তাহির’ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মহানবী (স.) তৃতীয় পুত্র ইবরাহিম মারিয়া কিবতিয়ার (রা.) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কন্যাগণের নাম জয়নব (রা.), রুকাইয়া (রা.), উম্মে কুলছুম (রা.) ও ফাতিমা (রা.)।[২] অন্য এক বর্ণনামতে, হযরত খাজিজাতুল-কুবরা (রা.)-ই মহানবী (স.)-এর (প্রায়) সব কয়জন সন্তানের গর্ভধারিণী। শুধু এক পুত্র ইবরাহিম (রা.)-এর জন্ম হয় হযরত মারিয়া কি’বতিয়া (রা.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর বয়স তিনি নবুয়তের সম্মানে ভূষিত হলেন। কিছুকাল হতে হযরত মুহম্মদ (স.) মক্কার অদূরবর্তী হেরা গিরি-গুহায় নির্জনে ধ্যান করে আসছিলেন। বিশেষ করে প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি এভাবে সম্পূর্ণ ধ্যান-ধারণা ও প্রার্থনা-আরাধনায় জীবনযাপন করতেন এবং দীন-দুঃখীদের মধ্যে দান-খয়রাত করতেন। এভাবে যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হল, তখন রমজান মাসের এক পবিত্র রাত্রিতে তিনি আল্লাহর বাণী লাভ করলেন। কুরআনের সেই প্রথম বাণী হলো–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

অনু: “পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’[৪] থেকে।”[৫]

---

১. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

২. ড. মজিদ আলী খান, অনূঃ আবু মুহাম্মাদ, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা), ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫, পৃ. ৩৬৫-৬৭

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৬, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৬২২

৪. আলাক শব্দের অর্থ সংযুক্ত, ঝুলন্ড, রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। তাফসিরকারগণ এর অর্থ রক্তপিণ্ড করেছেন। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানিগণ মাতৃগর্ভে মনুষ্য ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলেন যে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং এ সম্পৃক্তি সংঘটিত না হলে গর্ভাধান স্থায়ী হয় না। এ কারণে বর্তমানে ‘আলাক’ শব্দের অনুবাদ করা হয় ‘এমন কিছু যা লেগে থাকে’। দ্র. আল-কুরআন, ৯৬ : ২; ২২ : ৫; ২৩ : ১২-১৪

৫. আল-কুরআন, ৯৬ : ১-২

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বংশ পরিচিতি[১]

কুরাইশ
↓
কুশায়ি
↓
আবদুল মান্নাফ
↓

আবদুস শামস্ | হাশিম
উমাইয়া | আবদ-আল-মুত্তালিব

আল-আবক্ষাস | আবদুল্লাহ | আবু-

তালিব

মুহাম্মদ | আলি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যুগে শাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নাম। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যার সঠিক দিক-নির্দেশনা ইসলাম ধর্ম প্রদান করেনি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) নবুওয়াত প্রাপ্তির দীর্ঘ ১৩ বছর পর প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা মুকাররমা ত্যাগ করে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। হিজরতের প্রাক্কালে পথিমধ্যে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তিনি ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি. (১২ রবিউল আউয়াল) তারিখে মদিনার নিকটবর্তী কুবা নামক মরূদ্যানে এসে পৌঁছেন এবং পরে সেখানে হযরত আলি (রা.) তাঁদের সাথে মিলিত হন।[২] চান্দ্র বছরের প্রথম মাস মুহররমের প্রথম দিন (১৬ জুলাই) হতে হিজরি সনের প্রবর্তন করা হয়। মহানবী (স.) এর মদিনায় হিজরতের পর থেকে ৪০ হিজরি মোতাবিক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর সময়কালকে ঐতিহাসিকগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগ হিসেবে পরিগণিত করেন। মুহাম্মাদ (স.) এর হিজরতের প্রাক্কালে মদিনার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। মদিনায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মত কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। সুষ্ঠু ও সামাজিক জীবনের ধারণাবোধ তাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আমির আলি বলেছেন, আমরা সে সময়ের কথা বলছি যে সময়ে আরবের

১. P.K. Hitti, *History of the Arabs,* London: The Macmillan Press Ltd, 10th edt. 1970, p. 111
২. সম্পাদিত: মফীজুল্লাহ কবীর অনু: শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

কোনো নগরেই আইন-শৃঙ্খলা ছিল না। পৃথক পৃথক দল পরস্পর কলহে নিযুক্ত থাকায় এ উপদ্বীপটির সর্বত্র অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করছিল।[১]

এ সময় মদিনায় আউস ও খাযরাজ নামক দুটি গোত্র পরস্পর হিংসাত্মক কলহ-বিবাদে লিপ্ত ছিল। মদিনায় এ সময় বসবাসকারী স্বার্থপর ইহুদিগণের চক্রান্তে বুয়াস যুদ্ধ তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। মদিনায় ইহুদিগণ তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা– বানু কাইনুকা, বানু নাদির এবং বানু কুরাইযা। বানু কাইনুকা খাযরাজ পক্ষ এবং বানু কুরাইযা আউসের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। তারা তুলনামূলকভাবে সংঘবদ্ধ ও সভ্য ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারা অনেকটা উন্নত জীবন-যাপন করত। কিন্তু এদের চক্রান্তে পড়ে মদিনার অন্যান্য অধিবাসী উদ্বেগ ও সংশয়ের মধ্যে কালাতিপাত করত। মদিনার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যখন এরূপ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, ঠিক তখন হযরত মুহাম্মাদ (স.) তাদের মধ্যে আগমন করেন। মহানবী (স.) এর হিজরতের প্রাক্কালে মদিনায় ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম এবং পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। তারা নানা প্রকার কুসংস্কার এবং অনৈতিক কাজে লিপ্ত ছিল। ধর্মীয় অধঃপতন, সামাজিক কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মদিনাবাসীগণ মহানবী (স.) কে তাদের দেশে হিজরত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনিও আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর মহানবী (স.) মদিনাতে অনেকগুলো বিষয়ে সংস্কার সাধন করেন। তন্মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুলিশ বাহিনীর ক্রম বিকাশের রূপরেখা আলোচনা করার পূর্বে নিম্নোক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা আবশ্যক।

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র গঠন

মহানবী (স.) এবং তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীগণ শুধুমাত্র দ্বীনী বিশ্বাসের জন্য আপন প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে ইয়াছরিবে গমন করেন। ইয়াছরিববাসী তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। তাঁর আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তারা তাদের নগরীর পুরাতন নাম ইয়াছরিব[২] পরিবর্তন করে মদিনাতুন নাবী (নবীর শহর) বা সংক্ষেপে মদিনা নামকরণ করেন। মদিনায় পৌঁছে মহানবী প্রথমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম মসজিদ। এটা মসজিদুন নবী নামে পরিচিত। এখানে বসেই তিনি ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। মহানবী (স.) এর মদিনায় আগমন ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তখনও মক্কায় বসবাসরত নওমুসলিমগণ বিরামহীন নির্যাতন ও হয়রানিমূলক অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল। কিন্তু মদিনার মুহাজির নওমুসলিমগণ শুধু যে আশ্রয় পেলেন তাই নয়, তাদের জীবন ও সহায়-সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হয়। মহানবী (স.) এর সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মুসলিম উম্মাহর ধারণার উপর ভিত্তি করে।[৩] যে

---

১. "In the days of which we are speaking, there was no law or order in any city in Arabia. Different factions were at strife with each other, and general lawlessness and confusion prevailed in the Peninsula." see: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* London: Macmillan and Co. Limited, reprint, 1916, p. 9

২. وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا দ্র. আল কুরআন, ৩৩ : ১৩

৩. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর সরকার কাঠামো*, ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৪, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত মুসলমান জন্মভূমি এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তারা 'মুহাজিরিন' (স্বদেশ ত্যাগী) আখ্যা পান। আর যে সমস্ত মদিনাবাসী মুসলিম মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দান করে নিজস্ব ও পৈত্রিক সম্পত্তি সমভাগে ভোগের অধিকার দান করেন তাদেরকে 'আনসার' (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করা হয়। এ আনসারদের সহায়তা না পেলে ইসলাম মদিনায় এবং সারা দুনিয়ায় হয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। জগতের ইতিহাসে ধর্মভাইদের জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগের উপমা আর কোথাও দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টির মন্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- "আরবের ইতিহাসে রক্তের বন্ধনের চেয়ে বরং ধর্মের বন্ধনের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা।"[১]

মদিনায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের এবং সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর মুহাম্মাদ (স.) সেখানে প্রথমে ইসলামি শাসনব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মদিনায় তখন তাঁর অনুসারী মুসলমান মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায় ছাড়াও মূর্তি উপাসক, খ্রিস্টান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য মহানবী (স.) ঐসব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা এবং সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতিও অবলম্বন করেন। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সনদ প্রস্তুত করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' বা Charter of Medina নামে পরিচিত। এ সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল।

তন্মধ্যে প্রধান ধারাগুলো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-[২]

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি সাধারণ উম্মাহ বা জাতি গঠন করবে।

২. মুসলমান এবং অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৩. কোনো সম্প্রদায়ই কুরাইশদের কিংবা বাইরের অন্য কোনো শত্রুর সাথে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৪. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সে বহিঃশত্রুর মুকাবিলা করতে হবে।

৫. বহিঃশত্রু কর্তৃক মদিনা শহর কখনও আক্রান্ত হলে সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ একযোগে শত্রুকে বাধাদান করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব-স্ব যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

৬. ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য অপরাধীই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য তার সমগ্র সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।

৭. মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয় এবং সেখানে রক্তক্ষয়, হত্যা এবং অন্যায়-অনাচার নিষিদ্ধ করা হল।

---

১. This was the first attempt in the history of Arabia at a social organization with religions, rather than blood as its basis" see: P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 120

২. আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম, অনূঃ আকরাম ফারূক, *সীরাতে ইবনে হিশাম,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, সেপ্টেম্বর -১৯৯৮, পৃ. ১৪০-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৮. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।

৯. ইহুদিদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করতে হবে।

১১. মুহাম্মাদ (স.) এর পূর্ব অনুমতি ছাড়া কেউ কারও বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১২. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কারও মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে মহানবী (স.) নিজে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তা সমাধান করবেন।

১৩. এ সনদের শর্তাবলী কেউ ভঙ্গ করলে তার উপর আল্লাহর অভিশম্পাত কামনা করা হয়েছে।

১৪. হযরত মুহাম্মাদ (স.) প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকার বলে তাঁকে মদিনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মহানবী (স.) প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মদিনার এ রাষ্ট্রটি ছিল মানব জাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, প্রশাসনিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনা, কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষতাকে সুসংবদ্ধকরণ ও সমন্বয়সাধন এবং কার্যকরীভাবে সকল পর্যায়ে তদারকি নিশ্চিত করার জন্য এ রাষ্ট্রের ছিল এক মজবুত প্রশাসনিক কাঠামো, রাষ্ট্র ও তার কর্মনীতি ছিল বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, ছিল একটি শক্তিশালী সচিবালয়।[১] নিম্নে সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগসমূহ: (১) রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ (২) সীলমোহর সংরক্ষণ বিভাগ (৩) অহী লিখন বিভাগ (৪) রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি সম্পর্কীয় বিভাগ (৫) পত্র এবং নির্দেশাবলী লিখন ও অনুবাদ বিভাগ (৬) অভ্যর্থনা বিভাগ (৭) দাওয়া বিভাগ (৮) জাতি ও গোত্রসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বিভাগ (৯) প্রতিরক্ষা বিভাগ (১০) নিরাপত্তা (আশ-শুরতাহ) বিভাগ (১১) সমরাস্ত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ বিভাগ (১২) বিচার বিভাগ (১৩) হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ (১৪) অর্থ বিভাগ-বায়তুলমাল (১৫) যাকাত ও সাদাকাহ তহবিল বিভাগ[২] (১৬) খেজুর বৃক্ষের কর আদায় বিভাগ (১৭) জনস্বাস্থ্য বিভাগ (১৮) শিক্ষা বিভাগ (১৯) পরিসংখ্যান বিভাগ (২০) কৃষি ও বন বিভাগ (২১) মসজিদ বিভাগ (২২) নগর প্রশাসন বিভাগ (২৩) নগর উন্নয়ন ও প্রকৌশল বিভাগ (২৪) স্থানীয় সরকার বিভাগ ইত্যাদি।[৩]

মহানবী (স.) প্রবর্তিত মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ নিম্নরূপ:[৪]

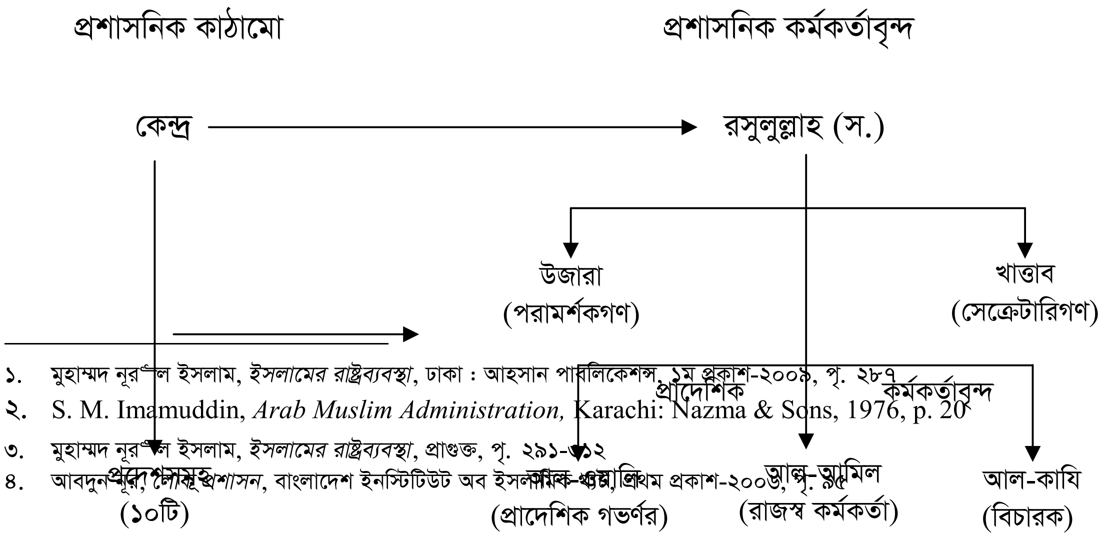

১. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ-২০০৯, পৃ. ২৮৭

২. S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Karachi: Nazma & Sons, 1976, p. 20

৩. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-৩১২

৪. আবদুন নূর, *লোক প্রশাসন*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মাদ (স.) যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, মদিনার সনদ তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইতিপূর্বে সারা দুনিয়ায় আইনের শাসন বলতে কিছু ছিল বলে মনে হয় না। তৎকালীন বিশ্বে শাসকদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। বিশ্বের সরকার পদ্ধতিও ব্যক্তিগত শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বের ইতিহাসে মদিনার সনদই সর্বপ্রথম লিখিত সনদ। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে মহানবী (স.) সর্বপ্রথম সকল সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উক্ত সনদ প্রদান করেন। উক্ত সনদের দ্বারা তিনি ধর্মের ব্যাপারে যে উদার নীতির পরিচয় দেন তা তৎকালীন বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা সেকালের বিশ্ব ইতিহাসে পরধর্মকাতরতা এবং অত্যাচারীর কাহিনী ছাড়া আর কিছু ছিল না। মদিনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদেরকে তিনি ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। মহানবী (স.) মদিনার সনদে মুসলিম এবং অমুসলিম সকল মদিনাবাসীকে সমান অধিকার ও কর্তব্য প্রদান করেন।

ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি যথার্থই মন্তব্য করেছেন–

"মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।"[১]

মদিনা সনদের দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স.) মদিনায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন এবং কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর হাত শক্তিশালী করেন। এ সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্য ও মিলন প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরবর্তীকালে ইসলামের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের পথ সুগম করে।

মদিনা রাষ্ট্রে নিয়মিত সেনাবাহিনীর ন্যায় নিয়মিত কোনো পুলিশ বাহিনীও ছিল না। তবে স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক সাহাবি নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব ছিলেন, বায়তুলমাল থেকে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হত। নিরাপত্তা বিভাগকে আশ-শুরতা বলা হত। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন হযরত কায়েস ইবনে সায়াদ (রা)। বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে যে, এ শক্তিশালী আনসারি সাহাবি সর্বদা রসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে থাকতেন। প্রয়োজনবোধে অপরাধীদেরকে তিনি বন্দী করতেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন-হযরত যুবাইর (রা.), হযরত আলি (রা.), হযরত মিককাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.), হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.), হযরত আসিম ইবনে সাবিত (রা.) ও হযরত যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কিলাবি (রা.)। সুস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া মদিনা রাষ্ট্রে কাউকে গ্রেফতার করা যেত না। মদিনায় একবার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী রসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে এ কথা জানায়। নিরাপত্তা বিভাগের গ্রেফতারকারী কোনো সুস্পষ্ট কারণ দেখাতে ব্যর্থ হলে রসুলুল্লাহ (স.) তখনই বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। অপরাধ দমন, বাজার পরিদর্শন, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ এ বিভাগের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একবার রসুলুল্লাহ (স.) বাজারে গমন করে দোকানদারের দ্রব্যসামগ্রীর অনুসন্ধান শুরু করলেন। এক ব্যক্তির খাদ্যদ্রব্যের ভেতরে হাত দিয়ে ভেতরের দ্রব্য ভিজা

১. Philp K. Hitti, *History of the Arabs,* Ibid, p. 120

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করে সে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ অবস্থা কেন? দোকানদার জবাব দিলেন 'বৃষ্টির পানি পড়ে ভিজে গেছে। রসুলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, "তাহলে এসব ভেজা দ্রব্যগুলো উপরে কেন রাখলে না?" তাতে ক্রেতারা দেখতে পেত। অতঃপর ইরশাদ করলেন, "যারা কোনো প্রকার ধোঁকাবাজি করবে তারা আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

মহানবী (স.) শান্তির দূত হিসেবে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির বার্তা নিয়ে এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও নিঃস্ব ও অত্যাচারিতদের রক্ষার জন্য হিলফুল ফুযুল (Hilful Fudul) নামক শান্তি সংঘ গঠন করেন। সংঘের অন্যতম কার্য ছিল-জালিম ও অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা প্রদান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন।[২] তাঁর সংগঠনের কার্যকলাপ অনেকাংশে পুলিশি কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। নবুওয়াত লাভের পর তিনি মদিনাকে রাজধানী করে আল-কুরআন ও মদিনা সনদের আলোকে ধর্মভিত্তিক ইসলামি সাধারণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় তাৎক্ষণিকভাবে সকল বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হত এবং জনগণই প্রাথমিকভাবে পুলিশি দায়িত্ব পালন করত। তিনি আবু হুরাইরাকে পুলিশি দায়িত্ব দিয়ে বাহরাইনে প্রেরণ করেন।[৩] 'ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে– মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর যুগে পুলিশ বা চৌকিদার বিভাগ নামে কোনো স্থায়ী বিভাগ ছিল না। জনসাধারণ কোনো অপরাধ করলেই নবী (স.) এর নিকট হাজির হয়ে তার কৃত অপরাধের বর্ণনা করতেন। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বয়ং মহানবী (স.) কে কাফির, ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের প্রেরিত গুপ্তঘাতকের হাত থেকে হিফাজত ও নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে কোনো কোনো সাহাবির দ্বারা পাহারাদারির দায়িত্ব পালন করানো হত।[৪] শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বিদায় হজে প্রদত্ত ভাষণে মহানবী (স.) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

> "চারটি কথা, হাঁ, চারটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও-শেরেক করিও না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিও না, অপরের সম্পদ অপহরণ করিও না, ব্যভিচারে লিপ্ত হইও না।"
> তিনি আরও বলেন, "কোনো মানুষের উপর অত্যাচার করিও না।"[৫]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রি. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। এ সময় মদিনায় আউস ও খাযরাজ নামক দুটি বিবদমান গোত্র বাস করত। এ দুটি গোত্রের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহুদি মদিনায় বসবাস করত। মহানবী (স.) মদিনায় হিজরতের সময় তখনকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক ও অস্থিতিশীল। উভয় গোত্র নিজেদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় খুঁজতেছিল। হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনার সকল গোত্রের সমন্বয়ে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মদিনার সনদ প্রণয়ন করেন। মদিনার বিভিন্ন বিবদমান গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন সংঘাত ও দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজেই এর মধ্যস্থতাকারী (Arbiter) এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি জনজীবনের

---

১. মুহাম্মদ নুর"ল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০০

২. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও ড. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী: বুকস প্যাভিলিয়ন, আগস্ট-১৯৮৯, পৃ. ৭; Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, London: Cambridge University Press, reprinted-1979, pp. 329-330

৩. Dr. Muhammad Munir, *Islam in History,* New Delhi: Kitab Bhavan, December-1999, p. 55

৪. মাওলানা মুশাহিদ আলী, অনূঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার*, ঢাকা: ইফাবা, সেপ্টেম্বর-১৯৮৪, পৃ. ১০০-১০১

৫. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ৮ম মুদ্রণ, ডিসেম্বর-২০০৫, পৃ. ৫৬৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রাত্যহিক বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক অনুশাসন প্রদান করেন। জনজীবনে কোনো সমস্যা দেখা দিলে জনগণ সরাসরি তার নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ দিত। তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে পথ নির্দেশনা দিতেন। উদাহরণস্বরূপ মদিনায় কোনো চুরির ঘটনা ঘটলে লোকজন তার নিকট হাজির হয়ে চোরের বিষয়ে করণীয় এবং শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত।[১]

মদিনার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মদিনার মুসলিমদের উপর অর্পিত ছিল এবং বহিঃশত্রুর যে কোনো আক্রমণ থেকে তারা মদিনাকে রক্ষা করত। উদাহরণস্বরূপ উহুদের যুদ্ধের পূর্বে মদিনার মুসলমানরা জানতে পারে যে, মক্কাবাসীরা মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। তখন তারা মদিনায় পাহারা দিত। এসময় সাহাবি যেমন– সাদ বিন মুআয, উসাইদ বিন হুযায়ের এবং সাদ বিন উবাদা মহানবী (স.) কে পাহারা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা করেন।[২] এ সময় মহানবী (স.) যুদ্ধের পূর্বে মুসলিম ক্যাম্প পাহারা দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলামা আল-আনসারির নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন লোক নিয়োগের নির্দেশ দেন।[৩] প্রত্যেকটি যুদ্ধে মহানবী (স.) এর দেহরক্ষী ছিল। যেমন– বদরের যুদ্ধে সাদ বিন মুয়াজ, উহুদের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, খায়বার যুদ্ধে আবক্কাস বিন বিশর, সাদ বিন আবি আক্কাস এবং আবু আইয়ুব আল আনসারি, খন্দকের যুদ্ধে যুবায়ের বিন আউয়াম মহানবী (স.) এর দেহরক্ষী ছিলেন।[৪]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের সময় মহানবী (স.) এর দেহরক্ষী ছিল এবং মুসলিমরা যুদ্ধের সময় তাদের ক্যাম্প পাহারা দিত। সুতরাং মুহাম্মদ (স.) এর সময়ে মুসলিমদের নিরাপত্তা, নগরীতে পাহারা ও দেহরক্ষী ব্যবস্থা চালু ছিল।

মহানবী (স.) ছিলেন মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু, সে কারণে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ সময় তাঁর নিরাপত্তা ভেঙ্গে পড়লে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিই ধ্বক্ষংস হয়ে যেত। উল্লেখ্য, সেকালে শত্রুপক্ষের নেতা ও প্রধানদের গুপ্তভাবে হত্যা করার রীতি আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের ঘটনা বিরোধী গোত্র বা শাখার মনোবলের ক্ষেত্রে কুঠারাঘাত করত। যুদ্ধের সময় তাঁর ব্যক্তিগত নিরাত্তার ঝুঁকি বৃদ্ধি পেত বলে মুসলমানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মহানবী (স.) এর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং এক্ষেত্রে মহানবী (স.)-এর সমর্থনও আদায় করেন।

আনসারের দুটি গোত্র আকাবার শপথ কালে মহানবী (স.)-এর নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গীকার করে। তারা নবী (স.) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত থেকে বিশ্বস্তভাবে অঙ্গীকার পালন করে। মূলত আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে মহানবী (স.) এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত ছিল এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুইজন ব্যক্তি ছিলেন আওস গোত্রের সাদ ইবন মুআয এবং খাযরাজ গোত্রের সাদ ইবন উবাদা। বদর অভিযানে মহানবী (স.) যে আরিশে (তাঁবু) অবস্থান করছিলেন সাদ ইবন মুআয তার সামনে প্রহরায় নিয়োজিত থাকতেন। উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শত্রু বাহিনী বিজয়ীর বেশে হামরা উল আসাদ এর দিকে ফিরে গেলে আওস গোত্রের উসায়দ ইবনুল হুযায়র'সহ আনসারদের দুজন গোত্র প্রধান তাঁর উপর আশু হামলার আশংকায় মহানবী (স.)-এর বাস ভবনে প্রহরায় ছিলেন। পরে হামরা উল-আসাদে শত্রুর মোকাবেলার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রাকালে আওস ও খাযরাজ গোত্রের

---

১. Ahmad bin Yahya al-Baladhuri, ed. Muhammad Hamidullah, *Ansab al-Ashraf,* Cairo: 1959, vol. 1, pp. 278–279
২. Muhammad binUmar al-Waqidi, ed. Marsden Jone, *Kitab al-Maghazi,* London : Oxford, 1966, vol. 1, p. 208
৩. Muhammad binUmar al-Waqidi, *Kitab al-Maghazi,* Ibid, p. 217; Shihab al-Din Ahmad bin Abdal Wahhab al-Nuwayri, *Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab*, Cairo: 1923-1955, vol-17, p. 86
৪. Shihab al-Din Ahmad bin Abdal Wahhab al-Nuwayri, *Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab*, Ibid, vol. 18, p. 23

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট নেতৃবর্গ মহানবী (স.)-এর তাঁবু পাহারা দেন। তাঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন আওস গোত্রের সা'দ ইবন মু'আয, আবক্কাদ ইবন বিশর, উবায়দাহ ইবনে আওস ও কাতাদহ ইবনুল নুমান এবং ৩ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের, তারা হলেন সাদ ইবনে উবাদাহ, হুবাব ইবনুর মুনযির এবং আওস ইবন খাওলি। পরবর্তী বিভিন্ন অভিযান যেমন জাতুর রিকা, আল-হুদায়বিয়া, ওয়াদি উল-কুরাসহ প্রায় সকল অভিযানেই দেহরক্ষী নিয়োগের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেহরক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন আবক্কাদ ইবন বিশর। তিনি সব সময়ই তাঁর প্রিয় নেতা মহানবী (স.) কে রক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নাম বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। অন্যান্য বিশিষ্ট দেহরক্ষীদের নামও উল্লেখিত হয়েছে বলে বর্তমানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, আরো কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন উপলক্ষে দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করেন। তবে তাদের মধ্যে দুজনেই সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির, মক্কার বানু মাখযুমের হালিফ এবং আবিনিসিয়াবাসী সুবিখ্যাত মুয়াজ্জিন বিলাল ইবন রাবাহ।[১]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য দেহরক্ষী: (১) সাদ ইবন মুআয (২) উসায়দ ইবনুল হুযায়র (৩) সাদ উবাদা (৪) আল-হুবাব ইবন আল মুনযির (৫) আওস ইবন খাওলি (৬) সাদ ইবন কায়েস (৭) আল হুবাব ইবন আল মুনবির (৮) কাতাদাহ ইবন আল নু'মান (৯) আবক্কাদ ইবন ইয়াসির (১০) সালামাহ ইবন আসলাম।[২]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যুগে মুসলিমগণ সুসংগঠিত পুলিশ ব্যবস্থা না থাকলেও পুলিশের দায়িত্ব জন সাধারণ কর্তৃক পালিত হত। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সার্বিক নির্দেশনায় জনগণ পুলিশি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করত। সহিহ বুখারি শরিফে উল্লেখ আছে–

কায়েস ইবনে সাদ (রা.) মহানবী (স.)-এর সামনে পুলিশ প্রধান যেমন আমিরের সামনে থাকেন তেমনি থাকতেন।[৩] তবে একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে মহানবী (স.) এর কোনো দারোয়ান ছিল না।[৪]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যুগে পুলিশি ব্যবস্থা সম্পর্কে এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন,

> "To establish peace and order a police (Ahdath) department was established with Sahib al-Ahdath (Shurtah) as its chief officer. In the beginning of Muslim rule generally the duties of the Police were carried out by the people. The Prophet appointed Abu Hurayrah with police duties in al-Bahrain."[৫]

---

১. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর সরকার কাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২–১৮৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৪–৪০৬

৩. The Muslims knew the police system since the Prophet's (peace be upon him) era, but was not in a systematic or organized manner. Al-Bukhari stated in his Sahih (authentic) Book of Hadith that "Qays ibn Sa`d (may Allah be pleased with him) was to the Prophet like a chief police officer to an Amir (chief)." see. http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached.jhtml? visited on 31.05.2012

৪. عن ثابت البناني قال سمعتُ أنس بن مالك يقول لإمرأة من أهله تعرفين فلانة؟ قالت نعم، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال اتقي الله وأصبري، فقالت إليك خلو من مصيبتي قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لكِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفته قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة. দ্র. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারি, *সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আহকাম, বাবুল হাকিম য়াহকুমু বিল কাতলি*, ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সংস্করণ, জুন-২০০৩, হাদিস নং-৬৬৬৯

৫. S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Ibid, P. 238

Dhaka University Institutional Repository

বাজার ও বাজারের সদস্যদের বাণিজ্যিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করা মধ্য যুগীয় সরকারসমূহের জন্য সর্বাবস্থায় ছিল কঠিনতম এক সমস্যা এবং বড়ই কৌশলময় এক বিষয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে করে রসুল পাক (স.) অসাধু বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক তৎপরতা সংস্কার করার জন্য স্বয়ং যত্নবান ছিলেন। কখনো কখনো তিনি নিজেই বাজারের হালচাল পরিদর্শন করতেন এবং পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী বিধানসমূহ জারি করতেন।

তিরমিযির এক হাদিস হতে পাওয়া যায়–

একদিন আল্লাহর রসুল (স.) বাজারে গেলেন এবং একটি খাদ্যের স্তুপের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। (সাবরাহ তা'আম, অর্থাৎ যা বিনা ওজনে ক্রয় ও বিক্রয় করা হচ্ছিল)। তিনি স্তুপের মধ্যে স্বীয় আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ভেতরে সেগুলোকে ভেঁজা দেখতে পেলেন। প্রতারণামূলক কাজের জন্য তিনি বিক্রয়কারীকে তিরস্কার করলেন। বুখারির অপর এক হাদিসে বলা হয় যে, যেখানে খাদ্যশস্য ক্রয় করা হচ্ছিল সেখানে খাদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। অনুরূপভাবে যে, শস্যবিক্রেতারা মুজাযাফাহ (অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়) ব্যবস্থায় লেনদেন করছিল তাদেরকে সে কাজ হতে নিবৃত্ত করেন। খাদ্যশস্য সচরাচর যেখানে বিক্রয় করা হয় কেবলমাত্র সেখানেই খাদ্যশস্য লেনদেনের অনুমতি দেয়া হত। স্পষ্টতই এজন্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে একদিকে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অপরদিকে প্রতারণামূলক প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভবপর হয়।

এ উদ্দেশ্যে নবী (স.) বাজারসমূহের জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। ইবনে সাদ বলেন যে, উমাইয়া গোত্রের সাঈদি পরিবারের একজন সদস্য সাঈদ বিন আল-আস মক্কার পতনের পরপরই এর বাজার কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছিলেন। অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, মদিনাতে উমর বিন আল-খাত্তাব বাজার কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও এ ধরনের কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে আর কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না তবুও এটা ধারণা করাই যুক্তিযুক্ত হবে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে আরও কিছু বাজার কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সকল বিশেষ কর্মকর্তা ছাড়াও প্রাদেশিক গভর্নর, স্থানীয় প্রশাসক এবং তাদের প্রতিনিধিবর্গ এ কাজে শরিক ছিলেন।[১]

১. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর সরকার কাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পুলিশ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের পরিচিতি

দশম হিজরি মোতাবিক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামে খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। খলিফা আবু বকর (রা.) মৃত্যু শয্যায় হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে মনোনীত করে যান। সে মনোনয়ন অনুযায়ী ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত উমর (রা.) খিলাফাত লাভ করেন। খলিফা উমর (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে ছয়জন প্রথম শ্রেণির সাহাবির উপর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। সে ছয়জন নির্বাচক পরস্পর আলোচনা করে হযরত উসমান (রা.) কে খলিফা হিসেবে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত করেন। হযরত উসমান (রা.) কে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে একদল বিক্ষোভকারী হত্যা করে মদিনার মসজিদে হযরত আলি (রা) কে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন। হযরত আলি (রা.) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত আবু বকর থেকে হযরত আলি (রা.) পর্যন্ত এ চার জন খলিফাকে খুলাফায়ে রাশিদিন বলা হয়। কেননা তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর আদর্শ প্রতিনিধি ছিলেন এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে খিলাফত পরিচালনা করতেন। উক্ত সময়ের মধ্যে ইসলামের যেমন বিস্তার হয় তেমনি ইসলামি রীতিনীতি ও আইন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। খুলাফায়ে রাশিদিন নিজেদের কখনও আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও প্রয়োগ করতেন না। তাঁদের দায়িত্ব ছিল 'ইসলামি শরিয়া আইন' বাস্তবায়ন, প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা। খুলাফায়ে রাশিদিন মনোনয়ন দান করতেন বটে, কিন্তু তা ছিল ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে এবং জাতীয় স্বার্থের উপযোগী। তাঁরা কেউ নিজ পুত্রকে মনোনীত করেননি। কথিত আছে যে, হযরত উমর এবং হযরত আলি নিজ পুত্রকে মনোনীত করতে অনুরুদ্ধ হয়ে জবাব দিয়েছিলেন যে, তাঁরা উক্ত পদের যোগ্যতা রাখেন না। খুলাফায়ে রাশিদিনের চারজন খলিফাই মহানবী (স.) এর অতি নিকটতম সাহাবি ছিলেন এবং চারজনই কুরায়িশ বংশোদ্ভুত ছিলেন। তাদের কুরাইশ বংশোদ্ভুত হওয়ার জন্য ফকিহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, খলিফা হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশোদ্ভুত হওয়া অপরিহার্য শর্ত। খলিফা আবু বকরের উপাধি ছিল 'খলিফাতু রসুলিল্লাহ' বা আল্লাহর রসুলের প্রতিনিধি। কিন্তু তিনি সে উপাধি ব্যবহার করতেন না। খলিফা হযরত উমরের উপাধি ছিল 'খলিফাতু খলিফাতি রসুলিল্লাহ' বা আল্লাহর রসুলের প্রতিনিধির খলিফা। কিন্তু এ উপাধি বড় হওয়ায় সংক্ষেপে তিনি খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। খলিফা হযরত উমরের যুগ থেকেই খলিফা উপাধি বিশিষ্ট রূপলাভ করে। তিনি আমিরুল মুমিনিন উপাধিও ব্যবহার করতনে।[১] সে সময় থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্বোধনের জন্য খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন শব্দও ব্যবহৃত হত।

---

১. ইবন সা'দ, *তাবাকাতুল কাবীর*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৪-২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানবতার ধর্ম, শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের ধর্ম। এটা একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি বিঘ্নিত হলে জীবনের অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জনগণের জীবন, সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইন রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর উপর অর্পিত।[১] মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই এক-একজন রক্ষক এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ রক্ষিত বস্তু সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" তাঁর সরাসরি সান্নিধ্য থেকে খুলাফায়ে রাশিদিনের চার খলিফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন এবং গণমানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা নিজ নিজ শাসনামলে মানুষের কল্যাণে পুলিশি কার্যক্রম শুরু করেন। বিশেষ করে হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলি (রা.) এর সময়ে সংগঠিত পুলিশ বাহিনী পরবর্তীকালে মুসলিম প্রশাসনে অপরাধ দমন এবং নাগরিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

ইসলামি রাষ্ট্রে পুলিশ বাহিনীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে গণ্য করা হত। নাগরিক ও সমাজ জীবনে এর রয়েছে সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকা। পুলিশ বাহিনীকে এমন একটি বাহিনীর সাথে তুলনা করা যায় যাদের উপর নির্ভরশীল হওয়া যায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারের রায় বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে। পুলিশ বাহিনী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থানে থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করত।

নৈশ প্রহরার পদ্ধতি যিনি প্রথম চালু করেন তিনি হলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি রাত্রিকালে নগরীতে প্রদক্ষিণ করতেন, মানুষদেরকে পাহারা দিতেন এবং সন্দেহভাজন লোকদেরকে খুঁজে বের করতেন।[২] সম্ভবত আশ-শুরতা ব্যবস্থা খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সামান্য পরিমাণে প্রচলিত ছিল। অতঃপর উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে এর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক পর্যায়ে এর কাজ ছিল বিচার ব্যবস্থার আওতাধীন থেকে বিচারকের ঘোষিত রায়ের সাজা কার্যকর করা। অতঃপর পুলিশ বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করা হয় এবং একজন পুলিশ প্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়। পুলিশ প্রধান অপরাধমূলক কাজের প্রতি তীক্ষ্ম নজরদারি করতেন। প্রত্যেক শহরের জন্য বিশেষ বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা থাকত। তারা সরাসরি পুলিশ প্রধানের অধীনস্থ থাকতেন। পুলিশ প্রধানের অনেক প্রতিনিধি ও সহযোগী-সহকারী থাকতেন এবং প্রত্যেকেই বিশেষ প্রতীক ও পোষাক ধারণ করতেন। তারা খাটো বর্শা বহন করতেন; যার উপর পুলিশ প্রধানের নামাঙ্কিত থাকত। তারা রাতে লণ্ঠন বহন করতেন এবং সাথে প্রহরার জন্য শিকারী প্রহরী কুকুর রাখতেন।[৩]

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের শাসনব্যবস্থা

মহানবী (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও খুলাফায়ে রাশিদিনের প্রশাসন কাঠামো অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মাহনবী (স.) এর মাদানি জীবন ও খলিফা আবু বকরের শাসনকাল শেষ হয়।

---

১. মোহাম্মদ মুজাফফার হুসাইন, *ইসলাম ও সামরিক জীবন*, ঢাকা: ইফাবা, মার্চ-১৯৮৩, পৃ. ৪৮

২. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, মদিনা মুনাওয়ারা: বায়তুল আফকার আদদুয়ালিয়্যা, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭

৩. কামাল ইনানী ইসমাঈল, *দিরাসাত ফী তারীখিল নিযামিল ইসলামিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সে কারণে মহানবী (স.) ও খলিফা আবু বকর (রা.) প্রশাসনিক উন্নতি বিধানে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নি। খলিফা উমরের শাসনকাল (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) শাসন সংস্কারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে মোট ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। সেগুলো হচ্ছে-(১) মক্কা (২) মদিনা (৩) সিরিয়া (৪) আলজাযিরা (৫) বসরা (৬) কুফা (৭) মিসর ও (৮) জেরুজালেম। রোমান শাসনামলে জেরুজালেম ১০টি জেলায় বিভক্ত ছিল। খলিফা উমর (রা.) জেরুজালেমকে প্রধান ২টি বৃহৎ প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন তাকে ওয়ালি বা প্রদেশপাল বলা হত। তাদের আঞ্চলিক রাজধানী ছিল আইলা ও রামলা। মিসরকে তিনি উচ্চ মিসর ও নিম্ন মিসর এ দু'টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। উচ্চ মিসরকে 'ধাস-সাঈদ' বলা হত। ইবনে আবি সারাহ তার প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন। উক্ত প্রদেশে মোট ২৮টি জিলা ছিল। নিম্ন মিসরের প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন আমর ইবনুল আস। উক্ত প্রদেশ ১৫টি জিলায় বিভক্ত ছিল। সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে একটি একক অঞ্চল ধরে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করা হত। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পারস্যে সাসানী আমলের ৬টি প্রদেশ হুবহু রাখা হয়েছিল। প্রদেশগুলো হলো-(১) ফারস (২) কিরমান (৩) খুরাসান (৪) মাকরান (৫) সিজিস্তান ও (৬) আযারবাইজান।

খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনকালে খিলাফতের শাসনকাঠামো একটি নবরূপ লাভ করে। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাও একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা লাভ করে। উক্ত ভিত্তির উপরই পরবর্তীতে মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক এবং অন্যান্য খলিফাগণ উন্নতমানের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের আমলে প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে একটি স্থায়ী সরকারি অফিস ভবন বা (دار الأمراء) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যেকটি প্রাদেশিক গভর্নরের একটা করে সচিবালয় (ديوان) স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। খলিফা উমর (রা.) যখন আম্মার ইবনে ইয়াসারকে কুফার গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তাঁর সাথে ১০ জন বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত কর্মচারীও প্রেরণ করেন। প্রদেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওয়ালি বা প্রদেশপাল, আমিল বা জিলা প্রশাসক, কাযি বা বিচারক, কাতিবুল দিওয়ান বা অর্থ সচিব যিনি সৈন্য বাহিনীর দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন এবং সাহিবু বাইতুল মাল বা কোষাধ্যক্ষ।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার কতগুলো জিলায় বিভক্ত ছিল। জিলা প্রশাসককে 'আল-আমিল' বলা হত। বড় বড় জিলাকে কতকগুলো মহাকুমায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক জিলায় বিচারের জন্য কাযি নিযুক্ত করা হত। জিলা বা আঞ্চলিক শাসকগণ ওয়ালির অধীনে ছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের আমলে 'ওয়ালি' কিংবা 'আমিল' প্রভৃতি কর্মচারীর নিযুক্তির সময় তাঁর সম্পত্তির হিসাব নেওয়া হত।[১] অতঃপর তাঁকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হত। উক্ত নিয়োগপত্রে উক্ত কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ক্ষমতার পরিমাণ উল্লিখিত থাকত। খলিফার স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরকৃত উক্ত নিয়োগপত্রে কয়েকজন গণ্যমান্য আনসার ও মুহাজির ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করতেন এবং মসজিদের সাধারণ সভায় নাগরিকদের সম্মুখে উক্ত নিয়োগপত্র পাঠ করে শোনানো হত। ইমাম আবু ইফসুফ বলেন যে, "খলিফা উমর (রা.) তাঁর ওয়ালিদেরকে নিম্নলিখিতভাবে পরামর্শ দিতেন- আপনারা জেনে রাখুন যে, আমি আপনাদেরকে প্রাদেশিক শাসন পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, কেননা জনসাধারণ আপনাদের অনুসরণ করবে। মুসলমানদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

---

১. আবুল আবক্কাস আহমদ বিন ইয়াহয়া আল-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈর"ত: মুআসসাসাতুল মা'আরিফ, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি., পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে আঘাত দেবেন না যাতে তারা অপমানিত হয় বা তাদের এমন প্রশংসাও করবেন না যাতে তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। আপনার দরজা জনসাধারণের জন্য বন্ধ করবেন না। তাহলে শক্তিশালীগণ দুর্বলদের হজম করে ফেলবে।"[১]

প্রশাসকগণ সকলেই নিয়মিত বেতনসহ ভাতা পেতেন। বেতনের পরিমাণও ছিল উচ্চ। আম্মার ইবনে ইয়াসার বার্ষিক ৬০০ দিরহামসহ দৈনিক রেশন পেতেন। কর্মচারীদের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। অবৈধ উপায়ে ধন সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। দুর্নীতির অভিযোগে আবু হুরাইরা এবং আমর ইবনুল আসের সম্পত্তি খলিফা উমর (রা.) বাজেয়াপ্ত করেন।[২] উল্লেখ্য যে, খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে প্রশাসনের যে সমস্ত বিভাগ সম্পর্কে জানা যায় তা নিম্নরূপ:

১. The bait-ul-mal (The Treasury বা রাজস্ব বিভাগ)

২. The Mahasil (The Board of Taxes বা কর বিভাগ)

৩. The Jund (The Military Department বা সামরিক বিভাগ)

৪. The Educational and religious instruction department (ধর্ম ও শিক্ষা বিভাগ)

৫. The Dar-ul-kuza and Ifta (The Judicial Department বা বিচার বিভাগ)

৬. The Ahdas (The Police Department বা পুলিশ বিভাগ)[৩]

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পুলিশ বাহিনী

মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগে জনগণই সাধারণভাবে পুলিশের দায়িত্বপালন করত। হযরত আবুবকর (রা.) এর সময় পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক রেখে যাওয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। সাধারণভাবে এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শাসনামলের অনুরূপ পুলিশি দায়িত্ব জনসাধারণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। হযরত ওমর (রা.) সর্বপ্রথম রাত্রিকালীন পাহারা ও টহলের ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান (রা.) পুলিশ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করলেও আলি (রা.) সর্বপ্রথম সংগঠিত পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলেন।[৪]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের দুঃসময়ে ত্রাণকর্তারূপে সফলতার সাথে সকল প্রতিকূলতা জয় করে একটি সফল ও জনকল্যাণকর প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর দুই বৎসরকাল শাসনামলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করে প্রশাসনিক সংস্কার শুরু করেন এবং জনকল্যাণে মনোনিবেশ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) সময় ইসলামি সাম্রাজ্যে প্রদেশগুলো হলো- (১) মক্কা (২) তায়িফ (৩) সানা (ইয়ামেন) (৪) হাজরা মাউত (ইয়ামেন), (৫) খোলান (৬) জাবিদ উয়ারিমা (ইয়ামেন) (৭) জিনদ (৮) বাহরাইন (৯) নাজরান (১০) জামাতুল জানদাল (১১) ইরাক (১২) যারস (১৩) হিমস (সিরিয়া), (১৪) জর্ডান (১৫) দামাস্কাস (১৬) প্যালেস্টাইন (১৭) মদিনা।[৫]

---

১. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২. আবুল আবব্বাস আহমদ বিন ইয়াহয়া আল-বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

৩. AL-HAJ MAHOMED ULLAH Ibn S. JUNG, '*THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN ISLAM*', New Delhi: Kitab Bhavan, 3rd ed. 1990, p. IX; Tauqir Mohammad Khan, *Law of Governance In Islam*, New Delhi: Pentagon Press, 2007, p. 71

৪. Umar introduced night watches and patrols and 'Ali introduced for the first time the office of the Shurtah (a police-cum-municipal department) on a regular basis. see: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Ibid, p. 238

৫. S. Athar Husain, *The Glorious Caliphate,* Lucknow : Islamic Research and Publications, 1974, p. 187

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর শাসনামলে প্রাদেশিক গভর্নরদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বগুলো ছিল–

(i) রাজস্ব সংগ্রহ ও সংগৃহীত রাজস্ব যথাযথভাবে সংরক্ষণ।

(ii) রাজ্যেগুলোর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(iii) জনগণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ রাখা।

(iv) আইনানুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা।

(v) যুদ্ধের আগ্রাসন মোকাবিলা করা এবং যুদ্ধে সংগৃহীত গণিমতের মাল যথাযথ বন্টন করা।

(vi) সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ রাখা এবং সৈন্যদের বেতন-ভাতাদির ব্যবস্থা করা।[১]

এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.) এর সময় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বিচারক, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, পুলিশ, আইনের ব্যাখ্যা দানকারী ও লেখক ইত্যাদি।[২]

তিনি প্রশাসনে কিছু মূলনীতি (Principle) প্রবর্তন করেন যা পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা.) এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে ভূমিকা রাখে। তিনি হযরত উমর (রা.) কে কাযি হিসেবে, হযরত উসমান (রা.) ও হযরত যায়িদ (রা.) কে সচিব, আবু উবাইদাহকে কোষাধক্ষ্যরূপে নিয়োগ করেন।[৩] খলিফার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জাতির নৈতিক মান সংরক্ষণ ও নাগরিকদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করা। এ ব্যাপারে তিনি কোনো পুলিশ বাহিনী অথবা অনুরূপ কোনো প্রহরীদল গঠন করেননি। নবী কারীম (স.) এর যুগে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তিনি ঠিক সে ব্যবস্থাই বহাল রাখেন। অবশ্য তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কে প্রহরার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কতক অপরাধের শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজপথগুলোকে চলাচলের জন্য নিরাপদ রাখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। শান্তি-শৃঙ্খলার পথে বাধা সৃষ্টিকারীদের তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আয়াস সালমি নামে একজন কুখ্যাত ডাকাত ছিল। সমগ্র দেশে সে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তারিফা ইবনে আজেরকে পাঠিয়ে সুকৌশলে তাকে গ্রেফতার করান এবং অপরাধীকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৪] তিনি পুলিশি কার্যক্রমের অনুরূপ একটি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে মদিনায় পাহারাদারি ও সাধারণ তত্ত্বাবধানের জন্য নির্দেশ দেন।[৫] হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে পুলিশি কার্যক্রম সম্পর্কে ‘হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)’ গ্রন্থ প্রণেতা সাঈদ আহম্মদ আকবরী বলেন, “তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য পুলিশ বিভাগের মত পৃথক কোনো বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এর কোনো প্রয়োজনও ছিল না। তবু উপস্থিত চাহিদা মিটানোর জন্য কয়েকজন বীর বাহাদুরকে এই কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। উসামা বাহিনী মদিনা হতে রওয়ানা হওয়ার পর কোনো গোত্রের পক্ষ হতে মদিনা আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে হযরত আলি (রা.) ও অন্যান্য সাহাবিকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়।”[৬]

---

১. S. Athar Husain, *The Glorious Caliphate,* Ibid, p. 188

২. "Besides the institution of government a number of offices like judiciary, police, Baitulmal or Treasury, authoritative interpretation of law, writing of documents etc. were set up, which will be discussed in later chapters." see: Ibid, p. 189

৩. S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Ibid, p. 126-127

৪. হাজী মঈন উদ্দীন নদভী, অনূঃ আখতার ফারুক, *সাহাবা চরিত-১*, ঢাকা: ইফাবা, অক্টোবর-১৯৮০, পৃ. ৫৪-৫৫

৫. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী, অনূঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, *তারিখে ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ৩৭

৬. মাওলানা সাঈদ আহম্মদ আকবরী, অনূঃ মোহাম্মদ সিরাজুল হক, *হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৩২৪-৩২৫ ; ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাচ্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাস, ঢাকা: মুক্তচিন্ড়া প্রকাশনা-২০০৮, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী না থাকলেও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় তিনি পুলিশি কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন।

'Abu Bakar' গ্রন্থে Dr. Atta Mohy-ud-din বলেন, "হযরত আবূ বকর প্রথম গণচরিত্র পর্যবেক্ষক (Censor of public morals) নিয়োগ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যিনি নগরীতে টহল দিতেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। আবু বকর (রা.) মদ্যপানের অপরাধসহ কতক অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেন।"[১]

হযরত আবু বকর (রা.) এর সময় মদিনার সেনাবাহিনী বিভিন্ন আরব উপজাতি বিশেষ করে রিদ্দা যুদ্ধে বিদ্রোহীদের দমনে ব্যস্ত ছিল। অনেক সময় সেনাবাহিনী যুদ্ধের কারণে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মদিনা থেকে দূরে অবস্থান করত। এসময় যেহেতু সেনাবাহিনী মদিনার প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল না তাই শত্রুপক্ষ মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে হযরত আবু বকর (রা.) বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। প্রথমত হযরত আবু বকর (রা.) মদিনায় বসবাসরত অধিবাসীদের মধ্যে যারা অস্ত্র বহনে সক্ষম তাদের মসজিদে সমবেত হয়ে শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত করে অপেক্ষমাণ রাখেন।[২]

দ্বিতীয়ত: তিনি মদিনার শহরতলীতে হারাস বা গার্ড মোতায়েন করেন। এ গার্ড কমান্ডারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, আলি বিন আবি তালিব, তালহা বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ, আবদুর রহমান, আল আউস প্রমুখ।[৩] এতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন মদিনা আক্রমণ আসন্ন তখন তাঁরা মসজিদে সমবেত হয়ে আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতেন।[৪]

ধর্মত্যাগীরা পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। হারাস বা প্রহরীর অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল মদিনার মসজিদে সমবেত সশস্ত্র ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করা। এছাড়া তারা শহরতলী পাহারা দিত এবং বেদুঈন উপজাতীদের প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করা তাদের কর্তব্য ছিল।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে পুলিশি ব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবে আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সাধারণতন্ত্রের শাসন প্রণালীকে পরিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন এবং ইসলামের মূলমন্ত্রে তাঁর জনকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থাকে সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে খলিফা সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশের উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা হলেন– হাকিম (Governor), কাতিব (Secretary), কাতিব আল দিওয়ান (Military Secretary), সাহিব আল-খারাজ (Revenue Collector), সাহিব আল-আহদাস (Police Officer), সাহিব বায়তুল মাল (Treasurer) এবং কাযি (Judge)।[৫] এছাড়া হযরত উমর (রা.)-ই ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক যিনি সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার করেন এবং নতুনভাবে কিছু বিষয়ের প্রচলন করেন।[৬]

---

১. Dr. Atta Mohy-Ud-Din, *Abu Bakar*, Delhi: S. Chand & Co., 1968, p. 142
২. Tabiari, Serial-1, Vol-4, 1874, Ibn Miskawayh, Tajarib al-Uman, Leyden: 1909, Vol-1, p. 294-295
৩. Abul Fida Imad al-Din Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, *Al-Bidaya wa'l-Nihaya*, Beirut: vol-6, p. 311
৪. Ibid.
৫. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,*Karachi: Nazmasons, 1976, p. 26
৬. শিবলী নোমানী, অনূঃ মাওলানা মহীউদ্দীন খান, *আল ফারুক*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩য় মুদ্রণ, মে-১৯৮০, পৃ. ৩৩৬-৩৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ক. উমর (রা.) নৈশ প্রহরা (আল-আস);[১] পুলিশ বাহিনী (আল-শুরতাহ),[২] তার প্রধান যাকে বলা হত সাহিব আল-আহদাস; মুহতাসিব নামক একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে হিসবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা করেন, যার কাজ ছিল বিপনণ কেন্দ্রগুলোতে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। মুহতাসিব পুলিশ-কর্মকর্তার পাশাপাশি কাজ করতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন।[৩]

খ. তিনি কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

গ. উমরই (রা.) প্রথম শাসক যিনি শাস্তি হিসেবে নির্বাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।[৫]

ঘ. উমর (রা.) খলিফার দপ্তরে আসা অভিযোগ তদন্তের জন্য এক বিশেষ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খুবই বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল লোকদের এ পদে নিয়োগ দিতেন।[৬]

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত উমর (রা.) আহদাস অর্থাৎ পুলিশ বিভাগের সৃষ্টি করেন। তিনি হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-কে বাহরাইনের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে সাথে ‘ইহতিসাব’ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন।[৭] ‘ইহতিসাব’ সম্পর্কিত কাজগুলো হচ্ছে যেন দোকানদার কর্তৃক ওজনে কম না দেয়া, রাজপথের উপর গৃহ নির্মাণ না করা, পশুর পিঠে অতিরিক্ত মাল না চাপিয়ে দেয়া, প্রকাশ্যে মদ বিক্রি না করা। এ ধরনের গণস্বার্থ ও শরিয়াতের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন সংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনা করা। পুলিশ অফিসারগণ সব দায়িত্ব পালন করতেন।[৮]

দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ও দুর্বৃত্তদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ইন্টেলিজেন্স কালেকশন প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণত পুলিশ বাহিনীর এস.বি (SB-Special Branch) ও সি.আই.ডি (CID-Criminal Investigation Department) এ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি পালন করে থাকে। খলিফা উমর (রা.) স্থায়ীভাবে সি.আই.ডি (CID) বা গোয়েন্দা বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার জুলুমের সংবাদ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে যথাসময়ে তা খলিফাকে অবহিত করা। ‘কানযুল উম্মাল’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, “হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম লোকদের উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি পত্র লেখক, ঘটনার বিবরণদানকারী অন্যান্য তথ্য সরবরাহকারী ও সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন।” ঐতিহাসিক তাবারীর মতে-“হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে কর্মচারীদের কোনো বিষয়ই খলিফার নিকট গোপন ছিল না। গোয়েন্দারা সবকিছু খলিফার নিকট লিখে জানাতেন। পরিদর্শন বিভাগ সৃষ্টি করে খলিফা এ

---

১. "العس هو الذي يطوف شخص بالليل يحرس الناس، ويكشف أهل الريبة." لسان العرب لابن منظور، مادة عسس المجلد السادس، ص ১৩৯

২. "وكان أول من سن نظام العس هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يعس بالمدينة (أي يطوف بالليل) يحرس الناس ويكشف أهل الريبة." تاريخ الأمم والملوك للطبري، المجلد الثاني ص ৫৭৬

৩. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 334

৪. "Prisons- For the first time in Islam Umar established prisons. In Makkah he purchased the house of Safwan bin Umayyah and converted it into a prison. Such prisons were established in important provincial centres. Umar was also responsible for introducing exile as a punnishment." see: Dr. S.A.Q Husaini, *Arab Administration,* Lahore : Ashraf Press, reprint, 1948, p. 53

৫. "Umar was also responsible for introducing exile as a punnishment." see: Dr. S.A.Q Husaini, *Arab Administration,* Ibid, p. 53

৬. মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, অনূঃ আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, *প্রশাসনিক উন্নয়নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ডিসেম্বর-২০০৭, পৃ. ২৪৯

৭. "Abu Hurayrah is definitely known to have been given police powers in al-Bahrayn. Police duties were performed by the public in general. Umar I introduced night watches and patrol. A regularly organised police force was not established until the time of Ali's Khilafat. This Pious Khalifah formed a municipal guard called the Shurtah whose chief was styled Sahibu'sh Shurtah. Supervision of markets, weights and measures and the detection of and prosecution for crimes were among the duties of the police." see: Dr. S.A.Q Husaini, *Arab Administration,* Ibid, p. 53

৮. হাজী মঈন উদ্দীন নদভী, অনূঃ আখতার ফারুক, *সাহাবা চরিত-১*, ঢাকা: ইফাবা, অক্টোবর-১৯৮০, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং এ বিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করার কতিপয় পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।" ইমাম মালেক তাঁর বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'মুয়াত্তায়' বর্ণনা করেন- "উমর (রা.) হাট-বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আব্দুল্লাহ ইবন উতবা (রা.) কে প্রধান এবং যায়েদ ইবন ইয়াযিদকে তার সহকারী নিযুক্ত করেন যাদের দায়িত্ব ছিল অবৈধ ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ওজনে কম-বেশি ও কারচুপি তদারকি করা।"[১]

আল্লামা শিবলী নো'মানী 'আল-ফারুক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> "হযরত উমর (রা.) ফৌজদারি মোকাদ্দমার জন্য পৃথক কোনো বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেননি। ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি গুরুতর অপরাধগুলির বিচার কাযির কোর্টেই করা হত। এতদ্ব্যতীত সর্বপ্রকার প্রাথমিক বিচারের ক্ষমতা পুলিশের উপর অর্পিত ছিল। তখন পুলিশ বিভাগের নাম ছিল 'আহদাস' এবং এর প্রধান কর্মচারীকে বলা হত সাহিব আল-আহদাস। হযরত উমর (রা.) বাহরাইনে কুদামা ইবন মাযঊন এবং আবু হুরাইরাকে কর্মচারী নিযুক্ত করেন। কুদামা ইবন মাযঊন রাজস্ব আদায় করতেন এবং আবু হুরাইরা পুলিশ বিভাগ পরিচালনা করতেন।"[২]

খলিফা উমর (রা.) এর খিলাফতের প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ বিভাগের কর্মকাণ্ড বিচার বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হত। তাদের দায়িত্ব ছিল বিচার বিভাগ থেকে জারিকৃত শাস্তির বিধান কার্যকর করা। পরবর্তীতে পুলিশ বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করা হয় এবং একজন পুলিশ প্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়। যিনি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি তীক্ষ্ণ নজরদারি করতেন। এভাবে প্রত্যেক নগরেই বিশেষ পুলিশ নিয়োজিত থাকতেন যারা সরাসরি কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রধানের অধীনস্ত থেকে পুলিশ প্রধানের প্রতিনিধি ও সহযোগীর ভূমিকা পালন করতেন। পুলিশের জন্য বিশেষ প্রতীক ব্যবহৃত হত। বিশেষ পোশাক পরিধান করতেন, মাতারিদ নামক বিশেষ খাটো বর্শা– যার উপর পুলিশ প্রধানের নামাঙ্কিত থাকত– তা বহন করতেন, রাতে লণ্ঠন ও শিকারী কুকুর সাথে রাখতেন।[৩]

এছাড়া উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) প্রথম মুসলিম শাসক যিনি রাত্রিকালীন টহল ব্যবস্থা চালু করেন তিনি নিজেও মদিনার রাস্তায় টহল দিয়ে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করতেন এবং সন্দিগ্ধ লোকদের তথ্য প্রকাশ করতেন।[৪]

হযরত উমর (রা.) এর সময়ে ইসলামি রাষ্ট্র সুসংহতরূপ পরিগ্রহ করে। তিনি মদিনার বসবাসরত নাগরিকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেন। তিনি নিজেই 'আসাস' এর ভূমিকা পালন করেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তিনি রাস্তায় টহল দেন। এ কাজে এক রাত্রিতে আবদাল রহমান বিন আউফ তাঁর সহযোগী ছিলেন।[৫] অন্য এক রাত্রিতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তার সঙ্গে ছিলেন। এ রাত্রিকালীন টহলের সময় হযরত উমর (রা.) একটি দুররা বা লাঠি সঙ্গে রাখতেন।[৬]

---

১. মাওলানা মুশাহিদ আলী, অনূঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ উমর আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

২. আল্লামা শিবলী নো'মানী, অনূঃ মাওলানা মহীউদ্দীন খান, *আল ফারূক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০; ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাচ্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাস, ঢাকা: মুক্তচিন্তা প্রকাশনা-২০০৮, পৃ. ১২৪

৩. "مطارد جمع طرد: وهو الرمح القصير، لأن صاحبه يطارد به، وهو الألوية كذلك." تاج العروس للزبيدي، باب الدال فصل الطاء مع الراء، المجلد الثامن ص ৩২০؛ دراسات في تاريخ النظم الإسلامية لكمال عناني إسماعيل ص ১৩৭-১৩৮

৪. Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) was the first Muslim ruler who carried out night patrols, as he used to patrol Madinah at night to guard the people and reveal the suspicious people. see: http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached.jhtml?search, visited on: 31.05.2012

৫. Tabari, vol-4, p. 205

৬. Ahamad Ibn Abi Yaqub Ibn Jafar al-Yaqubi, *Tarikh al-Yaqubi*, Najaf: 1964, vol. 2, p. 148

Dhaka University Institutional Repository

উমর (রা.) অতি সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বিচারক নিয়োগের কাজটি নিজেই করতেন। এই পদে নিয়োগ লাভের জন্য যদিও প্রার্থীর জ্ঞানের প্রসিদ্ধিই যথেষ্ট ছিল তবুও উমর (রা.) তার উপর নির্ভর না করে বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কার্যক্ষেত্রে দক্ষতা যাচাইপূর্বক বিচারক নিযুক্ত করতেন। দুর্নীতিমুক্ত বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় উমর (রা.) কর্মকৌশলসমূহ উপস্থাপন করা হলো: (১) সম্মানজনক বেতন-ভাতা (২) সাক্ষ্য গ্রহণ (৩) তদন্ত বিভাগ (৪) পুলিশ প্রশাসন (৫) পরামর্শ গ্রহণ (৬) সম্পদের হিসাব গ্রহণ (৭) জনসংখ্যানুপাতে আদালত (৮) শাস্তি বিধান (৯) মহিলা বিচারক নিয়োগ।[১]

ইয়াকুবির মতে, হযরত উমর (রা.) এর একজন পুলিশ প্রধান ছিল। যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন আবক্ষাস।[২] অনেকের মতে, যদি হযরত উমর (রা.) এর একজন পুলিশ প্রধান থাকতো তবে কেন তিনি রাত্রিকালীন নিজেই রাস্তা পাহারা দিতেন।[৩]

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর যুগে পুলিশি ব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন হযরত উসমান (রা.) তা অপরিবর্তিত রাখেন। হযরত উমর (রা.) যে সমস্ত বিভাগ কায়েম করেছিলেন তিনি সেগুলোকে শক্তিশালী করেন এবং এর অধিক উন্নতি বিধান করেন। প্রশাসনিক প্রয়োজন ও জনগণের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানীর রাজপথগুলো সুগম করেন এবং মদিনার রাজপথগুলোর বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি, সরাইখানা ও নহর তৈরি করেন।[৪] ইমাম সুয়ুতি বলেন, “হযরত উসমানের সময়ে শুরতা (পুলিশ) পুনর্গঠিত হয়েছিল।”[৫] হযরত উসমান (রা.) দেশ জয়ের পর বিজিত প্রদেশে হযরত উমর (রা.)-এর নীতি অনুসরণ করে প্রজাদের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। জনগণের যাতায়াত ও বাণিজ্যে সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, যেখানে অভাব সেখানে খাল কেটে কৃষি জমির জন্য সেচের ব্যবস্থা করেন। রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ এবং সরাইখানা নির্মাণের সু-ব্যবস্থা করেন। পথিকের নিরাপত্তার জন্য সর্বত্র পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেন।[৬] সুতরাং হযরত উসমান উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক গৃহীত পুলিশি কার্যক্রম আরও জোরদার হয় ও গণমানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ মজলিসে শুরা কর্তৃক মনোনীত হতেন। হযরত উমর (রা.) যোগ্যতানুযায়ী কর্মকর্তাদের নাম প্রস্তাব করতেন এবং মজলিসে শুরা কর্তৃক তা অনুমোদিত হত।[৭]

১. ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান, ড. মোছাঃ মনিরা রহমান, *উমর (রা.) এর জীবন ও কর্ম ও শাসন পদ্ধতি*, ঢাকা: আশরাফিয়া বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ-জুন ২০১৫, পৃ. ৪৬০-৪৬১

২. Ahamad Ibn Abi Yaqub Ibn Jafar al-Yaqubi, *Tarikh al-Yaqubi*, Ibid, vol-2, p. 149

৩. Ahamad Ibn Abi Yaqub Ibn Jafar al-Yaqubi, *Tarikh al-Yaqubi*, Ibid, p. 220

৪. হাজী মঈন উদ্দীন নদভী, *সাহাবা চরিত-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৫. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৬. মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *হযরত উসমান*, ঢাকা: আহম্মদ পাবলিশিং, জুন-১৯৭৮, পৃ. ৯৯-১০০

৭. The high officials of the centre and provinces were selected in the Majlis al-Shura. ‘Umar with due considerations used to propose the names and they were seconded and approved by the members of the Shura. Thus Numan b. Miqran was selected for the expedition on Nahawand. Among the provincial officials were Hakim (governor), Katib (secretary), Katib al-Diwan (military secretary), Sahib al-Kharaj (revenue collectors), Sahib al-Ahdath (Police officer), Sahib Bayt al-Mal (treasurer) and Qadi (judge) see: S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Ibid, p. 26

Dhaka University Institutional Repository

উসমান (রা.) এর সময়ের প্রশাসনিক বিভাগ

হযরত উসমান (রা.) এর সময় তাঁর খিলাফত নিম্নোক্ত ১২টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল–

(১) মদিনা মুনাওয়ারা (২) মক্কা মুকাররমা (৩) ইয়েমেন (৪) কুফা (৫) বসরা (৬) জাযিরা (৭) ফারস (৮) আজারবাইজান (৯) খোরাসান (১০) সিরিয়া (১১) মিসর (১২) উত্তর আফ্রিকা। এ প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার অনেকগুলো জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শহরগুলো ওয়ালি বা গভর্নর দ্বারা শাসিত হত। প্রদেশের উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তারা হলেন–

(১) কাতিব (মুখ্য সচিব) Katib, the Chief Secretary.

(২) কাতিব উদ-দিউয়ান (সামরিক সচিব) Katib-ud-Diwan, The Military Secretary.

(৩) সাহিব আল-খারাজ (রাজস্ব কর্মকর্তা) The Revenue Collector.

(৪) সাহিব আল-আহদাস (পুলিশ প্রধান) The Police Chief.

(৫) সাহিব বাইতুল মাল (কোষাধ্যক্ষ) The Treasury Officer.

(৬) কাযি (প্রধান বিচারক) Chief Judge.[১]

হযরত উসমান (রা.) এর সময় পুলিশের বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, তিনি প্রথম সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। এ পুলিশ প্রধানের নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন কুনফুদ যিনি কুরায়শ গোত্রের বনু তাইম বংশের লোক ছিলেন।[২]

হযরত উসমান (রা.) এর সময় পুলিশ বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। এ সময় মিসরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ। গভর্নর ৬৪৫ খ্রি. সাইদ বিন হিশামকে পুলিশ প্রধান (Shahib al-Shurta) হিসেবে নিয়োগ করেন।[৩]

কুফার শাসনকর্তা সাঈদ আল-আস তাঁর পুলিশ প্রধান (Shahib al-Shurta) হিসেবে আবদুর রহমান বিন খুনাইস আল আসাদিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।[৪]

বসরার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আমির এর পুলিশ প্রধান ছিলেন জায়িদ বিন জিবলা অথবা হিলিয়া আল সাদি।[৫]

মদিনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ নিয়োজিত করেন এবং তাঁর সময় মদিনায় পুলিশি কার্যক্রম চলমান ছিল। ইবনে সাঈদ এর মতে, যখন মহানবী (স.) এর চাচা আবক্কাস (রা.) ৬৫২ খ্রি. ইন্তেকাল ফরমান তখন মদিনার জনগণ তাঁর বাসস্থানে দোয়া করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জনতা সেখানে ভিড় করে একে অপরকে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। এ অবস্থায় উসমান (রা.) পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন জনসাধারণকে প্রহারের মাধ্যমে সরিয়ে দিতে যাতে বনু হাশেম গোত্র কবর খনন করে আবক্কাস (রা.) সমাহিত করতে পারে।[৬]

---

১. http://en.wikipedia.org/wiki/Rashidun_Caliphate, visited 01.02.2015
২. Muhammad Ibn Habib, *Kitab al-Muhabbar*, Hyderabad : 1942, p. 373; Abu Amr Khalifa Ibn Khayyat, *Tarikh Khalifa Ibn Khayyat*, np : Suhyl Zakar, Vol-1, ed. 1967, p. 195; Yaqubi, Ibid, Vol-2, p. 163
৩. Muhammad Ibn Yusuf al-Kindi, ed. Husayn Nassar, *Wulat Misr*, Beirut : 1959, p. 34
৪. Tabari, Ibid, vol. 4, p. 323; Ansab, Ibid, vol. 5, p. 40
৫. Ali Ibn Hasan Ibn Asakir, *Tahdhib al-Tarikh al-Tarikh al-Kabir*, Damascus : 1332 A.H., p. 450; Shihab al-Din Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani, *Isaba fi Tamyiz al-Sahaba*, Calcutta: 1888, vol .2, p. 87
৬. Muhammad Ibn Sad, *Kitab al-Tabaqat al-Kubra*, Beruit : n.d., vol. 4, p. 32; Ibn Asakir, Op.cit, vol. 7, p. 250

Dhaka University Institutional Repository

একদা উসমান (রা.) মদিনার মসজিদে গমন করে দেখতে পান যে, আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) মহানবী (স.) কিছু সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে বসে কান্না করছেন। তিনি এ দৃশ্য অবলোকন করে খুবই রাগান্বিত হন এবং পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন তাদেরকে পৃথক করে মসজিদ থেকে বের করে আনতে।[১]

অন্য এক ঘটনা এরূপ যে, শুক্রবার দিন হযরত উসমান (রা.) জনতার উদ্দেশ্যে খুতবাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকে। হযরত উসমান (রা.) তাকে বসার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বসতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি পুলিশ প্রধানকে প্রেরণ করেন উক্ত ব্যক্তিকে জোরপূর্বক আসন গ্রহণ করাতে বাধ্য করতে।[২]

হযরত উসমান (রা.) সময়ে বিজিত রাজ্যগুলোর জনগণের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এজন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে কুফা, বসরার, ফুসতাত এবং দামেস্কের সভ্য নাগরিকদের জন্য। সম্ভবত এসব শহর ও প্রদেশের শাসনকর্তাগণ সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যকে নগরীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নিয়োজিত করেন। ইসলামের পূর্বে বাইজেনটাইন সভ্যতায় এরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। বিজিত এলাকা যেহেতু বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যেভুক্ত ছিল সম্ভবত এসকল প্রদেশের শাসনকর্তাগণ বাইজেনটাইনদের নিরাপত্তার ধারণাটি ইসলামি সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দেন।

ঐতিহাসিক সুয়ুতির মতে, আমর বিন আস প্রথম গভর্নর যিনি পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত আমর বাইজেনটাইন বডিগার্ড ও সৈন্যের মডেলে পুলিশবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন।[৩]

হযরত উসমান (রা.) সময় মদিনা wall al-suq এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা ছিল অবিবেচক দাস ব্যবসায়ী। Sahib al-suq অনেক সময় Hellenistic cities-এর agoranomos সাথে তুলনা করা হয়। পরবর্তীতে এটি মুহতাসিব রূপে দেখা যায়। সম্ভবত এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সাসানিয়দের বাজার পর্যবেক্ষককে বুঝায়।[৪]

হযরত আলি ইবন আবি তালিব (রা.)-এর যুগে পুলিশি ব্যবস্থা

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম উম্মার খলিফারূপে নির্বাচিত হন। তিনি দিগ্বিজয়ী সেনাপতি ও পণ্ডিত হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আমলে পূর্ববর্তী খলিফাদের অনুসৃত শাসন ব্যবস্থায় প্রসারতা লাভ করে এবং নিজেকে জনসেবায় উৎসর্গ করেন। তাঁর শাসনামলে বহু রাষ্ট্রীয় ভবন, সরকারি দপ্তর, মালখানা, কারাগার, সেনানিবাস, অতিথিশালা, বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতিসাধিত হয়।

খুলাফায়ে রাশিদিনের সময় শাসন ও সামরিক কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের প্রদেশ নামে অভিহিত করা হত।

---

১. Abd al-Hamid Ibn Hibatallah Ibn Abi'l Hadid, ed. Muhammad A.C.Ibrahim, *Sharh Nahj al-Balagha*, Cairo : 1965-67, vol. 9, p. 4-5

২. Abd al-Hamid Ibn Hibatallah Ibn Abi'l Hadid, *Sharh Nahj al-Balagha*, Ibid, p. 220

৩. Jalal al-Din al-Suyuti, ed. Asad Talas, *al-Wasail ila Musamarat al-Awail*, Baghdad-1950, p. 99-100

৪. Already in the time of 'Uthman in Medina, a wall al-suq is mentioned who was also an unscrupulous slave trader. Sahib al-suq has been sometimes compared with the agoranomos of the Hellenistic cities, and the later muhtasib, but more probably had a precedent in the Sasanian institution of vacarapat (overseer of the markets, supervisor of the bazaar, listed in Shapur's inscription at Naqsh-i Rustam." see: Mohsen Zakeri, *Sasanid Soldiers in Early Muslim Society*, Wiesbaden: 1995, p. 177

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলি (রা.) এর সময় উল্লেখযোগ্য প্রদেশগুলো হলো– (১) মদিনা (২) মক্কা (৩) ইয়েমেন (৪) কুফা (৫) বসরা (৬) জাযিরা (৭) ফারস (৮) আজারবাইজান (৯) খোরাসান (১০) সিরিয়া (১১) মিসর (১২) উত্তর আফ্রিকা। এ সময় সিরিয়া হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দখলে ছিল।

প্রতিটি প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় ভাগ করা হয়েছিল এবং জেলার শাসনকর্তাকে 'আমিন', বিচারককে 'কাযি', রাজস্ব সচিবকে 'সাহিব আল-খারাজ', অর্থ সচিবকে 'সাহিব বাইতুলমাল' এবং পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাকে 'সাহিব আল-আহদাস' বলা হত। এরা প্রত্যেকেই গভর্নরের নিকট নিজ-নিজ কাজের জন্য দায়ী থাকতেন।[১]

অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও সুদক্ষ সেনাপতি বীর হযরত আলি (রা.)-ই পুলিশবিভাগ নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। এটি তাঁর একক কৃতিত্বের নিদর্শন। তিনি গ্রামে ও শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও প্রতিরোধকল্পে এই বিভাগের সৃষ্টি করেন। এ পুলিশ বাহিনীর দ্বারা চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন বন্ধ করা ও জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করাই খলিফার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এ বিভাগের একটি নিয়মিত ও বিরাট বাহিনী গঠন করে রাজ্যের সর্বত্র তাদের নিয়োজিত করেন। এ বাহিনীর প্রধানকে 'সাহিব আল-শুরতা' বা পুলিশ বিভাগের সর্বাধিনায়ক বলা হত। এ পুলিশ বিভাগটির দ্বারা দেশের জনসাধারণের প্রকৃত অর্থেই বিশেষ উপকার হয়েছিল। খলিফা আলি (রা.) এর আমলে যিনি এ পুলিশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা প্রধান ছিলেন তাঁর নাম মালিক ইবনে হাবিব।[২] তাঁর আমলে সু-শৃঙ্খল ও সুগঠিত বাহিনী হিসেবে পুলিশের উপর বিবিধ প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত ছিল। যেমন- রাতে পাহারা দেওয়া ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এ বাহিনী নগর, গ্রাম ও সকল স্থানের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং জুলুমবাজ ও অত্যাচারীদের হাত থেকে নিরীহ জনগণকে রক্ষা করতেন।[৩]

'হায়দারে আকবর' গ্রন্থের লেখক বলেন, "হযরত আলি (রা.) এর খিলাফতকালে পুলিশ বিভাগের বিশেষ গঠন খলিফার অপূর্ব সৃষ্টি। খলিফা গ্রামে ও শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমনের জন্য এ বাহিনী গঠন করেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) যে সামরিক বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন হযরত উমর (রা.) ও আলি (রা.) তা সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করেন। এ সামরিক বাহিনী দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা দান করত।"[৪]

Arab Muslim Administration গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম প্রশাসনের প্রাথমিক সময় জনগণই পুলিশের দায়িত্ব পালন করত। হযরত মুহাম্মাদ (স.) আবু হুরাইরাকে পুলিশি দায়িত্ব দিয়ে বাহরাইনে নিয়োজিত করেন। হযরত উমর (রা.) রাত্রিকালীন পাহারা ও টহলের ব্যবস্থা করেন। হযরত আলি (রা.)-ই সর্বপ্রথম নিয়মিত শুরতা বা পুলিশ কাম মিউনিসিপ্যাল বিভাগ প্রবর্তন করেন। পুলিশ বাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল নগরীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। শহরের ন্যায় প্রদেশগুলোতেও পুলিশ বাহিনীর শাখা ছিল। ছোট শহরগুলোতে পুলিশ সদস্য বা কনস্টেবলকে 'মা'উনা' বলা হত।[৫]

---

১. ডক্টর ওসমান গণী, *শের-ই-খোদা হযরত আলী*, কলকাতা: মল্লিক বাদ্রার্স, ৩য় সংস্করন, ১৯৯৪, পৃ. ২০৮-২০৯
২. মাওলানা মোঃ মাজহার উদ্দীন, *শেরে খোদা হযরত আলী (রা.)*, ঢাকা : বিউটি বুক হাউজ, ২য় প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৯ বাং, পৃ. ১২৫
৩. রশীদ আহম্মদ, *হযরত আলী (রা.) এর জীবনী*, ঢাকা: শিরীন পাবলিকেশন্স, আগস্ট-২০০৫, পৃ. ৮৫; ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাচ্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৪. মাওলানা মাজহার উদ্দীন, *হায়দারে আকবর হযরত আলী (রা.)*, ঢাকা: সালাহউদ্দীন বইঘর-১৯৯৭, পৃ. ৫২
৫. "In the begining of Muslim rule generally the duties of the police were performed by the people. The prophet appointed Abu Hurayrah with police duties in al-Bahrayn. Umar introduced night watches and patrols and Ali introduced for the office of the shurtah (*A police cum municipal department*) on a regular basis. The primary duty of the police was to maintain and restore peace with the city. It had cities branches in all provincial and important towns. In small cities there were soldiers called the maunah to maintain peace." see: S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Ibid, p. 28

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলি (রা.) প্রথম পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশ বা Shurta এর দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, এরা গভর্নরের প্রতি খুবই বিশ্বস্ত ছিল এবং বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করত। দ্বিতীয়ত, এরা বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর সামনে ক্ষমতাহীন ছিল।[১] হযরত আলি (রা.) এর সময় নগরীতে পুলিশের কার্যক্রম খুবই সক্রিয় ছিল। তিনি আরও একটি বিশেষ পুলিশ শাখার সৃজন করেন। যাকে Shurat al-Khamis বলা হত। হযরত উসমান (রা.) এর সময় পুলিশের যাত্রা শুরু হলেও হযরত আলি (রা.) এর সময় এর বিস্তার ঘটে এবং সুপরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিক ইয়াকুবির মতে, হযরত আলি (রা.) এর পুলিশ প্রধান ছিলেন মাকিল বিন কায়েস আল রিয়াহি।[২]

Ibn Muzahim-এর মতে, হযরত আলি (রা.) এর পুলিশ প্রধান ছিলেন মালিক বিন হাবিব।[৩] *Ibn Khayyat*-এর মতে, মাকিল এবং হাবিব উভয়েই হযরত আলি (রা.) এর সময়ে পুলিশ প্রধান ছিলেন।[৪]

উল্লেখ্য যে, হযরত আলি (রা.) শুক্রবারের নামাজের সময় খুতবা প্রদানকালীন সময়ে পুলিশ প্রধান তার মিম্বারের নিচে অবস্থান করতেন।[৫] ঐতিহাসিক আমির আলির মতে, হযরত আলি (রা.) প্রথম পুলিশ বিভাগ সৃজন করেন। কিন্তু তিনি কোনো সূত্র থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করেননি।[৬] হযরত আলি (রা.) পুলিশ ও পুলিশ প্রধানকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন। তিনি মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতিকালে পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন কুফার সকল উপজাতীয়দের সেনাবাহিনী ক্যাম্পে জড়ো করার জন্য। তিনি তাঁর পুলিশ প্রধানকে আরও নির্দেশ দেন যারা সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে হত্যা করার জন্য।[৭]

কুফার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কাজ করলেও তিনি যখন রাত্রিকালীন বাইরে গমন করতেন তখন পুলিশি পাহারা নিতেন না। আর একারণেই তিনি খারিজিদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে নিহত হন।[৮] তাঁর সময়ে পুলিশ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ শত্রুদের সম্পর্কে খলিফাকে সতর্ক করতেন।[৯]

উল্লেখ্য যে, হযরত আলি (রা.)-এর খিলাফতকালে পুলিশ বাহিনীর ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুপরিচিত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিকগণ এসময় পুলিশের নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় পুলিশ প্রধান বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন এবং খলিফার ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। অনেক সময়, সেনাবাহিনী যুদ্ধকালীন সময়ে কুফা থেকে দূরে অবস্থানকালীন সময়ে পুলিশ প্রধান একই সাথে নগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সামরিক পুলিশ প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

---

১. Ibn Abil Habib, ed. Muhammad A.C. Ibrahim, *Sharh Nahj al-Balagha*, Cairo: Nahj, vol. 9, p. 320
২. Yaqubi, Ibid, Vol-2, p. 203
৩. Nasr Ibn Muzahim al-Minqari Ibn Muzahim, ed. Abd al-Salam Harun, *Waqat Siffin*, Cairo : 1385 A.H., p. 6
৪. Ibn Khayyat, Ibid, vol. 1, p. 231
৫. Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman al-Dhahabi, ed. Ali b. al-Bijjawi, *Mizan al-Itidal fi Naqd al-Rijal*, Cairo : 1963; vol. 3, p. 218-219
৬. Amir Ali, *A short history of the Saracens*, London: 1934, p. 60
৭. Nasr Ibn Muzahim al-Minqari, ed. Abd al-Salam Harun, *Waqat Siffin*, Cairo: 1385, p. 136
৮. Tabari, Ibid, vol-5, p. 149; Nahj, Ibid, vol. 10, p. 259
৯. Ibn Muzahim, Op.cit, p. 108

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য সেনাবাহিনী পরবর্তী শ্রেণি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সচিবরা, তৃতীয় দলটি হচ্ছে বিচার কাজ নিশ্চিত করণের কাজে নিয়োজিত কাযি ও ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ। চতুর্থ দলটি হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে যাঁরা দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেন। তারপর আসছে সাধারণ মানুষ-মুসলমান যারা সরকারি কর প্রদান করে এবং অমুসলিম যারা করের বদলে জিযিয়া কর দেয়। তারপর আসছে সমাজের পাদ প্রদেশের দোকানদার, শিল্পী ও কারিগর, যাদেরকে তুমি দরিদ্র ও নির্যাতিত দেখতে পাবে।

আল্লাহর আদেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় একটা দুর্জয় দুর্গের ভূমিকা পালন করে। তারা একজন শাসকের জন্য অলংকার, তারা একটা শক্তির উৎস, ঈমানদারদের মর্যাদা ও শান্তি। যারা মানুষের মধ্যে শান্তি নিশ্চিত করে, তারা হচ্ছে নিরাপত্তার অভিভাবক যাদের মাধ্যমে দক্ষ অভ্যন্তরীণ প্রশাসন সুনিশ্চিত হতে পারে।[১]

খিলাফাতে রাশিদার যুগে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মানবজাতি পৃথিবীতে বসবাসের শুরু থেকেই নিজেদের আত্মরক্ষা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনো না কোনো নামে বা রূপে (Form) পুলিশি কার্যকলাপ করে আসছে। খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগেও শান্তি-শৃঙ্খলার অতন্দ্র প্রহরী এ পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও শুরুতে জনগণই পুলিশি দায়িত্ব পালন করতেন। পুলিশের প্রধানত দায়িত্ব ছিল নগরীতে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। নগরের ন্যায় প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতেও পুলিশের শাখা ছিল। তারা চোর ও দুর্বৃত্তদের ধরার জন্য রাত্রিকালে নগরীতে টহল দিত। দেশের যুদ্ধাবস্থা ও অস্থির পরিস্থিতির সময় তাদেরকে সৈন্যও সংগ্রহ করতে হত এবং প্রয়োজনে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে হত।[২]

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে Criminal justice system বা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাতেও পুলিশি তৎপরতা লক্ষ করা যায়। বাজার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, ওজন ও পরিমাপ পরীক্ষার সাথে সাথে অপরাধের সনাক্তকরণ (Detection of crime) অভিযোগের ফৌজদারি অভিশংসনের (Prosecution) কাজ পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব ছিল।[৩] অপরাধ তদন্ত এবং প্রচলিত রাজনৈতিক রীতি, প্রথা ও আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশের ছিল। অভিযুক্তকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তার দোষ স্বীকারে বাধ্য করার ক্ষমতা পুলিশের ছিল।[৪]

The Administration of Justice in Islam গ্রন্থে উমর (রা.)-এর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে–

> "Umar did not create separate criminal courts. The same court had the jurisdiction over both civil and criminal matters. However, In criminal matter the proceeding were initiated by the department of police technically known as Ahdas."[৫]

'আল ফারুক' গ্রন্থে পুলিশের দায়িত্ব সম্পর্কে শিবলী নো'মানী বলেন–

---

১. শামসুল আলম কর্তৃক সম্পাদিত, মঞ্জুর আহসান কর্তৃক অনুদিত, *হযরত আলী (রা.) এর একটি গুর"ত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি*, ঢাকা: ইফাবা, ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর-১৯৮৩, পৃ. ১০

২. The primary duty of the police was to maintain and restore peace within the city. It had its branches in all provincial and important towns. In small cities there were soldiers called the ma'unah force to establish peace who made nocturnal rounds for guarding against thiefs and malefactors. The chief officer of this force was the Sahib al-Shurtah (prefect of police) or Sahib al-Maunah ch with the police duties in the city. In times of war oru unrest he had to organize the main body of the troops. The ahdath or foot soldiers were posted in the outlying district to maintain law and order and to fight battle when needed. see: S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Ibid, p. 239

৩. Dr. S.A.Q Husaini, *Arab Administration,* Ibid, p. 53

৪. S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Ibid, p. 29

৫. "উমর (রা.) এর সময় ফৌজদারি বিষয়ে কোন আলাদা আদালত ছিল না। একই আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার হত। ফৌজদারি বিষয়গুলোর কার্যপদ্ধতি (Proceeding) পুলিশ বিভাগ কর্তৃক শুর" হত।" দ্র. Al-Haj Mahomedullah, *The Administration of justice in Islam,* Ibid, p. 8

Dhaka University Institutional Repository

"হযরত উমর (রা.) নাগরিকদের শান্তি রক্ষার জন্য অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আয়োজন করেন। এই জন্য তিনি স্থানে স্থানে পুলিশ কর্মচারি নিযুক্ত করে ওজন পরীক্ষা, দোকানদার কর্তৃক ক্রেতাদের প্রতারণা বন্ধ, রাজপথে চলাচলের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ, পশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ, মাদক ও শরাব পানের উপর নজরদারির দায়িত্ব পুলিশের উপর অর্পণ করেন।"[১]

এছাড়া শহর ও গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জালিমের হাত হতে মাজলুমকে রক্ষা করা পুলিশ বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব ছিল।[২]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রবর্তিত পুলিশি ব্যবস্থাকে পরবর্তী খলিফাদ্বয় সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, পরিমার্জিত করেন ও আরও বলিষ্ঠতর করে পরিচালিত করেন। যে পথ ধরেই পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণের জন্য এ পুলিশি ব্যবস্থাকে মজবুত করে ঢেলে সাজাতে অনেকটা সহজ হয়েছিল।[৩]

পুলিশ প্রধান সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করতেন। এ ব্যাপারে তিনি রাজনৈতিক এবং প্রচলিত আইনের দ্বারা অপরাধের শাস্তি প্রদান করতেন। ধর্মীয় আইনগুলো কাযির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার পর সে অনুযায়ী নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হত। পুলিশ প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায়ে ক্ষমতাবান ছিলেন।[৪]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুলিশ বিভাগ বিচার বিভাগের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং বিচারক কর্তৃক ঘোষিত দন্ড বাস্তবায়ন করত। পরবর্তী সময়ে এটি বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়। এ বিভাগের প্রধানকে বলা হত 'সাহিব আল-শুরতা'। তার প্রধান কাজ ছিল সংঘঠিত অপরাধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। প্রতিটি শহরে পুলিশ প্রধান নিয়োজিত ছিলেন এবং তাকে সহায়তা করার জন্য উপ-পুলিশ প্রধান ও সহকারীবৃন্দ ছিলেন। তাদের জন্য বিশেষ পোশাক এবং পদচিহ্ন ছিল। তাঁরা ছোট অস্ত্র বহন করতেন। যাকে 'matarid' বলা হত। তারা রাত্রিকালে অভিযানের সময় কুকুর ও মশাল ব্যবহার করতেন।[৫]

হিসবাহ্ বিভাগ

সাধারণভাবে বলা যায়, হিসবাহ্ নামক প্রতিষ্ঠানটি হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মুহতাসিব নামক একজন কর্মকর্তা থাকেন (সাহিব আল-সুক নামেও তিনি পরিচিত, বাজার পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়ক)। তাঁর কাজ হলো, 'ভালো কাজকে উৎসাহিত ও মন্দ কাজকে প্রতিহত করা, 'যেভাবে ইসলামি নৈতিকতার পরিভাষায় তা চিহ্নিত করা হয়েছে। মুহতাসিব হলেন শহরের, বিশেষত বাজারের ক্ষেত্রে জনগণের নৈতিকতা ও মান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তত্ত্বাবধান করার জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

---

১. আল্লামা শিবলী নো'মানী, অনূঃ মাওলানা মহীউদ্দীন খান, *আল ফারুক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০

২. মাওলানা মুজীবুর রহমান, *হযরত আলী* (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

৩. মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, অনূঃ আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, *প্রশাসনিক উন্নয়ন, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৪. The Sahib al-Shurtah (the Chief Police Officer) investigated offences committed, made his decisions in accordance with the political and customary law and punished the guilty. The religious side of the law was interpreted by the qadi who determined the appropriate punishment and prescribed legal penalties. Unlike the qadi the sahib al-shurtah enjoyed power to extract confession from an accused person by force. see. S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Ibid, p. 239

৫. "In the early age, it was affiliated to the judiciary, with the main objective of implementing the penalties issued by the judge. Later it became independent from the judiciary and the chief of police (Sahib al-Shurtah) was in charge of examining offences. Every city has had its own police presided over by a direct chief, chief of police, who had deputies and aides, who were distinguished with special marks, special uniforms and carrying small spears, called matarid, where the name of the police officer was engraved. They used also to be accompanied by guard dogs and carry lanterns at night." see: http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml?search Police in Islam, visited on 31.05.2012

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরানের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে হিসবাহ্’র বিষয়টি আরও পরিষ্কার হওয়া যায়, যেখানে মুহতাসিব ও ইসলামি সমাজের সদস্যদের কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اِمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অনু: “তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কলাণের দিকে আহক্ষান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।”[১]

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

অনু: “মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ নিষেধ করে ... ।”[২]

জনগণের নৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য বিচার ব্যবস্থায় মুহতাসিব নামক কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। মুহতাসিব ছিলেন কাযি ও পুলিশ অফিসারের মধ্যবর্তী কর্মচারী। তাঁর কিছু কিছু কাজ কাযির কার্যাবলীর অনুরূপ এবং কিছু কিছু কাজ পুলিশ অফিসারের কার্যাবলীর অনুরূপ। (কাযির মত তিনি অপরাধের বিচার করতেন)। তবে তাঁর বিচার সংক্ষিপ্ত বিচার। (অপরাধীর ঘটনাস্থলে বিচার করাই ছিল তাঁর ক্ষমতার আওতাভুক্ত। জনসমক্ষে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে এবং মুহতাসিব কিংবা তাঁর কোনো কর্মচারী সেই অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী হলে মুহতাসিব তার বিচার করতে পারতেন। কিন্তু কোনো অপরাধে সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হলে উক্ত বিচার কাযির কোর্টে স্থানান্তরিত হত এবং এই ধরনের বিচার মুহতাসিবের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। বিচারক অপেক্ষা মুহতাসিব ছিলেন প্রধান গণচরিত্রের পর্যবেক্ষক। জনসাধারণকে ধর্মীয় ও নৈতিক কাজে উৎসাহিত করা এবং অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখা ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য। সর্বপ্রকারের সামাজিক অসাধুতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা এবং ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা তাঁর কর্তব্য হিসেবে গণ্য ছিল। জুয়াখেলা, মদ খাওয়া, অবাধ বিবাহ এবং অশালীন কার্যকলাপ তিনি বন্ধ করতেন। জুয়াড়ু ও মদখোরকে তিনি প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করতেন এবং কোনো প্রকার মাদকদ্রব্য যাতে প্রকাশ্যে তৈরি ও বিক্রয় না হয় সেই বিষয়ে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। দাসদাসী ও ভৃত্যদের উপর যাতে গৃহস্বামী অমানুষিক অত্যাচার-অবিচার করতে না পারে সেই ব্যাপারেও মুহতাসিব লক্ষ রাখতেন। গৃহপালিত পশুর উপর অত্যধিক বোঝা চাপিয়ে না দেওয়া এবং ক্ষমতার বাইরে কাজ করতে না দেওয়ার প্রতি লক্ষ রাখাও ছিল মুহতাসিবের কর্তব্য। তিনি পরিত্যক্ত শিশুদের লালনপালনের ব্যবস্থা করতেন। স্কুলের শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করলে মুহতাসিব শিক্ষকগণকে ভৎর্সনা করতেন।

মুহতাসিব জনগণের নৈতিক চরিত্র দেখাশোনা কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের অনুশাসনের আলোকে ব্যবস্থা নিতেন। মুহতাসিব কাযির মতো আংশিক ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি জনগণের নৈতিক বিষয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে (Suo-motu) ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। তার দায়িত্ব মূলত (১) আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত (Whatever was due to Allah) (২) বান্দার সাথে সম্পর্কিত (Whatever was due to Man) (৩) উভয়ের সাথে সম্পর্কিত (Whatever was due to both).

১. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪
২. আল-কুরআন, ৯ : ৭১

Dhaka University Institutional Repository

Al-Mawardi এর মতে, মুহতাসিব-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হল তিনি একজন মুসলিম, তিনি স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও বুঝার ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বাক্ষ্য হিসেবে কাজ করার দক্ষতাসম্পন্ন (adl), এবং তাঁর নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। মুহতাসিব অবশ্যই নিরপেক্ষ বিচারক হবেন এবং শক্তিশালী ও ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি অবশ্যই শরিয়াহ্-এর নিয়মাবলী ভালভাবে জানবেন, আর আইনের দৃষ্টিতে যা ভাল এবং যা মন্দ তা ভালভাবে বুঝে ভালটা গ্রহণ করবেন। এ শর্তাবলী দরকার ছিল এ জন্যই যে, হিসবাহ্ খুবই দক্ষ ও যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ প্রকৃতি নিয়ে পরিচালিত হবে।[১]

দপ্তর হিসেবে হিসবাহ্ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও দাপ্তরিকভাবে একজন মুহতাসিব নিয়োগের পূর্বে, প্রাথমিক মুসলিমগণ বিশেষত মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবিগণ নিজেরাই ঐ কাজগুলো করতেন। তাঁরা সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দকাজে নিষেধ করতেন এবং মুসলিমদের তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় কার্যাবলী প্রতিপালনে নির্দেশনা দিতেন। পরবর্তীতে যখন সরকার ও শাসকগণ হিসবাহ্‌র উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন ও অযোগ্য লোকদের ঐ পদে নিয়োগ করেন, তখন প্রতিষ্ঠানটি ঘুষ ও লভ্যাংশ অনুসন্ধানকারী পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[২]

মুহতাসিব পৌর ও বাণিজ্যিক বিষয়গুলো দেখাশুনা করতেন। তারা বাজারের দ্রব্যগুলোর ওজন ও পরিমাপের বিষয়গুলো পরীক্ষা করতেন। এছাড়া নগরীর গৃহসমূহ যাতে রাস্তা এবং Public Place এ নির্মিত না হয় এ বিষয়ে নজরদারি করতেন। পশু দ্বারা মাত্রাতিরিক্ত ওজন বহন না করা এবং জনসম্মুখে যাতে মদ বিক্রি না করা হয় সে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতেন। সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁরা জননৈতিকতা রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনস্বার্থগুলোর প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করতেন।[৩]

মুহতাসিবের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ প্রশাসক, পৌর প্রশাসক ও আধুনিককালের ভ্রাম্যমান বিচারকও বটে। তবে তাঁর কর্তব্য তালিকায় যেসব কর্তব্যের কথা উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশই একজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করা যায়। আর এ ধারণা সঠিক বলে মেনে নিলে মুহতাসিবকে আধুনিককালের 'আই.জি.পি'র সংগে তুলনা করতে পারি।[৪]

---

১. মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, অনূঃ আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, *প্রশাসনিক উন্নয়ন, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

৩. The police was also entrusted with the work of hisbah (municipal and market affairs). They were to see that proper weights and measures were used in the market, houses were not constructed on roads and public places, animals were not laden with heavy loads and wine was not sold publicily. In short they were to look after the interest of the public and to help in the preservation of public morals." see: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Ibid, p. 239

৪. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : সমাবেশ, ২০০৬, ২য় সংস্করন, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশের ভূমিকা

মুসলিম রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রবর্তন শাসকের ধর্মীয় কর্তব্য। ন্যায় বিচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে অন্যায়-অবিচার বিদূরিত হয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে ন্যায় বিচার কায়েম করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশ আছে। ন্যায় বিচার সম্বন্ধে মহানবী (স.) বলেছেন–ন্যায় বিচারে এক মুহূর্ত সময় অতিবাহিত করা সত্তর বৎসরের ইবাদত হতেও উত্তম। মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও আইন বিশারদগণও ন্যায় বিচারের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। নিযাম-উল-মূলকের মতে, অধর্ম সত্ত্বেও রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে কিন্তু অন্যায়-অবিচার সহকারে রাষ্ট্র টিকতে পারে না।[১]

হযরত মুহম্মদ (স.) স্বয়ং প্রধান বিচারক ছিলেন এবং মদিনার মসজিদে বসে রাজকার্যসহ বিচার কার্যও পরিচালনা করতেন। প্রাদেশিক কাযিকে মুহাম্মদ (স.) স্বয়ং নিযুক্ত করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কাযি পদে নিযুক্ত করার জন্য তিনি শাসকদের নির্দেশনা প্রদান করতেন। হযরত মুয়ায বিন-জাবাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ মহানবীর আমলে কাযি হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

ফকিহ্ বা আইনবিদদের মধ্য হতে কাযি নিযুক্ত করা হত। বিশেষভাবে কুরআন ও হাদিসের বিশেষজ্ঞ এবং উত্তম চরিত্রের মুসলমানগণ কাযি হিসেবে নিযুক্তিতে অগ্রাধিকার লাভ করতেন। রসুলুল্লাহ (স.) সাহাবীদের মধ্য হতেই কাযি নিযুক্ত করতেন। বিচার কার্য ছাড়াও কাযিগণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ও নাবালকের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন।[২]

হযরত মুহাম্মদ (স.) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সবসময় সোচ্চার ছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি ন্যায় বিচার করার জন্য সকলকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। হাদিস শরিফে এসেছে, রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণ রোজ কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে নূরের আসনসমূহে মহান দয়ালু স্রষ্টার ডান পার্শ্বে বসা থাকবেন। সে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা হলেন তাঁরা, যাঁরা তাদের বিচার ও শাসন কাজে তাঁদের পরিবার-পরিজনের উপর নিজ দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করেন।"[৩]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায় তিনি পবিত্র কুরআন অনুযায়ী ন্যায়বিচার পরিচালনা করতেন। পবিত্র কুরআনের পর হাদিস হল শরিয়া আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হযরত মুহাম্মদ (স.) নিরপেক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর নিকট অমুসলিমগণও কোনো বিবাদ নিয়ে আসলে তিনি তা মীমাংসা করতে দিতেন এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলকে সমানভাবে দেখতেন। সকলে সমভাবে নিরাপত্তা পেত। কোনো বিচারের বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হলে তিনি তা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। হযরত জাবির হতে বর্ণিত, একদা একজন মহিলা তার দু'জন সন্তান নিয়ে মহানবী (স.) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল (স.)! এই দুই কন্যার পিতা হলেন সাবিত বিন কায়স যিনি উহুদের যুদ্ধে শহিদ হন, তাদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছেন, তাদের জন্য কিছুই রাখেননি। হে নবী (স.)! এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী? সম্পদ ছাড়া এ দুই কন্যাকে বিবাহ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

---

১. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

২. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৩. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.), অনু: শায়খুল হাদীস আল্লামা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সালাম, *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ-২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ, (সকল খণ্ড একত্রে), পৃ. ৭০৫

Dhaka University Institutional Repository

তখন মহানবী (স.) উল্লেখ করেন যে– এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই সিদ্ধান্ত দেবেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল হলে মহানবী (স.) উক্ত মহিলা এবং কন্যাদের চাচাকে ডেকে পাঠান। উক্ত চাচাকে তিনি সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ কন্যাদ্বয়কে এবং মহিলাকে $\frac{১}{৮}$ এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি তাকে নেওয়ার নির্দেশ দেন।[১]

বিচার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (স.) যখন হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা.) কে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন। সে সময় তাঁদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কথপোকথন হয়। হাদিসটি নিম্নরূপ–

عن أبي عون الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء. قال أقضي بكتاب الله تعالى. قال فإن لم تجد في كتاب الله. قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله. قال أجتهد برأيي ولا ألو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.

অনু: "হযরত আবু আওন হারেছ ইবন আমর ইবন আখিল মুগিরা ইবন শু'বা থেকে বর্ণিত, হিমসের কতিপয় অধিবাসী মুআজ ইবন জাবাল (রা.) এর সাথীদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (স.) মুয়ায ইবন জাবাল (রা.) কে যখন ইয়ামনে নিয়োগ করে প্রেরণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন– তোমার কাছে যখন কোনো মোকদ্দমা পেশ করা হবে, তখন তুমি কিরূপে তার ফয়সালা করবে? তিনি (মুয়ায রা.) বলেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করবো। এরপর নবী কারিম (স.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন– যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোনো সমাধান না পাও? তখন মুয়াজ (রা.) বলেন, তবে আমি রসুলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তিনি (স.) আবার জিজ্ঞাসা করেন– যদি তুমি রসুলের সুন্নাতে এবং আল্লাহর কিতাবে এর কোনো ফয়সালা না পাও? তখন তিনি (মুয়ায রা.) বলেন– এমতাবস্থায় আমি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো এবং এ ব্যাপারে কোনোরূপ শৈথিল্য করবো না। এ কথা শুনে রসুলুল্লাহ (স.) মুয়াযের বুকে হাত মেরে বলেন– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রসুলুল্লাহর দূতকে এরূপ তাওফিক দিয়েছেন, যাতে রসুলুল্লাহ (সা.) সন্তুষ্ট হয়েছেন।"[২]

এরপর একটি ঘটনায় এক ব্যক্তি এসে রসুলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস করলো, "হুজুর, আমার আবক্ষাজান সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে হজ্জ করতে পারেন নাই। তাঁর আত্মার সদগতির জন্য আমার পক্ষে হজ্জ করা কি প্রয়োজন?

রসুলুল্লাহ (স.) উত্তর দিলেন–

"তোমার আবক্ষা দেনা রেখে মারা গেলে তা শোধ করা কি তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় হতে পারে?"

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রসুলুল্লাহ (স.) কিয়াসের মাধ্যমে লোকটিকে বুঝিয়ে দিলেন যে দেনা পরিশোধ করা যেমন প্রয়োজন, হজ্জ করাও তেমনি প্রয়োজন। রসুলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীগণ সব সময়ে কিয়াসের ব্যবহার করতেন এবং সে সময়ে কোনো ব্যক্তি তাদের এই কাজকে অন্যায় বলেন নাই।[৩]

১. Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Ibid, p. 13
২. *আবু দাউদ শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, ১ম প্রকাশ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯
৩. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ-১৯৯২, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

রসুল (স.) এর সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের যে কয়জন বিচারকের বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁরা হলেন-হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), আলি, মুয়ায বিন জাবাল, আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ, উবাঈ বিন কা'ব, যায়দ বিন সাবিত, আবু মুসা আল-আশয়ারি, উকবাহ ও ম'াকিল বিন ইয়াসার প্রমুখ।

নবী (স.) এর নির্দেশে অনেক সময় তাঁর উপস্থিতিতেও কাযির দায়িত্ব পালন করতেন। তিরমিযি, আহমদ বিন হাম্বল ও আল-হাকিম কর্তৃক লিপিবদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায় যে, বিবদমান পক্ষগুলো নবী (স.) এর নিকট মামলা দায়ের করলে তিনটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে উমর, মাকিল বিন ইয়াসার ও উকবাহকে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মামলার নিষ্পত্তি করতে বলেছিলেন। অবশ্যই নবী (স.) এর লক্ষ্য ছিল ইসলামি রাষ্ট্রে ভবিষ্যত শাসকদের বাস্তব ধারণা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এমন একটি আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেটা প্রশাসনের প্রাত্যহিক সমস্যাসমূহের মুকাবিলা করতে পারবে।

বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশ্নে নবী (স.) ব্যক্তিগত ভাবেই কাউকে না কাউকে দায়িত্ব দিয়েছেন এমন নয় বরং কখনো কখনো মামলার প্রকৃতি বিচার করে সামষ্টিকভাব কয়েকজনের উপর বিচারের দায়িত্ব আরোপ করতেন। পরবর্তী কালের এক লেখক সুব্হ আল-আশআর মতে সেই প্রাথমিক দিনগুলোতে এমনকি পরবর্তী কালের কাযিদের কর্তব্য ছিল শরিয়তের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিরোধে জড়িত দু'পক্ষের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ মীমাংসা করে দেওয়া। প্রথমত নবী (স.) স্বয়ং এ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যখন যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তখন স্বীয় ক্ষমতা অনুসারীদের উপর ন্যস্ত করেছেন।[১]

একবার নবী করিম (স.) হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বিরোধ নিষ্পত্তি করে দেয়ার কথা বললে তিনি বললেন: ইয়া রসুলুল্লাহ: আপনার বর্তমানে আমি করবো বিচার? রাসুল (স.): হ্যাঁ, তুমি করবে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কীরূপ করবো? রাসুল (স.) বললেন: ইজতিহাদের সাহায্যে অর্থাৎ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে করবে, যদি শুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারো তবে তো দশটি নেকি পাবে। আর একান্তই তাতে ভুল হয়ে গেলেও একটি নেকি পাবে।[২]

ইসলামি আইনে প্রাথমিক উৎস হল 'আল-কুরআন' পক্ষান্তরে 'সুন্নাহ' আল-কুরআনকে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং নিঃসন্দেহে সুন্নাহ ইসলামি আইনের একটি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র উৎস। এটি কুরআনের সাথে সংযুক্ত এবং কুরআনের পরে দ্বিতীয় উৎস। কিয়াস হলো পদ্ধতিগত সাদৃশ্যমূলক জ্ঞানালোক। এর ভিত্তি কুরআন এবং হাদিসের উপর। ইজমা হল ব্যক্তিগত অভিমতের ফল যা সমাজ কর্তৃক সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মোটকথা কুরআন-হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ উৎসগুলোর পরিব্যাপ্তি একই আদর্শের। যার চূড়ান্ত কৃতিত্ব হলো আল-কুরআন।[৩]

Joseph Schacht ইসলামিক আইন সম্পর্কে An Introduction to Islamic Law গ্রন্থে বলেন, ইসলামের পবিত্র আইন হলো-ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য সর্বজন গ্রহণীয় ব্যবস্থা। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা যা মুসলিমদের জীবনে রাজনীতি, আইনি দিকসহ প্রতিটি বিষয়কে পরিচালিত করে।[৪]

---

১. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর সরকার কাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯

২. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ইফাবা, ২০১২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৩. The primary source of Islamic legislation is the Quran. The Sunnah explains and elaborates the Quran. While Sunnah undoubtedly constitutes also an independent source, it is closely linked with and is secondary to the Quran. Qiyas is the systematic form of ray (considered individual opinion) and is based on the Quran and the Sunnah. Personal opinion results in Ijma when it receives the universal acceptance of the community. In a word, the Quran the Sunnah, Qiyas and Ijma are interlinked; the same spirit pervades these sources for which the final authority is the Quran. see: H.S. Bhatia, *Studies in Islamic Law, Religion and Society*, New Delhi : Deep & Deep Publications, 1996, p. 56

৪. The sacred law of Islam is an all-embracing body of religious duties, the totality of Allah's commands that regulate the life of every Muslim in all its aspect, as well as political and (in the narrow sense) legal rules. see: David Pearl and Werner Menski, *Muslim Family Law*, London : Sweet & Maxwell, 3rd ed., 1998, p. 3

Dhaka University Institutional Repository

বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং নিরপেক্ষভাবে কার্যকরী করণের দিক থেকে মুসলিম খলিফাগণ সকল জাতির উপর কৃতিত্ব অর্জন করেন। মহানবী স্বয়ং প্রধান বিচারক ছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ হতে পৃথক করেন এবং বিচারক বা কাযিদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিচার বিভাগ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিচারে শুনানী ও রায় দানের বিধি-বিধান সুষ্ঠু নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

বিচারের গুরু দায়িত্ব যে কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকত তাঁকে কাযি বলা হত। কেন্দ্রে খলিফা স্বয়ং প্রধান কাযির দায়িত্ব পালন করতেন। প্রদেশে প্রাদেশিক কাযি এবং জেলায় জেলা কাযি নিযুক্ত হতেন। কাযিগণ প্রাদেশিক গভর্নর বা জেলা প্রশাসকের অধীন ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন পূর্ণ স্বাধীন। খলিফা স্বয়ং কাযিদের নিযুক্ত করতেন। কখনও বা খলিফার আদেশে প্রাদেশিক গভর্নরগণ ন্যায়বান ব্যক্তিকে কাযি হিসেবে নিযুক্ত করতেন। খলিফা উমর (রা.) আবু মুসা আল-আশয়ারিকে জনগণ কর্তৃক সম্মানিত ব্যক্তিকে কাযি হিসাবে নিযুক্ত করতে আদেশ প্রদান করেন। কাযিগণ উচ্চ নীচ ভেদাভেদ না করে বিচারের রায় প্রদান করতেন। এমনকি হযরত আলিও এক মোকদ্দামায় কাযির বিচারে হেরে যান।[২]

নিযুক্তির সময় কাযির যোগ্যতা চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করে দেখা হত। কাযিকে যে সকল অপরিহার্য গুণের অধিকারী হতে হত সেগুলি হচ্ছে তাঁকে পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে সুপণ্ডিত হতে হত। তাঁকে হাদিস শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হত। তাঁকে সাহাবিদের পূর্ব দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী হতে হত। তাঁকে পূর্ণ বয়স্ক, পুরুষ, মুসলমান, সুস্থ মস্তিষ্ক, স্বাধীন, সচ্চরিত্র, দৃষ্টিশক্তি ও পূর্ণ শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হতে হত।[৩]

কাযিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল বিবাদ নিষ্পত্তি করা, অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, অছিয়ত কার্যকরী করা, বিধবা বিবাহ উৎসাহিত ও বন্দোবস্ত করা, নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা, অনধিকার দখলের উচ্ছেদ সাধন করা, অধীনস্থদের উপর কর্তৃত্ব রাখা ও তাদের আচরণের উপর লক্ষ রাখা এবং দুর্বলকে সবল হতে রক্ষা করা।[৪] খলিফা ‘উমর কাযিদের নির্দেশ দেন–উভয় পক্ষকে সমভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং বাদীকেই প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। বিবাদীর অনুপস্থিতে একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সাক্ষী হিসেবে যে সকল মুসলমান কোনো বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত হননি বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেননি সে-ই কোর্টে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার কাছে যখন মোকদ্দমা আসবে তখন তুমি উত্তমরূপে তা অনুধাবন করবে। কেননা সেই সত্য নিয়ে কথা বলার কোনই সার্থকতা নেই যার বাস্তবায়ন হয় না। লোকসমক্ষে তোমার মুখভঙ্গি, উপবেশন এবং বিচার-মীমাংসা এমন হবে যেন দুর্বল তোমার সুবিচারের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে না পড়ে বা ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অহেতুক আশাবাদী হয়ে পড়ে। বাদীর দায়িত্ব হচ্ছে সাক্ষী উপস্থিত করা আর অস্বীকারকারী বিবাদীর কসম করে তা অস্বীকার করা।[৫]

---

১. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
২. জুরজি যায়দান, *তারিখ তামাদ্দুন আল-ইসলামি*, কায়রো : ১৯০২, ১৯০৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯
৩. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৫. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বিবাদীর জওয়াব না শুনে শুধু প্রথম পক্ষের বা বাদীর দাবি ও বর্ণনার ভিত্তিতে ফয়সালা প্রদানও নিষিদ্ধ ছিল। কাযিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ছিল এরূপ-সাক্ষ্য বা প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব। বিবাদীর দায়িত্ব হলো প্রমাণের অভাবে কসম করে দাবি খন্ডন করা।[১]

বিচারালয় হিসেবে মসজিদ ব্যবহৃত হত। বিচারের দিন উভয় পক্ষ স্ব-স্ব লোক নিয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হত। সাধারণ লোকেরা দর্শক হিসেবে বিচার শ্রবণ করতে উপস্থিত হত।

বাদী ও বিবাদীকে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদানের জন্য খলিফা উমর সরকারিভাবে কতিপয় আইন বিশেষজ্ঞ (মুফতি) নিযুক্ত করেন। কাযিগণও আইনের জটিল সমস্যা সম্বন্ধে মুফতিদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারতেন। পরামর্শ প্রদানের জন্য মুফতিগণ কোনো ফি গ্রহণ করতে পারতেন না।

খলিফা উমর (রা.) বিচারের জন্য কাযিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি বিখ্যাত কাযি শুরায়হকে পবিত্র কুরআনের বিধি অনুসারে বিচারের পরামর্শ দেন। অন্যথায় হাদিসের উপর নির্ভর করে বিচারে রায় প্রদানের জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। হাদিসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত না পাওয়া গেলে 'ইজমার' আদর্শ অনুসরণ করতে তিনি আদেশ দেন। 'ইজমা' দ্বারা অনুরূপ ব্যাপার নিস্পত্তি না হয়ে থাকলে তিনি শুরায়হকে নিজ মত প্রয়োগ করার অধিকার প্রদান করেন। জটিল ব্যাপারগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে আদেশ করেন।

হযরত উমর (রা.) শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলাম সাম্য এবং ন্যায় বিচারের নীতিকে বিচার প্রশাসনে সংযুক্ত করেন। বিচার বিভাগ পৃথককরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত উমর (রা.) অনুধাবন করেন যে, ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। সকল ক্ষমতা এক হাতে কেন্দ্রীভূত করা যাবে না।[২]

খলিফা উমর দোষীকে কারারুদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম কারাগারের ব্যবস্থা করেন। তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়ার গৃহ ক্রয় করে মক্কার কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতেও কারাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি নির্বাসন দন্ড প্রদানের রীতিরও প্রচলন করেন।[৩]

খুলাফায়ে রাশিদিন মহানবী (স.) অনুসৃত বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) স্বীয় খিলাফতকালীন সময়ে উমর (রা.) কে কাযি হিসেবে নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা.) এর প্রতি জনগণ এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁর কোর্টে কোনো মামলা রুজু হয়নি। এ সময় 'ইজমা' ও 'ইজতিহাদের' ব্যবহার শুরু হয়।[৪]

হযরত উমর (রা.) বিচার ব্যবস্থা পৃথক করেন এবং এটিই রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তিনি আবু দারদাকে মদিনার কাযি, আবু মুসা আল আশআরিকে কুফার কাযি এবং শুরায়হকে বসরার কাযি হিসেবে নিয়োগ করেন। তাঁর এই বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৬, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৬১৩

২. The third important change introduced was the complete separation of the Judiciary from the Executive by Hazrat Umar. Keeping in view the importance, Islam attached to the principle of equality before law and its insistence on a absolute fairness in the administration of justice, this separation of powers was considered absolutely essential. Hazrat Umar felt to be necessary from the very nature of things so that powers should be a check to power and, therefore, all powers should not be concentrated in one hand. see: H.S. Bhatia, *Studies in Islamic Law, Religion and Society*, Ibid, p. 111

৩. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৪

৪. Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Ibid, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.) আবু মুসা আশআরির নিকট কাযির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যে নির্দেশনা প্রদান করেন তা হল আদালত অবশ্যই পক্ষসমূহের মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলবে। যাতে দুর্বল ব্যক্তি তার প্রত্যাশিত ন্যায় বিচার পায় এবং সবল ব্যক্তি কোনোরূপ অনুকম্পা বা বিশেষ সুযোগ যাতে না পায়। অপরাধের প্রমাণ বাদীকেই করতে হবে এবং বিবাদীকে শপথ করতে হবে। তুমি কোনো মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের উপর উপযুক্ত যত্ন ও চিন্তা সহকারে তুমি বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করতে পার। তুমি যদি কুরআন এবং হাদিসের বিষয়ে সন্দেহপোষণ কর তাহলে এ বিষয়ে বার বার গভীর চিন্তা কর। অতঃপর তুমি কিয়াসের বিধান অনুসরণ কর। যখন কোনো পক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করতে চায় তখন একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দাও। যদি সে তা প্রমাণ করতে পারে তবে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সকল মুসলিমই উপযুক্ত। তবে 'হদ' অনুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী ব্যতীত।[১]

হযরত উমর (রা.) কাযি শুরায়হকে উদ্দেশ্য করে লিখেন যে, যদি তার নিকট কোনো মামলা বা বিষয় উত্থাপন করা হয় যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, তখন সে যেন তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেয় এবং কখনো কুরআনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যাবে না। তার নিকট উত্থাপিত কোনো বিষয় বা মামলা যদি কুরআনে উল্লেখ না থাকে, তবে তখন হাদিসের অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। যদি বিষয়টি কুরআন বা হাদিসে উল্লেখ না থাকে তখন 'ইজমাউল উম্মাত' অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবে। তোমার নিকট উত্থাপিত কোনো মামলা বা বিষয় যদি কুরআন ও হাদিস এবং তোমার পূর্বে এরূপ কোনো বিষয়ে কেউ যদি সিদ্ধান্ত না দিয়ে থাকে তখন তুমি অত্যন্ত সর্তকতা ও যত্নসহকারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। আমি এরূপ বিষয় অনুমোদন করি।[২]

হযরত উমর (রা.) মামলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করেন। কবি জিবরিকান বিন বদর কর্তৃক কবি হুতাইয়ার বিরুদ্ধে কবিতা বিকৃত করার অভিযোগ আনয়ন করা হলে তিনি বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করেন। বিতর্কিত কবিতার বিষয়ে তিনি কবি হাসসান বিন সাবিতকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।[৩]

হযরত উমর (রা.) পৃথক ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেননি। তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার অধিক্ষেত্র একই আদালতের উপর রাখেন। ক্রিমিনাল বিষয়গুলো পুলিশ বিভাগ কর্তৃক শুরু করা হত। যাকে 'আহদাস' বলা হয়ে থাকে। এ বিভাগের প্রধানকে সাহিব আল-আহদাস বলা হয়ে থাকে।[৪]

হযরত উমর (রা.) প্রথম মক্কা এলাকায় সরকারি জেলখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে অন্য এলাকায়ও জেলখানা স্থাপন করা হয়। জেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেক কঠোর শাস্তি জেলখানায় আটকে রেখে প্রদান করা হত। তিনি শাস্তি হিসেবে নির্বাসন ব্যবস্থাও চালু করেন। মামলার রায় প্রদানের ক্ষেত্রে শুধু সাক্ষী সংখ্যার উপরে নয় বরং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী সন্দেহাতীত সাক্ষীর বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন।[৫]

---

১. Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Ibid, p. 6

২. Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Ibid, pp. 6-7

৩. In another case Hazrat Umar created a new precedent by accepting the evidence of an expert in a defamatory suit filed by Zibriqan bin Badr against a poet Hutaya. The verse in dispute was not clear Hence he summoned another poet Hassan bin Sabit and decided the case according to the latter's opinion. see. Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Ibid, p. 7

৪. Umar did not create separate Criminal Courts.The same courts had jurisdiction over both civil and criminal matters. However, in criminal matters the proceedings were initiated by the Department of Police, technically known as "Ahdas". The officer-in-Charge of this Department was known as "Sahibul Ahdas." see: Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Ibid, p. 8

৫. Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Ibid, p. 8

Dhaka University Institutional Repository

হযর উমর (রা.) মামলা সংক্রান্তে যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন তার সারমর্ম হচ্ছে-[১]

(১) বিচারক হিসাবে একজন কাযীর সবার প্রতি সমান ব্যবহার করা উচিত।

(২) সাধারণত অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব বাদীর উপরই বর্তায়।

(৩) বিবাদীর হাতে যদি কোন প্রমাণ না থাকে তাহলে তাকে শপথ করানো হতে পারে।

(৪) বাদী-বিবাদী সর্বদাই আপোস করতে পারে। কিন্তু বে-আইনী বা আইনবিরোধী কোন ব্যাপারে আপোস মীমাংসা হতে পারে না।

(৫) কাযি তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।

(৬) মামলার শুনানীর জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করা উচিত।

(৭) বিবাদী যদি উক্ত তারিখে উপস্থিত না হয় তাহলে একতরফাভাবে মামলার রায় ঘোষণা করা যেতে পারে।

(৮) প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিই সাক্ষ্য দিতে পারে, কিন্তু যে পূর্বে একবার দণ্ডিত হয়েছে বা যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে যা প্রমাণ পাওয়া গেছে, সে পুনরায় সাক্ষ্য দেওয়াও অনুপযুক্ত।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) ও চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) সময়ে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। হযরত উসমান (রা.) এবং আলি (রা.) বিখ্যাত আইনবিশারদ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা পূর্ববর্তীদের বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করেন এবং ইজ্‌মা-এর ব্যবহারের উন্নতি সাধন করেন। এছাড়া তাঁরা ইজতিহাদেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত আলি (রা.) উত্তরাধিকারী আইনের ক্ষেত্রে আউল (Awl) এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। তিনি আইনের প্রাধান্যকে সমুন্নত করেন। জনৈক ইহুদির নিকট হতে তার হারিয়ে যাওয়া বর্ম উদ্ধারের মামলা ব্যক্তিগতভাবে কাযির আদালতে উপস্থিত হয়ে মামলায় পরাজিত হন। কারণ উক্ত মামলার সাক্ষী হিসেবে তিনি তাঁর নিজ পুত্র ও চাকরকে উপস্থিত করেন। ইসলামি আইনানুযায়ী এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে ইহুদির অনুকূলে রায় প্রদান করা হয়। ইসলামের এরূপ বিচারে ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত আলি (রা.) কে তার বর্ম ফিরিয়ে দেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলি (রা.)-এর সময় ফৌজদারি মামলাগুলো পুলিশ কর্তৃক শুরু করা হত; যা পরবর্তীতে অব্যাহত থাকে।

আদালতে উযমা বা উচ্চতর আদালত:

আদালতে উযমা বা উচ্চতর আদালত খলিফা এবং স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকারী কাজ করতো। যদি ঐ বিচারকের দায়িত্ব আনুসঙ্গিকভাবে কাউকে দেয়া হতো তা হলে তিনি সপ্তাহের একটি দিন এ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট রাখতেন, আর কেউ স্বতন্ত্রভাবে এ দায়িত্বে নিয়ুক্তি পেলে তিনি দৈনিক যথারীতি সে দায়িত্ব পালনের জন্যে অফিস করতেন।

উচ্চ আদালতের এজলাস মসজিদেই বসতো। এ সময় 'কাযি মাযালিম'-এর চতুর্স্পার্শ্বে পাঁচ ধরনের লোকজন থাকতেন।[২] যেমন নিম্নরূপ:

(১) সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোক-যাতে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা অবাধ্যতার দুঃসাহস দেখাতে না পারে এবং আদালতের রায় অমান্য করতে না পারে।

---

১. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০
২. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্রশাসকগণ-এরা বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের মধ্যে কী ঘটেছিল তার তদন্তে তাঁরা কী পেয়েছেন তা আদালতকে অবহিত করতেন। 'কাযি মাযালিম' তাঁদের সে তদন্ত রিপোর্ট আমলে নিতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) ফুকাহা বা মুফতীগণ-তাঁদের নিকট থেকে কাযি মাযালিমের হাজিবগণ প্রয়োজনে শরীয়ার মাসআলা জেনে নিতেন, বিশেষত যখন কোন প্রশ্ন জটিলতা দেখা দিত বা সন্দেহের উদ্রেক হতো।

(৪) মুহুরী-এর কাজ হলো উভয়পক্ষের জবানবন্দি এবং কাযি মাযালিমের রায় লিপিবদ্ধ করা।

(৫) সাক্ষী-এঁদের কাজ হলো নিম্ন আদালতের রায়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি প্রকাশ করা।

ইসলামি শরিয়াতে অপরাধ বলতে সে কাজ করাকে বুঝায় যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সে কাজ না করাকে বুঝায় যা করতে আদেশ করা হয়েছে। শরিয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী কোনো 'কাজ করা' বা 'না করা'কে অপরাধ গণ্য করতে হলে তার সমর্থনে কুরআন অথবা হাদিসের সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান থাকতে হবে। ইসলামি আইনে কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজের জন্য দায়ী করতে হলে তাকে বালেগ ও বুদ্ধিমান হতে হবে। অতএব পাগল, শিশু ও নির্বোধ ব্যক্তিকে কোনো কাজের জন্য দায়ী করা যায় না।[১]

ইসলামি আইন অনুসারে ফৌজদারি অপরাধ প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট– (১) ব্যক্তি (২) সম্পত্তি (৩) সম্মান (৪) রাষ্ট্র (৫) ধর্ম (৬) গণশান্তি ও সুস্থ পরিবেশ (৭) নৈতিকতা অথবা সৌন্দর্যবোধ।

ইসলামে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অপরাধীর দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শুরু হয়। (১) ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করা (The person commits a prohibited act) (২) ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছায় অপরাধ সংঘটন করা (The person commits an offence with his free consent).

(৩) ব্যক্তি কর্তৃক বয়ঃপ্রাপ্ত এবং স্বজ্ঞানে অপরাধ সংঘটিত করা যাতে সে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে (The person who commits an offence is an adult and sane and can differentiate between right and wrong)[২]

অপরাধের শাস্তি অনুযায়ী শ্রেণি বিন্যাসকরণ: ইসলামে ফৌজাদারি আইন অনুযায়ী অপরাধের শাস্তির মাত্রা অনুযায়ী একে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(১) কিসাস বা দিয়াত অর্থাৎ অপরাধের প্রতিশোধ অথবা রক্ত মূল্য পরিশোধ (Qisas and diyat)

(২) হুদুদ অর্থাৎ অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি (Hudud)

(৩) তাযির অর্থাৎ অপরাধের ক্ষেত্রে বিবেচনামূলক শাস্তি প্রয়োগ (Tazirat)

কিসাস বা দিয়াত অর্থাৎ অপরাধের প্রতিশোধ অথবা রক্ত মূল্য পরিশোধ (Qisas and diyat)

ইসলামে ফৌজদারি আইনানুযায়ী কতিপয় অপরাধের শাস্তি প্রতিশোধ অথবা রক্তমূল্য পরিশোধের মাধ্যমে নির্ধারিত করা হয়েছে। একে কিসাস বা দিয়াত বলা হয়। এ সমস্ত শাস্তি ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে। এগুলো ভিকটিম বা তার উত্তরাধিকার কর্তৃক পরিমার্জন অথবা পরিবর্তন হতে পারে। এগুলো হলো– (১) ইচ্ছাকৃত নরহত্যা (Intentional murder) (২) আপাত দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যা (Quasi-intentional murder) (৩) ভুলবশত হত্যা (Murder as a result of mistake) এবং (৪) আঘাত (Hurts)।

---

১. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২. Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam, Kitab Bhavan*, New Delhi: 1st edt. 2006, p. 28

Dhaka University Institutional Repository

হুদুদ অর্থাৎ অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি (Hudud)

এ ধরনের অপরাধের শাস্তি কুরআন এবং হাদিস দ্বারা নির্ধারিত। এ অপরাধগুলোর শাস্তি পরিমার্জন বা বৃদ্ধি বা হ্রাসের কোনো সুযোগ নেই। এ অপরাধগুলো হলো– (১) ব্যভিচার, (২) ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন, (৩) চুরি, (৪) দস্যুতা বা ডাকাতি, (৫) মদ্যপান করা, (৬) ধর্মত্যাগ।[১]

মহানবী (স.) হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন–

عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمري مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه الجماعة.

অনু: আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যভিচারী। আর আপন দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।[২]

মহানবী (স.) হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন–

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن.

অনু: জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে এল। এসে বলল, সে যিনা করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। তারপর রসুলুল্লাহ (স.) তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে রজম করা হলো। আর সে বিবাহিত ছিল।[৩]

হাদিস শরিফে আরও উল্লেখ রয়েছে–

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

অনু: আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী রসুলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম

---

১. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২; see. Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam,* Ibid, pp. 47; https://en.wikipedia.org/wiki/hud, visited on: 2.25.2016

২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা-ষষ্ঠ সংস্করন-২০১০, দশম খণ্ড, পৃ. ২৬১

৩. *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, ষষ্ঠ সংস্করন, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাধক্ষী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।[১]

তাযির অর্থাৎ অপরাধের ক্ষেত্রে বিবেচনামূলক শাস্তি প্রয়োগ

হুদুদ, কিসাস এবং দিয়াত ব্যতিত যে সমস্ত অপরাধের শাস্তির কথা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উল্লেখ নেই এবং যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি বিচারকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে তা'যির বলা হয়।[২]

ইসলামি দণ্ডবিধিতে তাযির

ইসলামি আইনের অভিব্যক্তি অনুসারে তাযির হল শাস্তি যা অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ সংঘটন হতে নিবৃত্ত করা বুঝায় এবং দ্বিতীয়, তাকে সংশোধন করাও বুঝায়। ইবনে ফারহান (Farhan) তাঁর সুবিখ্যাত তাবসিরাত আল হক্কাম গ্রন্থে তাযির এর উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করতে প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, এটা হল শৃঙ্খলামূলক, সংস্কারমূলক এবং নিবৃত্তিমূলক শাস্তি। "এটা দুটি নীতির নির্দেশ করে, যেমন সংশোধনমূলক এবং নিবৃত্তিমূলক" এবং তা এখানে একত্র করা হয়েছে। নিবৃত্ত করা হল তাযির-এর মূল ভিত্তি এবং তা দ্বারা কার্যত সংশোধনও বুঝায়।[৩]

উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহের জন্য উপরোল্লিখিত শাস্তিসমূহ সর্বোচ্চ শাস্তি। যে অবস্থাতে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সাক্ষ্যের প্রকৃতি এবং অপরাধী যে মতলবে অপরাধ সংঘটন করেছেন তা বিবেচনায় রেখে শাস্তির পরিমাণ কমানো যায়।[৪]

তাযির হল এমন শাস্তি, যার পরিমাণ এবং ধরন আদালতের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে। এটা সে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে সকল অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তি নেই।

বিচারকদের সমাজের স্বার্থ যখন বিপদাপন্ন হয় এবং তার সুনির্দিষ্ট শাস্তি আল-হুদুদ এবং প্রতিশোধের শাস্তি আল-কিসাস এর মধ্যে পড়ে না তখন সমাজের স্বার্থ রক্ষার্থে তাদেরকে অবশ্যই সুবিবেচনার অধিকার প্রদান করা উচিত।

এটা সত্য যে, মহানবী (স.) এবং সাহাবা (রা.) দিগের তাযির সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রায়ই ইসলামি আইনের কিতাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে হযরত উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তে। কিন্তু কার্যত এই সকল সিদ্ধান্তই মহানবী (স.)-এর কাজ ও কথার উপর প্রতিষ্ঠিত।

নিম্নে কয়েকটি তাযির-এর ঘটনা উল্লেখ করা হল–(১) মুসলিম এবং আবু দাউদ একটি হাদিসের বর্ণনা করেছেন। সে হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (স.) এক ব্যক্তিকে সেনা বিভাগের সেনাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অসদাচরণের কারণে যুদ্ধের মালের অংশ হতে বঞ্চিত করেছিলেন।[৫]

(২) যে মূল্যের দ্রব্য চুরি করলে হদ শাস্তি আরোপ করা যায় তার চাইতে কম মূল্যের ফল চুরি করায় মহানবী (স.) বললেন যে, চোরকে অবশ্যই ফলের দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে এই যে দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে এটা হল অর্থ দণ্ড এবং এটাকে

---

১. *বুখারী শরীফ,* ঢাকা: ইফাবা, ষষ্ঠ সংস্করন, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০

২. Crimes other than those liable to Hudud, Qisas and Diyat are the crimes for which punishments have not been fixed by the Quran or Sunnah of the prophet (S.A.W) and their punishment have been left to the discretion of the legislator or judge to prescribe them in accordance with the circumstances. These crimes are innumerable and are called Tazirat." see: Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam,* Ibid, pp. 46-47

৩. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৪. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৫. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তাযির শাস্তি বলা যায়। উপরোক্ত বিবৃতির সর্বশেষ লাইনে তাযির এর অতি স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় এবং শাস্তির জন্য দায়ী হবেন। এই ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে কাযির সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

(৩) যাকাত সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেছেন, "যে যাকাত দেয় আল্লাহ তাকে পুরস্কার দিবেন এবং যে এটা দিতে অস্বীকার করে তার নিকট হতে তা আদায় করা হবে এবং আমরা তার অর্ধেক সম্পত্তি আদায় করব; তা মুহাম্মদ (স.) অথবা তার পরিবারের জন্য নয় বরং তা বাইতুল মালের জন্য। অপরাধীর নিকট এইরূপ অর্থদন্ড আরোপ করা এক প্রকার শাস্তি।[১]

(৪) কুরআনে এই মর্মে নির্দেশ রয়েছে যে, কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আর্থিক অসুবিধার মধ্যে থাকলে পাওনাদরকে তা পরিশোধের জন্য অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে। মহানবী (স.) তাই আদেশ দিয়েছেন যে, যখন কোনো ধনী লোক তার ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তখন তাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ কাজের জন্য কি পরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে মহানবী (স.) তার ব্যাখ্যা দেন নাই। এই ক্ষেত্রে তাযির শাস্তি অনুমোদনের ক্ষেত্রে পাওনাদার এবং দেনাদার উভয়ের অবস্থা এবং উক্ত সময়ের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হয়। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই ক্ষেত্রে মহানবী (স.) তাযির শাস্তি আরোপের নির্দেশ দিয়াছেন।[২]

মহানবী (স.) ও ইসলামি আইনজ্ঞগণ কর্তৃক অনেক আঘাতের ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়েছে এবং সামান্য কিছু ব্যতিক্রমে সেগুলোকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তা'যিরের শাস্তি হিসেবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এ রূপ নির্ধারিত বিষয়কে আরস্ বলা হয়। আর যে গুলোর শাস্তি নির্ধারিত নেই সেগুলোকে 'আরসে গায়ির মুকাদ্দার' বলা হয়।[৩]

(৫) হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসুল (স.) বলেছেন-যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর রাহে (কাজ করতে গিয়ে) আত্মসাৎ করতে দেখ তবে তার মালপত্র পুড়িয়ে দেবে এবং তাকে প্রহার করবে"। রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিতদের আত্মসাৎ এ পর্যায়ে পড়ে। এগুলোর শাস্তি বিধান করা বিচারকের কর্তব্য।[৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ যদি অভিপ্রায় বা ইচ্ছা ছাড়া কোনো আঘাত করে এজন্য তাকে কোনো কিসাস ভোগ করতে হবে না কিন্তু তার অবহেলা এবং জনস্বার্থ বিবেচনায় তাকে তা'যিরের বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অধিকার লংঘন অনুযায়ী অপরাধের শ্রেণি বিন্যাসকরণ (Classification according to violation of rights)

অধিকার লঙ্ঘনকারী এ ধরনের অপরাধকে আবার দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। (১) জনতার বিরুদ্ধে অপরাধ (Crimes against the public) এবং (২) ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (Crimes against individuals).[৫]

অপরাধের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চারটি বিষয় বিবেচনা করা হয় না। যেমন– (১) নাবালকত্ব (২) অপ্রকৃতস্থ (৩) মাদকাসক্ত এবং (৪) বাধ্যকরণ।[১]

---

১. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
২. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৮
৩. There are many hurts for which compensation has been fixed in the Sunnah of the Prophet (pbuh) and the jurists, with some minor differences, have approved them. Fixed compensation is called arsh while unfixed compensation is called daman or arsh ghayr muqaddar. see. Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam,* Ibid, pp. 117–119
৪. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪
৫. Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam,* Ibid, p. 48-49

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি শরিয়াত সেসব অপরাধের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। বরং বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তাকে বলে তাযীর বা দন্ডবিধি। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেমন ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করেন, ততটুকুই দিবেন। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব আইন-প্রণয়ন করতে পারে এবং বিচারককে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারেন। অবস্থানুযায়ী তাযিরকে লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। তাযিরের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু হদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শোনা উভয়ই নাজায়েজ।[২] আইনে যে শাস্তি সুনির্দিষ্ট হয়েছে তা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করা যায় না এমনকি ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গির অধীনেও নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَّ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনু: "আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটা দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৩]

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়– (১) দোষ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তিকে যেকোনোভাবে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। (২) সুনির্দিষ্ট শাস্তি অর্থাৎ হদ্দ আরোপ করার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমা প্রদর্শন করা যায় না। (৩) সুনির্দিষ্ট শাস্তি অপসারণ করা যায় না: (ক) ক্ষমার দৃষ্টিতে তা পরিবর্তন করা হলে তা অমান্য হিসাবে গণ্য হয়, (খ) নিষ্ঠুরতার ধারণায় তা হলে তা অস্বীকার এবং অমান্য হিসাবে গণ্য হয় এবং শুধুমাত্র মুনাফিকই তা কল্পনা করতে পারে এবং বলতে পারে।

হাদিসে এসেছে –

عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في إمرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.

অনু: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উসামা (রা.) জনৈকা মহিলার ব্যাপারে নবী রসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধক্ষংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আতরাফ (নিম্নশ্রেণির) লোকদের উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৪]

শাস্তির উদ্দেশ্য হল অপরাধীর পদমর্যাদা খর্ব করা এবং জনগণের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করা। কাজেই শাস্তির উদ্দেশ্যসমূহ: (১) অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ অনুসারে শাস্তি প্রদান করা। (২) তাকে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করা হতে নিবৃত্ত করা। (৩) অন্যান্যের জন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করা, যাতে

---

১. Thus the commission of crime in the following circumstances will be considered and exception to criminal responsibility: (i) Minority (ii) Insanity (iii) Intoxication and (iv) Coercion. see: Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam,* Ibid, p. 26

২. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮

৩. আল-কুরআন, ২৪ : ২

৪. *বুখারী শরীফ,* ঢাকা: ইফাবা, ষষ্ঠ সংস্করন, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি কার্যকরী করবার মাধ্যমে অন্যান্য লোক অপরাধে উৎসাহবোধ না করে এবং কেউ যেন অপরাধ করতে সাহস না করে। (৪) শাস্তি জনসম্মুখে দিতে হবে, যাতে শাস্তি প্রদানকারী কর্মকর্তা শাস্তি প্রদানকালে কাউকে আনুকুল্য প্রদর্শন করতে না পারে।

ইসলামী আইনে নিষেধাজ্ঞা বা অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শাস্তি প্রদানের চেয়ে প্রতিরোধমূলক বা নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমাজে বা বিশ্বাসী উম্মাহ-এর মধ্যে স্থিতিশিলতা বজায় রাখার স্বার্থে শেষ পর্যন্ত এ ধরনের নিষেধাজ্ঞামূলক প্রক্রিয়াগত পরিকল্পনা করা হয়। জনসম্মুখে এ ধরনের হদুদ ও কিসাস অপরাধের শাস্তি লক্ষ্য হল অপরাধ থেকে বিরত রাখা।[১]

ইসলামে সাক্ষ্যের গুরুত্ব (The Importance of Evidence in Islam)

ইসলামে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সাক্ষ্য প্রদানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে এমন কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে, আপনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পেলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তা যেন প্রদান করা হয়।[২] পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

অনু: "হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন।[৩]

পবিত্র কুরআনে মু'মিনদেরকে ন্যায়ের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আর অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।[৪]

অপর একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

অনু: "এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সঙ্গে তা পরিহার করে চলে।"[৫]

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ভয়ানক অপরাধ। এর দ্বারা অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারে এবং নিরপরাধ ব্যক্তি ভুল বিচারের সম্মুখীন হতে পারে; ভুল শাস্তি পেতে পারে।

---

১. With regard to sancations in the context of Islamic law, the primary purpose was deterrence (both specific and general) rather than retribution. The sanctions were ultimately viewed as mechanisams designed to maintain the stability of the umma, the community of believers. The punishments for hudud and quesas crimes were illustrative of a deterrent goal in light of the fact that the sanctions were carried out in public. see: Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems A Comparative Survey*, Waltham: Anderson Publishing-2013, Eight Edition, p. 572

২. Tauqir Mohammad Khan, *Jurisprudence in Islam*, ibid, p. 361

৩. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

৪. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

৫. আল-কুরআন, ২৫ : ৭২

Dhaka University Institutional Repository

হাদিসে ইরশাদ হয়েছে–

عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور.

অনু: হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম (স.)-কে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, (সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।[১]

ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় কেউ কোনো বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করলে কিংবা কারো প্রতি কোনো মিথ্যা আরোপ করলে তাকেই বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأي أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك.

অনু: হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবক্ষাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হিলাল ইবন উমাইয়া নবী কারিম (স.)-এর কাছে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারিক ইবন সাহমা-এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করলে নবী কারিম (স.) বললেন, হয় তুমি প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে (বেত্রাঘাতের) দণ্ড আপতিত হবে। সে বলল, হে আল্লাহর রসুল (স.) আমাদের কেউ কি আপন স্ত্রীর ওপর অপর কোনো পুরুষকে দেখে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ছুটে যাবে? কিন্তু নবী কারিম (স.) একই কথা (বার বার) বলতে থাকলেন, হয় প্রমাণ পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে বেত্রাঘাতের দণ্ড আপতিত হবে।[২]

হযরত উমর (রা.) বলেন, বাদীকে তার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সময় দেবে-যার শেষ সীমা পর্যন্ত তার জন্যে অবকাশ থাকবে। তারপর যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে, তাহলে সে তার হক পাওয়ার অধিকারী হবে; অন্যথায় বিচারের রায় তার বিপক্ষে যাবে। কেননা তাতে বাদীর দাবির অসারতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যা অন্ধও দেখতে পায় এবং এটা ওযর-আপত্তিরও উর্ধ্বে। তিনি আরও বলেন, এক মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্য মুসলমানের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য, তবে সে যদি কোন অপরাধের জন্যে দণ্ডিত বা মিথ্যা সাক্ষ্যদাতারূপে পূর্বপরীক্ষিত থাকে বা কারো সাথে মিথ্যা পিতৃ সম্পর্কে বা মিছামিছি কারো মওলা (স্বাধীনকৃত দাস) বলে পরিচয় দিয়ে ফায়সা লোটার প্রয়াস পেয়ে থাকে, তবে সে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী বলে বিবেচিত হবে না।[৩]

পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য (Circumstantial Evidence)

ব্যভিচার প্রমাণের জন্য কোনো অবিবাহিত মহিলার গর্ভধারণই যথেষ্ট এবং ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ 'হদ' বাস্তবায়ন করা যায়। ইসলামের মৌলিক আইনানুযায়ী "benefit of the doubt" সবসময় অপরাধী প্রাপ্য হবে। মহানবী (স.) কর্তৃক এটি সমর্থিত। তিনি বলেন, যখন শাস্তি না প্রদান করার বিষয়ে কোনো সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন শাস্তি প্রদান এড়িয়ে চল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সম্ভব হলে মুসলমানদের

১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত: *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, অষ্টম সংস্করন-২০১৪, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭
২. *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, অষ্টম সংস্করন-২০১৪, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫
৩. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ইফাবা, ২০১২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি প্রদানে এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর এবং যদি অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ সৃষ্টি হয় তবে তা কর। ভুল বিচারে কোনো অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়ার চাইতে তাকে ছেড়ে দেওয়া উত্তম।[১]

সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার না করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا.

অনু: "সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।"[২]

সাক্ষ্য গোপন না করা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ.

অনু: "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী।"[৩]

সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপের পরিধি ব্যাপক। যেমন: হত্যা, ষড়যন্ত্র, সম্পত্তি আত্মসাৎ, গোলমাল, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা। যে সমাজে এসব কার্যকলাপ অবাধে চলতে থাকে সেখানে শান্তির আশা করা যায় না। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র এমন গর্হিত কাজের প্রশ্রয় দিতে পারে না। ইসলামে এ সবকিছুর কোনো অবকাশ নেই।

হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে–

عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.

অনু: যায়দ ইবন খালিদ জুহানি (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি কি তোমাদের উত্তম সাক্ষীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? উত্তম সাক্ষী সেই ব্যক্তি যাকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকার আগেই সে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসে।[৪]

ইসলামি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অপরাধের ক্ষেত্রে যা জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এ বিষয়ে শুধু ভিকটিম অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অভিযোগ আনয়নের বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ এ ধরনের অপরাধ আল্লাহর অধিকারকেও খর্ব করে। কেননা সংশ্লিষ্ট জনগণ শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয় সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিটি মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তার প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রধান দায়িত্ব হল আল্লাহর অধিকারকে রক্ষা করা। 'হদ' সংক্রান্ত সকল অপরাধ জন অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ

---

১. Is pregnancy by itself in an unmarried woman sufficient cricumastantial evidence for the establishment of the crime of zina liable to hadd? One of the basis principles of the Islamic law is that the benefit of the doubt should go to the accused. It is supported by the saying of the Prophet, "Avoid punishing whenever you find scope for it." The Prophet also said, "Try to avoid punishing Muslims whenever possible and if there is a way for an accused to escape punishment, let him off. An error of the judge in letting off an accused is better than one in punishing him. see: Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam,* Ibid, p. 162

২. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৩. আল-কুরআন, ২ : ২৮৩

৪. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা: চতুর্থ সংস্করন-২০১৫, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

কারণেই হদ সংক্রান্ত সকল অপরাধ এবং অনেক তা'যির অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া পুলিশ অথবা অন্য কোনো সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই।[১]

পূর্ণাঙ্গ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব ধরনের শাসন ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকে। পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সেনা ও প্রতিরক্ষা শক্তি এবং আইন যন্ত্র ও বিচারপতিগণ আইন বাস্তবায়নের উপকরণ।[২]

সৈয়দ আমীর আলী খুলাফায়ে রাশিদিনের আমলের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেন: প্রথম খলিফাদের আমলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সরকার ছিল জনগণের সরকার, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রধান সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে দেশ শাসন করতেন। রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার সীমিত ছিল প্রশাসনিক ও কার্যনির্বাহী বিষয়সমূহে; যেমন পুলিশ নিয়ন্ত্রণ, সৈন্যবাহিনী পরিচালন, বৈদেশিক বিষয়সমূহ সম্পাদন, অর্থ ব্যবস্থার বণ্টন ইত্যাদি। কিন্তু স্বীকৃত আইন লঙ্ঘন করে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।

বিচার বিভাগ সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল না। বিচারকদের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত নিয়মিত বিচার সংস্থা কোন ব্যক্তিকে কঠোর দণ্ড দিলে প্রথম খলিফাগণ তা মওকুফ করতে পারতেন না। ধনী ও দরিদ্র, ক্ষমতাশীল ও দিনমজুর সকলেই আইনের দৃষ্টিতে ছিল সমান।[৩]

ইসলামে মানবাধিকার ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিষয়টি একটি সহজাত, অপরিবর্তনীয় এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার। বাকস্বাধীনতা, ধর্ম পালনে স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা, চলাফেরা করার স্বাধীনতা, পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতাসহ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষার স্বাধীনতাসহ আইনের আশ্রয় লাভের স্বাধীনতা ইসলামে স্বীকৃত। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ও ঘটানো যাবে না। আর এ অধিকারগুলো সুরক্ষিত হলেই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা পাবে। পুলিশ মানুষের উপরোল্লেখিত অধিকারগুলো রক্ষায় কাজ করে থাকে।

খুলাফায়ে রাশিদিনের আমলে ইসলাম যেমন বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছিল, তেমনি উদারনীতি ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা দ্বারা খলিফাগণ দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের ত্রিশ বছরের শাসনে আরবদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছিল।

পরিবার থেকে সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ও শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেছে। সমাজ জীবনে পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব, সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার নির্দেশনা দেয় ইসলাম। সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারকে ইসলাম কোনোভাবে সমর্থন করে না। সমাজ জীবনে ফিতনা-ফাসাদ দূর করে ধনী-গরিবের মধ্যে সাম্য বিধানের জন্য কুরআন ও হাদিসে বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত সমাজ জীবনে সকল মানুষের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আচরণে সংযম, সহযোগিতার কথাই ইসলামে বার বার বলা হয়েছে। অন্যকথায়, ইসলাম সমাজ জীবনে পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তি কামনা করে শান্তি লাভের দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

---

১. Under Islam criminal procedure, a complaint from the victim or his representative is not necessary in matters of crimes that have harmful effects on the public. Such crimes violate the right of Allah, because they concern the public as a whole and not only the individual. Every human being is the vicegerent of Allah and it is his first and foremost duty to safeguard the rights of Allah. All the crimes liable to hudud relate to public rights. Many of the crimes liable to ta'zir also relate to public rights. It is for this reason that in all hudud crimes and in many of tazir crimes the vast majority of persecutions are carried out by the police or other public officers who have no personal interest therein. see: Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam,* Ibid, p. 3-4

২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৬১৪

৩. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ইফাবা, ২০১২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.) ও উসমান (রা.) এর সময় পুলিশ বিভাগের শুরুর কথাটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা গেলেও বস্তুত আলি (রা.) এর খিলাফতকালে পুলিশ বিভাগের বিস্তার লাভ করে। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নভাবে পুলিশের নানা কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পুলিশ প্রধানের পদটি খলিফার নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। অনেক সময় পুলিশকে নগরীর শান্তি-শৃঙ্খলার বাইরে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করতে হত। যেমন যুদ্ধ গমনের জন্য উপজাতি দলগুলো অবাধ্যতা দেখালে পুলিশ তাদেরকে যুদ্ধে গমনের জন্য জোরপূর্বক সমবেত করত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

উমাইয়া যুগের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ : উমাইয়া শাসনকাল ও পুলিশ বিভাগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমাইয়া যুগে পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উমাইয়া যুগে পুলিশ প্রতিষ্ঠান (দফতর) ও এর কাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়
উমাইয়া যুগের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ
উমাইয়া শাসনকাল ও পুলিশ বিভাগ

উমাইয়া যুগের পরিচিতি

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ শেষ হওয়ার পর হযরত মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান ইবন হারব ইবন উমাইয়া ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে যে উমাইয়া খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করেন তা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর চতুর্থ পূর্ব পুরুষ উমাইয়ার নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে। এ বংশে মোট ১৪ জন খলিফা ছিলেন। উমাইয়া বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামের শাসননীতি ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আমির আলি বলেন, "উমাইয়াদের সিংহাসনারোহণ শুধু শাসকবর্গের পরিবর্তনই সূচিত করেনি; এর অর্থ ছিল একটি নীতির আমূল পরিবর্তন এবং কতকগুলো নতুন অবস্থার সৃষ্টি।"[১]

৬৬১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হযরত আলি (রা.) এর মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া (রা.) বিশ্বের স্বঘোষিত খলিফা হয়ে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজের অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে মনোনীত করে সরাসরি ইসলামে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য নিষ্ঠাবান মুসলিমরা এমনকি উমাইয়া শাখার কতিপয় গণ্যমান্য সদস্যও প্রতিবাদ করে মুয়াবিয়ার বিরাগভাজন হন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইয়াজিদের মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে মুয়াবিয়া তাকে মদিনার গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত করেন। মুয়াবিয়া (রা.) অতি কৌশলে খিলাফাতে নববী উৎখাত করে সে স্থানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যে আদর্শ স্থাপন করেন উমাইয়া বংশ তা-ই অনুসরণ করে এবং প্রত্যেক খলিফা স্বীয় পুত্র কিংবা স্বীয় ভ্রাতাকে উত্তোরাধিকারী মনোনীত করেন (উমর ইবন আব্দুল আযীয এর ব্যতিক্রম ছিলেন)। সর্বমোট ১৪ জন্য উমাইয়া খলিফার মধ্যে ৪ জন সরাসরি পিতার মনোনয়ন অনুসারে খিলাফত লাভ করেন। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও তাদের উপাধি ছিল খলিফা। তবে উমাইয়া যুগে খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেকটা বিলোপসাধিত হয়। রাজনীতিকে ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করে উমাইয়া খলিফাগণ রাজকার্য পরিচালনা করতেন; অথচ খিলাফাতের দাবির ব্যাপারে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন। সে কারণে মহানবী (স.) এর সাথে 'আত্মীয়তার সম্পর্ক' খিলাফাতে দাবির একটি বড় রকমের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

---

১. "The accession of the Ommeyads did not simply a change of dynasty; it meant the reversal of a principle and the birth of new factors", see: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Ibid, p. 72

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া যুগের দামেশক কেন্দ্রিক ১৪ জন খলিফার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

এক নজরে উমাইয়া খিলাফাত

রাষ্ট্রের ধরন	:	উমাইয়া খিলাফাত (**Umayyad Caliphate**) الخلافة الأموية
শুরু	:	৪১ হি., ৬৬১ খ্রি.
শেষ	:	১৩২ হি., ৭৫০ খ্রি.
খলিফার সংখ্যা	:	১৪ জন
প্রথম খলিফা	:	প্রথম মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (৬৬১-৬৮০ খ্রি.)
শেষ খলিফা	:	দ্বিতীয় মারওয়ান ইবন মুহাম্মদ (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.)
খিলাফাতের মেয়াদ	:	৯০ বছর
শাসন বিভাগ	:	৫টি
প্রদেশ সংখ্যা	:	১৪টি
মুদ্রা	:	দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)
রাজধানী	:	দামিসক (৬৬১-৭৪৪ খ্রি.) হাররান (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.) কর্ডোভা (৭৫৬-১০৩১ খ্রি.)
ধর্ম	:	ইসলাম (সুন্নি)
ভাষা	:	সরকারি : আরবি আঞ্চলিক : কপটিক, গ্রিক, ফারসি, আরামাইক, আর্মেনিয়, বার্বার, আফ্রিকান, রোমান, জর্জিয়ান, হিব্রু, কুর্দি, তুর্কি।
পূর্ববর্তী রাজবংশ	:	খুলাফায়ে রাশিদিন
পরবর্তী রাজ বংশ	:	আবক্ষাসিয় খিলাফাত
আয়তন	:	১,৫০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার (৭৫০ খ্রি.)
জনসংখ্যা	:	৬,২০,০০,০০০ জন (৭৫০ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া বংশ পরিচিতি[১]

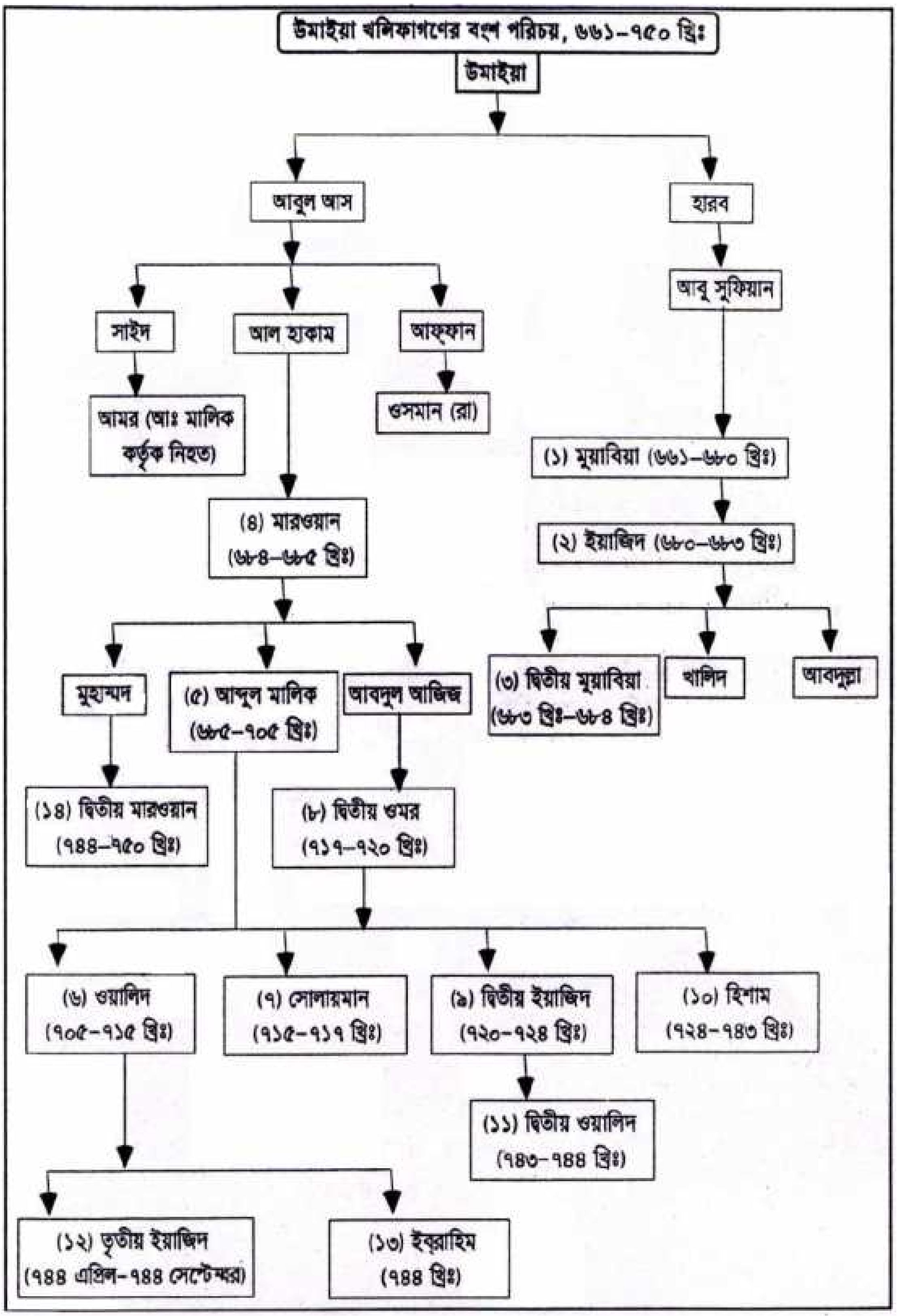

১. হাসান আলি চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃ. ১৮১

এক নজরে উমাইয়া খলিফগণ ও তাদের শাসনকাল[১]

(৪১-৪২২ হি. মুতাবিক ৬৬১-১০৩১ খ্রি. মোট ৩৭১ বছর)

ক্রমিক নং	খলিফাগণের নাম	খিলাফত কাল		
		হিজরী	খ্রিস্টাব্দ	বছর
দামেস্ক কেন্দ্রিক উমাইয়া খলিফাগণ ও শাসনকাল (৪১-১৩২ হি., ৬৬১-৭৫০ খ্রি. মোট ৯০ বছর)				
১	প্রথম মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান	৪১-৬০	৬৬১-৬৮০	২০
২	প্রথম ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়া	৬০-৬৪	৬৮০-৬৮৩	৩
৩	দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ইবন ইয়াজিদ	৬৪	৬৮৩-৬৮৪	১
৪	প্রথম মারওয়ান ইবনুল হাকাম	৬৪-৬৫	৬৮৪-৬৮৫	১
৫	আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান	৬৫-৮৬	৬৮৫-৭০৫	২০
৬	আল-ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিক	৮৬-৯৬	৭০৫-৭১৫	১০
৭	সুলাইমান ইবন আব্দুল মালিক	৯৬-৯৯	৭১৫-৭১৭	৩
৮	উমর ইবন আব্দুল আযিয	৯৯-১০১	৭১৭-৭২০	২
৯	দ্বিতীয় ইয়াজিদ ইবন আব্দুল মালিক	১০১-১০৫	৭২০-৭২৪	৪
১০	হিশাম ইবন আব্দুল মালিক	১০৫-১২৫	৭২৪-৭৪৩	১৯
১১	দ্বিতীয় আল-ওয়ালিদ ইবন ইয়াজিদ	১২৫-১২৬	৭৪৩-৭৪৪	১
১২	তৃতীয় ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ	১২৬	৭৪৪	৬ মাস
১৩	ইবরাহিম ইবনুল ওয়ালিদ	১২৬	৭৪৪	২ মাস
১৪	দ্বিতীয় মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ	১২৭-১৩২	৭৪৪-৭৫০	৬

১. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় প্রকাশ, অক্টোবর-১৯৭৪, পৃ. ১৭৭-২৪০ ও ৫১০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	খলিফাগণের নাম	খিলাফত কাল		
		হিজরী	খ্রিস্টাব্দ	বছর
কর্ডোভায় উমাইয়া আমিরগণ ও শাসনকাল (১৩৮–৩১৭ হি., ৭৫৬–৯২৯ খ্রি. মোট ১৭৮ বছর)				
১	প্রথম আব্দুর রহমান আদ দাখিল	১৩৮-১৭০	৭৫৬-৭৮৮	৩৩
২	প্রথম হিশাম	১৭০-১৮৪	৭৮৮-৭৯৬	৯
৩	প্রথম আল-হাকাম	১৮৪-২১০	৭৯৬-৮২২	২৬
৪	দ্বিতীয় আব্দুর রহমান	২১০-২৪০	৮২২-৮৫২	৩০
৫	প্রথম মুহাম্মাদ	২৪০-২৭৪	৮৫২-৮৮৬	৩৫
৬	আল-মুনযির	২৭৪-২৭৬	৮৮৬-৮৮৮	৩
৭	আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ	২৭৬-৩০০	৮৮৮-৯১২	২৪
৮	তৃতীয় আব্দুর রহমান	৩০০-৩১৭	৯১২-৯২৯	১৮
কর্ডোভায় উমাইয়া খলিফাগণ ও শাসনকাল (৩১৭–৪২২ হি., ৯২৯–১০৩১ খ্রি. মোট ১০৩ বছর)				
১	তৃতীয় আব্দুর রহমান	৩১৭-৩৫০	৯২৯-৯৬১	৩২
২	দ্বিতীয় আল-হাকাম	৩৫০-৩৬৬	৯৬১-৯৭৬	১৫
৩	দ্বিতীয় হিশাম	৩৬৬-৩৯৯	৯৭৬-১০০৮	৩২
৪	দ্বিতীয় মুহাম্মাদ	৩৯৯-৪০০	১০০৮-১০০৯	২
৫	সুলাইমান ইবনুল হাকাম	৪০০-৪০১	১০০৯-১০১০	২
৬	দ্বিতীয় হিশাম (পুনরায়)	৪০১-৪০৩	১০১০-১০১২	৩
৭	সুলাইমান ইবনুল হাকাম (পুনরায়)	৪০৩-৪০৮	১০১২-১০১৭	৬
৮	চতুর্থ আব্দুর রহমান	৪১২-৪১৩	১০২১-১০২২	২
৯	পঞ্চম আব্দুর রহমান	৪১৩-৪১৪	১০২২-১০২৩	২
১০	তৃতীয় মুহাম্মাদ	৪১৪-৪১৫	১০২৩-১০২৪	২
১১	তৃতীয় হিশাম	৪১৮-৪২২	১০২৭-১০৩১	৫

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া যুগের শাসনব্যবস্থা

উমাইয়া যুগের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রকৃত আরবীয় শাসনব্যবস্থা। একটি শাসক শ্রেণি হিসেবে প্রথম উমরের শাসনামলে আরবদের যে শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয় উমাইয়া যুগে নানা প্রকার সংস্কারের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। আরবগণ শাসক শ্রেণি হিসেবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় সে আমলে উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকার খুব শক্তিশালী ছিল এবং শাসিত জাতিসমূহ একটি পৃথক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। উমাইয়া যুগে রাজস্ব শাসন, ডাক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগ সুগঠিত হয়। এ যুগে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী সুবিন্যস্ত হয়।[১]

উমাইয়া খিলাফাতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ছিলেন স্বয়ং খলিফা। খুলাফায়ে রাশিদিনের খলিফা হতে উমাইয়া খলিফার বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। খলিফা প্রথম মুয়াবিয়া স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে নিজের উত্তরাধিকার (ওয়ালি আহদ) মনোনীত করে প্রকৃতপক্ষে রোমান ও সাসানীয় পদ্ধতির রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত উমাইয়া খলিফাগণ কার্যত রাজা ছিলেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে বসে রাজকার্য সম্পাদন করতেন।

খিলাফাতে বনি উমাইয়া ছিল একটি দিগ্বিজয়ী ও সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রমশালী সালতানাত। সে যুগে আরবদের বিজয়ী জাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে বিজিত জাতি বলে বিবেচনা করা হত। আরবদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান ছিল। কুরআনুল কারিম ও সুন্নাতে রসুল ছাড়া অন্য কোনো আইন তাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ও রাষ্ট্রীয় ফরমানের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারত না। মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহও ছিল, কিন্তু এ আত্মকলহ থাকা সত্ত্বেও আরব, সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি মুসলিম সাম্রাজ্যের জনজীবন এবং তাদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কোনো জটিল রাষ্ট্রনীতির তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। খলিফা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে পরামর্শ গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য কোনো বাধ্যবাধকতাও ছিল না। আবার বিনা তলবেও লোকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করত। অনেক সময় সে পরামর্শ তাকে মঞ্জুরও করতে হত। রাষ্ট্রে সাধারণত আরবসুলভ সরলতার প্রতিফলন ঘটত। মামুলি একজন মরুচারী বেদুইনও নির্বিবাদে খলিফার দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারত। খলিফার প্রবল পরাক্রম এ মরুচারী বেদুইনের বাকস্বাধীনতাকে একটুও বাধাগ্রস্ত করতে পারত না। খলিফা তাঁর অধীনস্থ প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে নিজ নায়েব মনোনীত করে প্রেরণ করতেন। সেসব রাজ্য বা প্রদেশে নায়েবের নিরংকুশ ক্ষমতা থাকত। খলিফা যেমন গোটা মুসলিম জাহানের শাসক ছিলেন, তেমনি তিনি গোটা মুসলিম জাহানের প্রধান সিপাহসালার বলেও গণ্য হতেন। প্রদেশ ও রাজ্যসমূহের আমিলগণ তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার বাদশাহ ও সিপাহসালার হতেন। একাধারে তারাই হতেন ধর্মীয় নেতা, সালাতের ইমাম এবং কাযিউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি। খলিফা যখন কোনো ধর্মীয় প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হতেন তখন তিনি আলিম ও ফকিহগণের কাছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে একটুও সংকোচবোধ করতেন না। অনুরূপ আমিল বা ওয়ালিদেরও সময় উলামা ও ফকিহদের মতামত চাইতে হত। কোনো কোনো সময় আবার এক একটি প্রদেশে একজন আমিল বা গভর্নরের সাথে আরেকজনকে কাযি বা প্রধান বিচারপতি করে পাঠানো হত। আমিল হতেন শাসন বিভাগের প্রধান। তার কাজ হত সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করা, শত্রুর আক্রমণের

১. মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৭, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রজাসাধারণের দেখাশুনা করা ও রাজস্ব আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা সঞ্চিত করা। কাযির কাজ ছিল শরিয়াতের দণ্ডবিধি জারি করা, বিচার-মীমাংসা করা এবং শরিয়াতের বিধি-বিধান ও অনুশাসন জনসাধারণকে মেনে চলার জন্য বাধ্য করা। এমতাবস্থায় আমিল কেবল সেনাবাহিনী প্রধানই হতেন। মোটকথা, বনি উমাইয়ার খিলাফাতে সরলতার আধিক্য ছিল। শরিয়াতের বিধি-নিষেধ দিয়ে সমস্ত জটিলতার নিরসন করা হত। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকায় প্রজাসাধারণ অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। প্রজা-সাধারণের উপর কোনোরূপ অন্যায় কর আরোপ করা হত না। শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকেও খুব একটা অর্থ ব্যয় করতে হত না। খলিফা একাধারে গোটা মুসলিম জাহানের আধ্যাত্মিক নেতা এবং পার্থিব জগতের শাহানশাহ বলে বিবেচিত হতেন। এ জন্য রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা বহাল রাখাটা ছিল খুবই সহজসাধ্য। বিধিবদ্ধভাবে কেউ উযির হতেন না। আবার প্রয়োজনে যে কেউ উযিরের দায়িত্ব পালন করতেন।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সকল এলাকায় আরব মুসলিমদের বিজয় সম্প্রসারিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকেই হেলেনেস্টিক, রোমান এবং বাইজেন্টাইন ঐতিহ্যগুলোর সাথে আরব উপদ্বীপের বাসিন্দাদের যোগাযোগ ছিল, শুধু ধর্মীয় বিষয়গুলো অবজ্ঞা করতে পারে এমন বিষয় ছাড়া। মুসলমানগণ তাদের ঐতিহ্যকে মূল্য দিত বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত শহর এলাকায়। শহরের প্রশাসনে পদক্রমে কর্মকর্তাগণ খলিফা বা সুলতান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হত। গভর্নর তার কার্যক্রমে পুলিশ, কাযি, মুহতাসিব, কোয়ার্টার প্রধান ও সংরক্ষিত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সুপারভাইজারের মাধ্যমে সহযোগিতা লাভ করত।[১]

উমাইয়া খিলাফাতের দিওয়ানসমূহ

উমাইয়া খলিফাগণ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। সে বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থাকে তারা পাঁচটি প্রধান দিওয়ানে বিভক্ত করেন। কেন্দ্রের সে দিওয়ান তত্ত্বাবধানের জন্য খলিফাগণ এক একজন প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। নিজ নিজ কাজের জন্য উক্ত কর্মকর্তা স্বয়ং খলিফার নিকট দায়বদ্ধ থাকতেন। দিওয়ানগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলী ছিল নিম্নরূপ–

(১) দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক বিভাগ) (Diwanu'l-Jund, The Military Board);

(২) দিওয়ান আল-খারাজ (ভূমিরাজস্ব বিভাগ) (Diwanu'l-Kharaj, The Board of Finance);

(৩) দিওয়ান আল-রাসাইল (সরকারি পত্র রচনা বিভাগ) (Diwanu'r-Rasa'il, The Board of Correspondence);

(৪) দিওয়ান আল-খাতাম (রেজিষ্ট্রি বিভাগ) (Diwanu'l-Khatam, The Board of Signet);

(৫) দিওয়ান আল-বারিদ (ডাক বিভাগ) (Diwanu'l-Barid, The Board of Posts)[২]

---

১. By the second half of the 7th century the Arab Islamic conquest had expanded over all Byzantine territories. At the time Islam was born, the Arabian Penishula had long been in contact with Hellenistic, Roman and Byzantine traditions and, except for those concepts that could undermine their relDgion, the Muslims valued this heritage, particularly in the highly-urbanized areas. City's organization consisted of a strictly hierarchical structure appointed by the Caliph or Sultan: Walis (governors) assisted by al-shurta (police), the qadi (judge), the al-muhtasib (supervisor of markets who was in turn assisted by the controller of various professions), the heads of city quarters and the supervisors of the protected communities of Jews and Christians. https://www.unhabitat.org.jo/en/inp/Upload/1424216 Pages%20from%20StateofArabCities high-4.pdf, Visited on-21/11/2015

২. There were five Boards at the Centre; see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Delhi: Idarah-I-Adabiyat-I Delhi, reprint, 1976, p. 83

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া উমাইয়া প্রশাসনে নিম্নলিখিত প্রশাসনিক বিভাগের কথা উল্লেখ রয়েছে–

(i) দিওয়ান আল-খারাজ (The Diwan-ul-Khiraj the board of land tax which was in the nature of the Department of Finance)

(ii) দিওয়ান আল-খিতাম (The Diwan-ul-Khitam the Board of the Signet, the ordinance after being sealed were issued)

(iii) দিওয়ান আল-রাসায়িল (The Diwan-ur-Rasail the Board of correspondence)

(iv) দিওয়ান আল-মুসতাগিলাত (The Diwan-ul-Mustaghillat, The Board of Revenue)

(v) নাজার আল-মাযালিম (The Nazirul-Mazalim the judiciary. Every province had a Governor, a kadi and a police-officer)[১]

(১) দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক বিভাগ): উমাইয়া খলিফাগণ স্বয়ং ছিলেন প্রধান সেনাপতি। কিন্তু তারা উক্ত বিভাগের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনের সময় সৈন্য পরিচালনার জন্য একজন প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। সৈন্যগণ খলিফা প্রথম উমরের আমল হতে ভাতা পেত। মুয়াবিয়া ও তাঁর উত্তরাধিকারীর আমলে উমাইয়া সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ এবং তাদের খাতে ব্যয় হত ৬০,০০,০০০ দিরহাম।[২] তৃতীয় ইয়াজিদ ইবন ওয়ালিদ এ খাতের ব্যয় ১০% কমিয়ে দেন।[৩] দ্বিতীয় মারওয়ান যাবের যুদ্ধে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে আবক্ষাসীয়দের মুকাবিলা করেন।[৪] কিন্তু উক্ত ভাতা প্রথা ত্রুটিযুক্ত ছিল। সৈন্যগণ মনে করত যে তারা বেতন পাচ্ছে না, ভাতা পাচ্ছে। তাছাড়া সে যুগে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সামরিক বাহিনীতে চাকুরি করা অপরিহার্য ছিল এবং সে কারণে সকল মুসলিমকে সরকারি ভাতা দেয়া হত। কিন্তু কার্যত সুবিধাভোগী শ্রেণির অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গমণ করত না; হয়ত বা কোনো প্রতিনিধি, মাওয়ালি বা দাসকে দিয়ে তার সামরিক দায়িত্ব পালন করিয়ে নিত। খলিফা হিশাম সে কুপ্রথা রহিত করেন এবং ভাতা প্রদানের স্থলে সৈন্যদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[৫] এ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল সৈন্য নিয়োগ করণ ও তাদের তালিকা সংরক্ষণ করা।[৬] সৈন্যবাহিনী গোত্রীয় ভিত্তিতে নিযুক্ত হত এবং তাদের কার্যাবলী যথারীতি কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।[৭] কার্যত খলিফা ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান এবং কেন্দ্র কর্তৃক তাদের বেতন বা ভাতা নির্ধারিত হত।

(২) দিওয়ান আল-খারাজ (ভূমিরাজস্ব বিভাগ): উমাইয়া যুগে কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব বিভাগ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হত সাহিব দিওয়ান আল-খারাজ বা সাহিব আল-খারাজ। স্বয়ং খলিফা কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হতেন এবং তাঁর কার্যাবলীর জন্য সরাসরি খলিফার নিকট তিনি দায়বদ্ধ থাকতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব দিওয়ান আল-খারাজে সংরক্ষিত থাকত। প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রদেশের আয় থেকে প্রাদেশিক ব্যয় নির্বাহান্তে অবিশিষ্ট অর্থ

---

১. Tauqir Mohammad Khan, *Law of Governance in Islam*, New Delhi : Pentagon Press, 2007, p. 73; Al-Haj Muhammed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, New Delhi : Kitab Bhaban, 3rd edt., 1990, p. XIII-XIV

২. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫

৩. "والزهرة في الجندي عشر درجات وعطارد في الحمل إحدى وعشرين درجة وثلثين دقيقة. ونقص الناس من أعطائهم فسمي بيزيد الناقص" দ্র. আহমদ ইব্‌ন আবি ইয়াকুব আল-ইয়াকুবী, *তারীখে ইয়াকুবী*, লিডেন : মাতবাউ ব্রেল, ১৮৮৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১

৪. আবুল ফিদা ইবন কাছীর, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৫, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২

৫. J. Wellhausen, Tr. Margaret Graham Weir, *The Arab Kingdom and its fall*, Calcutta: The Calcutta University Press, 1927, p. 348

৬. আবুল হাসান আলি ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব আল-মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সালতানিয়া*, কুয়েত : মাকতাবাতু দার ইব্‌ন কুতায়বা, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৯ হি., পৃ. ৩৫১-৩৫২

৭. আবুল হাসান আলি ইবনুল আছীর আল-জাযরী, *আল-কামীল ফিত তারীখ*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তর বা দিওয়ান আল-খারাজে জমা দিতেন। এ বিভাগ থেকে উমাইয়া খলিফাগণ সাম্রাজ্যের যাবতীয় জনহিতকর কার্যাবলীর ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ বাইতুল মালে জমা হত সাহিব আল-খারাজ তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতেন।[১] উমাইয়াদের প্রাথমিস যুগে নির্বাহি বিভাগ থেকে রাজস্ব বিভাগ পৃথক করা হয়। প্রদেশের অর্থ সচিব (সাহিব আল খারাস) রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি খারাজ, যাকাত, জিজিয়া, নওরোজ ও মিহিরগান উৎসব থেকে কর সংগ্রহ এবং প্রদেশের কর্মচারীদের বেতন, পেনশন ও জনস্বার্থ বিষয়গুলোর জন্য ব্যয় করতেন।[২]

(৩) দিওয়ান আল-রাসাইল (সরকারি পত্র রচনা বিভাগ): খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান দিওয়ান আল-রাসাইল প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের কাজ ছিল সরকারি চিঠি-পত্রাদি রচনা করা ও এর ভাষা মার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।[৩] সরকারি পত্রাদি লিখন, ঘোষণাবলীকে মার্জিত ভাষায় প্রকাশ ও বিজ্ঞপ্তির প্রচার ছিল এ বিভাগের কাজ। তাছাড়া অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও ছিল দিওয়ান আল-রাসাইল-এর কাজ। ড. হুসাইনি উল্লেখ করেছেন যে, "দ্বিতীয় মারওয়ানের সচিব আব্দুল হামিদ এ বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বাক্যালংকার প্রয়োগ করেন। তিনি একটি আরবি প্রবাদ উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে–

পত্রাদির আলংকারিক রচনা আব্দুল হামীদ হতে আরম্ভ
এবং ইবনুল আমিদে উহার পরিসমাপ্তি।"[৪]

(৪) দিওয়ান আল-খাতাম (রেজিস্ট্রি বিভাগ): খলিফা প্রথম মুয়াবিয়া দিওয়ান আল-খাতাম প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] এ বিভাগের কাজ ছিল খলিফার হুকুম নিয়ম মাফিক রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে মূল কপি সিল করত যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা। তৎপূর্বে সরকারি হুকুমাবলী বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের সময় সতর্কতা অবলম্বন না করে সরাসরি মূল কপি গন্তব্যস্থলে প্রেরণ করা হত। তাতে অনেক সময় খলিফার হুকুমনামা (আদেশপত্র) জাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। খলিফা মুয়াবিয়া একদিন আমর ইবন যুবাইরকে ১,০০,০০০ দিরহাম প্রদানের জন্য যিয়াদ বিন আবিহিকে নির্দেশ প্রদান করেন ও উক্ত পত্র আমরের হাতে দিয়ে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে আমর উক্ত পরিমাণ অংক বদল করে ২,০০,০০০ দিরহাম করেন ও তা যিয়াদকে প্রদান করে ২,০০,০০০ দিরহাম গ্রহণ করেন। এ জাল পরে ধরা পড়ে ও আমরকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর উক্ত অর্থ পরিশোধ করে ভ্রাতা আমরকে কারামুক্ত করেন।[৬] এ ঘটনার পর মুয়াবিয়া দিওয়ান আল-খাতাম প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] এ বিভাগে খলিফার খলিফার আদেশপত্রের অফিস কপি রেখে মূল কপি সিল করে গন্তব্যস্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। খলিফা আব্দুল মালিকের আমলে এ বিভাগ পূর্ণতা লাভ করে। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে 'সাহিব

---

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুস জাহশিয়ারী, *কিতাবুল উমারা ওয়াল কুত্তাব*, বৈরুত: দারুল ফিকরিল হাদিস, পরিমার্জিত মুদ্রণ, ১৪০৮হি., পৃ. ৭৯; আল-মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সালতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০–৫০

২. Early in the Umayyad period, revenue administration was separated from the executive business. The Finance Secretary of the province (Sahibu'l-Kharaj) was in charge of the collection and disbursement of the entire revenue of the province. He had to collect the kharaj, the zakat, the jizyah, the tribute from the tributary princes, and other ma'muls, such as presents on the Nawruz and Mihrgan festivals, and meet all the expenses of the province-pensions, salaries, public undertaking etc. see: Dr. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, pp. 106

৩. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1962, p. 299

৪. Dr. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, pp. 85-86

৫. আল-ফাখরী, পৃ. ১৪৯; আল-মাসউদি, *মুরূযুয যাহাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯

৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুস জাহশিয়ারি, *কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; আল-মাওয়ারদি: *আল-আহকামুস সালতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

৭. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, ক্যাসাব্লাঙ্কা: বাইতুল ফুনূন ওয়াল উলূম ওয়াল আদাব, পরিমার্জিত ৫ম মুদ্রণ, ২০০৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

দিওয়ান আল-খাতাম’ বলা হত। আবক্ষাসিয় যুগে এ বিভাগকে দিওয়ান আল-তাওকি বা দিওয়ান আল-ইনশা বলা হত।[১]

(৫) দিওয়ান আল-বারিদ (ডাক বিভাগ): উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগ প্রথম মুয়াবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে সরকারি কাজের জন্যই এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রজা সাধারণও ডাক বিভাগের উপকারিতা লাভ করে। রাজধানী দামেস্ক থেকে প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীকে সংযোজনকারী প্রধান প্রধান রাজপথগুলোকে ১২ মাইল অন্তর অন্তর মনজিলে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি মনজিলে সরকারি ‘ডাক অশ্ব’ বা ‘ডাক উষ্ট্র’ সহ সরকারি দূত নিযুক্ত থাকত। রিলে পদ্ধতিতে সরকারি দূতগণ অতি দ্রুত সরকারি পত্রাদি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিত।[২] বিশেষভাবে আরব ও সিরিয়াতে ডাকের জন্য উষ্ট্র ব্যবহার করা হত। ডাকের জন্য নির্দিষ্ট অশ্ব বা উষ্ট্রের লেজ কেটে দিয়ে চিহ্নিত করা হত।[৩]

খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান ঘোড়ার ডাকের উন্নতি বিধান করেন। কালক্রমে পোস্টমাস্টারদেরকে তাদের সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব দেয়া হয়। পোস্টমাস্টারগণ তাদের এলাকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন তথ্য গোপনে খলিফাকে অবহিত করত। ডাকের ঘোড়াগুলো ডাক বহন ছাড়াও সময় সময় সরকারি অফিসারদের দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর কাজ করত। এমনকি জরুরি অবস্থায় ডাক গাড়ির সাহায্যে জরুরি ভিত্তিতে সৈন্য প্রেরণের কাজ করানো হত।[৪] গাড়িগুলো এককালীন ৫০ হতে ১০০ জন সৈন্য স্থানান্তর করতে পারত। ডাক বিভাগ ছিল ব্যয়বহুল বিভাগ। ড. হুসাইনি বলেন যে, “ইরাকের ভাইসরয় ইউসুফ ইবন উমারের শাসনামলে কেবল ইরাকের ডাক বিভাগের জন্য ৪,০০,০০০ দিরহাম ব্যয় হত।[৫]

দিওয়ান আল-বারিদের প্রধান কর্মকর্তাকে সাহিব আল-বারিদ বলা হত। প্রাদেশিক অফিসারদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকায় সাহিব আল-বারিদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রতিটি জিলা হতে পত্রাদি ও সংবাদাদি প্রথমত স্থানীয় সাহিব আল-বারিদের নিকট পৌঁছত। তিনি সেগুলো সমন্বিত করে দ্রুত রিলে পদ্ধতিতে রাজধানীর সদর দপ্তরে প্রেরণ করতেন। সেখানে প্রধান সাহিব আল-বারিদ সেগুলো সমন্বিত করে খলিফার নিকট উপস্থাপন করতেন। তাছাড়া সাহিব আল-বারিদ (প্রধান পোস্টমাস্টার) প্রধান প্রধান শহরে ডাক কর্মচারি, বিভাগীয় সম্পাদক, ডাক পিয়ন প্রভৃতি নিয়োগ করতে পারতেন। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল নিয়মিত বেতন সরবরাহ প্রদানের খবরাখবর রাখা। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের ন্যায় তাঁর গুরুদায়িত্ব ছিল সাম্রাজ্যে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ সকল ঘটনার সংবাদ সরবরাহ করা। পোস্টমাস্টারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রাস্তাঘাটের খবর, সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান, বিভিন্ন অঞ্চলে এবং রাজপথের আশেপাশে কৃষির অবস্থা, নিকটস্থ শহর ও গ্রামাদির বিবরণ সংরক্ষণ করতে হত। পোস্টমাস্টার কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় এ সকল খবর ও বিবরণ সংগ্রহের ফলে মুসলিমগণ ভূগোলবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে ও ভূগোল বিদ্যারও উন্নতি হয়। সুলতান আল-আরসালান স্বীয় মন্ত্রী নিয়ামুল মুলকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে এ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রহিত করেন।

---

১. আবুল আবক্ষাস শিহাবুদ্দীন আহমদ কালকাশান্দি, *সুবহুল ‘আশা*, কায়রো, মিসর: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, পরিমার্জিত মুদ্রণ, ১৯৮৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০-১১২
২. আল-মাসউদি, *মুরূযুয যাহব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৩
৩. Dr. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 85
৪. ইবনুল আছীর, *আল-কামীল ফিত তারীখ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫২-৩৫৬
৫. Dr. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, pp. 85-86

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া যুগের প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা

উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বৃহত্তম আকার ধারণ করে। এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য রাজধানী দামিসক থেকে সাফল্যজনকভাবে শাসন করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এ কারণে উমাইয়া খলিফাগণ সাম্রাজ্যকে প্রশাসনের সুবিধার জন্য ১৪টি বড় প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে সর্বমোট ৭৯টি কুরাহ বা জেলায় বিভক্ত করেন।[১] প্রতিটি প্রদেশে উপযুক্ত পরিমাণ স্বায়ত্বশাসনসহ প্রদেশ শাসনের জন্য ওয়ালি বা আমির এবং জেলা শাসনের জন্য আমিল নিযুক্ত করা হত। আল মাওর্য়াদি ওয়ালি বা গভর্নরের যেসব দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো প্রদেশের সামরিক বিষয়াদি, বিচার বিভাগের পদায়ন ও নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব আদায় ও প্রদেশের ব্যয় নির্বাহ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, বিদায়াত থেকে ধর্মকে রক্ষা, পুলিশ প্রশাসন, নৈতিক চরিত্র (ইহতিসাব) পর্যবেক্ষণ ও শুক্রবারের নামাজের ইমামতি করা।[২]

খলিফা মুয়াবিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সাধারণ প্রশাসন হতে রাজস্ব বিভাগকে পৃথক করেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রদেশে সাহিব আল-খারাজ (রাজস্ব কর্মকর্তা) উপাধিধারী অফিসার নিযুক্ত করেন। উমাইয়া শাসনামলে প্রদেশের আদায়কৃত রাজস্ব হতে প্রাদেশিক ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় বাইতুল মালে জমা দেয়া হত। কেন্দ্রে প্রদানের পরও প্রাদেশিক ধনাগারে প্রচুর অর্থ জমা থাকত।[৩]

উমাইয়া আমলে দুই শ্রেণির 'ওয়ালি' ছিলেন বলে জানা যায়। বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য উমাইয়া সাম্রাজ্য ৫টি বড় বড় প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এ সকল প্রদেশে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে খলিফা পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে যে সকল 'ওয়ালি' নিযুক্ত করতেন তারাই ছিলেন ভাইসরয়। বৃহৎ প্রদেশগুলো নিম্নরূপ ছিল–

(ক) ইরাক প্রদেশ। যার রাজধানী ছিল কুফা। এর অধীনস্থ এলাকাগুলো হলো– পারস্য, খুরাসান, ট্রান্সওয়াক্সিয়ানা, পূর্ব আরব, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও কাবুল।

(খ) আল-হিজায প্রদেশ। যার রাজধানী ছিল মদিনা মুনাওয়ারা। এর অধীনস্থ এলাকাগুলো হলো– হিজায, ইয়েমেন ও মধ্য আরব।

(গ) আল-জাযিরা প্রদেশ। যার রাজধানী ছিল মসুল। এর অধীনস্থ এলাকাগুলো হলো– জাযিরা, আর্মেনিয়া, আযারবাইযান, এশিয়া মাইনারের পূর্বাংশ।

(ঘ) মিসর প্রদেশ। যার রাজধানী ছিল ফুসতাত। এর অধীনস্থ এলাকাগুলো হলো– জিফার, হাউফ, রিফ, আলেকজান্দ্রিয়া, ম্যাকদুনিয়া, সাঈদ ও আল ওয়াহাত।

(ঙ) আফ্রিকা প্রদেশ। যার রাজধানী ছিল কায়রোয়ান। এর অধীনস্থ এলাকাগুলো হলো– উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, সিসিল ও ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য দ্বীপ।

---

১. ইবন খালদুন ৯টি প্রদেশের উল্লেখ করেছেন। দ্র. আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৪১; ঐতিহাসিক হুসাইনির বিবরণ অনুসারে প্রদেশ ছিল ১৪টি। দ্র. Husaini, Dr. S. A. Q., *Arab Administration*, Ibid, pp. 185

২. Al-Mawardi' counts the following among the duties of a Governor: the supreme direction of the military affairs of the province, the nomination and control of the judiciary, levying of taxes, meeting all the expenses of the province, maintenance of law and order, safe-guarding relDgion aganist innovation (al-bid'at), police administration, supervision of morals (al-ihtisab), presiding af Friday prayers. see: Dr. S. A. Q., *Arab Administration*, Ibid, pp. 185-186

৩. আহমদ ইবন আবি ইয়াকুব, *তারীখে ইয়াকুবি*, লিডেন: মাতবাউ ব্রেল, ১৮৮৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া যুগে রাজধানীসহ সকল প্রদেশ ও জেলাসমূহ[১]

ক্রমিস	প্রদেশ	রাজধানী	জেলার সংখ্যা ও নামসমূহ
১	আরব	মক্কা মুকাররমা	৪টি। যথা : হিজায, ইয়েমেন, উমান ও হাজর।
২	ইরাক	কুফা	৬টি। যথা : কুফা, বসরা, ওয়াসিত, মাদাইন, হালওয়ান ও সামাররা।
৩	আল-জাযিরা	মৌসূল	৩টি। যথা : দায়র রবিয়াহ, দায়র বাকর ও দায়র মুযার।
৪	সিরিয়া	দামিসক	৫টি। যথা : কিন্নাসিরীন, হিমস, দামিসক, জর্দান ও ফিলিস্তিন।
৫	মিসর	ফুসতাত	৭টি। যথা : জিফার, হাউফ, রিফ, আলেকজান্দ্রিয়া, ম্যাকদুনিয়া, সাঈদ ও আল ওয়াহাত।
৬	আল-মাগরিব	কায়রোয়ান	৭টি। যথা : বারকা, ইফ্রিকিয়া, তাহিরাত, সিজিল মাসাহ, ফাস, সস ও স্পেন।
৭	পূর্ব প্রদেশ (মাওয়ারা উন-নাহর)	সমরকন্দ	৬টি। যথা : ফারগানা, ইসবিজাব, শাশ, উশরু সানাহ, সুগদিয়ানা ও বুখারা।
	পূর্ব প্রদেশ (খুরাসান)	মার্ভ	৮টি। যথা : বালখ, কাবুলিস্তান, সিজিস্তান, হিরাত, যুরজানান, মার্ভ, নিশাপুর ও কোহিস্তান।
৮	আদ-দাইলাম	জুরযান	৫টি। যথা : কুমিস, জুরযান, তাবারিস্তান, দাইলামান ও খাযার।
৯	আর-রিহাব	আজারবাইযান	আররান, আর্মেনিয়া ও আজারবাইযান।
১০	আল-জিবাল	হামাদান	৩টি। যথা : আর-রাই, হামাদান ও ইস্ফাহান।
১১	খুজিস্তান	জুনদেসাপুর	৭টি। যথা : সূস, জুনদেসাপুর, তুসতার, আসকার মুকরাম, আহওয়াজ, দাওরাক ও বামহরমুজ।
১২	ফারস	শিরায	৬টি। যথা : আরজান, আরদাশির, খাররাহ, দারাবজারদ, শিরায, সাবুর ও ইস্তাখার
১৩	কারমান	সীরজান	৫টি। যথাঃ বারদসির, নারমাসির, সিরজান, বাম ও জিরুফত।
১৪	সিন্ধু প্রদেশ	মানসূরা	৫টি। যথাঃ মাকরান, তুরান, সিন্ধু, ওয়াইহিন্দ ও কনৌজ।

১. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া যুগে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ন্যায় প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা প্রধানত ৩টি দিওয়ান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। দিওয়ানগুলো ছিল নিম্নরূপ–

(১) দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক দপ্তর): এটা প্রাদেশিক সামরিক বাহিনীর যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত।

(২) দিওয়ান আল-রাসাঈল (যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন দপ্তর): বস্তুত প্রদেশে এ দপ্তরই ছিল প্রধান দপ্তর। সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন হেতু এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। এ দপ্তরের ভাষা প্রথম থেকেই ছিল আরবি।

(৩) দিওয়ান আল-মুস্তাদিল্লাহ (রাজস্ব বিভাগ): প্রদেশের সকল রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব এ বিভাগে সংরক্ষিত থাকত।

উল্লেখ্য যে, উমাইয়া আমলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল এবং রাজ্য বিস্তার সাধিত হয়েছিল। এ জন্য সুগঠিত সেনাবাহিনী আবশ্যক ছিল। কুফা ও বসরায় হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের সময়ে সামরিক কার্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। স্বেচ্ছায় বহুলোক যুদ্ধে যোগ দিত। কুফা, বসরা, ফুসতাত প্রভৃতি স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল।

দশ, একশত, এক হাজার প্রভৃতি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এক একটি ইউনিট বা দল গঠিত হত। দশজনের উপর যে কর্মকর্তা কর্তৃত্ব করতেন তার উপাধি ছিল 'আমিরুল আশরাহ' বা দশজনের শাসক। একশত সৈন্যের উপর কর্তৃত্ব করতেন 'নায়েব' বা প্রতিনিধি। দশজন নায়েবের উপর থাকতেন একজন 'কায়েদ' বা লেফটেন্যান্ট এবং দশজন কায়েদের উপরস্ত কর্মকর্তার উপাধি ছিল আমির। একশত সৈন্যের দল নিয়ে যে ইউনিট গঠিত হত, তার দশটিকে নিয়ে একটি কুরদুস গঠিত হত। অশ্বারোহী, পদাতিক ও সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হত। সৈন্যদলে যে সকল বেসামরিক কর্মচারী থাকতেন, তাদের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ, বেতন প্রদানকারী কর্মকর্তা, কাযি, সংবাদ বাহক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্শা, তীর, ধনুক, তরবারি, গদা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হত। এ ছাড়া দূর্গ অবরোধকালে মিনজানিক নামে ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহারও ছিল।

দামেস্কে মোতায়েন সৈন্যগণ সাধারণত সিরিয়াবাসী ছিল। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা হত সাধারণত বসরা এবং কুফা হতে। উমাইয়াদের প্রথম দিকের স্থায়ী বেতনভোগী সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০,০০০ এবং তাদের জন্য বার্ষিক ব্যয় ছিল ৬,০০,০০,০০০ দিরহাম। তৃতীয় ইয়াজিদ এ ব্যয়ের ১০% হ্রাস করেছিলেন। সর্বশেষ উমাইয়া খলিফার আমলে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২,০০০। আরবদের নৌবাহিনীও বাইজেন্টাইনদের আদর্শে গঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি যুদ্ধ জাহাজে কম পক্ষে ৪০ জন সৈন্যের স্থান ও শতাধিক চালক থাকত। যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ সৈন্যগণ জাহাজের উপরিভাগে থাকত।

কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের সকল নথিপত্রের প্রতিলিপি প্রাদেশিক গভর্নরের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকত। প্রদেশে প্রদেশে দিওয়ান আল-বারিদের কাজ সুচারুরূপেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা কেন্দ্রীয় দিওয়ান আল-বারিদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। সাহিব আল-বারিদ বা পোস্ট মাস্টার প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

প্রাদেশিক কর্মচারীদের মধ্যে আমির বা ওয়ালি, আমিন, সাহিব আল-খারাজ, কাতিব, সাহিব আল-আহদাস (পুলিশ) ও কাযি উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক প্রদেশ ও নগরে পুলিশ অফিসারের কাজ ছিল অনেকটা পুলিশের ও অনেকটা সামরিক বিভাগের। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিদ্রোহ দমন, প্রয়োজন মতো বিদ্রোহীদেরকে যুদ্ধে প্রেরণ করা এবং অপরাধমূলক কার্য বন্ধ রাখা ছিল এ কর্মচারীর কর্তব্যের মধ্যে।[১]

১. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কর্মকর্তাবৃন্দ

৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মু'আবিয়া সিরিয়ায় যে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন তা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আমির আলি বলেন, "উমাইয়া বংশের ক্ষমতা লাভের ফলে কেবল শাসক বংশেরই পরিবর্তন হয়নি, বরং শাসননীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এটা সাম্রাজ্যের ভাগ্য ও জাতির ক্রমবিকাশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করার মত অনেক নতুন উপাদানের জন্ম দেয়।"[১]

প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের মধ্যে 'ওয়ালি' বা 'আমির' সর্বোচ্চ পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি ছাড়াও প্রাদেশিক পর্যায়ে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় 'আমিল', 'সাহিব আল-খারাজ', 'কাতিব', 'সাহিব আল-আহাদাস' ও কাযির উপর।

উমাইয়া খিলাফতে প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'ওয়ালি' অথবা 'আমির'। উল্লেখ্য যে, প্রদেশসমূহে স্বায়ত্তশাসন চালু ছিল। তিনি প্রদেশে খলিফার নির্দেশক্রমে শাসন ব্যবস্থায় একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রদেশে খলিফার প্রতিনিধি হয়ে সামরিক বাহিনী, রাজস্ব বিভাগ, মসজিদের ইমামতি, প্রধান বিচারক, প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যের দায়িত্ব পালন করতেন।[২]

ওয়ালি বা আমির (প্রাদেশিক শাসনকর্তা)

উমাইয়া যুগে প্রাদেশিক প্রশাসককে আমির বা ওয়ালি বলা হত। খলিফা সাধারণত স্বায়ত্ব শাসন বিষয়ে সকল ক্ষমতা দিয়ে প্রদেশ শাসনের জন্য আমির বা ওয়ালি নিযুক্ত করতেন। কেন্দ্রে খলিফা যেমন স্বয়ং সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা, প্রধান মসজিদের ইমাম, বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান এবং বিচার বিভাগের প্রধান বিচারক, তেমনিভাবে প্রদেশে আমির ছিলেন প্রধান সেনাপতি, প্রধান বেসামরিক প্রশাসক, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, প্রধান বিচারক ও প্রধান মসজিদের ইমাম। ওয়ালি প্রদেশের সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। তিনি রাজস্ব অফিসার বা আমিল, ভূমির রাজস্ব অফিসার বা সাহিব আল-খারাজ, দিওয়ানের সম্পাদক বা কাতিব, পুলিশ অফিসার বা সাহিব আল-আহদাস, বিচারক বা কাযি ইত্যাদি প্রাদেশিক কর্মকর্তা এবং জিলা প্রশাসক বা আমিল নিযুক্ত করতেন। তাঁর কার্যাবলীর জন্য তিনি সরাসরি খলিফার নিকট দায়বদ্ধ থাকতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খলিফা কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রাদেশিক কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়ালি খলিফার অনুমোদনক্রমে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করতেন।[৩]

ওয়ালিগণ (আমির বা গভর্নর) সাহিব আল খারাজ নিয়োগ করলেও রাজস্ব আদায়ে আমিলের মতামতকে আমির বা গভর্নরের চেয়েও গুরুত্ব দেয়া হত। কুফা প্রদেশে খলিফা মুয়াবিয়ার নিজস্ব সাহিব আল খারাজ ছিল এবং তার দুই ভ্রাতা খোরাসানের আমিল হিসেবে যোগদান করেন। অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে দিওয়ানের সচিববৃন্দ এবং পুলিশ অফিসার গভর্নর বা আমির নিজেই নিয়োগ করতেন। মুয়াবিয়ার ইরাক প্রদেশের আমিল খালিদ পারস্যের নওরোজ ও মিহরজান উৎসব থেকে ১০,০০০,০০০ দিরহাম মূল্যের উপঢৌকন সংগ্রহ করেন।[৪]

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩. আবুল আবব্বাস আহমদ ইবন ইয়াহিয়া ইবন জাবির আল-বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরুত: মুআস্‌সাতুল মা'আরিফ, পরিমার্জিত মুদ্রণ, ১৪০৭ হি., পৃ. ২২৪

৪. The 'Amil's opinion in the case of revenue was more valued than that of the Amir or Wali. Mu'awiyah had his own Sahib al-Kharaj at Kufah and two borthers as joint 'amils of Khurasan in 58 H/678 A.D. Other officials like Katibs of the Diwan and Sahib al-Ahdath (police officer) were appointed by the governor himself. Mu'awiyah's 'amil in 'Iraq namely Khalid received at the Persian feasts of Nawruz and Mihrjan gift worth 10,000,000 dirhams. see: S.M. Imamudin, *Arab Muslim Administration*, Karachi: Najmahsons-1976, pp. 63

Dhaka University Institutional Repository

'সাহিব আল-আহদাস' প্রত্যেক প্রদেশে এবং প্রাদেশিক শহরে পুলিশ প্রধান সাহিব আল-আহদাস হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার দায়িত্ব ছিল সামরিক মিলিটারি এবং অর্ধেক পুলিশি। তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হত এমনকি প্রয়োজন হলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হত এবং প্রাদেশিক পুলিশদের তত্ত্বাবধান করতে হত। স্থানীয় পুলিশ প্রধানের উপর পুলিশি দায়িত্ব অর্পিত হত। কিন্তু সাহিব আল-আহদাসকে বিদ্রোহ নিবারণ এবং অন্যান্য অপরাধ যেমন– চুরি, ডাকাতি নিয়ন্ত্রণ করতে হত।

মুআবিয়ার রাজত্বকালে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের তালিকা করা হত এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হত। জিয়াদ জাদ বিন কায়েসকে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়োগ করেন।[১]

অসীম ক্ষমতাবান ওয়ালি

অসীম ক্ষমতাবান ওয়ালিগণ ছিলেন স্থায়ী। তারা খলিফার হয়ে সব কাজ করতে ক্ষমতাবান ছিলেন। কেবল বড় বড় বিজয় অভিযানে খলিফার সম্মতি ছাড়া সাম্রাজ্যের পক্ষে হিতকর সকল কাজ করার তাঁর অবাধ অধিকার ছিল। এ শ্রেণির ক্ষমতাবান ওয়ালিদের মধ্যে যিয়াদ ইবন আবু সুফিয়ান, উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, আমর ইবনুল আস, মুসা ইবন নুসাইর, উমার ইবন হুবায়রা, খালিদ আল-কাসরি প্রমুখ প্রধান ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক উন্নয়ন ও জনহিতকর কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে ওয়ালির দায়িত্বে সম্পন্ন হত।

পরবর্তী উমাইয়া খলিফাদের যুগে রাজ পরিবারের শাহজাদাগণ ওয়ালি হিসাবে নিযুক্ত হতেন। প্রায়শ তারা রাজধানীতে অবস্থান করতেন এবং নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে স্ব স্ব প্রদেশে প্রেরণ করতেন। এতে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। যে সকল শাহজাদা প্রদেশের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করতেন তাঁদের অধিকাংশই প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রে জমা দিতেন না। ফলে কেন্দ্রীয় ধনাগারও দুর্বল হয়ে পড়ত।

আমিল (কোষাধ্যক্ষ)

প্রদেশের দ্বিতীয় প্রধান অফিসার ছিলেন আমিল বা কোষাধ্যক্ষ। উমাইয়া যুগে সাধারণ প্রশাসন হতে রাজস্ব প্রশাসনকে পৃথক করা হয়। ফলে কোষাধ্যক্ষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্যক্ষেত্রে আমিলের ক্ষমতা ওয়ালি বা আমির অপেক্ষা বেশী ছিল। মিসরে খলিফা যে আমির নিযুক্ত করতেন, কখনও তাঁকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হত, কখনও দেয়া হত না। সেই সকল ক্ষেত্রে হয় খলিফা নয়ত আমির রাজস্ব কর্মকর্তা বা সাহিব আল-খারাজ নিয়োগ করতেন। খলিফা কর্তৃক নিয়োজিত রাজস্ব কর্মকর্তা আমিরের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন এবং সরাসরি খলিফার অধীন ছিলেন।

সাহিব আল-খারাজ (ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তা)

প্রদেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তা বা সাহিব আল-খারাজ। প্রথম দিকে সাহিব আল-খারাজ নামক কোনো কর্মকর্তার পদ ছিল না। কারণ তখন খারাজি ভূমি ছিল খুব স্বল্প পরিমাণ। খারাজ ভূমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে দিওয়ানুল খারাজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উক্ত বিভাগ সাহিব আল-খারাজ উপাধিধারী কর্মকর্তার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। 'আমিল' ও 'সাহিব আল-খারাজ'-এর মধ্যে কর্তৃত্বে তারতম্য ছিল। আমিল ছিলেন সাধারণভাবে সমগ্র রাজস্বব্যবস্থার প্রধান। 'সাহিব আল-খারাজ' ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন এবং বাইতুল মালে জমা দিতেন।

---

১. Under Mu'awiyah all the suspects in Damascus were registered and watched. Ziyad appoints Ja'd bin Qays to watch the activities of the suspects. see. Dr. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 121-22

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে 'আমিলুস সাদাকা' সাদাকা, যাকাত ইত্যাদি স্বেচ্ছামূলক দান ও অর্থ সংগ্রহ করতেন। 'আমিল' ছিলেন সকলের উধের্ক্ষ। তিনি প্রদেশের সমগ্র আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতেন। কিন্তু আমিল ছাড়া আর কোনো কর্মকর্তারা ওয়ালির দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না।

কাতিব (সচিব)

প্রদেশের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল কাতিব বা সেক্রেটারির পদ। কাতিব বা সেক্রেটারি দিওয়ানের তত্ত্বাবধায়ক। একজন ওয়ালির উপর বহুবিধ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত এবং সে সকল দায়িত্বের কিছু কিছু তিনি কাতিবের উপর ন্যস্ত করতেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালির কার্যক্রম প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে সকল কাজ একজন ওয়ালির পক্ষে করা সম্ভবপর ছিল না। সেজন্য বিভিন্ন বিভাগের কাজে সহায়তার জন্য ওয়ালি কয়েকজন কাতিব নিযুক্ত করতেন। কাতিবগণ ওয়ালিকে প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করতেন। যেমন প্রাদেশিক অর্থনীতির কাতিব সকল প্রকার রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আমির বা ওয়ালিকে সহযোগিতা করতেন।

সাহিব আল-আহদাস (পুলিশ প্রধান)

প্রদেশের পঞ্চম উধর্ক্ষতন কর্মকর্তা ছিলেন সাহিব আল-আহদাস বা পুলিশ প্রধান। প্রয়োজনবোধে তাঁকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হত। তবে তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল নাগরিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইন রক্ষা করা, অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা এবং অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করা। গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া থাকত গ্রাম্য প্রধানের উপর। অপরাধীকে ধরে দেয়া বা শায়েস্তা করার জন্য গ্রাম্য প্রধানের উপর চাপ প্রয়োগ করা হত। পুলিশ প্রধান ছিলেন একাধারে আধা-সামরিক ও আধা-বেসামরিক অফিসার। মুয়াবিয়ার শাসনামলে কুফায় ৪০,০০০ পুলিশের একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠিত হয়, কারণ কুফা ছিল বিদ্রোহীদের বড় একটি ঘাঁটি।[১]

কাযি (বিচারক)

প্রদেশে কাযি ছিলেন ষষ্ঠ উধর্ক্ষতন কর্মকর্তা। তিনি বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কাযিকে মামলার শুনানী কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাড়াও কতকগুলো অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হত। যেমন-

(১) তাঁকে অসমর্থ, নাবালেগ বা উন্মাদ হওয়ার কারণে যারা সম্পত্তির কর্তৃত্ব লাভে অক্ষম তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে হত ও তাদের সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হত।

(২) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে হত।

(৩) আইনানুগ ওয়াছিয়াত কার্যকরী করতে হত।

(৪) অবিবাহিতা মহিলাদের ও তাদের সম্পত্তি নিয়ে যোগ্যপাত্রে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করতে হত।

(৫) আইনগতভাবে নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হত।

(৬) প্রয়োজনবোধে সাদাকা আদায় করতে হত।

(৭) জনসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলের নিরাপত্তা বিধান করতে হত।

(৮) জনসাধারণের ব্যবহার্য পথঘাট যেন কেউ দখল না করে বা গৃহাদি নির্মাণ না করে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হত।

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রারম্ভ হতেই বিচারকের স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ বিচারকের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রাদেশিক ওয়ালিগণ সাধারণত কাযি নিযুক্ত করতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে খলিফাগণ কাযি নিযুক্ত করতেন। যেভাবেই নিযুক্ত হোক না কেন কাযি ন্যায় বিচার কায়েম করতেন।

আরব শাসন ব্যবস্থায় শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের নিরসনের জন্য এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত হতেন, যেমন– 'মুহতাসিব', 'সাহিব আল-শুরতা' এবং 'নায়িব আল-মাযালিম'। অষ্টম শতাব্দীতে, বিশেষ করে আবক্ষাসিয় যুগে মুহতাসিব মদ্যপান, ওজনে কারচুপি, দূষিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি দমনে সচেষ্ট থাকতেন। কাযির সঙ্গে 'সাহিব আল-শুরতা' বা পুলিশ কর্মকর্তার সম্পর্ক নিবিড় ছিল এবং উভয়ের সহযোগিতায় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত। সমাজবিরোধী কাজ দমনের দায়িত্ব ছিল পুলিশ বিভাগের কিন্তু কাযির সহায়তা ব্যতীত অপরাধীর দণ্ড হত না। কখনো কখনো নির্দোষ ব্যক্তি অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপিল করার সুযোগ পেতেন। যিনি এই আপীল কোর্টেও প্রধান ছিলেন তাকে বলা হত 'নাজির-আল-মাযালিম।'[১]

কুরা (জিলা প্রশাসন)

প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে কুরা বা জিলা বলা হত। কুরা আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টি। গ্রামকে বলা হত কারইয়া। গ্রাম প্রধানগণ কারইয়া প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন। মিসরে কারইয়া প্রধানগণ রাজস্ব আদায় করে সরকারের কোষাগারে জমা দিতেন।[২] মিসরে রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে কাবক্ষাল উপাধিধারী একজন সরকারি কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সরকারের পক্ষে কর ধার্য ও আদায় করতেন।[৩]

খুরাসান খুব বড় জিলা ছিল বলে মুয়াবিয়া সেখানে এক সঙ্গে দুইজন আমিল নিযুক্ত করেন।[৪] খুরাসানের প্রতিটি বালাদ বা শহরকে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্তির অধিকার দেয়া হত। উক্ত প্রতিনিধিগণ তাঁদের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকতেন।[৫]

উমাইয়া-স্পেন

উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের মত স্পেনের আমিরও ছিলেন সরকারের সামরিক ও বেসামরিক প্রধান। কর আদায় ও শান্তি রক্ষার জন্য দেশকে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করা হয়। এবং প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত ছিল গভর্নরদের উপর। প্রয়োজনের সময় তাদেরকে (কেন্দ্র) কর্ডোভা হতে সৈন্য সরবরাহ করা হত। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য হতে কর আদায়কারী নিযুক্ত হত। তারা কমিসনার বলে পরিচিত ছিল। পুলিশ শহরের শান্তি রক্ষা করত এবং পৌর প্রশাসনের প্রতিও লক্ষ্য রাখত। বড় শহরে অবস্থিত বিচারালয় ফৌজদারি ও সাধারণ মামলার রায় প্রদান করত। বড় বড় শহরে খ্রিস্টানদের জন্য নিজস্ব বিচারালয় ছিল।[৬]

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
২. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 361
৩. Becker, *Papyri*, p. 70-72
৪. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 357
৫. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 357
৬. প্রফেসর এস.এম. ইমামউদ্দিন প্রণীত, ড. আয়েশা বেগম সম্পাদিত, *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

কর্ডোভার পরবর্তী বিচার বিভাগের প্রধান কাযি ছিলেন সাহিব আল-মাযালিম, সাহিব আল-রাদ, সাহিব আল-শুরাতা, সাহিব আল-সুক অথবা মুহতাসিব এবং সাহিব আল-মাওয়ারিস (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারী)।[১]

সাহিব আল-মাযালিম নামে অপর একজন বিচারক কার্ডোভায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্বাস ভঙ্গ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অপরাধজনক মামলা শুনানীর জন্য আমিরগণ তাকে নিয়োগ করতেন। বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করতেন সাহিব আল-রাদ। সাহিব আল-রাদ ও সাহিব আল-মাযালিম নামে কোনো কোনো সময় একই ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করতেন।

নিজস্ব আইন মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনার জন্য অমুসলিমদের পৃথক বিচারক ছিলো। কিন্তু মুসলিম ও অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্পর্কিত মামলার বিচার করত মুসলিম বিচারক।

জরিমানা, বেত্রাঘাত ও অঙ্গচ্ছেদন ছিল সাধারণ শাস্তি। ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্ম ত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হত। সাহিব আল-শুরতা নামক শহর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কাযির অধীন। জনগণ তাকে সাহিব আল-লাইল ও সাহিব আল-মদিনা (নৈশ প্রহরী ও শহর প্রধান) বলত। কিন্তু দশম শতাব্দীতে এই দায়িত্ব পৃথক পৃথক দুই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়। কোনো কোনো সময়ে কাযি ও সাহিব আল-শুরতার দায়িত্ব একই ব্যক্তি পালন করতেন। সাহিব আল-শুরতার কার্যকলাপ প্রাসাদের ভিতরও ছিল। তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল শহর ও নগরের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব। তিনি জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি বিধান করতেন। পুলিশ প্রধান সরাসরি গভর্নরদের অধীনে ছিলেন। প্রাদেশিক শহরের পুলিশ প্রধানকে 'সাহিব আল-আহদাস' বলা হত। তার মর্যাদা নিয়মিত সেনা ও পুলিশের মাঝামাঝি ছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যান্য অপরাধ দমনের দায়িত্ব ছিল তার উপর।

কাযিদের শ্রেণিভুক্ত মুহতাসিব নামে পরিচিত বিশেষ কর্মকর্তার অধীনে ছিল পৌর পুলিশ বাহিনী। সাহিব আল-সুক অথবা ওয়ালি আল-সুক নামে প্রথম যুগের মার্কেট অফিসার দশম শতাব্দীর শেষে মুহতাসিব ও উল্লাত আহকামুল হিসবাহ নামে পরিচিতি লাভ করে। মুহতাসিব ছিলেন রাজার তত্ত্বাবধায়ক ও সরকারি পরিদর্শক। বাজারসমূহ পরিদর্শন কালে মাপ ও ওজন পরীক্ষার সময় তিনি প্রকাশ্যে প্রতারক ও চোরদের বেত্রাঘাত এবং শাস্তি প্রদান করতেন। জুয়া ও যৌন অপরাধ এবং রুচিহীন পোশাকেরও তিনি বিচার করতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন ও মৃত্যুদন্ডের ন্যায় কঠোর শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা তার ছিল।[২]

বিচার বিভাগের কার্যকে সহজ করার জন্য আরও কতকগুলি পদ ছিল। সেই পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা হলেন–(১) কাযি আল আসাকির (সামরিক বিভাগে বিচারপতি) (২) সাহিব আল-মাযালিম (মজলুমদের প্রতি ইনসাফ কায়েমের বিচারপতি) (৩) সাহিব আল-রা'দ (বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযান শ্রবণ ও বিচারের বিচারপতি) (৪) সাহিব আল-শুরতা (পুলিশ প্রধান) (৫) সাহিব আল-শুক (বাজার প্রধান) (৬) সাহিব আল-মাওয়ারিস (এতিম ও ওয়ারিসি সম্পর্কিত বিচারের বিচারপতি)। এটা এরা ব্যতীত প্রতি শহরে একজন সাহিব আল-লাইল ও একজন সাহিব আল-মদিনা থাকতেন। প্রদেশে সাহিব আল-আহদাস অবিকল কেন্দ্রের সাহিব আল-শুরতার কার্য করতেন। দশম শতকে সাহিব আল-সুক মুহতাসিব নামে অভিহিত হন। মুহতাসিব বাজার দর নিয়ন্ত্রণ, জনগণের নৈতিক অপরাধ নির্ধারণ ও শাসন করতেন। মিথ্যা, জুয়াখেলা, ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি অপরাধে শাস্তি দেয়া হত। হাতকাটা ও

১. প্রফেসর এস.এম.ইমামউদ্দিন, *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুদন্ড আইন বলবৎ ছিল। রাত্রিতে নগরদ্বারে যে প্রহরী থাকত তাকে আল দারাবুন বলা হত। এছাড়াও যাত্রাপথে জনগণের জানমাল ও ইজ্জত হেফাজতের জন্য প্রহরী ছিল।[১]

উমাইয়া শাসন আমলে পুলিশ বিভাগের প্রধান (সাহিব আল-শুরতা) শাসনকর্তার অধীন ছিলেন। হিশামের রাজত্বের প্রারম্ভে 'আহদাস' নামক এক প্রকার নতুন সৈন্যদলের সৃষ্টি হয়েছিল; তারা বেসামরিক নগররক্ষী দলের কাজ করত এবং পুলিশ ও নিয়মিত সৈন্যদলের মধ্যবর্তী স্থান দখল করেছিল।[২]

এছাড়া উমাইয়া শাসন আমলে শাসনকার্য বস্তুত চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল–

(১) দিওয়ান আল-খারাজ (ভূমি রাজস্ব বিভাগ); এটা বর্তমান অর্থবিভাগের মতো ছিল (২) দিওয়ান আল-খাতাম বা সীলমোহর বিভাগ; এখানে সরকারি অনুজ্ঞাসমূহ তৈরি অনুমোদিত ও সীলমোহরাঙ্কিত হত (৩) দিওয়ান আল-রাসায়িল বা পত্রবিনিময় বিভাগ; প্রাদেশিক ব্যাপারসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকর্তাগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ভার এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল; (৪) দিওয়ান আল-মুস্তাগিল্লাত বা বিবিধ রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগ।

এটা ব্যতীত রাজস্ব বিভাগের অধীনে আরও দুটি দফতর ছিল বলে মনে হয়; এগুলোর উপর পুলিশ ও সৈন্যদের বেতন প্রদানের ভার ছিল।[৩]

উমাইয়া শাসকগণ শুক্রবারের নামাজ ও দৈনিক নামাজে ইমামের কার্য করবেন এরূপ আশা করা হত। মুয়াবিয়া আব্দুল মালিক এবং দ্বিতীয় উমর অতিশয় নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় ইয়াজিদ প্রায়শ দেহরক্ষী প্রধানকে (সাহিব আল-শুরতা) প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করতেন।[৪]

নগরের নৈশপ্রহরী প্রধান মুসলিম স্পেনে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি দাপ্তরিকভাবে সাহিব আল-শুরতা কিন্তু জনগণের কাছে সাহিব আল-মদিনা', 'যাহবাল মেদিনা' বা 'সাহিব আল-লাইল', 'যাহবালেইল (নৈশপ্রহরী প্রধান) নামে অভিহিত হতেন। তিনি নৈশ পুলিশ পরিদর্শক এবং ফৌজদারি ও অন্যান্য মামলার বিচার করতেন। বেসামরিক শাসনকর্তা ও বিচারালয় সংক্রান্ত কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্বপালন করতেন। কাযিগণ বিচার কাজে তার সহযোগিতা পেতেন। উমাইয়া খিলাফত আমলে এই কর্মকর্তাকে শুধু মাত্র কর্ডোভা আয-যাহরা এবং আয-যাহিরাহর ন্যায় শহরগুলিতে নিয়োগ করা হত।

মুসলিম শহরগুলি খ্রিস্টানদের দ্বারা পুনঃ বিজিত হলে খ্রিস্টানগণও এই কর্মকর্তাদেরকে একই ক্ষমতা ও দায়িত্বে সারাগোস, টলেডো প্রভৃতি শহরে নিয়োগ করে। এই দায়িত্বসমূহ আধুনিক স্পেনেও রাজপ্রাসাদ ও বিচারালয়ের মেয়র কর্তৃক পালিত হয়।

ওয়ালিগণ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং হাজিব (প্রধানমন্ত্রী) এর মাধ্যমে আমির বা খলিফার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বানু তাইফাসদের সময়ে টলেডো, সেভিল, মার্সিয়া, সারাগোস প্রভৃতি শহরের উযিরগণ তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন না, তারা শুধু তাদের শাসকদের আজ্ঞাবাহক কোর্ট কনেস্টবল ছিলেন।

---

১. প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ৬ষ্ঠ সং., মহররম ১৪২৩ হি.,পৃ. ১৯৮
২. সৈয়দ আমির আলি প্রণীত, শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনুদিত, ড. মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: ঢাকা বুকস্ ইন্টারন্যাশনাল, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৬১
৩. সৈয়দ আমির আলি প্রণীত, শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনুদিত, ড. মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে টলেডোতে উযির ও কাযির দায়িত্ব একই ব্যক্তির উপর অর্পিত ছিল। আরাগনে উযির ও কাযির কর্তব্য 'alguaciel real' (রাজকীয় কনস্টেবল) পালন করতেন। তিনি 'Casa de Asturia (Austurian House) প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত আইন সংক্রান্ত সকল বিষয়ের উপর দেওয়ানি ও ফৌজদারি আধিপত্যের অধিকারী ছিলেন। Alguacil mayor (মহা-কনস্টেবল) তাইফাসের উযিরদের সমান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মুসলিম স্পেনের সাহিব আল-মাযালিমের দায়িত্ব Justicia mayor de Aragon (আরাগণের মহাবিচারক) কর্তৃক অনুকৃত হত।

'মুহতাসিব', মুসলিম স্পেনের ওজন ও পরিমাপ বিষয়ক বাজার পরিদর্শক সাধারণভাবে 'মুসতাসিফ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বর্তমানে almotacen নামে অভিহিত হন। এই কর্মকর্তা জালিয়াতি, ওজন ও পরিমাপে প্রতারণা, নগর পরিবহন, বাড়িঘর নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে দেখাশোনা করতেন এবং দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১]

উমাইয়া যুগের পুলিশ বাহিনী

উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তাঁর পূর্বে খুলাফায়ে রাশিদিনের তিনজন খলিফা হযরত উমর, উসমান ও আলি (রা.) আততায়ীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।[২] এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি পুলিশ ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারসাধন করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আল-আহদাস নামে পুলিশ বাহিনী এবং এর প্রধানকে বলা হত সাহিব আল-আহদাস। সাথে সাথে তিনি পুলিশ বাহিনীর সাথে খলিফার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী পুলিশ বাহিনীও সংযোজন করেন। তিনিই হলেন প্রথম মুসলিম শাসক যিনি ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন।[৩]

সাহিব আল-আহদাস বা পুলিশ প্রধান প্রদেশের পঞ্চম উধর্ক্ষতন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন অর্ধসামরিক ও অর্ধবেসামরিক কর্মকর্তা। প্রয়োজনবোধে তাঁকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হত। তবে তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল নাগরিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা এবং অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করা। গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া থাকত গ্রাম্য প্রধানের উপর। অপরাধীকে ধরে দেয়া বা শায়েস্তা করার জন্য গ্রাম প্রধানকে চাপ প্রয়োগ করা হত।

উমাইয়া যুগে পুলিশের ক্রমবিকাশ

খলিফা মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময় পুলিশ বাহিনী শুরতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রদেশের গভর্নরগণ শুরতা বা পুলিশকে সমাজের রক্ষক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবহার করতো। মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর শাসনকর্তাদের শাসনামলে শুরতা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে পরিগণিত হয়। দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দমন করত। যেমন– শিয়া ও খারিজিদের দমন।

---

১. মোঃ আবু তাহের, *স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৮, পৃ. ১৪৩

২. "হযরত উমর (রা.) কে নামাযরত অবস্থায় আবু লু'লু' ফিরোজ হি. ২৩ সনের ২৭ যিলহজ্জ বুধবার খঞ্জরের দ্বারা একে একে ছয়টি আঘাত করে আহত করে এবং এ অবস্থায় তিনি হি. ২৪ সনের ১ মুহররম শনিবার শাহাদত বরণ করেন।" দ্র. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : ইফাবা, ২য় সং, জুন ২০০৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫
"উসমান (রা.) কে কুরআন তিলাওয়াত রত অবস্থায় কিনানাহ ইবন বশীর হি. ৩৫ সনের ১৮ যিলহজ্জ তরবারি দ্বারা একে একে দু'টি আঘাত করে শাহাদত করে।" দ্র. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, প্রাগুক্ত পৃ. ৪০৪; "হি. ৪০ সনের ১৫ রমযান আব্দুর রহমান ইবন মুলযিম মসজিদের মধ্যে হযরত আলি (রা.) এর উপর হামলা চালিয়ে আহত করে। এর দু'দিন পর ১৭ রমযান তিনি শাহাদত বরণ করেন।" দ্র. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮৮

৩. "وقد توسَّع معاوية بن أبي سفيان في اتخاذ الشرطة، وتطويرها، فأضاف إليها شرطة الحرس الشخصي، وكان أول من اتخذ الحرس في الحضارة الإسلامية، وخاصة وقد اغتيل زعماء الدولة الإسلامية قبله: عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم." البداية في والنهاية لابن كثير، المجلد الثامن، ص. 156

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে মুয়াবিয়া (রা.)ই প্রথম খলিফা, যিনি নিজেকে রক্ষার জন্য পুলিশের ব্যবহার শুরু করেন। Al-Damiri তাঁর *Hayat al-Hayawan al-kubra* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তিনি যখনই বাইরে যেতেন তখনই তার নিরাপত্তা দেহরক্ষীদের সঙ্গে রাখতেন।[১]

মুয়াবিয়া (রা.)কে রক্ষার কাজে এই বাহিনীর প্রভাব ছিল বিশেষ করে খারিজিরা যখন আলি (রা.)কে হত্যা করে এবং মুয়াবিয়া (রা.) ও ইবনে আল-আস হত্যার পরিকল্পনা করে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনার পর মুয়াবিয়া (রা.) যখনই মসজিদে নামাজের জন্য যেতেন তখন শুরতা বা পুলিশকে তাঁর নিকটে অবস্থানের জন্য নির্দেশ দিতেন।[২] হারাস এবং শুরতা বাহিনীর সংজ্ঞা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে মুয়াবিয়া (রা.) প্রচলিত পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি হারাস (দেহরক্ষী) বাহিনী চালু করেন। তাদের দায়িত্ব ছিল খলিফাকে রক্ষা করা এবং শত্রুদের নিকট থেকে প্রাসাদকে রক্ষা করা।[৩]

হারাস বাহিনী শুরতা বা পুলিশের বৃহৎ দল হতে সংগ্রহ করা হত এবং তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল প্রাসাদের অন্দর কেন্দ্রিক। ইয়াকুবের মতে, মুয়াবিয়াই প্রথম হারাস ও শুরতা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হারাস বাহিনীর বল্লম দ্বারা তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন।[৪]

উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) অধিক সংখ্যক পুলিশ নিয়োগ করেন এবং পুলিশি ব্যবস্থার নিয়োগ সাধন করেন। তিনিই প্রথম খলিফা যিনি দেহরক্ষী নিয়োগ এবং দেহরক্ষী পুলিশেরও উন্নতি সাধন করেন। বিশেষ করে, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলি (রা.) নিহত হওয়ার পর তিনি এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। উমাইয়া যুগে পুলিশ পদটি খলিফার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম প্রধান ছিল। এ যুগে পুলিশ প্রধান পদটি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, অনেক রাজপুত্র এ পদটি অলংকৃত করেন। ১০১০ হিজরীতে খালিদ বিন আব্দুল্লাহকে বসরার পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[৫]

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে উক্ত বিভাগের সর্বপ্রথম বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) এর যুগে যিয়াদ এ বিভাগটির প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। চার হাজার লোক পুলিশ বিভাগে ভর্তি করা হয়, যার কর্তৃত্ব দেয়া হয় আবদুল্লাহ বিন হিসানকে। এরূপ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য যাই হোক তথাপি এ বিভাগের দ্বারা শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত দূর উন্নতি হয় যে, রাস্তায় যদি কারও কোনো জিনিস পড়ে যেত তবুও কোনো ব্যক্তি হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো না। মহিলারা ঘরের দরজা খুলে রাতের বেলায় ঘুমুতো। যিয়াদ নিজেই বলতেন, "যদি আমার এবং সুদূর খোরাসান প্রদেশের মাঝে একটি রশিও হারিয়ে যায় তবে সাথে সাথেই রশি গ্রহণকারী ব্যক্তিটির নামও আমি জানতে পারবো।" শান্তিপ্রিয় ও ভদ্রলোকদের হিফাজত করা এবং অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর লোকদের দমনে সরকারের সাথে সবরকমের সহযোগিতা করাই হবে ইসলামের দৃষ্টিতে পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্য কথায়-দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশের প্রতিটি ফাঁড়ি তথা প্রতিটি থানায় একটা রেজিস্ট্রার থাকবে যাতে পার্শ্ববর্তী সমস্ত

---

১. Muhammad Ibn Musa Ibn Isa al-Damiri, *Hayat al-Hayawan al-Kubra*, Cairo : 1284 A.H., Vol. 1, p. 74
২. Tabari, Ibid, vol. 5, p. 149
৩. Ansab, vol. 4A, p. 136; Tabari, vol. 5, P. 330; Ibn Khayyat, vol. 1, p. 276
৪. Yaqubi, vol. 2, p. 220
৫. Umayyad Caliph Mu`awiyah ibn Abu Sufyan (may Allah be pleased with him) recruited more police members and developed its system. He developed the so-called bodyguard police. He was the first Muslim ruler to appoint a bodyguard, especially the former caliphs `Umar, `Uthman and `Ali (may Allah be pleased with them) were assassinated. Therefore the police under the Umayyad Caliphate was a tool for the implementation of the caliph's orders. Sometimes, the position of the chief of police (Sahib al-Shurtah) was so sensitive that some princes and viceroys held it. In 110 AH Khalid ibn `Abdullah was appointed as a viceroy and chief of police of Basra. see: http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2012

Dhaka University Institutional Repository

চোর, গুন্ডা ও বদমাশ লোকদের নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকবে। হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা) এ বিভাগে আরও একটি সংযোজন করেন এবং তা সন্দেহজনক লোকের চাল-চলন ও গতিবিধি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তিনি দামেশকে হযরত আবু দারদা (রা.)-কে লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি সেখানকার সমস্ত বদমা'শ লোকের নাম লিখে পাঠিয়ে দেন।[১]

মুয়াবিয়া (রা.)-এর রাজত্বকালে পুলিশ ও হারাস বাহিনী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। হযরত উসমান (রা.) এর সময় কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যদল বোঝালেও পরবর্তীকালে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে প্রসার ঘটে। কুফার গভর্নর সাইদ বিন আল-আস উল্লেখ করেন যে, ইসলামের ইতিহাসে আব্দুর রহমান আল আসাদিই সম্ভবত প্রথম পুলিশ প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খলিফার পুলিশ প্রধানদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আরব বংশীয়। অন্যদিকে হারাস প্রধান ছিলেন অনারব।[২]

যিয়াদ বসরার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর চার হাজার সৈন্য নিয়োগ করেন। যাদের দায়িত্ব ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সান্ধ্যআইন (কারফিউ) বলবৎ করা। পুলিশ রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল গ্রেফতার যেমন ৬৭১ খ্রিস্টাব্দে হুযায়ির বিন আদি এর গ্রেফতার এবং শুরতা অধিনায়ক হোসাইন বিন নুমাইর আল-তামিম[৩] এর অধীনে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে আলি (রা.) এর পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.)-কে হত্যার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেন এবং শিমার ইমাম হুসাইন (রা.) কে হত্যা করে। অন্য এক বর্ণনামতে, শিমার যিল জাওশান ছয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম হুসাইন (রা.) উপর হামলা চালায়।[৪]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তার ত্রিশজন তরবারি সজ্জিত পুলিশ সদস্য কারবালার প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন এবং শিয়া অনুসারী মুসলিম বিন আকিলকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেন। শাসকবর্গের স্কর্ট প্রদানের জন্য পুলিশ সদস্যদের ভূমিকা ছিল। যিয়াদ তাঁর প্রটোকল প্রদানের জন্য পুলিশ প্রধান কর্তৃক বর্শা বহন করার প্রথা প্রবর্তন করেন। পুলিশ সাধারণত তরবারি সজ্জিত থাকত কিন্তু তারা অস্ত্র হিসেবে এক ধরনের দন্ড ব্যবহার করত। আরব বংশোদ্ভূত পুলিশ প্রধানকে শুরুর দিকে আমির আল শুরতা বলা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি সাহিব আল-শুরতা রূপে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া যিয়াদ পাঁচশত হারাস পুলিশ নিয়োগ করেন।[৫]

---

১. মওলানা মুশাহিদ আলি, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২. Muswiyas reign saw the developments of the shurta and the haras into established Institutions. There are secured references to the shurta (or more commonly to the plural shurat) from the reign of 'Uthman onwards, orDginally the term probably meant simply 'choice troops, but it soon developed by usage to mean police or security forces. In 33/653-4 the governor of Kufa, saib al-As is said to have had a sahib al-shurta, 'Abd al-Rahman al-Asadi, who is possibly the first known holder of this office in Islamic history. The names of the commanders of the Caliph's shurta are listed, and seem to have been mostly Arab tribesmen. The commanders of the guard (ashab al-haras) by contrast, usually seem to have been non-Arab mawids (freedom). see. Huge Kennedy, *The Armies of the Caliphs*, NewYork : 1st published, 2001, p.

৩. When Ubayd Allah b. Ziyad had learnt of the journey of al-Husayn, peace be on him, from Mecca to Kufa, he had sent al-Husayn b. Numayr, the commander of the bodyguard (shurta), to station himself at al-Qadisiyya and to set up a (protective) link of cavalry between the area of al-Qadisiyya to Khaffan and the area of al-Qadisiyya to al-Qutqutaniyya. see: http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?print =5, visited on: 2/25/2016

৪. মূল: মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনু: মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা-২০০৩, পৃ. ৭৩-৭৪

৫. After his appointments as governor of Basra in 45/665-6, Ziyad b. Abi Sufyan established a shurta of 4000 men which was responsible for law and order and enforcing a strict curfew. It was the shurta who undertook the politically sensitive arrest of Hujr b. Adi in 51/671-2, and the shurta under its commander. Hussayn b. Tamim played a leading role in the death of al-Husayn b.Ali at Karbals in 61/680. Ubayd Allah b. Ziyad had shurtas armed with swords in his audience, and the thirty members of the shurta he had with him in his palace in kufa in 60/680 enabled him to hold off the Shi'te followers of Muslim b.Aqil while he created a diversion. They also had a ceremonial role as the governor's escort and Ziyad established the protocol of the leader of the shurta carrying a ceremonial spar, the harba, before him. The were certainly armed with swords but the characteristic weapon was the stave (amlid) which they would used to quell civil disturbances. The commander of the shurta, who was always an Arabtribesman, was sometimes called the amir al- shurta in the beginning but the usage sahib al-shurta soon became generally established. Ziyad also recruited a guard (haras) of 500 men who were stationed (rabita) in the mosque. see. Huge Kennedy, *The Armies of the Caliphs*.

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াবিয়ার শাসনের শেষ দিকে পুলিশ বিভাগ দুটি প্রধান সামরিক পুলিশ ইউনিট হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। খলিফার পুলিশ এবং হারাস প্রধান উমাইয়া এবং আবক্ষাসীয় যুগে গুরুত্বপূর্ণ অফিস হিসেবে স্থান করে নেয়। প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীতে পুলিশ নিয়োজিত ছিল। পুলিশ প্রধান গভর্নর কর্তৃক নিয়োগকৃত হত। সাধারণত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে তাদের নিয়োগ করা হত। তারা ছিল সরকার এবং খলিফার নিয়মিত সৈন্য।

গাসসানি সম্প্রদায় উমাইয়া সাম্রাজ্যেকে সমৃদ্ধ করণের সহায়ক ও শান্তিস্থাপক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক তাদের ঐতিহ্যকে মূল্যায়িত করা হয় এবং মুয়াবিয়া খ্রিস্টান ও বাইজেন্টাইন অমুসলিমদের অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানান। গাসসানিগণ রাষ্ট্রের সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– খলিফা কর্তৃক গভর্নর পদে নিয়োগ, সচিব, গৃহাধ্যক্ষ ও পুলিশ প্রধান। এছাড়া গাসসানিগণ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে সিরিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন।[১]

ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া আল গাসসানি তার পিতার মাধ্যমে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। ইয়াহিয়া বিন কায়িস খলিফা মারওয়ানের পুলিশ বাহিনীতে কাজ করেন।[২]

মাসুদির বর্ণনা মতে, 'তারীখে ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর স্থানীয় ফৌজদার বা পুলিশ প্রধানের রিপোর্ট শুনতেন। এরপর মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সভাসদবৃন্দ রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে তাঁর দরবারে হাযির হতেন। ঐ বৈঠকে পেশকাররা বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছ থেকে আগত চিঠি-পত্রাদি ও রিপোর্টসমূহ পড়ে শুনাত। যোহরের সময় সালাত আদায়ের জন্য তিনি মহল থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং সালাতে ইমামতি শেষে মসজিদেই বসে যেতেন। তিনি সেখানে জনসাধারণের মৌখিক অভিযোগসমূহ শুনতেন এবং তাদের আবেদন গ্রহণ করতেন। এরপর মহলে ফিরে এসে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাত দান করতেন। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। আসরের সালাত সমাপনান্তে তিনি মন্ত্রী, সভাসদ ও উপদেষ্টাদেরকে সাক্ষাত দান করতেন। রাতের বেলা দরবারে বসেই সবার সাথে খাবার খেতেন এবং আরেকবার জনসাধারণকে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়ে সেদিনের মত অন্দর মহলে চলে যেতেন।[৩]

মুয়াবিয়ার সময় ইরাক প্রদেশের পুলিশের ভূমিকা

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময় ইরাক দুটি বৃহৎ প্রদেশে বিভক্ত ছিল। একটি কুফা এবং অপরটি হলো বসরা। খলিফা আলি (রা.)-এর সময় তিনি কুফাকে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া যখন ৬৬১ খ্রি. খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি রাজধানীকে দামেস্কে স্থানান্তর করেন। মুয়াবিয়া'র সময় কুফার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন মুগিরা ইবনে শুবা। মুগিরা সুরতা বাহিনী দ্বারা কুফার

---

১. Their grand children composed and related Arabic histories of the early Islamic empire. Their role as facilitators and mediators for the Umayyads meant that they were poised to participate in the development of the Islamic state as they prospered under their new rulers. Their heritage was valued by Muslim elites as early as the reign of Muawiya, who sought the expertise of both Christian Arabs and non-Arab Byzantine officials who continued in their employ during the initial decades of Muslim occuption. In this environment, Ghassanids held important civil and military posts. Governors, ashab al-shurta chiefs of police, scribes and chamberlains to the caliph. One even went on to become a famous holy man. Ghassanid scholars would also feature in networks of teachers and students in Syria during the first centuries of Islamic in Syria. see. Nancy Khalek, *Damascus after the Muslim Conquest*, New York : Oxford University Press, 2011, pp. 44-45

২. Yahya b. Yahya al-Ghassani (d. 132/5) was conneted to the upper levels of the Ummayad regime through his father, Yahya b.Qays, who served in the shurta of the caliph Marwan. see. Nancy Khalek, *Damascus after the Muslim Conquest*, Ibid, p. 46

৩. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসামের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা: ইফাবা-২০০৮, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি Qubaysa Ibn Dammun কে সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন।[১] মুগিরার শাসনামলে খারিজিরা কুফায় বিদ্রোহ শুরু করে। এ সময় সাহিব আল-শুরতা মুগিরার নিকট গিয়ে বলেন যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খারিজিরা একটি বাড়িতে সমবেত হয়েছে। গভর্নর মুগিরা তৎক্ষনাৎ সাহিব আল-শুরতাকে বাড়িটি অবরোধ করার নির্দেশ দেন। শুরতা সেখানে গমন করে বিশৃঙ্খলাকারীদের বন্দি করেন।[২] কুফায় পরিস্থিতি অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সঙ্গীয় খারিজিরা জেলখানায়ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়।

তখন গভর্নর মুগিরা খারিজিদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিয়াপন্থী অনুসারীদের জড়ো করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৩] বসরা প্রদেশের প্রথম উমাইয়া শাসক আব্দুল্লাহ বিন আমির উপজাতিদের দমন করতে অক্ষম ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত ও সরল হৃদয়ের মানুষ। যিনি দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ পছন্দ করতেন না। তখন বসরা প্রদেশে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল; কেউই নিরাপদ ছিল না।[৪]

মুয়াবিয়া বসরার বিখ্যাত ব্যক্তিদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে বরখাস্ত করেন।[৫]

৬৬৫ খ্রি. মুয়াবিয়া যিয়াদকে বসরার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। যিয়াদ যখন বসরায় আগমন করেন তখন নগরীতে কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তিনি তার অভিষেক বক্তৃতায় বসরার নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন–

"You are putting tribal loyalties before relDgion ....You are excusing and sheltering criminals from amongst you, and tearing down the protecting laws sanctified by Islam."[৬]

তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা থেকে বসরার সামাজিক দুর্নীতির চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীদের বিপদের বিষয়ে সতর্ক করেন।[৭]

ঐতিহাসিক বালাযুরির মতে, যিয়াদ গভর্নর বা শাসক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর প্রাসাদের কাছে কিছু শব্দ শুনতে পান। যিয়াদ তখন জিজ্ঞাস করেন, ঐ শব্দগুলো কিসের। তখন তিনি জানতে পারেন যে, কোনো নিরাপত্তা নেই বা কোনো পুলিশ নেই। একজন ব্যক্তিকে প্রাসাদ পাহারার জন্য ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে।

সেদিনই, যিয়াদ এশার নামাজের পর থেকে বসরার রাস্তায় সাহিব আল-শুরতাকে টহল দেয়ার নির্দেশ দেন।[৮] বালাযুরি আরও উল্লেখ করেন যে, ঐদিন সাহিব আল-শুরতা এবং তাঁর সঙ্গীয় পুলিশগণ যখন বসরার রাস্তা দিয়ে গমন করেন তখন প্রায় পাঁচশ দুর্বৃত্তকে হত্যা করেন।[৯]

---

১. Tabari, vol. 5, p. 181; Ansab, vol. 4, p. 144
২. Tabari, vol. 5, p. 182
৩. Tabari, Ibid, pp. 184-89
৪. Tabari, p. 212; Abd al-Rahman b. Muhammad Ibn Khaldun, *Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada w'aL-Khabar*, Cairo : 1887, vol. 3, p. 7
৫. Tabari, vol. 5, p. 212
৬. Tabari, Ibid, vol. 5, p. 218-219
৭. Tabari, Ibid, p. 222; Ansab, vol. 4A, pp. 180-82
৮. Ansab, vol. 4A, p. 171
৯. Ansab, Ibid

Dhaka University Institutional Repository

যিয়াদই প্রথম ব্যক্তি যিনি বসরায় সান্ধ্যআইন বা Curfew বলবৎ করেন এবং জনগণকে রাত্রিকালে তাদের গৃহ হতে বের হতে নিবৃত্ত করেন। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, একদিন বেদুইন এক ব্যক্তি এশার নামাযের পর Curfew আইন সম্পর্কে অজ্ঞাত হয়ে বের হয়ে পড়ে। তখন সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান তাকে দেখে ফেলে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বন্দি করা ও খলিফার নিকট হাজির করার জন্য পুলিকে নির্দেশ দেন। শাসক যিয়াদ ঐ বন্দিকে রাত্রিকালে বাইরে গমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে ঐ বেদুইন বলেন, তিনি বসরায় তার মেষ বিক্রি করার জন্য এসেছিলেন। তিনি জানেন না কেন তিনি বন্দি হয়েছেন। যিয়াদ তার প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনি তার কথায় বিশ্বাস করেন কিন্তু নগরীর মঙ্গলের জন্য বেদুইনকে হত্যা করাই তার দায়িত্ব।[১]

তখন তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এ ঘটনার দ্বারা যিয়াদ বসরার জনগণকে বার্তা দিতেন চান যে, কেউ ভুলক্রমে আইন ভঙ্গ করলেও তাকে এরূপ শাস্তি পেতে হবে যদিও সে নির্দোষ। এ ঘটনা দ্বারা তিনি নিজেকে শক্তিশালী শাসক হিসেবে জনসম্মুখে প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

যিয়াদ সমগ্র প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা সফলভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের পুণর্গঠনের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি পুলিশের সংখ্যা চার হাজারে বৃদ্ধি করেন এবং একজন পুলিশের প্রধানের পরিবর্তে দু'জন পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন।[২] যিয়াদ ও হুযর ইবনে আদির মধ্যে বিবাদের সময় সমর্থকগণ লাঠি নিয়ে মসজিদে আগমন করেন। এ সময় একজন পুলিশ সদস্য তার লাঠি দ্বারা জনতার মধ্যে এক ব্যক্তিকে তার মাথায় আঘাত করে তাকে নিবৃত্ত করেন। ৬৮০ খ্রি. গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কুফার গভর্নর থাকাকালীন সময় চার হাজার অশ্বারোহী বাহিনীর সমন্বয়ে শুরতা বাহিনী গঠন করেন। এর মধ্যে প্রায় দুইশত জন গোত্র প্রধান ও সরকারি কর্মকর্তাদের অনুচর ছিল। গভর্নর যিয়াদ বিদ্রোহ দমনে আরিফ, পুলিশ এবং হারাস বাহিনীর উপর নির্ভর করতেন। নিরীহ জনসাধারণকে সরকারকে সমর্থন করার জন্য সমজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং প্রতিটি গৃহে মুসলিম বিন আকিলের অনুসন্ধানের জন্য পুলিশকে তল্লাশি করতে বলা হয়। মুসলিমকে পাওয়া গেলে একজন পুলিশকে মুসলিমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৩]

এ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বসরার নগরী ও নাগরিক সমাজের অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কেউ কোনো জিনিস হারিয়ে ফেললে কেউ তা ছুয়েও দেখতনা যতক্ষণ না বস্তুর মালিক এটি সংগ্রহ করতো। এমনকি রমনীগণ তাদের গৃহের দরজা খুলে নিদ্রাযাপন করতে পারতেন।[৪]

যিয়াদ খারিজিদের পক্ষ থেকে বিশেষ বিরোধিতা মোকাবিলা করেন। ৬৬৭ খ্রি. খারিজিদের একটি দল বসরার মসজিদ রক্ষকদের প্রধানকে হত্যা করে। যখন পুলিশ এ ঘটনা জানতে পেরে পুলিশ খারিজিদের মোকাবেলা করতে থাকে যতক্ষণ না খারিজিদের অধিকাংশ লোকদের হত্যা করা হয়।[৫] পরবর্তীতে খারিজিরা যাহাব বিন যাহরকে নতুন নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেন। খারিজিরা বিভিন্ন স্থাপনার উপর নতুনভাবে আক্রমন শুরু করে এবং যাদেরকে তারা তাদের বিরুদ্ধবাদী মনে করতো তাদেরকেই তারা হত্যা করতো। পুলিশ বাহিনী বা পুলিশ খারিজিদের এ হত্যার কথা জানতে পারে। তখন পাঁচশ পুলিশ সদস্য তাদের দমনের জন্য বের হয়। পুলিশ বাহিনী খারিজিদের গৃহ অবরোধ করে তারপর তাদেরকে আক্রমণ করে হত্যা করে।[৬]

---

১. Ansab, Ibid, p. 172; Michael G. Morony, *Iraq after the Muslim conquest*, New Jercy: Gorgias Press, 2005, p. 35
২. Tabari, vol. 5, p. 222, Ansab, vol. 4A, p. 188
৩. Michael G. Morony, *Iraq after the Muslim conquest*, Ibid, p. 95
৪. Tabari, vol. 5, p. 222
৫. Ansab, vol. 4A, p. 149
৬. Ansab, vol. 4A, p. 152, Ibn Khayyat, vol. 1, pp. 262-263

Dhaka University Institutional Repository

কুফার গভর্নর মুগিরা ৬৭০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করলে মুয়াবিয়া যিয়াদকে একই সাথে 'কুফা' ও 'বসরা'র গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। কুফার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বসরার তুলনায় অধিকতর অস্থিতিশীল ছিল। কারণ কুফায় উমাইয়া বিরুদ্ধ মত অধিক ছিল; কেননা কুফার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল শিয়াপন্থী। কুফায় উপস্থিত হয়ে যিয়াদ জনগণকে সতর্ক করলেন যে, তিনি কুফার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বসরা প্রদেশ হতে দু'হাজার শুরতা বা পুলিশ আনয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কুফাবাসীকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা ছিল সত্যবাদী জনগণ।[১]

যখন যিয়াদ তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করেন তখন জনগণ তার প্রতি প্রস্তর বা পাথর নিক্ষেপ শুরু করেন। তখন যিয়াদ নির্দেশ দেন যে, যে সকল লোক আল্লাহর নামে শপথ নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তাদের হস্ত কর্তন করা উচিত।[২] বস্তুতপক্ষে, এ ঘটনায় ত্রিশ ব্যক্তির হাত কাটা হয়। যিয়াদ শিয়াদের বিদ্রোহ দমনে পুলিশকে ব্যবহার করেন। সে সময় কুফার শিয়া নেতা ছিলেন হুযর বিন আদি। যিয়াদ তাকে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেন।[৩]

হাযর বিন আদি কুফায় বিদ্রোহ অব্যাহত রাখলে যিয়াদ জনৈক পুলিশকে নির্দেশ দেন, হাযর বিন আদিকে যেন রাজপ্রাসাদে হাজির করা হয়। কিন্তু হাযর রাজপ্রসাদে হাজির না হলে পুলিশ যিয়াদের নিকট ফিরে যায় এবং হাযরের অস্বীকৃতির কথা অবগত করে। তখন সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান আরও অধিক সংখ্যক পুলিশকে হাযরের নিকট প্রেরণ করেন যিয়াদের নিকট হাযরকে হাজির করার জন্য। হাযর ও তার অনুসারিরা পুলিশকে অপমান করে এবং হাজির হতে বিরত থাকে। তখন পুলিশ প্রধানকে অন্যান্য পুলিশের সাথে অপারেশনে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেন। তারপরও সে যদি যিয়াদের নিকট আসতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাকে যেন বল প্রয়োগের মাধ্যমেও হলেও তার নিকট হাজির করা হয়।[৪]

এ ঘটনায় হাযর ও তার অনুসারীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং হাযর নগরীর একটি অংশ দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে পিছু ধাওয়া করে বন্দি করে, পরে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়। যিয়াদ ৬৭২ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইরাকের আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুলিশ বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ ফোর্স হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনামলে ইরাক শান্তিপূর্ণ প্রদেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। জনগণকে তাদের জান ও মালের জন্য কখনই ভীত হতে হত না। যিয়াদের মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া কুফা প্রদেশকে বসরা হতে পৃথক করে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৬৭৪ খ্রি. মুয়াবিয়া যিয়াদের পুত্র উবায়দুল্লাহকে বসরার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। উবায়দুল্লাহ তাঁর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় পিতার মত একই নীতি অনুসরণ করেন। তিনি অত্যন্ত সর্তকতার সাথে পিতৃ নীতি অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ শত্রু মোকাবিলায় পুলিশকে আরও অধিকতর ব্যবহার করেন। খারিজিরা এ সময় বসরায় বিদ্রোহ শুরু করে। ৬৭৭ খ্রি. খারিজিরা বসরায় বিদ্রোহ শুরু করলে উবায়দুল্লাহ খারিজি নেতা মিরদাসকে বন্দি করার নির্দেশ দেন এবং তাকে কয়েদখানায় প্রেরণ করা হয়।[৫] প্রতিশোধ হিসেবে খারিজিগণ একজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে।[৬] করে।[৬] উবায়দুল্লাহর শাসনামলে পুলিশ এবং খারিজিদের মধ্যকার সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন যে, একদিন উবায়দুল্লাহ খালিদ বিন আবক্ষাদ নামে একজন খারিজি নেতাকে বন্দি করেন।

১. Tabari, vol. 5, pp. 234-235
২. Tabari, Ibid
৩. Tabari, vol. 5, pp. 254-256
৪. Ibid, pp. 257-258
৫. Tabari, vol. 5, pp. 312-314
৬. Muhammad b. Yazid al Mubarrad, ed. M.A.F. Ibrahim and S. Shahata, *al-Kamil,* Cairo : 1956, vol. 3, pp. 248-249

Dhaka University Institutional Repository

উবায়দুল্লাহ খালিদকে হত্যা করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলে কোনো পুলিশ সদস্যই তাকে হত্যা করার সাহস করে নাই। কেননা তারা খালিদকে ভয় পেত। কারণ খালিদ একজন ধার্মিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারা খালিদকে হত্যা করতে অনাগ্রহী ছিল এজন্য যে, খারিজিরা এজন্য হয়তো প্রতিশোধ নিতে পারে। অবশেষে ইবনে মাশরু নামে একজন শুরতা খালিদকে হত্যা করে।[১]

যখন খারিজিরা উক্ত শুরতা কর্তৃক তাদের নেতাকে হত্যার কথা জানতে পারে তখন তারা উক্ত পুলিশকে হত্যার পরিকল্পনা করে তাকে হত্যা করে।[২]

অন্যান্য প্রদেশের পুলিশের ভূমিকা

মিসর

মিসর প্রদেশ শান্ত ছিল। সেখানে ইরাকের মত পুলিশ এত সক্রিয় ছিল না; কেননা সেখানে শিয়া এবং খারিজি বিদ্রোহ ছিল না। দুটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, মুয়াবিয়া খলিফার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকিম মদিনায় মুসআব বিন আবদুর রহমান বিন আউফকে একই সাথে পুলিশ প্রধান ও কাযির দায়িত্ব প্রদান করেন।[৩]

ইবনে সাদের মতে, মুসাআব বিন আবদুর রহমান পুলিশ প্রধান হিসেবে দুর্বৃত্তদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।[৪]

ছিলেন।[৪]

আবুল ফরাযের মতে, মারওয়ান বিন হাকাম যখন মুসআবকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন তখন মুসআব মারওয়ানকে বলেন যে, তিনি মদিনার বর্তমান জনবল দ্বারা মদিনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন না। তিনি মারওয়ানকে অন্য নগরী হতে শুরতা বা পুলিশ আনয়নের জন্য অনুরোধ করেন।[৫] আবুল ফারাজ উল্লেখ করেন যে, মুয়াবিয়া মদিনা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুই শতাধিক পুলিশ আনয়ন করেন।[৬]

উমাইয়া সাম্রাজ্যে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে পুলিশ বসরার শহর ও শহরতলিতে নিয়োজিত ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় থেকে শুরু করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বসরায় পুলিশের কার্যক্রম বলবৎ ছিল। বসরায় পুলিশ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদান। পুলিশ ক্ষমতা, শাসন ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রতীক ছিল। পুলিশ প্রধান রাষ্ট্রীয় মিছিলে গভর্নরের অগ্রভাগ দিয়ে হেটে অথবা ঘোড়ায় আহরণ করে এগিয়ে যেতেন। এ সময় তিনি হাতে এক ধরনের বল্লম বা বর্শা রাখতেন।

পুলিশ বসরার জনগণের নিরাপত্তা বিধানেও কাজ করত। এছাড়া চোর-দস্যুদের দমন, অভ্যন্তরীণ বিবাদ যেমন-নরহত্যা বিষয়গুলো তিনি দেখাশুনা করতেন। পুলিশ প্রধানের উপর কিছু অপরাধের শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেমন–কেউ অন্য ব্যক্তির শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করলে তাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হত এবং কেউ অন্য ব্যক্তির গৃহ জ্বালিয়ে দিলে তাকে জ্বালিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হত। ধর্মীয়, নৈতিক এবং বৈধ আচরণ লঙ্ঘনকারীদের বিষয়গুলো পুলিশ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হত। যেমন বিলাপকারী মহিলাদেরকে তাদের কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা, ঋণ খেলাপীদের জেলে পুরা, ব্যভিচারীদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা, কাযি কর্তৃক প্রদত্ত রায় গ্রহণে

১. Ibid, p. 273
২. Muhammad b. Yazid al Mubarrad, *al-Kamil,* Ibid, p. 274
৩. Tabaqat, vol. 5, p. 158
৪. Tabaqat, Ibid
৫. Ali b. Husayn Abul-Faraj al-Isfahani, *Kitab al-Aghani*, Cairo : 1268 A.H., vol. 5, p. 74
৬. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের সদস্যদের বাধ্য করা। যাকাত বা সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে কেউ অস্বীকৃতি জানালে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করা ইত্যাদি।

পুলিশ কর্তৃক যে সমস্ত শাস্তি বা নির্যাতন করা হত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-গৃহ ধক্ষংসকরণ, জেলে পুরা, বেত্রাঘাত, হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধকরণ। এ শাস্তিগুলো পুলিশ প্রধান কখনও নিজেস্ব বিবেচনায় আবার কখনও খলিফা, গভর্নর ও কাযিদের নির্দেশে প্রদান করতেন। এছাড়া খারিজিদের বিদ্রোহ দমনেও পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, কবি সরকার ও পুলিশ প্রধানের সমালোচনা করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হত।

বসরার পুলিশ প্রধান মূলত গভর্নরের পরে দ্বিতীয় পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশেও পুলিশ অনুরূপ দায়িত্ব পালন করতো বলে ধারণা করা হয়।[১]

বসরায় হযরত উসমান ও আলি (রা.) এর সময় পুলিশের কাঠামো, আকার ও কার্যক্রম সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার শাসনামলে বিশেষ করে তার গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহি (৬৬৫-৬৭৩ খ্রি.) এর তত্ত্বাবধানে বসরা ও কুফার পুলিশের কাঠামো, আকার ও দায়িত্বের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। বসরায় নৈরাজ্য দমনে যিয়াদকে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বলা হয়। পুলিশ প্রধানের নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমেই উমাইয়া শাসন ব্যবস্থার গতিশীল নেতৃত্বের বিষয়টি ফুটে ওঠে। সুফিয়ানি শাসনকালীন সময়ে পুলিশ প্রধান গভর্নর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরার পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি গ্যারিসন শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কুফা ও বসরায় একই ব্যক্তিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। ওয়াছিতে নতুন গ্যারিসন শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সিরিয়ান সৈন্য ও পুলিশসহ তথায় গমন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদ্ধতি মারওয়ারি শাসনামল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিশেষভাবে ইরাকের গভর্নর ইয়াজিদ বিন আল মুহাল্লাব, মাসলামা বিন আব্দুল মালিক, উমর বিন হুবাইরা, খালিদ আল কাসরির শাসনামল পর্যন্ত। হাজ্জাজসহ উল্লিখিত শাসকগণ কর্তৃক পুলিশ প্রধান নিয়োগ প্রদান করা হয়। উমাইয়া সাম্রাজ্যের (৭৪৪-৭৫০ খ্রিস্টাব্দে) শেষ সময়ে পুলিশ প্রধান ইরাকের পরিবর্তে বসরা ও কুফার গভর্নরগণ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ৭২১ খ্রিস্টাব্দে শুরতা পুলিশের অধীনে 'আহদাস' নামে একটি পুলিশ ইউনিট ছিল।[২]

৬৮০ খ্রি. কুফা ও বসরায় গোলযোগ চলাকালীন সময় পুলিশ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৬৮৫ খ্রি. কুফায় চার হাজার শুরতা ছিল। আল মুখতার তার অনুসারিদের নিয়ে নিজস্ব শুরতা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন যারা কাঠের তৈরি লাঠি দ্বারা সজ্জিত ছিল। ৬৮৫ খ্রি. আল মুখতার এই শুরতা বাহিনীর সদস্য থেকে প্রায় ৮০০ সদস্যকে মদিনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মিদ ইবনে হানিফকে ইবনে যুবায়ের-এর নিকট থেকে রক্ষা করা।[৩]

খলিফা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার রাজত্বকাল

খলিফা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সিংহাসনে আহরণের পর তার প্রথম কাজ ছিল মদিনার গভর্নরের নিকট এই নির্দেশ প্রেরণ যে, হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ'র প্রতি বল প্রয়োগের মাধ্যমে তার খিলাফতের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করানো। কিন্তু হুসাইন ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র মদিনা ত্যাগ করেন। যখন

---

১. http://www.academia.edu/545802/Shurta Chiefs in Basra in the Umayyad Period a Prosonpographical Study Al-Qantara XXX1 1, 2010, pp. 109-112, dated 17.6.14
২. Michael Ebstein, Shurta Chiefs in Basra in the Umayyad Period a Prosonpographical Study, Jerusalem: Al-Qantara, No. XXX1 1, 2010 pp. 113-116, see. http://www.academia.edu/545802/, Visited on: 17. 6.2014
৩. Michael G. Morony, *Iraq after the Muslim conquest*, Ibid, p. 95

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াজিদ এ ঘটনা শুনতে পান তখন তিনি মদিনার গভর্নর পরিবর্তন করে আমর বিন সাঈদ বিন আল আস নামক এক ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দান করেন। আমর তার পুলিশ প্রধান মুসআব বিন আবদুর রহমানকে হাশিমি ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সমস্ত ঘর-বাড়ি ধক্ষংস করার নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রধান গভর্নরের এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানালে গভর্নর তাকে পদচ্যুত করেন। উক্ত পুলিশ প্রধান পদত্যাগ করেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে যোগদানে মক্কা গমন করেন।[১]

অতঃপর মদিনার গভর্নর আমর বিন যুবায়েরকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[২] গভর্নর তখন নতুন পুলিশ প্রধানকে যুবায়ের এবং আলি পরিবারের সমস্ত স্থাপনা ও সম্পত্তি ধক্ষংসের নির্দেশ দান করলে তিনি তা পালন করেন।[৩] নতুন পুলিশ প্রধান বেশিরভাগ বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরাজিত করেন যারা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের অনুসারী ছিলেন। এমনকি তিনি তার নিজ ভ্রাতাকে প্রহার করেন।[৪]

ইমাম হুসাইনকে হত্যায় পুলিশের ভূমিকা

ইমাম হুসাইন (রা.) মক্কা গমনের পর কুফা প্রদেশের জনগণ তাকে কুফা গমণের জন্য আহক্ষান করেন। যাতে তারা তার খিলাফতের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে পারে। এ ঘটনা ইমাম হুসাইন (রা.) কে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে এবং তার মৃত্যুর পিছনে পুলিশের বড় ভূমিকা ছিল।

ইমাম হুসাইন (রা.) তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে কুফা গমনের পূর্বে সেখানে প্রেরণ করেন। মুসলিম বিন আকিলের কুফায় আগমনের পর তিনি শিয়া নেতা হানি বিন উরওয়া'র গৃহে আতিথিয়তা গ্রহণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে কুফার নতুন গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হানিকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাকে প্রহার করেন। সেখানে হানি একজন শুরতার নিকট হতে তার তরবারি ছিনিয়ে নেয় এবং উবায়দুল্লাকে হত্যার ইচ্ছা করে। হানির এ প্রচেষ্টা প্রতিহত করে তাকে কয়েদখানায় প্রেরণ করা হয়।[৫]

এরপর ওবায়দুল্লাহ সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্সসহ মসজিদে গমন করেন এবং কুফার জনগণকে কঠোরভাবে এ বলে সতর্ক করেন যে, সরকারের কোনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তারা যেন কোনো কাজ না করে।[৬] এ নির্দেশ শুনে মুসলিম বিন আকিল শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের একত্রিত হওয়ার জন্য আহক্ষান জানান। এ আহক্ষানে প্রায় বার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। ইবনে আকিল সমবেত বার হাজার লোকদের নিয়ে রাজপ্রসাদের গভর্নরকে হুমকি প্রদর্শন করেন। হুমকি প্রদর্শনের সময় গভর্নর ওবায়দুল্লাহর নিকট মাত্র ত্রিশজন পুলিশ সদস্য ছিল। ওবায়দুল্লাহ তখন স্থানীয় উপজাতীয় নেতাদের সহায়তায় সমবেত জনতাকে শান্তিপূর্ণভাবে বিতাড়িত করে। এরপর মুসলিম বিন আকিল আত্মগোপনে চলে যান।[৭] এরপর ওবায়দুল্লাহ কুফার সমস্ত পুলিশ সদস্যকে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং হুমকি প্রদান করেন যে, কোনো পুলিশ সদস্য হাজির না হলে তাকে হত্যা করা হবে।[৮]

---

১. Aghani, vol. 5, p. 75
২. Tabari, vol. 5, p. 344, Tabaqat, vol. 5, p. 185
৩. Aghani, vol. 5, p. 75
৪. Ibid, Tabaqat, vol. 5, p. 185, Ansab, vol. 4B, p. 24
৫. Tabari, vol. 5, p. 367; Ali b. al-Husayn b. Ali al-Masudi, *Kitab Muruj al-Dhahab wa Maadin al-Jawhar*, ed. M.Muhil-Din Abd al-Hamid, n.p, 1967, vol. 3, p. 67
৬. Tabari, vol. 5, p. 368
৭. Ibid
৮. Izzal-Din Abu Husayn Ali b. Muhammad, Ibn al-Athir, *al-Kamil Fi'L-Tarikh*, Leiden : 1869-72, vol. 4, p. 26

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ওবায়দুল্লাহ পুলিশ প্রধানকে মুসলিম বিন আকিলকে খুঁজে বের করার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বিন আকিলকে বন্দি করে হত্যা করা হয় (৬৭৯ খ্রি.)।[১]

হুসাইন বিন আলি (রা.) তখন মক্কা থেকে কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মক্কার গভর্নর হুসাইন (রা.) এর কুফা গমনের সংবাদ শুনতে পান তখন তিনি পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন যে, হুসাইন (রা.) কে মদিনা ত্যাগ করতে না দেয়া হয়।[২]

তখন সাহিব আস-শুরতা হুসাইন (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করে গভর্নরের আদেশের কথা তাঁকে জানান। এ ঘটনায় হুসাইন (রা.) এর সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে হুসাইন (রা.) এর মক্কা ত্যাগের বিষয়ে পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন। কেননা তিনি সম্ভাব্য বিদ্রোহের পরিণতি সম্পর্কে আতঙ্কিত ছিলেন।[৩]

এরপর হুসাইন (রা.) কুফার দিকে অগ্রসর হন। কুফার গভর্নর হুসাইন (রা.) আগমনের সংবাদ শুনে পুলিশ প্রধান হুসাইন বিন নোমাইর আল-তামিমিকে আল-কাদিসিয়াতে প্রেরণ করেন।[৪] পুলিশ প্রধান প্রধান পথিমধ্যে থেকে হুসাইন (রা.) এর একজন দূতকে বন্দি করে ওবায়দুল্লাহর নিকট প্রেরণ করেন।[৫]

হুসাইন (রা.) কুফার নিকটবর্তী স্থলে আগমন করলে ওবায়দুল্লাহ পুলিশ কমান্ডারের নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন এবং হুসাইন (রা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়।[৬] এ যুদ্ধে পুলিশ ফোর্স বিশেষ ধরনের পোষাক (তাজিফাত) পরিধান করে। হুসাইন ও তার সমর্থকদের ৬৮০ খ্রি. হত্যা করা হয়।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের হুসাইন (রা.) এর শাহদাত বরণের কথা শুনে মক্কায় উমাইয়া গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেন। মদিনার গভর্নর পুলিশ প্রধান আমর বিন যুবায়েরকে নির্দেশ দেন যে, আব্দুল্লাহ'র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যেন সৈন্য পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু সৈন্য বাহিনী পরাজিত হওয়ায় পুলিশ প্রধানকে বন্দি করে মক্কায় নিয়ে আসা হয়। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের পুলিশ প্রধানকে প্রহারের নির্দেশ দেন। কেননা জনগণ ইতোপূর্বে পুলিশ প্রধান কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল।[৭]

গৃহযুদ্ধকালীন পুলিশের ভূমিকা

ইয়াজিদের মৃত্যুর পর উমাইয়া সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। সকল সম্প্রদায় যেমন-শিয়া, উমাইয়াদের মধ্যে এটি অব্যাহত থাকে। তৎকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যে কোনো এলাকার নিয়ন্ত্রণের জন্যে পুলিশ নিয়োগ করা হয়। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর বসরার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বসরা হতে পলায়ন করেন এবং নতুন গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আল হারিস আল হাসিমি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বসরার গভর্নর পদটি শূন্য থাকে। আব্দুল্লাহ বিন আল হারিস আল হাসিমি গভর্নর নির্বাচিত

১. Kamil, vol. 4, p. 26, Tabari, vol. 5, p. 373, Ahmad b. Da'ud Abu Hanifa al-Dinwari, ed. V. Guirgass, *Kitab al-Khbar al-Tiwl*, Leiden : 1888, p. 253
২. Abu Hanifa, Op.cit, p. 257
৩. Ibid
৪. Ibdi p. 258, Tabari, vol. 5, p. 394; http://www.geni.com/people/Imaam-Hussain-bin-Maulana-Ali/600000, visite on: 2/25/2016
৫. Ibdi p. 395, Abu Hanifa, Op.cit, p. 258
৬. Tabari, vol. 5, p. 334
৭. Ansab, vol. 4B, p. 224-225, Tabaqat, vol. 5, p. 185-186

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পর তার প্রথম কাজ ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় হামিয়ান বিন আদিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ দান করা।[১]

উপজাতীয়দের উপর নতুন গভর্নরের নিয়ন্ত্রণ ছিল খুবই দূর্বল। প্রকৃতপক্ষে সে সময় পুলিশ প্রধান সরকারের কর্তৃত্বকে খুব কমই প্রয়োগ করতে পেরেছিল।[২]

ইবনে যুবায়ের-এর সময় কুফার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ আল-আনসারি শিয়াদের মোকাবিলায় পুলিশকে ব্যবহার করেন।[৩]

তার পরিবর্তে আব্দুল্লাহ ইবনে মুতিকে কুফার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হলে তিনি পুলিশ প্রধান হিসেবে আয়াস বিন মুদারিব আল আযলিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। নতুন গভর্নর পুলিশ প্রধানকে জনগণের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ ও দুর্বৃত্তদের সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণের পরামর্শ দেন।[৪]

শীঘ্রই বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুখতার বিন আবি ইমাম হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাপোষণ করেন যার কুফায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী ছিল। গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন মুতি মসজিদে চিৎকার করতেছিলেন। তখন তার পুলিশ প্রধান তার নিকট এসে তার বিরুদ্ধে মুক্তারের বিদ্রোহ গড়ে তোলার পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং তখন ঐ মুখতারকে বন্দি করার পরামর্শ দেন।[৫] গভর্নর ঐ সময় মুখতারকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ প্রধানকে প্রেরণ করলেও পরে পুলিশ প্রধান অসুস্থতার ভান করে তার নির্দেশ পালন করেননি।[৬]

মুখতার কুফায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে তার সভাসদ নিয়োগ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর জয় করার জন্য সে কয়েকটি পতাকা তৈরি করে এবং একটি পতাকা দিয়ে মুহাম্মদ ইবন হারস ইবন আশতারকে আওবিনিয়ার দিকে, একটি পতাকা দিয়ে মুহাম্মদ ইবন আমের ইবন আতারুদকে আযারবায়জানের দিকে, একটি পতাকা দিয়ে আবদুর রহমান ইবন সাঈদ ইবন কায়সকে মাওসিলের দিকে, একটি পতাকা দিয়ে ইসহাক ইবন মাসউদকে মাদায়েনের দিকে এবং অপর একটি পতাকা দিয়ে সাদ ইবন হুযায়ফাকে হুলওয়ানের দিকে প্রেরণ করেন। সে আবদুল্লাহ ইবন কামিলকে কুফার কোতোয়াল (পুলিশ প্রধান) এবং শুরায়হকে কাযি (বিচারপতি) নিয়োগ করেন। পরে অবশ্য শুরায়হকে পদচ্যুত করে আবদুল্লাহ ইবন মালিক তায়ীকে কুফার কাযি নিয়োগ করা হয়। সবদিকেই মুখতার প্রেরিত অধিনায়করা সাফল্য অর্জন করে।[৭]

ইব্রাহিম বিন আশতার নামে কুফার উপজাতীয় নেতা মুখতারের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার নিকট গমন করতেন। পুলিশ প্রধান তার এ আচরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং পুনরায় গভর্নরকে সতর্ক করেন।[৮] পরবর্তীতে সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান সঙ্গীয় পুলিশসহ কুফার রাস্তা ও বাজারের চর্তুদিকে টহল দেন।[৯]

---

১. Ansab, vol. 4B, p. 105, Tabari, vol. 5, p. 514
২. Ansab, vol. 4B, p. 105
৩. Tabari, vol. 5, p. 561
৪. Ansab, vol. 5, p. 221, Tabari, vol. 6, p. 10
৫. Abu Muhammad Ahmad b. Ali, Ibn al-Atham al-Kufi, *Kitab al-Futuh*, Hyderabad : 1970-75, vol. 6, p. 89; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯
৬. *Kitab al-Futuh,* Ibid, p. 30
৭. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসামের ইতিহাস, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩
৮. Tabari, vol. 6, p. 18; Ansab, vol. 5, p. 224
৯. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় একটি ভয়ানক ঘটনার উদ্রেক হয় যাতে পুলিশ ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উক্ত ব্যক্তির একশ'জনের একটি সশস্ত্র দল ছিল। এ ঘটনায় সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান ইব্রাহিমকে বলেন তাকে গভর্নরের নিকট যেতে হবে। তখন ইব্রাহিম একজন পুলিশের নিকট হতে তার বল্লম ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশ প্রধানকে হত্যা করে। পুলিশ তখন তার বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করে।[১] ঘটনাক্রমে পুলিশ প্রধানের হত্যার কথা জানতে পেরে গভর্নর ঐ পুলিশ প্রধানের পুত্রকে তার উত্তরাধিকার হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[২] পরবর্তীতে ইব্রাহিমের তিন হাজার অনুসারীর সাথে নতুন পুলিশ প্রধানের চার হাজার পুলিশের সদস্যদের ভয়ানক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়।[৩] হয়।[৩] ঐ ঘটনায় পুলিশ পরাজিত হয় এবং পুলিশ প্রধান নিহত হয়।[৪] মুখতার কুফার প্রধান হন এবং এবং ইয়াযিদ বিন আনাসের নেতৃত্বে মুসুলের উমাইয়াদের আক্রমনের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। মুখতার এবং ইয়াযিদ উভয়েই তাদের সৈন্যবাহিনীকে Shurtat Allah বলে সম্বোধন করেন।[৫] হুসাইন (রা.) এর হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মুখতার পুলিশকে নিয়োজিত করেন।[৬] পুলিশ তাদের কর্তকর্তাসহ প্রতিটি ঘরে ঘরে হুসাইনের হত্যাকারীদের খোঁজ করে এবং তারা তারা উমর বিন সাদ'কে হত্যা করে। এই উমর বিন সাদ ছিলেন হুসাইনের বিরুদ্ধে উমাইয়া সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার।[৭] খ্রি. পর্যন্ত কুফা মুক্তারের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। পরবর্তীতে বসরার গভর্নর মুসআব বিন যুবায়ের মুখতারের নিয়ন্ত্রনাধীন শহরে আক্রমন করলে পর মুখতার নিহত হয়। গভর্নর মুসআব মুখতারের স্ত্রীদের নিয়ে আসার জন্য লোক প্রেরণ করেন। মুখতারের স্ত্রীদের একজন তার স্বামীর সমালোচনা না করার কারণে মুসআব পুলিশকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং সেভাবে হত্যা করা হয়।[৮]

আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান ও তাঁর পুত্র ওয়ালিদের খিলাফতকালে শুরতা বা পুলিশি বিভাগ

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মৃত্যুর পর আব্দুল মালিক সমগ্র ইসলামিস সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তিনি উপজাতীয়দের নিয়ন্ত্রণ ও সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন শুরু করেন। গৃহ যুদ্ধের অব্যহতির পরেই ইরাকের শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ উপজাতীয়দের হাতেই ছিল। সে সময়ে উপজাতীয় নেতারা নিজেদেরকে একই সাথে প্রশাসক এবং পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োজিত করেন।[৯] খুরাসান প্রদেশেও একই ধরনের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা বিরাজিত ছিল।[১০] সেখানে পুলিশ প্রধান গভর্নরকে হত্যা করে।

ক্ষমতারোহণের পর আব্দুল মালিকের জননীতি

আব্দুল মালিক ক্ষমতা আরোহণের পর প্রাদেশিক জনসাধারণের অবস্থার কথা উপলব্ধি করেন। বিশেষ করে ইরাক ও খুরাসান প্রদেশের বিষয়ে। এ দুই প্রদেশের জনসাধারণ শাসকবর্গের প্রতি খুব কমই আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তারা প্রায়শই বিদ্রোহ করে। ৬৯৪ খ্রি. আব্দুল মালিক মদিনায় তার বক্তৃতায় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতির বিষয়ে অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি

১. Tabari, vol. 6, p. 18
২. Ibid; Ansab, vol. 5, pp. 224-225
৩. Tabari, vol. 6, p. 23
৪. Ansab, vol. 5, p. 226
৫. Ansab, vol. 5, p. 242
৬. Tabari, vol. 6, p. 60-64
৭. Ansab, vol. 5, p. 239; Tabari, vol. 6, p. 67-68; Aghani, vol. 14, p. 229-231
৮. Ansab, vol. 5, p. 264
৯. Ansab, vol. 4B, p. 164
১০. Futuh, pp. 405-406; Tabari, vol. 6, p. 177

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উসমান (রা.) মত কোমল হৃদয়ের শাসক বা মুয়াবিয়া (রা.) এর ন্যায় ধূর্ত শাসক হবেন না। তিনি আরও যোগ করেন যে, জনগণের প্রতি তার নীতি হবে অত্যন্ত কঠিন। এটি এতই কঠিন হবে যে, যদি কেউ তার মাথাকে ভুল দিকে চালনা করে তবে তা কেটে ফেলা হবে।[১]

হযরত মুয়াবিয়ার খিলাফতের সময় জনগণ অনেক সময় তাঁর নিকট চিৎকার করে কথা বলত এবং প্রকাশ্যভাবে তাদের মতামত দিত। আব্দুল মালিক মনস্থির করেন যে, তার উপস্থিতিতে জনগণ এরূপ করতে পারে না। যদি কেউ এরূপ করে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। ইবনে সাদের মতে, কোনো এক ঘটনায় আব্দুল মালিক মদিনায় জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন। তখন হজের সময় এক ব্যক্তি তার প্রতি চিৎকার করেছিল। ফলে পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে বন্দি করে।[২] এর দ্বারা আব্দুল মালিক নিজেকে শক্তিশালী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং জনগণ থেকে পৃথক ছিলেন।

মুসা ইবন আবদুল্লাহ একদিকে তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করে যেমন সাফল্য অর্জন করতেন, অন্যদিকে আবদুল মালিক কর্তৃক নিযুক্ত খুরাসানের শাসনকর্তার সাথেও সব সময় যুদ্ধরত থাকতেন। খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন বুকায়র ইবন বিশাহ। আবদুল মালিক তাকে পদচ্যুত করে উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবন খালিদ উসায়দকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। উসায়দ ইবন আবদুল্লাহ তার পদচ্যুতির পর খুরাসানেই অবস্থান করতে থাকেন এবং উমাইয়া ইবন আবদুল্লাহ পরবর্তীকালে তাকে মার্ভের কোতোয়াল (পুলিশ প্রধান) নিয়োগ করেন।[৩]

ইরাকে বিশর বিন মারওয়ানের শাসননীতি

আব্দুল মালিক তার ভ্রাতা বিশরকে ৬৯২ খ্রি. গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। বিশরের দায়িত্ব ছিল উপজাতীয়দের নিয়ন্ত্রণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারের কর্তৃত্বকে বলিষ্ঠ করা। ঐতিহাসিক বালাযুরির মতে, ইবনে গালিব আল আসাদিকে তার পুলিশ প্রধান হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ইবনে গালিব তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন; কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি এ কাজের জন্য যোগ্য নন[৪] এবং তিনি শহরের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন না।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনব্যবস্থা

আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ৬৯৭ খ্রি. ইরাকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুলিশ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঐতিহাসিক বালাযূরী ও ইবনে কুতায়বা'র মতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা মারওয়ানের রাজত্বকালে প্যালেস্টাইনের পুলিশ প্রধান ছিল।[৫]

ঐতিহাসিক *Ibn al-Atham and Ibn Rabbihi* এর মতে যখন আব্দুল মালিক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আব্দুল মালিকের পুলিশ প্রধান তার নিকট এসে জানান যে, তার পুলিশ বাহিনীতে উক্ত যুবায়েরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার যোগ্য একজন সদস্য রয়েছেন।[৬] আব্দুল মালিক পুলিশ প্রধানের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনে যুবায়েরকে হত্যা করে উক্ত অভিযান সফল করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুলিশ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে দক্ষ ছিলেন ও পরবর্তীকালে পুলিশ বাহিনীর উপর তার প্রভাব ছিল।

---

১. Ibn Khayyat, vol. 1, p. 349
২. Tabaqat, vol. 5, p. 222
৩. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসামের ইতিহাস, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
৪. Ansab, vol. 5, p. 117
৫. Ibid, p. 166; Ali b. Husan Ibn al-Askir, *Tahdhib al-Tarikh al-Kabir*, Ibid, vol. 2, p. 100
৬. Ibn al-Atham, vol. 6, pp. 271-272; Shihab al-Din Ahmad b. Muhammad Ibn Abd Rabbihi, *Kitab Suluk al-Malik fi Tadbid al-Mamalik*, Cairo : 1286 A.H, vol. 5, pp. 298-299

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তার অভিষেক বক্তৃতায় আব্দুল মালিকের মতোই ইরাকের জনগণকে সতর্ক করেন। ঐতিহাসিক *Ibn al-Atham* এর মতে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উপলব্ধি করেন যে, কুফার জনগণ খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নন। এ বিষয়ে তিনি পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন যে, যে ব্যক্তি খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তাকে হত্যা করা হবে। হাজ্জাজ যে কোনো পলাতক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতের নির্দেশও দেন।[১] হাজ্জাজ এবং তার পুলিশ সদস্যদের নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত কঠোর ছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে তাঁর শাসনামলে কুফায় অনেকগুলো বিদ্রোহ দমন করতে হয়। একদা এক রাত্রিতে খারিজি নেতারা তাদের দলবলসহ কুফা শহরস্থিত মসজিদ, বাজার ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রাসাদে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল হাজ্জাজ ও তার পুলিশ প্রধানকে হত্যা করা। এরূপ অসংখ্য ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত যে, খারিজিরা শহরে আক্রমণ করতো কিন্তু পুলিশ তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হত না। কেননা সংখ্যায় পুলিশ ছিল অত্যন্ত নগণ্য যার ফলে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনকালে ইউফ্রেতিস অঞ্চলে Raba al-Zinji তার অনুসারী নিগ্রোদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হাজ্জাজ তখন উপ-পুলিশ প্রধানকে সৈন্যবাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে নিগ্রোদের আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এ উপ-পুলিশ প্রধান পরাজিত ও নিহত হন।[২] এ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পুলিশ প্রধান অন্য কোনো বিদ্রোহ দমনের জন্য নগরীর বাইরে অবস্থান করছিলেন।

৬৯৬ খ্রি. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হামাদানের গভর্নরকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত গভর্নরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য তিনি পুলিশ প্রধানকে প্রেরণ করেন এবং বন্দি করার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে এই পুলিশ প্রধানই পুরস্কার হিসেবে গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন।[৩] ৭০১ খ্রি. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অত্যন্ত ভয়ানক এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়। ঐ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন আবদুর রহমান বিন আল আশআস।

ঐতিহাসিক *Ibn al-Atham* এর মতে, একদিন হাজ্জাজ তার সচিবকে পুলিশ প্রধান নির্বাচনের জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত সচিব হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে আবদুর রহমান বিন আল আশআসকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগের পরামর্শ দেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ বিষয়ে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।[৪]

Ibn al-Atham আরও উল্লেখ করেন যে, আবদুর রহমান বিন আল আশআসকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি জানানো হলে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। প্রত্যুত্তরে তিনি জানান যে, কিভাবে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অধীনে কাজ করবেন ও তলোয়ার পরিচালনা করবেন।[৫] পরবর্তীতে হাজ্জাজ তার পুলিশ প্রধানকে ইবনে আল আসাদের অনুসারীকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[৬]

ইবনে আল আসাকিরের মতে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুলিশকে আল হাসান আল বসরিকে বন্দি করার নির্দেশ দেন। কেননা তিনি আবদুর রহমান বিন আল আশআস-এর অনুসারী ছিলেন।[৭]

এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হাজ্জাজ এবং তার পুলিশ বাহিনী হতে কেউ পরিত্রাণ পেত না। তার প্রশাসনিক ক্ষমতা খুবই শক্তিশালী ছিল বলেই তিনি ইরাকের বিদ্রোহ দমনের জন্য সিরিয়ান সেনাবাহিনীকে ইরাকে নিয়োজিত করেন।

প্রাথমিক উমাইয়া খলিফাগণ শহর এবং বাজারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সাংগঠনিক পুলিশ ব্যবস্থা চালু করেন। ইবনে কুতাইবা তার *'Uyan al-Akhbar'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, খলিফা আব্দুল মালিকের

---

১. Ibn al-Atham, Ibid, vol. 7, p. 15
২. Abu Uthman Amr b. Bahr al-Jahiz, *Thalath Rasa'il*, Leiden : 1903, p. 65
৩. Tabari, vol. 6, p. 294-295
৪. Ibn al-Atham, vol. 7, p. 109-110
৫. Ibn al-Atham, ibid
৬. Tabari, vol. 6, p 380
৭. Ibn al-Askir, ibid, vol. 4, p. 30

Dhaka University Institutional Repository

রাজত্বকালে ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবদুর রহমান ইবনে উবাইদকে কুফা প্রদেশের পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। ইবনে উবাইদ কঠোরভাবে উক্ত প্রদেশের চুরি এবং অপরাধ দমন করলে তাকে বসরা প্রদেশের পুলিশ প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেন। পুলিশ প্রধান তার দায়িত্ব পালনে শুধু স্যাকুলার আইন অনুসরণ করতেন না বরং ধর্মীয় নৈতিক আইন অনুসরণ করতেন।[১]

খলিফা সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিক কর্তৃক উমর বিন আব্দুল আযিযকে ওলি আহাদ মনোনিত করণ

খলিফা সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিক তার পুত্র আইয়ুবকে ওলি আহাদ মনোনিত করলে আইয়ুব খলিফার জীবিত অবস্থায় মারা যান। কনিষ্ঠ পুত্রকে ওলি আহাদ মনোনিত করতে চাইলে রাজা ইবন হায়াত উমর বিন আব্দুল আযিযকে ওলি আহাদ মনোনিত করার প্রস্তাব করেন। সুলায়মান উমর বিন আব্দুল আজিজকে যোগ্য মনে করে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি ভয় করেন যে, তার এ অসিয়তে তার ভাই এবং পুত্ররা বিরোধিতা করতে পারে। পরে সুলায়মান রাজা ইবনে হায়াতের পরামর্শে উমর বিন আব্দুল আযিযকে ওলি আহাদ মনোনিত করে একটি ফরমান লিখে তার উপর মোহর লাগিয়ে দেন। এরপর তিনি এ ফরমানটি রাজা ইবনে হায়াতের হাতে তুলে দিয়ে বলেন যে, আমিরুল মুমিনিন এই লেফাফার মধ্যে পরবর্তী খলিফার নাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অতঃপর খলিফা সুলায়মান ইবনে হায়াতকে নির্দেশ দেন যে, কোতোয়াল ও পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দাও তারা যেন আমার হুকুম অনুযায়ী জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সুলায়মানের এ হুকুম শোনার সাথে সাথে একে একে সকলেই বায়আত গ্রহণ করে।[২]

উমর বিন আব্দুল আযিয এর সময়ের পুলিশ ব্যবস্থা

উমর বিন আব্দুল আযিয তাঁর রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হলো- (১) সরকার (২) বিচার বিভাগ (৩) বায়তুল মাল ও (৪) খলিফা।

এছাড়া রাজস্ব বোর্ড, সামরিক বোর্ড, পুলিশ ও নিরাপত্ত রক্ষী, সাহিব আল-খাতাম ইত্যাদি।

নিম্নে উমর বিন আব্দুল আযিযের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি ছক দেয়া হলো–

উমর বিন আব্দুল আযিযের সময় রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তাদের তালিকা[৩]

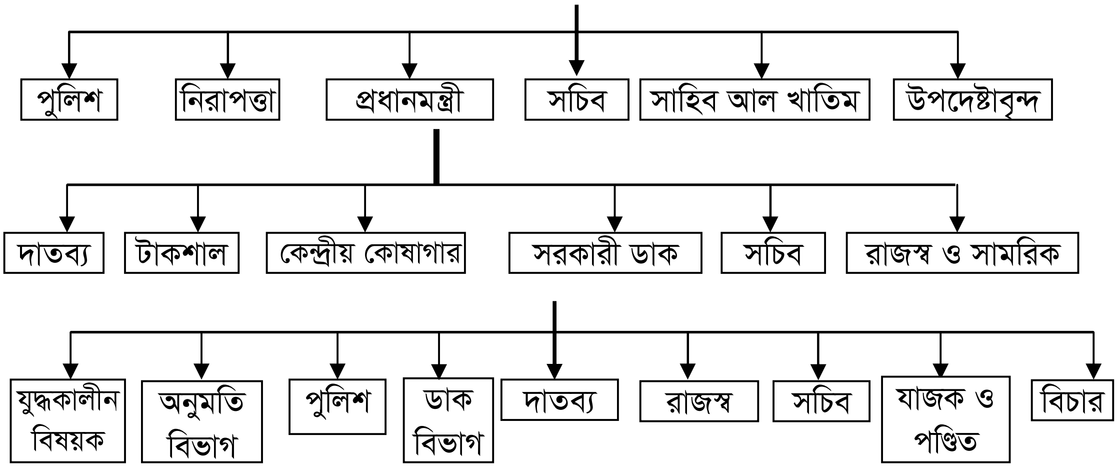

---

১. The Sahib al-Ahdath or Shurtah was not only concerned with the secular side of law but also with the relDgio-moral side of it during the time of the Umayyads. see. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Ibid, p. 59

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসামের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

৩. Umar applied, we find that he divided the roles of the State into four main divisions that fell under the responsibility of four trustees: the Governor, Judge, Treasurer of the Bayt al-Mai (Public Treasury) and Caliph, in addition to other Boards like al-Kharaj (Board of Revenue), al-Jund (Board of Military), ash-Shurtah wal-Haras (Police and Security), Sahib al-Khatim (Signet) and so on. Below is a tree structure illustrating the organisation of responsibilities that formed part of the Caliph's administration during the reign of 'Umar bin 'Abd al-Aziz. see. Dr. Ali Muhammad Muhammad as-Sallabi, *The Righty-Guided Caliph and Great Reviver, Umar bin 'Abd al-Aziz*, Riyadh: Darussalam, http://archive.org/stream/UmarBinAbdAlAziz/Umar%20bin%20Abd-Aziz#page/n4/mode/1up, visited on 28.12.2014

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি বিভাগের জন্য কর্ম বণ্টন নির্ধারিত ছিল। যেমন– অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল উমর বিন ইয়াযিদ বিন বিসর আল কালবির উপর। তিনি পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। আর উমর বিন মুহাজির বিন আবি মুসলিম আল আনসারিকে দেহরক্ষী প্রধান ও প্রধামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হুবায়িস। তার দাস মিসরে চেকপয়েন্ট-এর প্রবর্তন করেন।

> "Another division connected with internal security was run by 'Umar bin Yazid bin Bishr al-Kalbi who occupied the post of Head of Police. 'Umar bin Muhajir bin Abi Muslim al-Ansari was appointed as Chief Bodyguard and his Chief Minister was Hubaysh, his slave, who introduced check-points, such as licensing in Egypt under the headship of 'Umar bin Raziq al-Ayli."[১]

ইয়াহইয়া গাসসানি বলেন, উমর ইবন আবদুল আযিয (র.) সুলায়মান ইবন আবদুল মালিককে একজন খারিজি হত্যা থেকে নিবৃত্ত রাখেন এবং এই মর্মে রায় দেন যে, তাকে তখন পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে। তখন সুলায়মান ঐ খারিজিকে ডেকে বলেন, তুমি এবার কি বলতে চাও? সে উত্তর দিল, হে ফাসিকের পুত্র ফাকিস! যা জিজ্ঞেস করতে চাস কর। সুলায়মান বলেন, আমি আবদুল আযিদের রায়ের কারণে নিরুপায়। এরপর তিনি উমরকে ডেকে বলেন, দেখ এই খারিজি কি বলে। খারিজি পুনরায় সেই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। সুলায়মান বলেন, এবার বল তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিতে হবে। উমর ইবন আবদুল আযিয (র.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! সে যেভাবে আপনাকে গালি দিয়েছে আপনিও সেভাবে তাকে গালি দিন। খলিফা সুলায়মান বলেন, এটা সমীচীন নয়। এরপর তিনি খারিজিকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়। উমর যখন খলীফার দরবার থেকে ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে পুলিশপ্রধানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। পুলিশপ্রধান বলেন, আপনি একটি অদ্ভুত রায় দিলেন যে, আমিরুল মুমিনিনও খারিজিকে সেরূপ গালি দিন যেরূপ গালি সে তাঁকে দিয়েছে। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, না জানি আমিরুল মুমিনিন আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি পুলিশপ্রধানকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমিরুল মুমিনিন আমার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতেন তাহলে তুমি কি আমার গর্দান উড়িয়ে দিতে? খালিদ (পুলিশপ্রধান) উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমি তাই করতাম। তিনি খলিফা হওয়ার পর খালিদ যথারীতি নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উমর ইবন আবদুল আযিয (র.) তাকে নির্দেশ দেন, তোমার এই তরবারি রেখে দাও এবং এখন থেকে নিজেকে পদচ্যুত মনে কর। এরপর তিনি ইবন মুহাজির আনসারিকে ডেকে তাকে পুলিশপ্রধান নিয়োগ করেন এবং বলেন, আমি তাকে (ইবন মুহাজিরকে) প্রায়ই কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি এবং এমন গোপন জায়গায় নামায পড়তে দেখেছি, যেখানে কেউ তাকে দেখতে পেত না। উমর ইবন আবদুল আযিয (র) বলতেন, যে ব্যক্তি রাগ, ঝগড়াঝাটি এবং কামনা-বাসনা থেকে দূরে রইল সে মুক্তি পেয়ে গেল।[২]

হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের নিকট তাঁর নিকট লোকজন যতক্ষণ বসে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতো ততক্ষণ তিনি বায়তুল মালের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেন। আর যখন লোকেরা চলে যেত তখন তিনি সেই প্রদীপ নিভিয়ে ব্যক্তিগত প্রদীপ জ্বালাতেন। ইতিপূর্বে খলিফার নিরাপত্তার জন্য একশ জন চৌকিদার ও পুলিশ নিয়োজিত থাকত। তিনি খলিফা হয়ে তাদের বলেন, আমার নিরাপত্তার জন্য আমার ভাগ্যলিপি যথেষ্ট। তোমাদের আমার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও যদি

---

১. Dr. Ali Muhammad Muhammad as-Sallabi, *The Righty-Guided Caliph and Great Reviver, Umar bin 'Abd al-Aziz*, Riyadh : Darussalam, http://archive.org/stream/UmarBinAbdAlAziz/Umar%20bin%20Abd-Aziz#page/n4/mode/1up, visited on 28.12.2014

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসামের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের কেউ আমার সাথে থাকতে চায় তাহলে সে দশ দীনার করে বেতন পাবে। আর যদি থাকতে না চায় সে যেন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়।[১]

শেষ উমাইয়া খলিফাগণের অধীনে পুলিশি কার্যক্রম

খলিফ ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা সোলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়েছিল। খলিফা সোলায়মান ওয়ালিদ কর্তৃক নিয়োগকৃত অধিকাংশ শাসনকর্তাকে পরিবর্তন করেন। গভর্নরের সাথে সাথে পুলিশ প্রধানও পরিবর্তিত হয়। নতুন শাসনকর্তাগণ যে সমস্ত পুলিশ প্রধানকে নিয়োগ করেন তারা হয় তার আত্মীয় নতুবা তার উপজাতীয় বংশধর অথবা কমপক্ষে উপজাতীয় বংশধরদের সাথে সম্পৃক্ত।[২]

খলিফা সোলায়মানের মৃত্যুর পূর্বে তিনি ধার্মিক খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ও তার পরবর্তীতে আবদ আল মালিককে মনোনিত করার ইচ্ছাপোষণ করেন। এ বিষয়ে সোলায়মান তাঁর মৃত্যুশয্যায় পুলিশ প্রধানকে উমাইয়া বংশের উত্তরাধিকারদের একত্রিত করা এবং রাজা বিন হাওয়াকে তার উইল (অছিয়ত) পাঠ করার নির্দেশ দেন।

উইলের ইচ্ছানুযায়ী উমাইয়া বংশধরদেরকে নতুন খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়েছিল। এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশ প্রধান উমাইয়া শাসক পরিবারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ৭১৭-৭১৯ খ্রি. পর্যন্ত খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি উমাইয়া প্রশাসনে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করেন এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ধর্মীয় নীতি ও আদর্শ তাঁর পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপেও প্রতিফলিত হয়। ঐতিহাসিক Kindi এর মতে, উমর বিন আব্দুল আজিজ আইয়ুব বিন সুরহাবিলকে মিসরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দান করেন এবং উক্ত গভর্নরকে যে সমস্ত স্থানে অধিক শরাব পান করা হত তা ধক্ষংস করার নির্দেশ দেন।[৩]

তিনি দুর্বৃত্তদের শাস্তি প্রদান ও বন্দি করার জন্য সকল গভর্নরদের পরামর্শ দেন। তিনি আরও নির্দেশ প্রদান করেন যে, মহিলা হাজতি ও পুরুষ হাজতিদের পৃথক পৃথকভাবে রাখার জন্য।[৪] উমর বিন আব্দুল আজিজ প্রকাশ্যে মদ্য পানের বিষয়েও খুবই কঠোর ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ইবনে সাদের মতে, উমর (রা.) অমুসলিমদের শহরে মদ পান করার অনুমতি দিয়েছিলেন[৫] কিন্তু যারা প্রকাশ্যে মদ পান করতো তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করত। তার ধর্মীয় নীতি ও ধার্মিকতা স্বত্ত্বেও তিনি নিজেকে রক্ষার জন্য পুলিশ এবং হারাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ঐতিহাসিক যাহাবি-এর মতে তার তিনশত পুলিশ ও তিনশত হারাস বাহিনী ছিল।

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের উত্তরাধিকারী ছিলেন হিশাম বিন আব্দুল মালিক (৭২৩-৭৪২ খ্রি.)। হিশামের রাজত্বকালে উমাইয়া শাসনামলের কঠিন সময়ে শুরু হলও তাঁর দক্ষতা এবং অভিজ্ঞ গভর্ণর যেমন খালিদ আল কাসরির সহায়তায় উমাইয়া খিলাফত আরও ত্রিশ বৎসর বহাল থাকে। হিশামের নীতি অনুযায়ী প্রদেশগুলোতে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের নীতি গ্রহণ সত্ত্বেও অনেক প্রদেশে বিদ্রোহ

১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসামের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
২. Tabari, vol. 6, pp. 513, 545, 551; Abu Hanifa, Ibid, p. 332
৩. Wulat, p. 89
৪. Tabaqat, vol. 5, pp. 356-57
৫. Ibid, p. 356

Dhaka University Institutional Repository

দেখা দেয়। পুলিশ বাহিনীকে এসকল বিদ্রোহ মোকাবেলার জন্য নিয়োজিত করা হয় এবং তাদের দায়িত্ব পালনে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ৭৩৭ খ্রি. ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কুরাইশির শাসনামলে খারিজিরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কারণ তিনি অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাসনালয় তৈরি এবং তাদেরকে চাকুরি করার সুযোগ দিয়েছিলেন।[১] খালিদ আল কাসরি খারিজিদের বিদ্রোহের কথা জানতে পেরে সিরিয়ার ছয় শতাধিক সৈন্যবাহিনীকে এ বিদ্রোহ মোকাবিলা এবং কুফার দুইশত পুলিশকে সিরিয়ান সৈন্য বাহিনীর সাথে যোগদান করার নির্দেশ দেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে সিরিয়ান সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেননি। যুদ্ধ শুরু হলে খারিজিরা সিরিয়ান সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। ফলে সিরিয়ান সৈন্যরা ঘোড়ায় আরোহণ করে পলায়ন করে। পুলিশ সদস্যরা এ দৃশ্য দেখে পলায়ন করে।[২] ঐতিহাসিক তাবারির মতে– পুলিশ সদস্যরা পদব্রজে পলায়ন করেন। কারণ সিরিয়ান সৈন্যদের ন্যায় তাদের ঘোড়া ছিল না।[৩] যখন বাহালুল এবং তার অনুসারীরা পুলিশ সদস্যদের নিকট পৌঁছায় তখন পুলিশ সদস্যরা খারিজিদেরকে তাদের হত্যা না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং পলায়নের সুযোগ চান।[৪] এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, সিরিয়ান সৈন্য ও পুলিশ সদস্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতটাই প্রবল ছিল যা তাদেরকে পরাজিত করে। কেননা, খারিজিদের দমনে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়। পুলিশ সদস্যরা খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি বরং তারা পলায়নের সুযোগ গ্রহণ করে।

পুলিশ প্রধানের ব্যক্তিগত যোগ্যতা

পুলিশ প্রধান সবসময় খলিফা ও গভর্নরের খুব নিকটের ব্যক্তি ছিলেন। তাকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হতে হত। ঐতিহাসিকদের মতে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্য অবশ্যই পুলিশ প্রধানকে কিছু নির্দিষ্ট গুণের অধিকারী হতে হত। ঐতিহাসিক ইয়াকুবির মতে, যিয়াদ বিন আবিহি বলেন যে, পুলিশের কার্য সম্পাদনের জন্য অবশ্যই তাকে বয়স্ক এবং দক্ষ হতে হবে। যিয়াদ আরও উল্লেখ করেন যে, পুলিশ প্রধান অবশ্যই সতর্ক হবেন। কখনও তাকে অসতর্ক হলে চলবে না।[৫] Ibn Qutayba এর মতে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলতেন যে, আমাকে একজন যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান দাও যিনি পুলিশ প্রধানের জন্য উপযুক্ত। তখন কিছু ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি চান? জবাবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জানান যে, তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে প্রত্যাশা করেন যিনি সবসময় বিশ্বস্ত, ধৈর্য্যশীল ও সাহসী হবেন, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না এবং সত্য উপস্থাপনের সময় কখনও রাগান্বিত হবেন না এবং উচ্চপদস্থ শ্রেণির মধ্যে সংযোগকারী হবেন।[৬]

আবদুর রহমান আল তামিমিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদানের জন্য হাজ্জাজ পরামর্শ প্রাপ্ত হন।[৭] অবশেষে হাজ্জাজ আবদুর রহমান বিন উবায়িদকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।

আস-সাহাবির মতে, হাজ্জাজ পুলিশ প্রধানের জন্য একজন সৎ, নির্ভীক নির্ভরশীল ও উপর্যুক্ত ব্যক্তির বর্ণনা করছিলেন। সে আলোকে বনু তামিম গোত্রের আব্দুর রহমান ইবনে উবায়েদকে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করা হয়। আব্দুর রহমান অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি শুধু ঋণখেলাপির ক্ষেত্রে কারাবন্দি করেন। কোনো ব্যক্তি কাউকে ছুরি মারলে তিনি ঐ ব্যক্তির ছুরি তার নিজস্ব পেটে চালাতেন যতক্ষণ না এটি উক্ত ব্যক্তির পিষ্ঠ বেধ করত।[৮]

---

১. Tabari, vol. 7, p. 130-137; Kamil, vol. 5, pp. 156-157
২. Ibid
৩. Ibid
৪. Ibid
৫. Yaqubi, vol. 2, p. 223
৬. Abu Muhammad Abdullah b. Muslim Ibn Qutayba, *Uyun al-Akhbar*, Cairo : n.d., vol. 1, p. 16
৭. Ibid
৮. Michael G. Morony, *Iraq after the Muslim conquest*, Ibid, p. 95

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে আসাম-এর বর্ণনা মতে, আব্দুর রহমান পুলিশ প্রধান হয়ে হাজ্জাজের নিকট অনুরোধ করেন যে, হাজ্জাজের পরিবার এবং তার সহযোগীরা যাতে কোনো বিষয়কে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেয়ার আবেদন করে তার নিকট না আসে এবং এ বিষয়টি যাতে খলিফা তাদেরকে অনুমোদন (Allow) না করেন। হাজ্জাজ এ বিষয়টি মেনে নেন এবং একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন যে, যদি হাজ্জাজের পরিবার ও পুলিশ প্রধানের মধ্যে কেউ এরূপ কাজ করে তাকে হত্যা করা হবে।[১] তাবারি পুলিশ প্রধানের সত্যবাদী হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ৭২৪ খ্রি. খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালেকের শাসনামলে ইরাকের গভর্নর উমর বিন হুবাইরা মুসলিম বিন সাঈদকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি উমরকে সৎ পুলিশ প্রধান নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করেন। উমর এ বিষয়ে তাঁর শাসনকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> "There are pieces of Advice that I recommend that you follow. Your chamberlain (hajib) is the face with which you see people. If he does good then you do good, and if he acts wickedly then you act wickedly. As for the sahib-al-shurta who is your lash and your sword, wherever he puts them, you put them."[২]

them."[২]

ইবনে আবদ রাবিহি উল্লেখ করেন যে, পুলিশ প্রধান তার দায়িত্বপালনে সৎ না হলে সরকারের সুনামের উপর তার লজ্জাস্কর প্রভাব পড়ে এবং পুলিশ প্রধান কোনো জনবিরোধী কাজ করলে বা পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সরকারকে তার দুর্নাম বহন করতে হয়।

ঐতিহাসিক বালাযুরির মতে, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর এর খেলাফতকালীন সময়ে কুফার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন মুতি তার পুলিশ প্রধানকে জনগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে ও সন্দিগ্ধদের প্রতি কঠোর হবার পরামর্শ প্রদান করেন।[৩]

ঐতিহাসিক Levey মন্তব্য করেন যে, পুলিশ প্রধানগণ তাদের নিষ্ঠুরতা ও অবিবেচকতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি সম্ভবত অপরাধীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করার কারণে পুলিশ প্রধান সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন। এছাড়া হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে সাম্রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অপরাধীদের প্রতি অতিমাত্রায় শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল বলেও তিনি এরূপ মন্তব্য করতে পারেন। পুলিশ প্রধানের নিষ্ঠুরতার বিষয়টি ছিল শাসনকর্তার ইচ্ছাধীন। শাসনকর্তা যেরূপ প্রত্যাশা করতেন তিনি সেরূপ দায়িত্বপালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে সকল পুলিশ অফিসারই ছিল সম্মানিত ও দায়িত্ববান। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গভর্নরের আদেশ পালন করতেন।

ঐতিহাসিক আবুল ফারাজের মতে, আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতেন বলে, তার পুলিশ প্রধানও সমভাবে কঠোর ছিল এবং রাত্রিকালে কেউ বের হলে তাকে হত্যা করা হত।[৪]

উমাইয়া খলিফাগণ এ পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে পুলিশ প্রধান নিয়োগের জন্য কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেন। যায়িদ বিন আবিহি বলেন, একজন পুলিশ প্রধান অবশ্যই দৃঢ় ও সচেতন হবেন। এছাড়া দেহরক্ষী প্রধান অবশ্যই বয়োজ্যেষ্ঠ, সৎ ও নিষ্ঠাবান হবে।[৫]

---

১. Ibn Atham, vol. 7, pp. 110-111
২. Ibn Abd Rabbihi, ibid, vol. 1, p. 15
৩. Ansab, vol. 5, p. 221
৪. Ali b. Husayn Abul-Faraj al-Isfahani, *Maqatil al-Talibiyyin*, Ibid, p. 162
৫. The Umayyad caliphs were aware of the seriousness and vitality of this post; therefore they set general criteria that must be met by the chief of police. Ziyad ibn Abih said: "A chief of police must be firm in authority and watchful. A chief of guard must be old, chaste, and honest. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafy, the viceroy of Iraq and Hijaz during the reign of `Abdul-Malik ibn

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা ও গভর্নরের সাথে পুলিশ প্রধানের সম্পর্ক

উমাইয়াদের রাজত্বকালে ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী ও শহরগুলোতে পুলিশি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কার্যকর ছিল। এর প্রধান Shabib al Shurta খলিফার অথবা গভর্নরের নিকট দায়ী থাকতেন। খলিফা ছিলেন ইসলামি রাষ্ট্রের অধিকর্তা। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। পুলিশ প্রধান ছিল তার মধ্যে অন্যতম।

৬৬১ খ্রি. উমাইয়া সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। এ সময় প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা ও ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পুলিশ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। উমাইয়া শাসন আমলে পুলিশ প্রধানের পদটি খুবই মর্যাদা ও ক্ষমতাপূর্ণ ছিল। আর প্রদেশের পুলিশ প্রধানের পদটি ছিল গভর্নরের পরেই মর্যাদাপূর্ণ। মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধানকে দাহক বিন কায়েস আল ফেহরিকে কুফার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।[১] একইভাবে খলিফা মারওয়ান বিন হাকাম ৬৮৪ খ্রি. মিসর প্রদেশের পুলিশ প্রধান আমর বিন সাদ আল আসকে মদিনার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।[২]

রাজধানীতে পুলিশ প্রধানের দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল তার ফোর্সদের নিয়ে খলিফার নিরাপত্তা বিধান করা যখন তিনি প্রাসাদের বাইরে গমন করতেন। উমাইয়া শাসনামলে প্রাদেশিক গভর্নরদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই প্রথার প্রচলন হয়। ইরাকের জনপ্রিয় গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহি যখন বাইরে গমণ করতেন তখন তিনি প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন এবং পুলিশ প্রধান তার হাতে বর্শাসহ তাঁর সম্মুখে হাঁটতেন।[৩]

খলিফার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেও পুলিশ প্রধানের রক্ষামূলক ভূমিকা ছিল। তিনি খলিফার নিকটে দন্ডায়মান থাকতেন এবং প্রয়োজেন খলিফাকে রক্ষা করা, জনসাধারণকে নিশ্চুপ করা বা কাউকে বরখাস্ত করা অথবা খলিফার নির্দেশে কাউকে হত্যা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। আদালতে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ও তার চাচাতো ভাই উমর বিন আব্দুল আজিজের মধ্যে যুক্তিপ্রদর্শনকালে পুলিশ প্রধান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একটি মতে জানা যায় যে, পুলিশ প্রধান উমর বিন আব্দুল আজিজকে জানান যে, তিরি তার শিরচ্ছেদ করতেন যদি খলিফার নিকট হতে এরূপ নির্দেশ পেতেন। কারণ ওয়ালিদ উমর (রা.) এর যুক্তিতর্কে তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন।[৪]

অন্য একটি ঘটনা এইরূপ যে, উমর বিন আব্দুল আজিজের আদালতে এক ব্যক্তি একটি বিদ্রুপাত্মক বা আক্রমণাত্মক মন্তব্য করলে উমর (রা.) এর পুলিশ প্রধান তাকে তৎক্ষণাৎ আদালত ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু উমর (রা.) উক্ত ব্যক্তিকে অবস্থানের নির্দেশ দেন।[৫] অন্য একটি ঘটনায় এইরূপ যে, খলিফা আব্দুল মালিক যখন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমার বিন সাদ বিন আল আসকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি পুলিশ প্রধানকে আদালতে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন।[৬]

Marwan, searched for a man able to take command of the police in Kufa. He consulted with the notables and the elite among people, who in turn asked him: "What men do you want?" He said: "I want a man, who sits for a long time (tolerant), honest, free of dishonesty, keen on the least of right, and does not accept any intercession from any one no matter how noble is he." It was said to him: "It is `Abdul-Rahman ibn Obayd al-Tamimy." So he sent to him to appoint him. However, al-Tamimy said to al-Hajjaj: "I can't accept it unless you prevent your children and entourage (from interfering in his work)." Then al-Hajjaj asked his valet: "O boy, call in the people that whoever among them asks for something from him (al-Tamimy), I will be free from him." For al-Tamimy's efficiency and ability to preserve security, al-Shi`by said: "He might have stayed forty days without anybody coming to him (in a dispute). Therefore, al-Hajjaj entrusted him with the position of being in charge of the police of Kufa and Basra. see. http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2012

১. Tabari, vol. 5, pp. 300, 323
২. Wulat, p. 70; Tabari, vol. 5, p. 343
৩. Ansab, vol. 4A, p. 188; Tabari, vol. 5, p. 223
৪. Nahj, vol. 17, p. 43
৫. Ibid, vol. 18, p. 165
৬. Ansab, vol. 4B, p. 145

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ রাজপ্রাসাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে খলিফারা পুলিশ প্রধান নিয়োগে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং যাদেরকে তিনি খুব বিশ্বস্ত মনে করতেন তাদেরকেই নিয়োগ করতেন। উদাহরণস্বরূপ মুয়াবিয়া (রা.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন তখন তিনি দু'জন ব্যক্তির উপর আস্থা রেখে তাদের ডেকে তার পুত্র ইয়াযিদকে খলিফা হিসেবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন তার পুলিশ প্রধান দাহহাক আল ফিহরি।[১]

প্রাদেশিক অন্য কর্মকর্তাদের মতো, পুলিশ প্রধানও গভর্নর কর্তৃক নিয়োজিত হতেন।[২]

ইরাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরবর্তী খলিফা ছিলেন ইয়াজিদ ইবনে মুহাল্লাব। যিনি খুরাসান ও বসরায় রাজস্ব কর্মকর্তাসহ ও পুলিশ কর্মকর্তাও নিয়োগ করেন। সমরখন্দ প্রদেশে পুলিশ কর্মকর্তা সামরিক দায়িত্ব পালন করেন ও রাজস্ব সংগ্রহ করেন।[৩]

রাজনৈতিকভাবেও পুলিশ প্রধানের গুরুত্ব

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক (৭১৪-১৭ খ্রি.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুলিশ প্রধানকে ডেকে এ নির্দেশ দেন যে, তার মৃত্যুর পর তার পরিবারকে একত্রিত করতে এবং তার অছিয়ত বা উইল পালনে ব্যর্থ হলে তাকে হত্যা করতে।[৪]

এছাড়া আদালতে খলিফা ও গভর্নরের সাথে অংশগ্রহণ করে পুলিশ প্রধান রাষ্ট্রীয় ও শহরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, বিশেষ করে নিরাপত্তার বিষয়ে। খলিফা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের শাসনামলে পুলিশ প্রধান কুফার গভর্নরকে পরামর্শ দেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে মুখতারকে বন্দি করার।[৫]

অন্য একটি ঘটনায় কুফার গভর্নরকে তার পুলিশ প্রধান মুগিরা বিন সাবাহ জানান যে, কিছু লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে এবং তিনি তাকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন। অন্য একটি ঘটনায় এরূপ যে, আব্দুল মালিকের শাসনামলে খুরাসানের গভর্নরের পুলিশ প্রধান তার নিকট এসে জানায় যে, প্রাক্তণ গভর্নর বুকাইর বিন উইশাহ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছেন। তার উচিত তাকে বন্দি করা।[৬]

পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ছিল অভ্যন্তরীণ শত্রু থেকে খলিফাকে রক্ষা করা এবং রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পুলিশ প্রধান তার দায়িত্ব পালনে অবজ্ঞা করলে বা ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রের রাজধানীর নিরাপত্তাসহ ও সকল প্রদেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ-৬৪৩ খ্রি. ইয়াযিন বিন ওয়ালিদ খলিফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের নিকট হতে রাজধানী দামেস্ক দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসময় খলিফা ওয়ালিদ রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর এক আত্মীয়দের মধ্যে একজন খলিফার দায়িত্বে ছিলেন। এসময় বিদ্রোহীরা দামেস্ক দখল করতে ইচ্ছা করলে উপ-প্রধান খলিফাও রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। এসময় পুলিশ প্রধান বা সাহিব আল-শুরতা এবং উপ-প্রধান খলিফার পুত্র রাজধানীর নিরাপত্তার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। বিদ্রোহীরা যখন দামেস্কের মসজিদে আক্রমণ করে সকল প্রহরীদের আটক করে খলিফার প্রাসাদ দখল করছিল তখন পুলিশ প্রধান সম্পূর্ণরূপে মাদকাসক্ত ছিল।[৭]

---

১. Tabari, vol. 5, p. 323
২. S.M. IMAMUDDIN, *ARAB MUSLIM ADMINISTRATION*, Ibid, p.63
৩. Reuben Levy, *AN INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY OF ISLAM,* Ibid, vol. 2, pp. 193-194
৪. Abu Hanifa, Op.cit, p. 232
৫. Tabari, vol. 6, p. 11
৬. Ibn al-Atham, vol. 7, p. 289
৭. Aghani, vol. 7, p. 76

Dhaka University Institutional Repository

এতে প্রতীয়মান হয় যে, উমাইয়া সাম্রাজ্যে পুলিশ প্রধান উচ্চ মর্যাদায় ছিলেন এবং খলিফার নিকটস্থ উপদেষ্টা ও সহচরদের একজন ছিলেন। কেন্দ্রের ন্যায় উমাইয়া সাম্রাজ্যে প্রাদেশিক গভর্নরদেরও পুলিশ প্রধান ছিলেন। যিনি গভর্নরের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতাধর ছিলেন। এ দুর্যোগপূর্ণ সময়ে পুলিশ প্রধান ইরাকের সামরিক শহর ও কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

নির্দিষ্ট কতকগুলো প্রদেশ যেমন ইরাক এবং খোরাসানে একজন গভর্নর বা ওয়ালি সমগ্র এলাকার জন্য ছিলেন এবং একই সময়ে একজন আমিলও থাকতেন। আমিল এবং ওয়ালি উভয়েরই পুলিশ প্রধান ছিল। ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার শাসনামলে অনেক গভর্নর মিসরের ফুসতাত শহরে অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে পুলিশ প্রধানকে তার ডেপুটি করতেন।[১] উদাহরণস্বরূপ মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল আল আযিয বিন মারওয়ান সিরিয়া গমণকালীন সময়ে তার পুলিশ প্রধানকে তার ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ করেন।[২]

সাধারণত পুলিশ প্রধান গভর্নরের অনুপস্থিতিকালীন সময়ে গভর্নরের নীতি অনুসরণ করতেন। অনেক সময় তিনি তার নিজ দর্শন অনুযায়ী প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন যা গভর্নরদের মনঃপূত হত না। উল্লেখ্য যে, পুলিশ প্রধান আবিস বিন সায়িদ মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল আযিয বিন মারওয়ান এর অনুপস্থিতকালীন সময়ে ফুসতাদের সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গভর্নর ফিরে এসে এ বিষয়ে উভয় সঙ্কটে পড়েন। তিনি যদি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করেন তবে সৈন্যরা ক্ষেপে যাবে। সুতরাং তিনি বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে সম্মতি দেন। ঐতিহাসিক কিন্দির মতে, পুলিশ প্রধান গভর্নরকে জানান যে, তিনি ইচ্ছা করলে তার এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন।[৩]

সাধারণত গভর্নরের ইচ্ছানুযায়ী পুলিশ প্রধানকে নির্বাচন করা হত এবং তিনি এমন লোক নির্বাচন করতেন যিনি তার প্রতি অনুগত থাকতেন। অনেক সময় গভর্নর পরিবর্তনের সাথে সাথে পুলিশ প্রধানও পরিবর্তিত হতেন।

অনেক সময় পুলিশ প্রধান শুধু গভর্নরের ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন না বরং গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত হতেন। খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এর শাসনকর্তা হামাদান পুলিশ প্রধান হতে গভর্নররূপে নিয়োজিত হন। অন্য একটি ঘটনায় খলিফা হিশাম মিসরের গভর্নরকে বরখাস্ত করে ফুসতাতের পুলিশ প্রধান হাফস বিন ওয়ালিদকে তার স্থলে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।[৪]

অনেক সময় গভর্নরের মৃত্যু হলে পুলিশ প্রধান নতুন গভর্নর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। পুলিশ প্রধানের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল নামাযের ইমামতি করা।

---

১. Wulat, p. 62
২. Ibid, p. 73
৩. Wulat, p. 70
৪. Wulat, p. 96

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমাইয়া যুগে পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

উমাইয়া শাসনামলে পুলিশকে ব্যাপক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হত। কেন্দ্রে খলিফা ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ অভ্যন্তরীণ শত্রু থেকে নিজেদেরকে রক্ষাকল্পে ও মুসলিম সাম্রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করতেন। পুলিশ শহরের অপরাধী ও দুর্বৃত্তদের শাস্তি প্রদান করতো। তারা কোনো বিদ্রোহ দেখা দিলে শহরের অভ্যন্তরে টহল দিত। পুলিশের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল শরিয়া আইন ভঙ্গ করে কেউ অপরাধ করলে তাকে বিধিবদ্ধ দন্ড প্রদান করা।

উমাইয়া যুগে পুলিশ প্রধান বা সাহিব আল-শুরতা এর দায়িত্ব আধুনিক পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপেক্ষা অধিক ছিল। Shurta এর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রচলিত পুলিশ ব্যবস্থা হতে অধিক সামরিক মানের ছিল। পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ পাঁচভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:[১]

(i) খলিফা ও গভর্নরদের নিরাপত্তার বিধান (The protection of caliphs and governors against their internal enemies and of the cities against internal rebels.)

(ii) দুর্বৃত্তদের শাস্তি প্রদান (Punishing wrong-doers and outlaws)

(iii) হুদুদুশ শরিয়া বাস্তবায়ন ও মাসলাহাহুল উম্মাহ নীতির আলোকে অন্যান্য শাস্তি কার্যকর করা (Carrying out the hudud al-Sharia, and the punishing of other offences according to the Principles of maslaha al-umma)

(iv) শহরগুলোর বহিঃদেশে শত্রুদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা (Helping the army against enemies outside the cities)

(v) রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ এবং বন্দি ও কারারক্ষীদের সাথে কার্যক্রম (Carrying out executions and tortures of political offenders and generally dealing with prisoners and the sahib al-sijin.)

উমাইয়া রাজত্বকালে খলিফা ও গভর্নরদের রক্ষাকল্পে পুলিশের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন- মুয়াবিয়া (রা.) প্রাসাদের বাইরে অবস্থানকালীন নিজের নিরাপত্তার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করতেন।[২] তিনি যখন নামাজের জন্য মসজিদে গমণ করতেন তখন পুলিশি নিরাপত্তা গ্রহণ করতেন।[৩]

ঐতিহাসিক আবুল ফারায এর মতে, খলিফা যখনই বাইরে গমণ করতেন তখন নিজের নিরাপত্তার জন্য একইভাবে পুলিশ ব্যবহার করতেন।[৪] প্রাদেশিক গভর্নরগণও কেন্দ্রের খলিফার মত পুলিশি নিরাপত্তা গ্রহণ করতেন। খলিফাদের ন্যায় পুলিশ প্রধান গভর্নরের ভ্রমণকালীন সময়ে তাঁর সম্মুখে বর্শা হাতে অগ্রসর হতেন।

খলিফা ও গভর্নরগণ পুলিশকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দুর্বৃত্ত বা গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। জনগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে

---

১. ARSSAN MUSSA RASHID, *THE ROLE OF THE SHURTA IN EARLY ISLAM*, Phd Thesis Published, University of Edinburgh, 1983, pp. 84-104
২. Husari, *Zahr-al-Adab Wa Thamar al-Albab*, Cairo : 1953, vol. 2, p. 932; Damiri, Op.cit, vol. 1, p. 74
৩. Tabari, vol. 5, p. 159
৪. Aghani, vol. 7, p. 7

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণ করতেন। যেমন-খলিফা ওয়ালিদ বলেন, আমি রাজধানী দামেস্কের বিভিন্ন গৃহে আত্মগোপনকারী খারিজিদের বন্দি করার জন্য পুলিশকে প্রেরণ করেছিলাম।[১]

প্রদেশের গভর্নররা গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বন্দি করার জন্য পুলিশকে নিয়োগ করতেন। মুয়াবিয়ার শাসনামলে বসরার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কবি ইবনে আল মুফাররিগের উপর খুব রাগান্বিত হলেন। কবি মুফাররিগ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে আত্মগোপন করেন। কিন্তু গভর্নর যখন কবির আত্মগোপনকারী জায়গার সন্ধান জানতে পারেন তখন তিনি তাকে (কবিকে) বন্দি করার জন্য পুলিশ প্রেরণ করেন।[২]

খলিফা সুলায়মানের সময় খোরাসানের গভর্নর কোতায়াবা বিন মুসলিম তার শত্রু ওয়াকিকে বন্দি করার জন্য পুলিশ প্রধানকে প্রেরণ করেন। সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান ওয়াকির নিকট গমন করে খলিফার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন।[৩]

পুলিশ খলিফা ও গভর্নরদের রাজপ্রসাদের অভ্যন্তরে নিরাপত্তায় নিয়োজিত থেকে তাদেরকে পাহারা দিত। প্রসিদ্ধ গভর্নরগণ যেমন-যিয়াদ, তার ছেলে ওবায়দুল্লাহ এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রাসাদে পুলিশ থাকতো।

উমাইয়াদের রাজত্বকালে অনেকগুলো বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রধানত সামরিক শহর কুফা ও বসরায় শিয়া ও খারিজিদের বিদ্রোহ দমনে পুলিশ সচেষ্ট ছিল। পুলিশ এসব বিদ্রোহীদের দমনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশ প্রধান অগ্রিম তথ্য পেতেন। সে অনুযায়ী তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য গভর্নরের অনুমতি প্রার্থনা করতেন।[৪]

অন্য একটি ঘটনা এরূপ যে, আব্দুল্লাহ বিন মুতি কুফার গভর্নর নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে তাঁর পুলিশ প্রধান তাঁকে অবগত করেন যে, শিয়া নেতা মুখতারের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে। পুলিশ প্রধান তার একজন গোপন এজেন্টের মাধ্যমে এ সংবাদ লাভ করেন।[৫]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ প্রধানের Spy বা Agent ছিল। সাহিব আল-শুরতা যখন কোনো বিদ্রোহীদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতেন তখন তিনি গভর্নরকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করতেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ রাস্তায় টহল দিত এবং অস্থিতিশীল সময়ে সাধারণ সময়ের তুলনায় বেশী সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে পুলিশ প্রধান রাস্তায় টহল দিতেন। যেকোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা এবং রাস্তায় যে কাউকে বন্দি করার ক্ষমতা পুলিশের ছিল। পুলিশ ও পুলিশ প্রধান শহরের রাস্তায় টহলকালীন সময়ে যাদেরকে বিদ্রোহী বা বিদ্রোহীদের সমর্থক মনে করতো তাদেরকে বন্দি বা হত্যা করতে পারত।

বিদ্রোহীরা যেখানে আত্মগোপন করে আছে বলে পুলিশ ধারণা করতো সেসব স্থানে তল্লাশি করা ও বিদ্রোহীদের বন্দি করে শাস্তি দানে ক্ষমতাও তাদের ছিল।[৬]

---

১. Aghani, vol. 13, pp. 162-163
২. Tabari, vol. 5, pp. 318-319
৩. Kamil, vol. 5, p. 10
৪. Tabari, vol. 5, pp. 181-182
৫. Ibid, vol. 6, p. 11
৬. Tabari, vol. 5, p. 373

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণস্বরূপ: খলিফার নির্দেশে পুলিশ বিদ্রোহীদের গৃহগুলোও ধক্ষংস করতে পারতো। যেমন- খলিফা ইয়াযিদের সময় মদিনার গভর্নর আমর বিন সাঈদ তার পুলিশ প্রধানকে বনু হাশিম ও বনু আসাদ গোত্রের লোকদের গৃহগুলো ধক্ষংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন কেননা, তারা ইয়াযিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি।[১]

দুর্বৃত্তদের শাস্তি প্রদান (Punishing wrong-doers and outlaws)

প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে পুলিশের দায়িত্ব ছিল শহরের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সামাজিক ও নৈতিক স্খলন দূরীকরণে গভর্নরগণ অপরাধী ও দুর্বৃত্তদের প্রতি কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ-বসরার গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহি শহরের সামাজিক ও নৈতিক শৈথল্যকারীদের দমনে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক বালাযুরির মতে, যিয়াদ তাঁর অভিষেক বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, কেউ যদি কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে তা ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। যিয়াদ তাঁর বক্তৃতায় বলেন–

> "Every crime has its punishment. If anyone drowns a man, I will drown him. If anyone burns a house down over the head of its occupant, I will burn him. If anyone digs (nagaba) into a house to steal, I will dig out his heart. If anyone digs up graves (to snatch bodies), I will bury him a live."[২]

ঐতিহাসিক বালাযুরির মতে, যিয়াদ যেরূপ বিবৃতি দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী তিনি অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পুলিশ প্রধান এশার নামাযের পর যাকে রাস্তায় পেতেন তাকে গ্রেফতার করতেন। অপরাধীদের মধ্যে যারা মৃতদেহ চুরি করতো তাদেরকে যিয়াদের নিকট নিয়ে আসলে তিনি তাদের জীবন্ত কবরস্থ করার নির্দেশ দেন। যে সমস্ত ব্যক্তি অন্যের গৃহ জ্বালিয়ে দিত তিনি তাদেরকেও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৩]

গভর্নর হাজ্জাজের সময়ও চোর ও এবং দুর্বৃত্তদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হত। ঐতিহাসিক ইবনে কুতায়বার মতে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পুলিশ প্রধান অপরাধীদের প্রতি খুবই কঠোর ছিলেন। এক ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে যখন এক ব্যক্তির গৃহে গিয়ে ধরা পড়ে, তখন তাকে কোনো এক ব্যক্তির গৃহের সিঁদেল চোরকে পুলিশ প্রধানের নিকট আনা হলে তিনি ছিদ্রকারী যন্ত্র দ্বারা তাকে এঁফোড়-ওফোঁড় করেন। চোরের মৃতদেহ তার নিকট আনা হলে তিনি তার জন্য কবর খনন করে তাতে সমাহিত করেন। উল্লেখ্য যে, কোনো অপরাধী কারও ঘর জ্বালিয়ে দিলে তিনি তাকে জ্বালিয়ে দেয়ারও নির্দেশ দেন। সন্দেহজনক দস্যুতা, যার বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, তারপরও তিনি ঐ ব্যক্তিকে তিন'শ বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতেন।

নগরীর নিরাপত্তার প্রয়োজনে পুলিশ প্রধানকে Curfew বা সান্ধ্যআইন জারি করতে হত এবং কেউ এটা ভঙ্গ করলে তাকে হত্যা করা হত। তারা বিশ্বাস করতেন যে, অপরাধী এবং নাশকতাকারী ব্যক্তি ব্যতীত কোনো নির্দোষ Curfew বা সান্ধ্যআইন কালীন সময়ে গৃহের বাইরে যেতে পারে না।

মুয়াবিয়ার শাসনামলে মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকাম মদিনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে মদিনায় অপরাধ সাধারণ বিষয় হয়ে ওঠে। তখন মারওয়ান মুসাআব বিন আবদুর রহমানকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ দান করেন। পুলিশ প্রধান অপরাধ দমনে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

---

১. Musab b. Abdallah al-Zubayri, *Kitab Nasab al-Quraysh*, Cairo : 1953, p. 268
২. Ansab, vol. 4A, p. 180
৩. Ibid, p. 172

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণস্বরূপ কেউ রাত্রিকালে বের হলে মুসআব তাকে বন্দি করার নির্দেশ দিতেন। এছাড়া তিনি একে-অপরের প্রতি আক্রমণ কখনই অনুমোদন করতেন না। তিনি অপরাধীদের বেত্রাঘাত করতেন এবং তাদের গৃহ ধক্ষংস করে দিতেন। ফলে জনগণ তাঁকে এবং তার পুলিশ বাহিনীকে ভয় পেত।[১]

পুলিশ ও পুলিশ প্রধান শুধু শরিয়া নির্ধারিত আইন Hudud অনুযায়ী শাস্তি দিতেন না বরং মাসলাহা এর নীতি অনুযায়ী তাঁর বিবেচনা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করতে পারতেন। পুলিশ প্রধান মুসলিম সমাজকে যেকোন ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে নতুন ধরনের শাস্তি দেয়ার এখতিয়ার রাখতেন। গভর্নর যিয়াদ এবং হাজ্জাজের পুলিশ প্রধান শাস্তির এমন কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করতেন যা ইসলামি আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যেমন-মৃতদেহ চোর ও অগ্নিসংযোগকারীদের শাস্তি হুদুদের অন্তর্ভুক্ত নেই। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে কোনো অস্বাভাবিক বা নতুন কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে পুলিশ প্রধান ও গভর্নর নতুন ধরনের শাস্তির বিধান তৈরি করতেন। কেননা তারা বিশ্বাস করতেন যে, এটি সমাজের রীতি (মাসলাহা)।[২]

প্রশাসক বা ওয়ালি আল যারাইম যিনি ফৌজদারি ও রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ফৌজদারি আইনের অধিক্ষেত্রমূলক বিষয়গুলো পুলিশের উপর অর্পন করেন। ফৌজদারি আইনগুলো সাধারণত মাজালিম কোর্টের অধিক্ষেত্রভুক্ত ছিল। জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তাগণ নিজেদের আদালতে বসতেন এবং তারা প্রায়ই শরিয়া পদ্ধতিগত বিধি এড়িয়ে যেতেন। উদাহরণস্বরূপ তারা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যকে গ্রহণ করতেন এবং তারা প্রশ্নবিদ্ধ সাক্ষের প্রামাণিক সাক্ষ্য শ্রবণ করতেন। তারা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করতে পারতেন বল প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারতেন। 'হদ' অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশ যখন আদালতে বসতেন তখন যদি শরিয়া আইনের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রমাণ না পাওয়া যেত তখন তারা এরূপ বিচার করতেন না। এ ধরনের অধিক শৈথিল্য অপরাধমূলক পদ্ধতিগত মানদণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে দোষী হিসেবে সাব্যস্তকৃত অপরাধীদের বিষয়ে পুলিশকে যথাযথভাবে বিবেচনা করতে সক্ষম করে তুলেছিল।[৩]

উমাইয়া যুগে পুলিশ বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যকার সম্পর্ক

বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা বিধানে মুসলিম প্রশাসকগণ উন্নত শ্রেণির প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। প্রাক-ইসলামি আরব দেশে বিচার বা বিবাদ মীমাংসার জন্য হাকাম (হাকিম) নিযুক্তির প্রথা প্রচলিত ছিল। গুণবান, প্রতিভাবান, প্রতিষ্ঠাবান ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণই কেবল হাকামের মর্যাদা লাভ করতেন। আরবদেশে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবী স্বয়ং মদিনায় কাযির দায়িত্বপালন করতেন এবং আরবদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর মনোনীত কাযিগণ কাযির দায়িত্বপালন করতেন। মহানবী

---

১. Zubayr b. Bahkar, *Jamhara Nasab al-Quraysh wa Akbariha*, Beirut : 1966, pp. 517-518

২. Al-Raqiq al-Nadim, *Qutb al-Sarur fi Awsaf al-Khumur*, Damascus : 1969, pp. 500-501; Arssan Mussa Rashid, *The Role of The Shurta in Early Islam*, Ibid, p. 95-96

৩. The ciminal law was singled out as a facet of law in which the jurisdication had been essentially delegated to the police by the wali al-jara'im, who was the official authorized to handle criminal offenses by the political leader. Thus, criminal law became a particular focus of mazalim jurisdication. Senior police could hold a court, and they often ingnored the procedural rules established by the Sharia. For example, they entertained the use of circumstantial evidence; they heard the testimony of equestionable witness; they imprisoned suspects; and they extorted confessions. While the police courts could apply the punishments of hudud offenses, they were not required to do so if the Sharia standards of proof were not met. These highely flexible criminal procedural stadndards enabled them to use a good deal of discretion when determining an appropriate sanction for the convicted offender. see: Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems A Comparative Survey*, Waltham: Anderson Publishing-2013, Eight Edition, p. 544

Dhaka University Institutional Repository

(স.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে খুলাফায়ে রাশিদিনের 'খলিফাগণও' রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বপালন করতেন এবং প্রাদেশিক বিচারের জন্য কাযি নিযুক্ত করতেন। কেবল মুসলমানদের বিচারের জন্য কাযিদের দায়িত্ব দেয়া হত। কারণ অমুসলমানদের বিচার সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রধান বা ধর্মযাজকের উপর ন্যস্ত ছিল।[১]

উমাইয়া যুগে কাযির প্রধান দায়িত্ব ও বিচার ক্ষমতা ছিল ধর্মীয় বিষয়াদি, বিবাহ, তালাক, ওয়াক্ফ ও উত্তরাধিকারী সমস্যা সংক্রান্ত। অন্যান্য বিষয়গুলি আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদানের ব্যাপারে ফিক্হ বা আইন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করতেন না, নির্ভর করতেন 'আদা' (প্রচলিত আইন) বা 'উরফ' (পারস্যের প্রচলিত আইন) এর উপর। বিচার কার্যে অনেক সময় কাযিগণ সামরিক কর্মকর্তা বা খোদ খলিফারও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। খলিফা প্রথম মু'য়াবিয়ার শাসনকালে মিসরের কাযি সুলায়মান বিন আনয্ এর উত্তরাধিকার বিষয়ক এক মামলার রা'য় প্রতিপক্ষ মানতে অস্বীকার করে। পরে উক্ত বিবাদ পুনরায় উক্ত কাযির দরবারে পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপন করলে কাযি সেবারেও তাঁর রায় লিপিবদ্ধ করে তাতে সামরিক অফিসারদের দস্তখত করিয়ে স্বীয় রা'য়কে শক্তিশালী করেন। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে খলিফা 'উমর বিন আবদুল আযিযের নিকট মিসরের কাযি ইযায বিন-'উবায়দুল্লাহ প্রতিবেশী ও অংশীদারের মধ্য সম্পত্তিতে কার ক্রয়াধিকার (Pre-emtion) বেশী বিষয়ে অভিমত প্রার্থনা করলে খলিফা অংশীদারের প্রি-এমশন অধিকার বেশী বলে রায় দেন।

কাযি প্রধানত-বেসমারিক বিচারের দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন। কাযিগণ সাধারণত মসজিদে বসে বিচার করতেন। তবে মসজিদ ব্যতীত নিজ অফিস কক্ষও বিচারালয় হিসেবে ব্যবহার করতেন। কাযির সর্বপ্রথম দায়িত্ব ছিল কারাগার পরিদর্শন করা এবং অন্যায় ও বে-আইনীভাবে বন্দী ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়া। তিনি একটি বৃহৎ কক্ষে বিচারালয় স্থাপন করতেন এবং বিচারের সময় আইন গ্রন্থসমূহ সম্মুখে রাখতেন এবং তাঁর সহকারীর লিখিত রেকর্ডসমূহ তত্ত্বাবধান করতেন। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর তিনি রায় দিতেন। বিবাদীর স্বীকৃতি পেলে আর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হত না।[২]

উমাইয়া আমলে সাহিব আল-শুরতা কাযি অপেক্ষা অধিকতর বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখতেন। কাযি তাঁর দরবার বা অধিক্ষেত্রের বাইরে যেতে পারতেন না। কিন্তু পুলিশ প্রধান অভিযোগের তদন্ত, অভিযুক্তকে শাস্তি প্রদান, বিনা বিচারে আটক, নির্যাতন করে স্বীকৃতি আদায়, সন্দেহের উপর শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সব রকম কার্য করতে পারতেন। কিন্তু কাযি কেবল অভিযোগ পেলে এবং সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা কেবল তাঁর বিচার কক্ষে বিচার কার্য চালাতে সক্ষম ছিলেন। কাযির দরবারে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, পুলিশ প্রধান তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারতেন। আবদুর রাহমান বিন-উবায়েদ নামক কুফায় নিযুক্ত হাজ্জাজের এক 'শুরতা' নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেন। একদা এক 'নাবিককে' তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তিনি তার দেহে কাঁটাবিদ্ধ করেন। কোনো খননকারী অভিযুক্ত হলে তিনি তাকে কবর খুড়ে পুতে ফেলতেন; অস্ত্র দ্বারা ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে কাউকে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে হাত কেটে শাস্তি প্রদান করতেন; কেউ গৃহদাহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তিনি তাকে পুড়িয়ে মারতেন; ডাকাত বলে কাউকে সন্দেহ হলে, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই তিনি তাকে তিনশত বেত্রাঘাত করতেন। কিন্তু কার্যত কাযির এত ক্ষমতা ছিল না।[৩]

---

১. ড. মুহম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া যুগে বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিব আল-শুরতা কাযি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা রাখতেন। কাযি তাঁর দরবার বা এজলাসের বাইরে যেতে পারতেন না। কিন্তু পুলিশ প্রধান অভিযোগের তদন্ত, অভিযুক্তকে শাস্তি প্রদান, বিনা বিচারে কাউকে আটক, শাস্তি দিয়ে স্বীকৃতি আদায়, সন্দেহের উপর শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সব রকম কার্য করতে পারতেন। কিন্তু কাযি কেবল অভিযোগ পেলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে শুধুমাত্র তাঁর বিচার কক্ষেই বিচার কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম ছিলেন।[১] কাযির দরবারে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, পুলিশ প্রধান তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারতেন।

উমাইয়া যুগে আমির কাযি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ কাযির প্রধান দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট; কিন্তু আমির ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতার অধিকারী। কাযি ছিলেন কেবল মুসলমানদের বিচারের জন্য নিযুক্ত বিচারক; কিন্তু আমির ছিলেন মুসলমান ও অমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের উপর শাসক ও বিচারক।

আল-আসমাঈ আলি ইবন মুসলিম আল-বাহিনী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক খারিজী মহিলাকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হলো। হাজ্জাজ তার সাথে কথা বলছিলেন। কিন্তু, মহিলা তার দিকে নজর করছিল না এবং তার কোনো কথারও উত্তর দিচ্ছিল না। তখন তাকে একজন পুলিশ বলল, তোমার সাথে আমির কথা বলছেন আর তুমি তার থেকে পিছন ফিরে রয়েছ? মহিলা বলল, আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করছি এমন লোকটির দিকে নজর করতে, যার দিকে আল্লাহ্ নজর করেন না। তারপর মহিলাকে হত্যার হুকুম দেয়া হলো এবং সে নিহত হলো।[২]

সিরিয়া ব্যতীত উমাইয়া শাসনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত সকলই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করতেন। তাদের মধ্যে পুলিশিং ও অর্থ প্রশাসন অন্যতম ছিল। ফুসতাতের কাযি আবিস বিন সাঈদ আল মুরাদি দ্বন্দ্ব দমনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পুলিশের কার্যক্রমে অনুরূপ করতেন।[৩]

একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, উমাইয়া শাসনের প্রাথমিস যুগে মিসরের ফুসতাত নগরীর পনেরজন বিচারকের মধ্যে ছয়জনই পুলিশের বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করতেন। অনেক কাযি কর সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। "According to one count, six out of fifteen qadis appointed to Fustat in this early period also charged with supervising the shurta. Many qadis, especially after 50/670, were also charged with the collection of taxes, except, again in Syria."[৪]

পুলিশ প্রতিষ্ঠানটি বিচার বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কেননা এ দুটি সংস্থাই আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগের কাজ করে থাকে। উমাইয়াদের শাসনামলে খলিফাই বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। বিচারকের দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের মধ্যে যেকোন ধরনের বিবাদ উদ্ভব হলে তার মিমাংসা করা। যেমন-বৈবাহিক সমস্যা, তালাক, উত্তরাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বিবাদের মিমাংসা করা। এছাড়া অনেক কাযি এতিম, বিধবা ও পাগলদের সম্পদেরও পরিচালনা করতেন।[৫]

---

১. ইমাম শাফিঈ, *কিতাবুল উম্ম*, খ.৬, পৃ. ২৪০; ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১০৭

২. আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৫, খ. ৯, পৃ. ২২১

৩. With the exception of Syria-the center of Umayyad rule-most appointees had other weighty responsibilities, having to do with policing and financial administration. The illiterate qadi ‘Abis b. Said al-Muradi was charged in Fustat with the task of adjudicating conflicts-in keeping, it would seem, with the orDginal meaning of the term ‘qada-and of heading the police section (shurta). see. WAEL B. HALLAQ, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, New York : Cambridge University Press, 2005, p. 36

৪. WAEL B. HALLAQ, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Ibid, p. 37

৫. Qudat, p. 17; Ibn Khaldu, *al-Muqaddima*, Beirut : n.d., p. 175; Abd al-Qadir al-Maadidi, *Wasit fil’l Asr al-Umawi*, Baghdad : 1979, p. 277

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়াদের শাসনামলে কাযি মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন আবার কখনও কখনও নিজ গৃহে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[১] তাঁরা পবিত্র কুরআন ও রসুল (স.) সুন্নাহ্ এর আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করার অধিকারী ছিলেন। কখনও কখনও প্রয়োজন অনুসারে তিনি ইস্তিহাদের পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক যুগে কাযি সীমিত ক্ষমতা উপভোগ করতেন। তাদেরকে কখনও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যেমন–গভর্নর ও পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করতে হত।

কাযি, পুলিশ ও পুলিশ প্রধানের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইবনে ওয়াকির মতে, কাযি যখন মসজিদে বিচারের জন্য আসন গ্রহণ করতেন তখন জনগণের নিকট হতে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য দু'জন ব্যক্তি চাবুক হাতে তাদের প্রহরায় দন্ডায়মান থাকতেন।[২] ইবনে ওয়াকি এ দু'জনকে প্রহরী বা haras বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] অন্য একটি জায়গায় তিনি Jilwaz (শুরতা) বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

একদা হাসান বসরি বলেন যে, গভর্নরদের কেন পুলিশ প্রয়োজন? কিন্তু যখন তিনি বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তখন জনগণ তার চতুর্দিকে ভিড় করলে তিনি বলেন যে, জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এ ধরনের সদস্য বা ফোর্স থাকা দরকার।[৫] উমাইয়া যুগে কখনও কখনও পুলিশ প্রধান ও কাযির কাযির পদটি একত্রিত ছিল এবং একই ব্যক্তি কাযি ও পুলিশ প্রধান ছিলেন।

ঐতিহাসিক কিন্দির মতে, প্রথম ব্যক্তি হিসেবে যিনি পুলিশ প্রধান ও কাযির পদটি অলংকৃত করেন তিনি হলেন, আবিস বিন সাঈদ আল মুরাদি।[৬]

উল্লেখ্য যে, পুলিশ প্রধানের পদটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তাদেরকে কাযি হিসেবেও নিয়োগ করা হত। ঐতিহাসিক Jurji Zaydan এর মতে, পুলিশ সংস্থাটির সূচনা হয় কাযিকে বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করে এবং পুলিশ বা শুরতা ছিল কাযির সেবক।[৭]

কিন্তু অধিকাংশ সময় পুলিশ প্রধান কাযি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সুতরাং পুলিশ সংস্থাটি কাযি বা বিচারককে অনুসরণ করে গড়ে উঠেনি। উদাহরণস্বরূপ-মিসরের গভর্নর কর্তৃক পুলিশ প্রধান আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াকে কাযি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

অনুরূপভাবে ইরাকের বসরা প্রদেশের গভর্নর খালিদ আল কাসরি তার পুলিশ প্রধানকে কাযি হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[৮]

Jurji Zaydan পুলিশ বা শুরতাকে বিচারকদের সেবক হিসেবে উল্লেখ করার বিষয়টি সঠিক। কেননা, কাযিদের কাজে সাহায্য করা ও দন্ডাদেশ প্রয়োগ করার জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সহায়তা প্রয়োজন ছিল। পুলিশ প্রধান প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং প্রদেশের গভর্নরের পরেই পুলিশ প্রধানের মর্যাদা বা স্থান ছিল। বেশিরভাগ সময় কাযি গভর্নর কর্তৃক আবার কখনও খলিফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। প্রায় সকল কাযিকেই 'কারি' অথবা 'ফকিহ'দের মধ্য হতে বাচাই করা হত। কিন্তু পুলিশ প্রধানকে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা অথবা উপজাতীয় প্রধানদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা

---

১. Waki, vol. 1, p. 333
২. Ibid, vol. 1, p. 145
৩. Ibid
৪. Ibid, vol. 1, p. 188
৫. Mubarrad, vol. 1, p. 270
৬. Qudat, p. 11
৭. Jurji Zaydan, *Tarikh al-Tammadun al-Islam*, Beirut : n.d., vol. 1, p. 243
৮. Ibn Khayyat, vol. 2, p. 366

Dhaka University Institutional Repository

হত। এসময় অনেক পুলিশ প্রধান গভর্নর ও সামরিক কমান্ডার হিসেবে কাজ করলেও কোনো কাযি এরূপ উচ্চ মার্যাদা লাভ করতে পারেননি।

ঐতিহাসিক Levy এর মতে পুলিশ প্রধান বিচারক অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করতেন। যেমন তিনি বলেন–

> "The sahib al-shurta had wider powers than the qadi, or ordinary judges concerned with Sharia affairs. The latter had no authority outside his own court for investigation of crimes reported of suspected, nor could he attempt to extract a confession by force from an accused person."[১]

উমাইয়াদের রাজত্বকালে বিচারকগণ জনগণের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু তাদের শাস্তি পুলিশ প্রধানের শাস্তির মতো কঠোর ছিল না। উদাহরণস্বরূপ ৭২১ খ্রি. বসরার কাযি কতিপয় ব্যক্তিকে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগে প্রহার, মাথামুন্ডন ও মুখমণ্ডলে কালিমা লেপনের নির্দেশ দেন যাতে তারা লজ্জিত হয়।[২] পুলিশ প্রধান গভর্নরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে মুয়াকিব (Escort) পেতেন। মাওয়ারদির মতে, ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরি এর পুলিশ প্রধান এস্কর্টসহকারে ইবনে সুবরামাকে অতিক্রম করেন। এতে ইবনে সুবরামা পুলিশ প্রধানের গর্বে খুবই রাগান্বিত হন। পরবর্তীতে ইবনে সুবরামা কাযি হিসেবে নিযুক্ত হলে তার সন্তান পুলিশ প্রধানের পূর্বের এস্কর্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। জবাবে ইবনে সুবরামা জানান, পুলিশ প্রধান, গভর্নর এবং তিনি একত্রে আহার করেছেন বলে তিনি তাদের মতই হয়ে গেছেন।[৩]

খলিফা প্রশাসনের আমলা ব্যক্তিবর্গের সাথে বিচারকদেরও নিয়োগ দেন। তিনি ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে বিচারকদের নিয়োগ শুরু করেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম বহু দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা যারা বিচার, পুলিশ, কর ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো দেখাশোনা করতেন। উমাইয়া যুগে বিচারকগণ তাদের বিচারিক কাজের বাইরেও পুলিশ, কর সংগ্রহ, সৈন্যদের বেতন প্রদান ও নামাজের নেতৃত্বে প্রদানসহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন দিকগুলো দেখভাল করতেন। তাঁরা ইসলামি আইন ও স্থানীয় রীতি অনুযায়ী বিচার করতেন।[৪]

(১) আবিস বিন সাইদ আল মুবাদি: তিনি মিসরের কাযি ছিলেন। এছাড়া তিনি পুলিশের তত্ত্বাবধানও করতেন।

(২) আব্দুল মালিকের (৭০২ খ্রি.) মৃত্যুর পর খলিফা আব্দুল আজিজ ইউনুস বিন আতিয়াকে কাযি ও পুলিশের দায়িত্ব প্রদান করেন।

(৩) কাযি ইউনুছ অসুস্থ হয়ে পড়লে খলিফা তার ভাতিজা আউস বিন আব্দুল্লাহ বিন আতিককে কাযি হিসেবে নিয়োগ করেন এবং বিচার বিভাগ থেকে পুলিশ বিভাগ পৃথক করেন। এ সময় আব্দুর রহমান

---

১. Reuben Levy, Op.cit, vol. 2, p. 364

২. Waki, vol. 2, p.19

৩. Mawardi, *Adab al-Dunya wa'l-Din*, Beirut: 1978, p. 40

৪. Alongside the bureaucratic staffs, the caliphs also appointed judges (qadis). Caliphal appointment of judges began in 642. They were at first multicompetent state officials dealing with justice, police, tax, and finance issues. Judges in the Umayyad period had a variety of administrative and political duties in addition to their judicial duties, including policing, tax collecting, making payments to soldiers and reaching and leading the community in prayer. They adjudicated on the basis of Islamic law and local, customary law. see. Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, London: Cambridge University Press, 3rd Edt. p. 78

Dhaka University Institutional Repository

বিন হুদায়িযকে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করা হয়। পরে পুনরায় আব্দুর রহমান বিন হুদায়িযকে পুলিশ প্রধান ও কাযির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১]

শরিয়ত নির্দেশিত হদ এবং অন্যান্য অপরাধের শাস্তি

উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সমাজে ফাসাদ্ বা অনৈতিক কর্মকান্ড সংঘটিত হলে শরিয়তের হুদুদ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। পবিত্র কুরআনে হদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ মদ্য পান করলে চল্লিশ বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) এটিকে আশি বেত্রাঘাত রূপে নির্ধারিত করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফারাযের মতে, একদিন উমাইয়া কবি দাললাল তাঁর বন্ধুদের নিয়ে মদ পান করছিলেন। পুলিশ এ ঘটনায় দাল্লাল ও তার বন্ধুদের গ্রেফতার করে মদিনার গভর্নরের নিকট হাজির করেন। মদিনার গভর্নর পুলিশকে হদ অনুযায়ী আশি বেত্রাঘাত ও মদিনার রাস্তায় ঘুরানোর নির্দেশ দেন।[২]

অন্য একটি ঘটনায় মুয়াবিয়ার শাসনামলে মদিনার জনৈক কবি ইবনে শায়হান মদ পান করেন। রাত্রিকালে তিনি রাস্তায় বের হয়ে আসলে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ প্রধানের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ প্রধান শরিয়তের নির্ধারিত হদ অনুযায়ী আশি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন।[৩] কোনো মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের পূর্বে পুলিশ প্রধান তাকে পরীক্ষা করতেন যে, উক্ত ব্যক্তি মদপান করেছে কিনা। আধুনিককালে পুলিশ যেমন ড্রাইভারদের ড্রাগ টেস্ট করে থাকে। উক্ত ব্যক্তি সত্যি সত্যি মদ পান করেছে কিনা পরীক্ষা করতে পুলিশ প্রধান তাকে একটি কুরআনের আয়াত পাঠ করতে বলতেন। উক্ত ব্যক্তি আয়াত তিলাওয়াত করতে না পারলে পুলিশ প্রধান তাকে আশি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতেন।[৪]

ঐতিহাসিক আবুল ফারাযের মতে, কবি আল ওয়াকাইশির একদিন পানশালায় মদ পান করছিলেন। এ সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে আসলে কবি পলায়ন করে তার গৃহে গমন করেন এবং গৃহের দরজা বন্ধ করে দেন। পুলিশ তার বাড়িতে আসলে তিনি জানান যে, তিনি মদ পান করেননি। সুতরাং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতেন পারেন না। তখন পুলিশ জানায় যে, তারা তাকে গামলা বা পাত্রে মদ পান করতে দেখেছেন। এ কথা শুনে তিনি জানান যে, তিনি উক্ত পাত্রে দুধ পান করতেছিলেন মদ নয়।[৫]

আবুল ফারায আরও উল্লেখ করেন যে, আল উকাইশির দুই দেরহাম না দেয়া পর্যন্ত পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়নি। এ দ্বারা পুলিশের অসততা ও ঘুষ গ্রহণের বিষয়টিও ফুটে ওঠে। ইবনে কুতায়বা অন্য একটি ঘটনায় উল্লেখ করেন যে, ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরি (৭২৩-৭৩৭ খ্রি.)-এর পুলিশ প্রধান ওরইয়ান বিন হাশিমের নিকট এক যুবককে মদ্যপ অবস্থায় হাজির করা হয়। পুলিশ প্রধান উক্ত যুবককে তার পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে যুবক একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনান। এতে পুলিশ প্রধান যুবকটিকে কুফার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বলে ধারনা করেন এবং তাকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ যুবক চলে যাওয়ার পর পুলিশ প্রধান অন্যান্য পুলিশ সদস্যদেরকে এ যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, এ যুবকটি একজন সবজি বিক্রেতার ছেলে।[৬]

---

১. Steven C. Judd, *Religious Scholars and the ummays*. New York: Routledge -2014, p. 162-163
২. Aghani, vol. 2, pp. 247-49
৩. Ibid, p. 248
৪. Ibid
৫. Aghani, vol. 2, p. 257
৬. Ibn Qutayaba, *Uyun al-Akhbar*, Ibid, vol. 2, p. 201

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় যে, পুলিশ প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শাস্তি না দিয়ে তাদের দোষকে এড়িয়ে যেতেন। কেননা তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় তাদেরকে সমীহ করতেন। ঐতিহাসিক বালাযুরির মতে, খলিফা প্রথম ইয়াযিদের রাজত্বকালে মদিনার গভর্নর আমর বিন সাঈদের পুলিশ প্রধান ছিলেন মুসাব বিন আবদুর রহমান। পুলিশ প্রধান মদ্য পানের অভিযোগে আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ানকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সাহস দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আব্দুল আজিজ মিসরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[১]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশ প্রধান উমাইয়া পরিবারের সদস্যদেরকেও হদ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন। পুলিশ প্রধানের কর্তব্যের মধ্যে আরেকটি ছিল ব্যভিচারের অভিযোগে শাস্তি প্রদান করা। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে হুমায়দা নামে এক বিবাহিত মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এ ঘটনায় হুমায়দা পলায়ন করলে হুমায়দার পরিবার এক বৎসর পর্যন্ত খোঁজাখুজির পর তার প্রেমিকার আবাসস্থলে তাকে খুঁজে পায়। অতঃপর ঐ রমণীকে পুলিশ প্রধান আবদুর রহমান বিন উবায়িদের নিকট হাজির করা হয়।[২] এ সময় এই রমণী অন্তঃসত্ত্বা হলেও পুলিশ প্রধান শরিয়তের হদ্ নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দেন।[৩]

এছাড়া উমাইয়া যুগে অন্যান্য যৌন অপরাধের শাস্তিও পুলিশ তার নিজস্ব বিবেচনায় প্রদান করতো। ঐতিহাসিক আবুল ফারাযের মতে, খলিফা সুলায়মানের রাজত্বকালে তিনি উপ-পুলিশ প্রধানকে 'মুখান্নাস' বা 'সমকামীদের' বিশেষ করে গায়ক সমকামীদের খোঁজা বা নপুংস করার নির্দেশ দেন।[৪] এ সময় একজন সমকামী কবিকেও পুলিশ কর্তৃক খোঁজ করা হয়েছিল।[৫]

ঐতিহাসিক আবুল ফারায সমকামিতার বিষয়ে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেন। একজন সমকামী মদিনায় মসজিদে গিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল এবং তার সাথে যৌনসম্পর্ক করার চেষ্টা করলো। দুভার্গ্যবশত যে ব্যক্তির সাথে তিনি এরূপ আচরণ করেন তিনি ছিলেন মদিনার পুলিশ প্রধান। সম্ভবত এ ব্যক্তিকেই মদিনার বাইরের অধিবাসী ছিল বলে পুলিশ প্রধানকে চিনতে পারেনি। এ ঘটনায় পুলিশ প্রধান উক্ত সমকামীকে একশত বেত্রাঘাত ও বন্দি করার জন্য নির্দেশ দেন।[৬] এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমকামীদের শাস্তি ছিল বন্দিকরণ ও বেত্রাঘাত। এছাড়া তাদেরকে রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হত যাতে অন্য লোকরা এ ঘটনা থেকে সতর্ক হতে পারে। আবুল ফারাজ আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করেন যে, মদিনার জনৈক কবি আবু আওয়াজ সমকামী ছিলেন। মদিনার গভর্নর ইবনে হাজম তাকে একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। অতঃপর কবির মাথায় তেল ঢেলে তাকে মদিনার রাস্তায় ঘোরানো হয়। যাতে জনতা অবলোকন করতে পারেন।[৭]

এছাড়া কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে গানবাজনা করলে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারের ক্ষমতা ছিল। মুবারদদের মতে, একদিন এক ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর মসজিদে নববীতে গান করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেন।[৮]

---

১. Ansab, vol. 4B, p. 144
২. Ibn Qutayaba, *Uyun al-Akhbar*, Ibid, vol. 2, p. 93
৩. Abu Ubayda, *Naqaid Jarirwal Farazdaq*, Leiden : 1905, vol. 2, p. 831
৪. Aghani, vol. 4, pp. 273-276
৫. Ibid, p. 276
৬. Ibid, Aghani, vol. 4, pp. 280-281
৭. Ibid, p. 236
৮. Mubarad, vol. 2, p. 236

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফারায়ের বর্ণনা মতে, ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরি তার পুলিশ প্রধানকে দুর্বলতা ও প্রকাশ্যে গান করার অনুমতি প্রদান করার জন্য দোষারোপ করেন। খালিদ তার পুলিশ প্রধানকে এ বলে সতর্ক করেন যে, তিনি যদি গায়কদের বন্দি এবং নিয়ন্ত্রণ না করতে পারেন তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে। সুতরাং পুলিশ প্রধান গায়কদের গ্রেফতার করেন।[১]

সম্ভবত গভর্নর যে গানগুলো নিষিদ্ধ করেছিলেন তা ছিল অনৈতিক ধরনের। পুলিশ প্রধান আরও এক ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করতেন যেমন-চুলের স্টাইলের মাধ্যমে মহিলাদের কু-পথে প্রলুব্ধকারী ব্যক্তিদেরও শাস্তি প্রদান করা হত। আবু তামিমের বর্ণনামতে, ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমর পুলিশ প্রধান আবু তানহাম আল আসাদিকে কোকড়া চুলের মাধ্যমে মহিলাদেরকে কু-পথে প্রলুব্ধ করার কারণে মাথা মুন্ডনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২]

ইবনে আবদাল রাবিহ্হি এর বর্ণনা মতে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে ওয়াসিত প্রদেশের গভর্নরের পরামর্শে পুলিশ প্রধান কু-পথে প্রলুব্ধকারীদের গ্রেফতার করেছিলেন।[৩]

অনেক উমাইয়া খলিফার আমলে দাবা খেলা নিষিদ্ধ ছিল। খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের সময় পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি দাবা খেলবে তাকে যেন শাস্তি দেয়া হয়। এ আদেশের পর পুলিশ প্রধান যাকে প্রকাশ্যে দাবা খেলতে দেখতেন, তাকে গ্রেফতার করতেন। কেননা, মূর্তির দ্বারা দাবা খেলা পাপ ছিল। এছাড়া দাবা খেলার ফলে জনগণ কোনো কাজ করতে চাইত না এবং মসজিদে নামাজের সময় সমবেত হত না।[৪]

উমাইয়া শাসনকালে পুলিশ এত তৎপর ছিল যে, কোথাও নাগরিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারত না। মুয়াবিয়ার শাসনকালে ইরাকের শাসক যিয়াদ পুলিশ বিভাগটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ৪০,০০০ লোক পুলিশ বিভাগে ভর্তি করানো হয়, যার কর্তৃত্ব দেয়া হয় আব্দুল্লাহ ইবন হিসনকে। এরূপ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য যাই হোক এ বিভাগের দ্বারা শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত দূর উন্নতি হয় যে, রাস্তায় যদি কারও কোনো জিনিস পড়ে যেত-তবুও কোনো ব্যক্তি হাত দিয়ে তা স্পর্শ করতো না। মহিলারা ঘরের দরজা খুলে রাতের বেলায় ঘুমাতো।[৫] যিয়াদ নিজেই বলতেন যে, "যদি আমার এবং সুদূর খুরাসান প্রদেশের মাঝে একটি রশিও হারিয়ে যায় তবে সাথে সাথেই রশি গ্রহণকারী ব্যক্তিটির নাম আমি জানতে পারবো।" শান্তিপ্রিয় ও ভদ্রলোকদের হিফাজত করা এবং অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর লোকদের দমনে সরকারের সাথে সবরকমের সহযোগিতা করাই হবে ইসলামের দৃষ্টিতে পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্য কথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই ছিল পুলিশ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশের প্রতিটি ফাঁড়ি তথা প্রতিটি থানায় একটা রেজিষ্টার থকত যাতে পার্শ্ববর্তী সমস্ত চোর, গুণ্ডা ও বদমাশ লোকদের নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকত। উমাইয়া খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এ বিভাগে আরও একটি বিষয় সংযোজন করেন এবং তা হলো সন্দেহভাজন লোকদের চাল-চলন ও গতিবিধি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। খলিফা মুয়াবিয়া

---

১. Aghani, vol. 19, p. 63

২. Habib b. Aws Abu Tammam, ed. G.G. Freytag, *al-Hamasa*, Bonn : 1828, Op.cit, p. 811

৩. Ibn Abd Rabbihi, Op.cit, vol. 7, p. 177

৪. Muhammad Kurd Ali, *Rasail al-Bulagha*, Cairo : 1913, pp. 165-66; Butros al-Bustani, *Udaba al-Arab*, Beirut : 1979, p. 412

৫. Under Ziyad, al-Rufah alone had a military police force of 40,000 men. Perfect order prevailed throughout the province. No one dared even to pick up a thing left on the road till the owner returned and recovered it. Lonely women could sleep in their houses without lock. see. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration,* Ibid, p. 121

Dhaka University Institutional Repository

দামিসকে হযরত আবু দারদা (রা.)কে লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তথাকার গুণ্ডা-বদমায়েশদের তালিকা লিখিতভাবে প্রস্তুত করেন ও তাদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[১] যিয়াদ যাদ ইবন কায়সকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য নিযুক্ত করেন।[২]

উমাইয়া শাসনে আমলে শহরগুলো আল হারাস বা কোয়ার্টারে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি কোয়ার্টারে গৃহ, মসজিদ, বাজার, গণশৌচাগার ও কবরস্থান ছিল। উক্ত বাজার এবং নগরের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশ প্রধানের উপর অর্পিত ছিল।[৩]

উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশ প্রধানের পদটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। ইবনে খালেদুন বলেন, উমাইয়া আবক্ষাসিয় যুগে আন্দালুসিয়া, মিসর ও মরোক্কতে পুলিশ প্রধান অপরাধের অনুসন্ধান ও দন্ড কার্যকর করতেন। এটি রাষ্ট্রের অন্যান্য শরিয়া পদের ন্যায় একটি ধর্মীয় পদ। এ পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা ছাড়াই অপরাধ প্রমাণের পূর্বে অপরাধীকে তৎক্ষণাত শাস্তি দিতে পারতেন। এছাড়া তিনি, কোনো আঘাতের জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তি, কিসাস ও তাযির অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারতেন।[৪]

সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক

উমাইয়ার রাজত্বকালে পুলিশ বা Shurta দুর্বৃত্ত ও বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নগরীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এছাড়াও তারা নগরীর বাইরেও সেনাবাহিনীকে সহায়তার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমনে ক্ষমতাবান ছিল। তাবারির বর্ণনা মতে, কারবালার যুদ্ধে হুসাইন বিন আলি (রা.) ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে উমাইয়া সেনাবাহিনীকে পুলিশ সহযোগিতা করেছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পুলিশ ও পুলিশ প্রধান এ যুদ্ধে উমাইয়াদের সঙ্গে ছিল এবং এক বিশেষ ধরনের পোষাক (A kind of Armour) পরিধান করেছিল।[৫]

তাবারি আরও উল্লেখ করেন যে, খারিজিদের দমনেও পুলিশ বাহিনী উমাইয়া সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করতো। ৭৩৭ খ্রি. খারিজিদের বিদ্রোহ দেখা দিলে ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরি সিরিয়ার সেনাবাহিনী ও দুইশত পুলিশ সদস্যকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ যুদ্ধটি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল।[৬]

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, গভর্নর খালিদ আল কাসরি যখন জানতে পারলেন যে, কিছু খারিজি বিদ্রোহ করছে এবং কুফা নগরীর বাইরে গ্রামবাসীদের উপরে আক্রমন চালাচ্ছে তখন তিনি একজনকে

---

১. মাওলানা মুশাহিদ আলি, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২. Under Muawiyah all the suspects in Damascus were registered and watched. Ziyad appointed Jad bin Qays to watch the activities of the suspects. See. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 122

৩. Cities were divided into al-harras (quarters) each being independent having houses, mosques, markets, baths and grave yards. Markets and municipal affairs were put under the charge of the town police officer Sahin al-ahdath. see. S.M. IMAMUDDIN, *ARAB MUSLIM ADMINISTRATION,* Ibid, p. 65

৪. Thus, the post of the chief of police under the Umayyads and the Abbasids has witnessed remarkable development. Ibn Khaldun said: "The examination of crimes and the implementation of penalties under the Abbasids and the Umayyads in Andalusia as well as the Ubaidis in Egypt and Morocco were carried out by the chief of police. It was a relDgious position among other Shari`ah-related positions in such States, where the person in charge of this position can go beyond the judicial rulings, expand the scope of the charge in the judgement, impose deterrent punishments before the crime is proven, implement the established penalties, give rulings of Arsh (indemnity paid for inflicting certain wounds) and Qisas (retaliation), and implement rulings of Ta`zir (discretionary punishment) and disciplinary punishments on whoever does not desist from committing crime. see. http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2012

৫. Tabari, vol. 5, pp. 434-35

৬. Tabari, Ibid, vol. 7, pp. 130-31

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশকে অধিনায়ক করে বিদ্রোহের জন্য প্রেরণ করেন। পুলিশ স্বল্পতম সময়ে যুদ্ধের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের দমনে সক্ষম হয়েছিল।[১]

এদ্বারা বুঝা যায় যে, গভর্নর অনেক সময় পুলিশ প্রধানের পরিবর্তে অন্য কাউকে পুলিশের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করতেন। কেননা পুলিশ প্রধান গভর্নরের খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। ফলে গভর্নর বাইরে না গেলে তারাও বাইরে যেতেন না।

যাহিজের মতে, গভর্নর হাজ্জাজের সময় রাবক্ষাহ আল জিনজি এর নেতৃত্বে কিছু যানয বিদ্রোহ করে এবং ইউফ্রেতিস এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ ঘটনায় হাজ্জাজ তাদের মোকাবিলার জন্য পুলিশ প্রধানের পরিবর্তে তার পুত্রকে বিদ্রোহ মোকাবিলায় প্রেরণ করেন।[২]

পুলিশ প্রধান সাধারণত তার অফিসেই কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। অনেক সময় সেনা ছাউনিতে তার অফিস থাকত এবং সেনা ছাউনিতে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তিনি তার জন্য দায়ী থাকতেন।

খলিফা মারওয়ানের রাজত্বকালে তিনি যুবরাজকে উমাইয়া সেনাবাহিনী অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান করে বিপদজনক খারিজিদের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। এসময় খলিফা তার সচিব আবদুল হামিদের মাধ্যমে যে নির্দেশনাটি প্রেরণ করেন তা নিম্নরূপ–

> "Advise your commanders not to punish anyone of their troops except for punishments for indiscipline or bad behaviour. But any 'hudd' which reaches life-blood or cutting (of hands) or excess in whippin...., should not be inflicted by one except yourself or your sahib al-shurta on your orders."[৩]

এদ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সামরিক ছাউনি বা ক্যাম্পেও পুলিশ প্রধানের গুরুত্ব ছিল। এ পত্র দ্বারা খলিফা যুবরাজকে জোর দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি (যুবরাজ) যে কোনো সৈন্যদের যে কোনো ধরনের বড় অপরাধের শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু অধিনায়ক শুধুমাত্র ছোট অপরাধের শাস্তি দিতে পারে। যদি গভর্নর নিজে কাউকে শাস্তি দিতে নাও পারতেন তবে পুলিশ প্রধান এরূপ শাস্তি দিতে পারতেন। এদ্বারা খলিফা তার সন্তানকে আরও উপদেশ দিতে চেয়েছেন যে, তিনি তার শত্রুদের সম্পর্কে সতর্ক হবেন এবং পুলিশকে তার সেনা ছাউনিতে দায়িত্বপালনে নিয়োজিত করবেন।[৪]

এ পত্রের মাধ্যমে খলিফা তার পুত্রকে এমন পুলিশ প্রধান নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যিনি হবেন তার অধিনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, সৎ উপদেশ প্রদানকারী, বিবেকবান এবং কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আদেশ পালনকারী। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পুলিশ প্রধান অবশ্যই সৈন্যদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হবেন এবং সেই সাথে অবশ্যই কৌশল প্রনয়ণ ও দায়িত্ব পালনে দক্ষ ও পরিপূর্ণ হবেন।[৫]

পুলিশ প্রধানের নির্দেশে গভর্নর যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারতেন। যারা তাদের কর্মস্থল থেকে পলায়ন করতো অথবা কর্মে ফাঁকি দিত। ইবনে আসামের এর মতে, হাজ্জাজ দেখলেন যে,

---

১. Tabari, Ibid, ser-11-3, p. 1628
২. Jahiz, *Thalath*, Ibid, p. 65
৩. Abu Abbas Ahmad b. Ali al-Qalqashandi, *Subh al-Asha fi Sina at al-Insha*, Cairo : 1963, vol. 10, p. 222; Kurd Ali, Op.cit, p. 139-161
৪. Kurd Ali, Op.cit, p. 161; Qalqashandi, Op.cit, vol. 10, p. 228
৫. Kurd Ali, Ibid, p. 215-216, Kurd Ali, op.cit, p. 153

Dhaka University Institutional Repository

জনগণ খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক ক্যাম্পে যাচ্ছে না। তখন তিনি পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন যে, জনগণকে বাধ্যতামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। এজন্য তিনি পুলিশ প্রধানকে তার সঙ্গে তরবারি নিতে বলেন এবং কেউ যুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পুলিশ প্রধানকে যুদ্ধে প্রথম সারিতে (Front Line) অবস্থান করে যুদ্ধ করতে এবং প্রথম আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়। বর্ণিত আছে যে, শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদ তার পুলিশ প্রধানকে প্রথম আক্রমন করতে বলেন কিন্তু তিনি খলিফার নির্দেশ সত্ত্বেও দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান। এ যুদ্ধের নাম ছিল যাব যা ৭৪৯ খ্রি. উমাইয়া ও আবক্ষাসীয়দের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল।[১] পুলিশ শুধু ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শত্রুদেরই মোকাবিলা করতেন না বরং ইসলামি সাম্রাজ্যের বহিঃশত্রুরও মোকাবিলা করতো। উদাহরণস্বরূপ খোরাসান প্রদেশের গভর্নর আসাদ বিন আব্দুল্লাহ ৭৩৭ খ্রি. তুর্কিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন তখন তিনি সুসংঘটিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশকেও যুদ্ধ অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেন।[২] যুদ্ধ শুরু হলে পুলিশ প্রধান গভর্নরের পাশে অবস্থান করতেন।

তাবারির বর্ণনামতে, ৭৪৯ খ্রি. সেনাপতি কাতাবাহ্ বিন হাবিব যখন আবক্ষাসীয় সৈন্যদের পরিচালনা করছিলেন তখন তিনি প্রথমেই পতাকাধারী ও পুলিশ প্রধানকে উমাইয়াদের উপর আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। এ যুদ্ধে আবক্ষাসীয় বাহিনী যখন ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করছিল তখন কিছু উমাইয়া সৈন্য পশ্চাতপদ হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রধান তাদেরকে বাধা দেন এবং যুদ্ধের পূর্বের স্থলে ফিরে যেতে বাধ্য করেন।[৩]

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ৪৪৭ খ্রি. আবক্ষাসিয় সেনাপতি আবু মুসলিম আল খুরসানি যখন উমাইয়া শিবির আক্রমন করেন তখন তিনি প্রথমেই উমাইয়া পুলিশ প্রধানকে গ্রেফতার করেন। কেননা সেনাপতি মুসলিম কর্তৃক সেনা ছাউনি আক্রমণের পূর্বেই গভর্নর পলায়ন করেছিলেন।[৪]

হাইওয়ে পুলিশ

নগরীর বাইরে হাইওয়ে বা মহাসড়কে দস্যুদের মোকাবিলা করার ক্ষমতাও পুলিশের ছিল। শুধু শহরে নয় শহরের বাইরে দুষ্কৃতিকারী, চোর ও অপরাধীদের গ্রেফতার ও হত্যা করার ক্ষমতা পুলিশের ছিল। তারা গভর্নরের নির্দেশে শহরের বাইরের অপরাধ দমন করতো। উদাহরণস্বরূপ-খলিফা মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়ে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ ইরাকের গভর্নর ছিলেন। এ সময় বসরায় কাকা বিন আউফ নামে এক ব্যক্তি বনু সাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করে মরুদ্যানে পলায়ন করে। তখন গভর্নর উক্ত হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ প্রধান ও তার বাহিনীকে শহরের বাইরে প্রেরণ করেন। পুলিশ প্রধান উক্ত হত্যাকারীর গোপন আস্তানার সন্ধান পাওয়ার পর তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। ফলশ্রুতিতে পুলিশ প্রধান তাকে বল্লম দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেন এবং হত্যা করেন।[৫]

অন্য একটি ঘটনা এরূপ যে, খলিফা মারওয়ান বিন হাকামের সময় বনু আযদ গোত্রের কিছু চোর হত্যাকারী মিলে একটি হাইওয়ে বা মহাসড়ক ডাকাত দল গঠন করে। দলটি অন্য গোত্রের লোকদের

১. Yaqubi, vol. 3, p. 87; Ibn Tiqtaqa, *Al-Fakhri fil-Adab al Sultaniyya wal Duwal al-Islamiyya*, Paris : 1895, p. 198
২. Tabari, ser. 11-3, p. 1609
৩. Tabari, Ibid, ser. 111-1, p. 15-17
৪. Tabari, Ibid, vol. 7, p. 384
৫. Muhammad b. Habib, *Diwan Farazdaq*, Paris : 1870, p. 25

Dhaka University Institutional Repository

উপর ডাকাতির উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতো। মক্কার গভর্নর এ বিষয়টি জানতে পেরে আযদ গোত্রের প্রধানকে বন্দি করেন। কিছু লোক তাকে অবহিত করেন দুষ্কৃতিকারী ও অপরাধী দলের উপর এই নেতার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। তখন গভর্নর তাকে ছেড়ে দেন এবং অপরাধীদের গ্রেফতারে পুলিশকে প্রেরণ করেন। পুলিশ তাদের অনুসন্ধান করে এবং তাদের সর্দার ইয়ালা বিন মুসলিম আল আযদি'সহ গ্রেফতার করেন।[১]

অন্য একটি ঘটনা এইরূপ যে, হুদবা নামে এক ব্যক্তি অন্য এক গোত্রের একজনকে হত্যা করে। ফলে নিহতের আত্মীয়-স্বজন গভর্নরের নিকট গমন করে এ হত্যার জন্য ন্যায় বিচার দাবী করেন। গভর্নর তখন হত্যাকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাতে ব্যর্থ হয়ে হত্যাকারীর চাচাকে বন্দি করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না হত্যাকারী ব্যক্তিটি আত্মসমর্পণ করবে ততক্ষন পর্যন্ত তার চাচাকে ছাড়া হবে না মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়। অবশেষে হত্যাকারী আত্মসমর্পণ করলে তার চাচাকে ছেড়ে দেয়া হয়। মৃত ব্যক্তির সন্তান বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দি করা হয়। উক্ত মৃত ব্যক্তির সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কী তোমার পিতার হত্যার বদলা চাও নাকি হত্যার রক্তপণ (দিয়া) চাও? উত্তরে উক্ত সন্তান জানায় যে, হত্যার বদলে হত্যা চায়। এ সময় গভর্নর পুলিশ প্রধানকে জনসম্মুখে হত্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।[২]

পুলিশ মহাসড়কে দস্যুতা দমনে খুবই সক্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ কবি দুহুল রুমা ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরি ও মালিক বিন মুদির পুলিশ প্রধানের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। কেননা, তিনি নগরী এবং নগরীর বাইরের চোর, হাইওয়ে দস্যু ও দুর্বৃত্তদের হত্যা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩]

দুহুল রুমা অন্য একটি কবিতায় পুলিশ প্রধানের প্রশংসা করেন। কেননা, পুলিশ প্রধান অপরাধীর প্রতি বিশেষ করে শহরের বাইরের অপরাধীদের প্রতি খুবই কঠোর ছিলেন।[৪]

পুলিশ প্রধান কর্তৃক হাইওয়ের দস্যুতায় শাস্তি ছিল জনসম্মুখে ফাঁসি প্রদান অথবা ক্রুশবিদ্ধকরণ। এ ধরনের শাস্তি শরিয়তের হদ্ অনুযায়ী করা হত।

ইবনে হাযম এর মতে, কেউ মহাসড়কে মুসলমানদের উপর দস্যুতা করলে তাকে শাস্তিস্বরূপ ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হত।[৫] এছাড়া পুলিশ গভর্নরের নিকট হতে খলিফার নিকট অর্থ প্রেরণকালীন সময়ে অর্থের পাহারা (Money Escort) দিত।

ইবনে বালাযুরির মতে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের যখন খলিফা ছিলেন তখন বসরা হতে গাড়ী যোগে অর্থ প্রেরণকালীন সময়ে ত্রিশজন পুলিশ কর্তৃক অর্থের পাহারা বা (Money Escort) দেয়া হয়। কিন্তু পথিমধ্যে ষাটজন খারিজি কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং অর্থ খোয়া যায়।[৬]

রাজনৈতিক অপরাধী, জেলখানার বন্দি ও মৃত্যুদন্ড পরোয়ানা কার্যকরণে পুলিশ

---

১. Aghani, vol. 19, p. 111
২. Abu Tammam, Op.cit, p. 235-36
৩. Yusuf Khalifa, *Dhul Rumma Shair al-hubb wal-sahra*, Cairo : 1970, pp. 203-204
৪. Yusuf Khalifa, *Dhul Rumma Shair al-hubb wal-sahra*, Ibid. p. 202
৫. Ibn Hazm, Op.cit, vol. 11, pp. 314-315
৬. Ansab, vol. 11, p. 127

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের শত্রু বিশেষ করে রাজনৈতিক শত্রু শিয়া ও খারিজিরা উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে খুবই সক্রিয় ছিল। বিদ্রোহীদের বন্দি করে মৃত্যুদন্ড প্রদানের দায়িত্ব পুলিশের উপর ছিল। তারা প্রদেশের গভর্নরের নির্দেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করতো। তাবারির বর্ণনা মতে, ৭২০ খ্রি. যুদ্ধ শেষে সিরায়ার সৈন্যরা ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের তিনশত সৈন্যকে গ্রেফতার করেন। এ সময় ইরাকের গভর্নর তার পুলিশ প্রধানকে বিশ অথবা ত্রিশজন সৈন্যকে একই সময়ে প্রাণদন্ড প্রদানের মাধ্যমে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[১] যেকোন সন্দিগ্ধ বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীকে অপরাধের দায়ে প্রাণদন্ড প্রদানের এখতিয়ার ছিল পুলিশ ও পুলিশ প্রধানের । ইবনে আবিল হাদিদ, উল্লেখ করেন যে, বসরার গভর্নর যিয়াদ এর শাসনামলে পুলিশ প্রধান জনৈক ব্যক্তিকে খারিজি বলে ধারণা করে, তাকে প্রাণদণ্ড প্রদান করেন।[২]

মুবাররাদের বর্ণনা মতে, বসরার গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ খারিজি নেতাকে প্রাণদন্ড প্রদানের নির্দেশ দেন পুলিশকে যার ফলে একজন পুলিশ উক্ত প্রাণদণ্ড কার্যকর করেন।[৩]

গভর্নর তার কোর্টে কোনো ব্যক্তিকে প্রান্ডদন্ড প্রদানের ইচ্ছাপোষণ করলে পুলিশকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেন। ইরাকের গভর্নর মুসাব বিন যুবায়ের তার পুলিশকে মুখতারের স্ত্রীর প্রাণদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন।[৪]

ইবনে আবদ রাবিক্ষহির মতে, ইরাকের গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহি তাঁর পুলিশ প্রধানকে ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করার নির্দেশ দেন যারা তাঁর সমালোচনা করতো।[৫] ৭৪৭ খ্রি. মারওয়ান ও সুলায়মানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পর দাস ব্যতীত সকল বন্দিকে প্রাণদন্ড প্রদান করার জন্য মারওয়ান বিন মুহাম্মদ তাঁর পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ মোতাবেক প্রায় ত্রিশ হাজার বন্দিকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয়।[৬]

ইবনে বালাযুরির মতে, ইরাকের গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ আবু আযযাহ্ নামক জনৈক পুলিশকে এক ব্যক্তির প্রাণদন্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই পুলিশ সদস্য তার নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানালে গভর্নর তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করেন।[৭]

পুলিশ সদস্যটি ধারণা করেছিল যে, এ ব্যক্তিকে প্রাণদন্ড প্রদানের নির্দেশটি সঠিক নয়। বালাযুরির মতে, নতুন খলিফা ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার প্রতি যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা বা সম্মান জানাতে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করতো তাকেই নির্যাতন করার জন্য মদিনার গভর্নর পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৮]

পুলিশ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে অপরাধীদের নির্যাতন করতো। উল্লেখ্য যে, সাঈদ বিন মুসায়্যিব গ্রেফতার হলে তাকে শাস্তিস্বরূপ বিশেষ ধরনের খারাপ অন্তর্বাস পরিধান করতে বাধ্য করা হয় এবং ত্রিশটি বেত্রাঘাত করা হয়।

অতঃপর পুলিশ সাইদকে জনসম্মুখে দেখানো জন্য সূর্যের আলোতে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখে। এরূপ শাস্তি প্রদানের মধ্যে সাঈদের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি নতুন খলিফার প্রতি

---

১. Tabari, ser. 11-3, p. 1407
২. Nahj, vol. 4, p. 77
৩. Mubarrad, vol. 3, p. 273-74
৪. Tabari, vol. 6, p. 112
৫. Ibn Abd Rabbihi, Op.cit, vol. 1, p. 44
৬. Tabari, vol. 7, p. 325
৭. Ansab, vol. 4B, p. 89
৮. Ansab, vol. 4B, p. 24

Dhaka University Institutional Repository

শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে রাজি আছেন কিনা? কিন্তু এবারও সাঈদ অস্বীকার করায় পুলিশ তাকে পুনরায় নির্যাতন শুরু করে।[১]

ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরি জনৈক উপ-জাতীয় নেতার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন তাকে নির্যাতন করার। পুলিশ প্রধান এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বেত্রাঘাত করেন।[২]

এছাড়া খলিফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ (৭৪২-৭৪৩ খ্রি.) ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরির প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তার পুলিশ প্রধানকে নির্যাতন করার নির্দেশ দেন। এ প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রধান খালিদকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শাস্তি প্রদান করেন।[৩]

শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের জন্য উমাইয়াগণ পুলিশকে ব্যবহার করত না, অন্যান্য কারণেও পুলিশকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন কুফার গভর্নর মুখতার আল থাকাফি এর পুলিশ প্রধান জনৈক ব্যক্তিকে হুসাইন বিন আলি (রা.) এবং তার পরিবারকে হত্যার অভিযোগে শাস্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রধান ঐ ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপ করে নির্যাতন করতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অতঃপর তাকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়।[৪]

আবুল ফারাযের বর্ণনা মতে, ইবনে মুফাররিগ জনৈক কবি বসরার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করেন। ফলে গভর্নর পুলিশ প্রধানকে কবির উপর নির্যাতনের নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রধান কবি মুফাররিগের নির্যাতনের সময় এমন পানীয় পান করান যার ফলে কবি ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় তাকে রাস্তায় নিয়ে আসা হলে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না।[৫] অতঃপর তারা কবির সাথে একটি শুকরকে বেঁধে দেয় এবং ছোট ছেলেরা তার প্রতি ঠাট্টাস্বরূপ হাসতে থাকে। অতঃপর পুলিশ তাকে বন্দি করে বেত্রাঘাত করে।[৬]

হযরত উমর (রা.) প্রথম কয়েদখানা (Sijn or habs) দাপ্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কায় একটি বাড়ি ভাড়া করে এটিকে কয়েদখানায় রূপান্তর করেন।[৭]

উমাইয়া শাসনামলে জেলখানায় বন্দি করার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান খুবই সাধারণ প্রথায় পরিগণিত হয়। বিশেষ করে গভর্নরগণ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে কয়েদখানাকে ব্যবহার করতে থাকেন। তৎপ্রেক্ষিত পুলিশ ও পুলিশ প্রধান জনগণকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় হস্তান্তর করতেন। পুলিশ উমাইয়াদের শত্রু ও অপরাধীদেরকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা পেত। পুলিশ শুধু রাজনৈতিক বন্দিদেরকে বন্দি করতো না বরং প্রকৃত অপরাধীদের বন্দি করতো।

> "The sahib al-shurta with his shurta arrested not only political prisoners but also criminals. Many incidents show that criminals, murderers, thieves, and those who had committed an offence against Islamic law or the state were imprisoned. According to Ibn Waki, the governor of Basra, who was at the ame time sahib al-shurta, Bilal B. Abi Burda b. Musa al-Ashari, in the time of the caliph Hisham (105-125/723-42) imprisoned a muderer."[৮]

---

১. Abu Nuaymal Isfahani, *Hilyat al-Awliya wa Tabaqat al-Asfiya*, Cairo : 1933, vol. 2, pp. 170-171
২. Tabari, ser. 11-3, pp. 1495-1496
৩. Abu Hanifa, Op.cit, pp. 346-347
৪. Ansab, vol. 5, pp. 238-239
৫. Aghani, vol. 17, pp. 56-57; *Diwan Ibn Mufarrigh al-Himyari*, Beirut : 1975, pp. 56-149
৬. Aghani, vol. 17, p. 58, *Diwan Ibn Mufarrigh al-Himyari*, Beirut, 1975, pp. 187-188
৭. F. Rosenthal, *The Muslim Concept of Freedom*, Leiden : 1960, p. 36
৮. Waki, vol. 2. p. 40

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, হাজ্জাজের পুলিশ প্রধান ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতার দায়ে জনগণকে বন্দি করতেন।[১] এছাড়া পুলিশ প্রধান খলিফার নির্দেশে দাবা খেলোয়াড়দের বন্দি করতেন।[২]

উমাইয়াদের সময় কয়েদখানার ভবনগুলো সুরক্ষিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ মুখতার আল থাকাফি'র পুলিশ প্রধান কর্তৃক বাধা সত্ত্বেও মুখতারের প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনে হুর তার স্ত্রীসহ জেলাখানা থেকে পলায়ন করেন।[৩]

পুলিশ প্রধান বন্দিদেরকে কয়েদখানায় আনয়নের জন্য দায়িত্ববান হলেও কয়েদখানা ভিতরে বন্দিদের দায়িত্ব ছিল জেলার বা জেলপ্রধানের উপর। তাবারির বর্ণনা মতে, উমাইয়া কর্তৃক ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব ও তার সমর্থক পরাজিত হলে তাদের কয়েদখানায় বন্দি করা হয়। অতঃপর গভর্নর পুলিশ প্রধানকে তাদের প্রাণদন্ড প্রদানের নির্দেশ দেন।[৪]

১. Uyun al-Akhbar, vol. 1, p. 16
২. Kurd Ali, Op.cit, p. 166
৩. Ansab, vol. 5, p. 294
৪. Tabari, vol. 20, p. 162

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাইয়া যুগে পুলিশি প্রতিষ্ঠান (দফতর) ও এর কাঠামো

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা বিধানের জন্য উমাইয়া শাসনামলে পুলিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কারণেই প্রতিটি শহরে পুলিশের বসবাসের জন্য কোয়ার্টার এর ব্যবস্থা ছিল। যেখানে অবস্থান করে তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতো। উমাইয়া শাসকগণ পুলিশের জন্য শহরের অভ্যন্তরে অবকাঠামো নির্মাণ করেন। আর এ অবকাঠামোগুলো গভর্নর বা খলিফার রাজপ্রাসাদের নিকট বা বৃহৎ মসজিদের সন্নিকটে নির্মিত হয়। পুলিশ প্রধান গভর্নরের সভাস্থল বা মজলিসের সন্নিকটে অবস্থান করতেন এবং খলিফার শত্রু ও বিরোধী পক্ষের যে কোনো ভীতি বা হুমকি (Threat) থেকে গভর্নরকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তাবারির বর্ণনা মতে, ৭৪৪ খ্রি. কুফার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন উমরের সময় দু'জন গোত্রপতি তার সভাস্থলে প্রবেশ করে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ভীতি প্রদর্শন করে। গভর্নর এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত নেতাদ্বয়কে সভাস্থল হতে বের করার নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রধান যিনি গভর্নরের পিছনে অবস্থান করছিলেন তিনি তাদেরকে সভাস্থল থেকে বের করে দেন।[১] উল্লেখ্য, অনেক সময় পুলিশ প্রধান গভর্নরের পিছনে দন্ডায়মান থাকতেন।[২] তাবারির বর্ণনা মতে, পুলিশ প্রধান গভর্নরের মাথায় নিকটে দণ্ডায়মান থাকতেন।[৩]

বালাযুরির বর্ণনা মতে, গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহি'র শাসনামলে এক ব্যক্তি একটি চাকু নিয়ে গভর্নরের সন্নিকটে আসল এবং ঐ সময় পুলিশ প্রধান ভাবলেন যে হয়তো এ ব্যক্তি গভর্নরকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তৎক্ষনাৎ তিনি তাকে হত্যা করেন।[৪]

তাবারি আরও উল্লেখ করেন যে, ইরাকের গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহী কুফার শিয়া নেতা হাযর আল কিন্দিকে তার নিকট হাজির করার জন্য নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে সভাস্থলে অবস্থানরত পুলিশ প্রধান পুলিশ সদস্যদেরকে হাযরের নিকট গমনের জন্য নির্দেশ দেন।[৫] এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশ গভর্নর বা সভাস্থল, বিচারালয় বা আদালত এবং গভর্নরের আশেপাশে অবস্থান করতেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী পুলিশ খলিফা ও গভর্নরকে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা এবং শহর ও বিভিন্ন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতো। ইবনে কুতায়বার মতে, মুয়াবিয়া (রা.) এর শাসনামলে মদিনার গভর্নর সাঈদ বিন আল আস এক রাত্রিতে জনগণের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করেন। ভোজ সমাপ্ত হলেও জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি কার্পেটে বসেছিল। পুলিশ উক্ত ব্যক্তিকে সরিয়ে দিতে চাইলেও গভর্নর তাকে বাধাপ্রদান করেন।[৬]

মিসরের গভর্নর আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান (৬৮৪-৭০৪ খ্রি.) হালুয়ান শহরে একটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। নতুন প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে তিনি যে উদ্যোগটি প্রথমে নিয়েছিলেন তা

১. Tabari, vol. 7, p. 305
২. Tabari, Ibid, vol. 5, p. 368
৩. Tabari, Ibid.
৪. Ansab, vol. 4A, p.193
৫. Tabari, Ibid, p. 257
৬. Shir, vol. 1, p. 284

Dhaka University Institutional Repository

হলো পুলিশের জন্য নতুন প্রাসাদের অভ্যন্তরে অফিস নির্মাণ করা।[১] ইরাকের গভর্নর আবিহি প্রাসাদে দায়িত্বরত পুলিশদের জন্য রাত্রিকালীন খাবার প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[২]

উল্লেখ্য যে, সকল পুলিশ সদস্য রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থান করতো না বরং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য সেখানে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করতো। এছাড়া পুলিশ সদস্যরা রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের পাহারা দিত যাতে তারা বাইরের শত্রু ও বিদ্রোহীদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রাজপ্রাসাদকে রক্ষা করতে পারে।[৩]

আল-জাহিযের বর্ণনা মতে, হাজ্জাজের পুলিশ প্রধান তার এক সদস্যকে বলেন যে, যদি এ কাজটি তিনি করতে পারেন তবে তাকে এক বছরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।[৪]

সকল পুলিশ যেমন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থান করতো না তেমনি সকল পুলিশ আবার সবসময় তাদের কর্মস্থলে দায়িত্বপালন করতো না। কোনো বিদ্রোহ দেখা দিলে সকল পুলিশকে তাদের কর্মস্থলে উপস্থিত হতে হত। বেশির ভাগ সময়ে পুলিশ নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদের নিকট অথবা বৃহৎ মসজিদের নিকট সমবেত হত।[৫] প্রয়োজন অনুসারে একজন আহক্ষানকারী পুলিশকে এ বলে সতর্ক করতো যে যদি তারা দায়িত্বপালনের জন্য এগিয়ে না আসে তবে তাদের শাস্তি পেতে হবে।[৬] পুলিশ তার কর্মস্থলে অবস্থান করেই মামলার তদন্ত করতো এবং অপরাধীকে অপরাধ সংঘটনের দায়ে অপরাধস্থলেই শাস্তি দিতে পারতো।[৭]

পুলিশ প্রধান তার অফিস বা কর্মস্থলে বসেই অভিযোগের শুনানি করতেন। তার অফিসে এসে যে কেউ অভিযোগ করতে পারতো এবং পুলিশের সাহায্যে বা সহযোগিতা চাইতে পারতো। যুবায়ের বিন বাক্কারের বর্ণনা মতে, হজ্জের সময় এক ব্যক্তি মদিনার পুলিশ প্রধানের নিকট অভিযোগ করলো যে, জনৈক ব্যক্তি তার নাক ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং পুলিশ প্রধান একজন পুলিশকে মামলাটির তদন্ত করার জন্য প্রেরণ করেন।[৮]

এদ্বারা বুঝা যায় যে, পুলিশের কার্যালয় বা পুলিশ স্টেশন সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। যে কেউ পুলিশের সহযোগিতা চাইতে পারতো এবং পুলিশ সবসময় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতো। অপরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো গৃহ আক্রান্ত হলে বা চোর কর্তৃক কোনো গৃহ ভাঙ্গলে এ সময় যদি কেউ পুলিশের সাহায্যের জন্য লোক প্রেরণ করতো তবে পুলিশ সেই গৃহে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হয়ে অপরাধীদের গ্রেফতারে সাহায্য করতো।[৯]

পুলিশ সকল অপরাধের শাস্তি তাদের কার্যালয়ে বসে প্রদান করতো না। বরং কিছু অপরাধীর শাস্তি কার্যালয়ের বাইরে গিয়ে প্রদান করতো। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি কবরস্থানে গিয়ে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে দেয়া হত।[১০]

---

১. Wulat, p. 71
২. Ansab, vol. 4A, p. 210
৩. Ansab, Ibid
৪. Bukhala, p. 162
৫. Tabari, vol-5, p. 372; Maqatil, p, 136
৬. Tabari, Ibid
৭. Tabari, Ibid, p. 92
৮. Zubayr b. Bakkar, Op.cit, p. 517
৯. Aghani, vol. 6, p. 145
১০. Abu Ubayda, Op.cit, vol. 2, p. 831

Dhaka University Institutional Repository

নগরীর বৃহৎ মসজিদগুলোর পাশে পুলিশের কার্যালয় বা স্টেশন ছিল। বিশেষ করে সে সকল মসজিদগুলোতে খলিফা ও গভর্নর উপস্থিত হতেন। মসজিদগুলো এজন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, শুক্রবার নামাজে খলিফা ও গভর্নর এই মসজিদগুলোতে উপস্থিত হয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন। প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া মসজিদে পুলিশকে তার দেহরক্ষী হিসেবে ব্যবহার করেন।[১]

খলিফা ও গভর্নরের রাজপ্রাসাদগুলোর পাশেই বৃহৎ মসজিদগুলোর অবস্থান ছিল। কেননা, এই মসজিদ থেকেই তারা জনতার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বক্তব্য রাখতেন। পুলিশ খলিফা বা গভর্নরের বক্তব্য প্রদানের সময় তাদের পাশে দন্ডায়মান থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো।[২]

আল কিন্দি'র বর্ণনা মতে, খলিফা ও গভর্নরগণ মসজিদে অবস্থান না করলেও পুলিশ মসজিদগুলো পাহারা দিত। উদাহরণস্বরূপ খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময় বিদ্যমান গভর্নরকে বরখাস্তের পূর্বেই মিসরের নতুন গভর্নর ফুসতাত শহরে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং গভর্নরের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় উপবিষ্ট হলেন। তৎক্ষণাৎ পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে জায়গাটি গভর্নরের জন্য নির্ধারিত বলে তাকে জানালেন। নতুন গভর্নর পুলিশ সদস্যটিকে পূর্বের বিদ্যমান গভর্নরকে তার সম্পর্কে অবহিত করতে বললে পুলিশ সদস্যটি জানায় যে, গভর্নর শহরে উপস্থিত নেই। তখন নতুন গভর্নর বিদ্যমান গভর্নরের ডেপুটিকে নিয়ে আসার জন্য পুলিশকে বলে। পুলিশ সদস্যটি এ বিষয়টি পুলিশ প্রধানের নিকট গিয়ে নতুন গভর্নর সম্পর্কে অবহিত করেন।[৩]

এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশের কাজ সম্পাদনের জন্য কার্যালয় বা স্টেশন ছিল। এখানে অবস্থান করেই পুলিশ মামলা তদন্ত ও অপরাধের জন্য দন্ড প্রদান করত।

উমাইয়া প্রশাসনে রাষ্ট্রীয় পদের অনুক্রমে গভর্নর এবং আমিল (কর সংগ্রাহক) এর পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গভর্নরের কার্যক্রম শুধু প্রাদেশিক শাসনকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং কিছু সামরিক ও আইন বিভাগের কাজও তিনি করতেন। গভর্নর কর্তৃক আমিল বা কর সংগ্রাহক পদটির নিয়োগ প্রদান করা হত। অনেক সময় খলিফা নিজেই আমিল নিয়োগ করতেন। অনুরূপ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল কাযি বা বিচারক। কাযি অনেক সময় সামরিক বিষয়াদি দেখাশুনা করতেন। তাকে 'কাযি আল জানদ' বলা হত। পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখাশুনা করতেন সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধান। তিনি একই সাথে দুই ধরনের দায়িত্বপালন করতেন। তিনি একদিকে সামরিক বিষয়াদিসহ অপরাধীদের অনুসন্ধান ও শাস্তি প্রদান করতেন। অন্যদিকে তিনি বিচার বিভাগের মামলা তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন।[৪]

---

১. Abu Ubayda, Ibid, p. 29

২. Tabari, vol. 5, p. 149

৩. Wulat, p. 83

৪. One of he significant posts in Umaiyad hierarchy of state administration was the posts of umara (governor) and amil (tax collector). The function of governor did not only include the administration of the province but implementation of judicial power some military functions. The governor had the power to appoint the tax collector; however there were cases when the latter was appointed by caliph himself. One of the other significant positions was the position of qadi (judge), whose functions, could be implemented by governor as well. The judiges could also undertake military administrative districts. The police affairs of the state was regulated by sahib al-shurta (chief of police), who combined two functions: on the one hand, he was in charge of 'an executive-military authority, charged with pursuing and punishing criminals" and on the other hand he assumed judiciary competence in order to examine the facts and presecute the offenders. See. http://samlib.ru/a/ahmedow-a-s/theumyyadcaliphsandtheirnon-musli, Visited on: 6.3.2012

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন

পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, বহিঃশত্রুর আক্রমন প্রতিহতকরণ, রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা প্রদান এবং খলিফা ও গভর্নরের নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে নগর ও সেনানিবাসে অবস্থান করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতো। উমাইয়া যুগে পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, বল্লম (Lance)। তাবারির বর্ণনা মতে, ইরাকের গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহি দুজন পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। তাদের একজনের নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন হিশাম এবং অপরজনের নাম ছিল যায়িদ বিন কায়েস। একদিন গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহি ভ্রমণের সময় এ দু'জন পুলিশ প্রধান তার সম্মুখে বল্লম হাতে হাঁটছিলেন। এসময় হঠাৎ এ দু'জন বির্তক শুরু করলে গভর্নর যায়িদ বিন কায়েসকে তার বল্লব অবনত করার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ তাকে বরখাস্ত করেন।[১] আবুল ফারাযের বর্ণনা মতে, যায়িদ বিন কায়েস বরখাস্ত হন তখন তিনি তার তরবারি অবনত করেন।[২]

উভয় তথ্যই সঠিক। পুলিশ প্রধান নিয়মিতভাবে তার সঙ্গে তরবারি রাখতেন। কারণ খলিফা ও গভর্নর কাউকে হত্যার নির্দেশ দিলে তিনি হত্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বিশেষ করে আদালতে অবস্থানকালীন সময়ে।[৩]

যাহাবির বর্ণনা মতে, উমাইয়া যুগে পুলিশ প্রধান সাধারণত ঘোড়ায় পৃষ্ঠে আরোহণ করার সময় তার হাতে একটি বল্লম থাকত। এ সময় তিনি পুলিশ সদস্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন এবং তাদের হাতেও 'কাফর কুবাত' নামক অস্ত্র থাকতো।[৪]

এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশ প্রধানকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ সদস্যরাও এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতো। ওয়াকির মতে, 'কাফর কুবাত' হলো পাথর নিক্ষেপের জন্য একধরনের যন্ত্র বা ফিঙ্গা।[৫]

ঐতিহাসিক বালাযুরি আরও উল্লেখ করেন যে, যিয়াদ বিন আবিহি বসরার গভর্নর নিয়োগপ্রাপ্ত হবার পর পুলিশকে তার বল্লম (Lance) সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেন যে, তোমার বল্লম অত্যন্ত খাটো যা দেখতে একটি ছাগের পায়ের মতো।[৬]

যিয়াদের পূর্বে পুলিশ অত্যন্ত খাটো বল্লম ব্যবহার করতো। এই খাটো বল্লম তিনি একারণে অপছন্দ করেন যে, শত্রুর মোকাবিলায় এটি কার্যকর ছিল না।[৭]

এছাড়া পুলিশ আমুদ নামক এক ধরনের দন্ড বা Pole ব্যবহার করতো। তাবারির বর্ণনা মতে, যিয়াদ পুলিশকে শিয়া নেতা হুযর বিন আদিকে তার নিকট হাজির করার জন্য প্রেরণ করলে পর হুযরের অনুসারী এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় পুলিশ তাদের প্রহার করার জন্য 'আমুদ' ব্যবহার করেন।[৮] তবে পুলিশ অনৈতিক অপরাধের জন্য বর্ণিত হুদুদ বাস্তবায়নের জন্য চাবুক ব্যবহার করতো।[৯]

---

১. Tabari, Op.cit, pp. 222-223
২. Aghani, vol. 5, p. 75
৩. Aghani, Ibid, p. 64
৪. Mizan, vol. 1, p. 64
৫. Waki, vol. 2, p.51
৬. Ansab, vol. 4A, p. 152
৭. Ansab, Ibid
৮. Tabari, vol. 5, p. 259
৯. Tabari, Ibid, p. 108

Dhaka University Institutional Repository

যাহিযের বর্ণনা মতে, উমাইয়া শাসনামলে খোরাসানের গভর্নর এক ধরনের লাঠি দ্বারা এক ব্যক্তিকে প্রহার করছিলেন। কেউ বলেন যে এ লাঠি ছিল জীবজন্তুকে প্রহারে ব্যবহারের জন্য, 'চাবুক' ছিল হুদুদ বা তাজির বাস্তবায়নের জন্য এবং 'দুররা' ছিল কাউকে তিরস্কার বা লঘু শাস্তির জন্য, 'তরবারি' ছিল শত্রুদের সাথে যুদ্ধে ব্যবহার জন্য।[১]

উদ্দেশ্য বা শাস্তির ভিন্নতা অনুযায়ী পুলিশ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতো। যেমন যুদ্ধের সময় পুলিশ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের অনুরূপ অস্ত্র ব্যবহার করতো। যেমন-বল্লম, তরবারি, তীর ধুনক।[২] এছাড়াও পুলিশ নিজেকে রক্ষার জন্য সংঘর্ষ বা যুদ্ধের সময় 'মুজাফফিফা' (A kind of Armour) নামক এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতো।

সাধারণত পুলিশ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অথবা পদব্রজে বা পায়ে হেঁটে দায়িত্বপালন করতো। মুহাম্মদ বিন হাবিবের মতে, ইরাকের গভর্নর যিয়াদ একটি হত্যাকান্ডের বিষয়ে পুলিশ প্রধানকে নগরীর বাইরে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করতে বলেন। পুলিশ ও পুলিশ প্রধান তখন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে ঘটনাস্থলে গমন করেন।[৩]

নগরীর অভ্যন্তরে পুলিশ সাধারণত পায়ে হেঁটে দায়িত্বপালন করতো। তানুকির বর্ণনা মতে, পুলিশ নগরীতে রাস্তায় টহল দিত এবং গভর্নরের নির্দেশে যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারতো।[৪]

কিন্তু বিদ্রোহ দেখা দিলে পুলিশ নগরীর অভ্যন্তরেও ঘোড়া ব্যবহার করতো। আবুল ফারাযের বর্ণনার মতে, কুফায় বিদ্রোহ দেখা দিলে পুলিশ গভর্নরের নির্দেশে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করে।[৫]

পুলিশ প্রধান সাধারণত অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের সাথে ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় টহল দিতেন। এসময় তিনি অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের দ্বারা এস্কর্ট প্রাপ্ত হতেন।[৬] অনেক সময় পুলিশ গাধা বা খচ্চরের উপরও আরোহণ করতো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় পুলিশ প্রধান খচ্চরের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া ব্যবহার করতেন।[৭]

ইবনে আসাকির বর্ণনা মতে, মুয়াবিয়ার সময় মদিনার গভর্নরের পুলিশ প্রধান বাহন হিসেবে উট ব্যবহার করতেন।[৮]

পুলিশের বেতন

উমাইয়া যুগে পুলিশ সদস্যগণ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যায় তাদের সেবার জন্য বেতন ভোগ করতো। তুলনামূলকভাবে পুলিশ অন্যান্যদের তুলনায় উচ্চ বেতন পেত। Nawawi বর্ণনা মতে, হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে তিনি তার পুলিশ প্রধানকে বাৎসরিক ৪০০০ হাজার দিরহাম প্রদান করেন।[৯]

---

১. al-Jahiz, *Kitab al-Bayan wal Tabyin*, vol. 3, p. 45
২. Qalqashandi, Op.cit, vol. 10, p. 228
৩. Muhammad b. Habib, *Diwan Farazdaq*, p.25
৪. Faraj, vol. 2, p. 124
৫. Maqatil, p. 138
৬. Mawardi, Op.cit, p. 40
৭. Qawl, p. 74
৮. Ibn Asakir, Op.cit, vol. 6, p. 409
৯. Nawawi, Op.cit, vol. 2, p. 116

Dhaka University Institutional Repository

বালাযুরির বর্ণনা মতে, ইরাকের গভর্নর বিশর বিন মারওয়ান তার পুলিশ প্রধানকে বাৎসরিক ১ লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন।[১]

প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকেও অনুরূপভাবে উচ্চ বেতন প্রদান করা হত। যাহাবির বর্ণনা মতে, খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ তার প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদেরকে ১০ দিরহাম প্রদান করেন।[২]

মাকদিসি এর মতে, যে সমস্ত পুলিশ সদস্য যায়েদ বিন আলি'র ক্রুশবিদ্ধ হবার পর তার দেহকে পাহারা দিয়েছিল তারা প্রত্যেক দিনের জন্য তিন দিরহাম বেতনপ্রাপ্ত হত।[৩] পুলিশ সদস্যরা নিয়মিতভাবে বেতনপ্রাপ্ত হত। এছাড়া তারা বিভিন্ন সময় খলিফা ও গভর্নরের নিকট হতে অর্থ ও উপহার সামগ্রী পেত। খলিফা আব্দুল মালিকের পুত্র ওয়ালিদের বিবাহের সময় যারা গার্ড ডিউটিতে নিয়োজিত ছিল তাদের প্রত্যেককে উপহার হিসেবে ১০ দিনার প্রদান করা হয়।[৪]

ইরাকের গভর্নর বিশর বিন মাওয়ান একদিন কতিপয় ব্যক্তিকে উপহার হিসেবে ১০ হাজার দিরহাম ও ত্রিশটি পোষাক প্রদান করেন। এসময় তিনি সেখানে উপস্থিত পুলিশ প্রধানকেও অনুরূপ অর্থ ও পোষাক উপহার হিসেবে প্রদান করেন।[৫]

পুলিশকে প্রাসাদের দায়িত্ব প্রদানকালীন সময়ে খাবারও সরবরাহ করা হত। খলিফা ও গভর্নরগণ পুলিশ প্রধানের উপর খুবই সদয় এবং উদার ছিলেন। কেননা পুলিশের নিকট হতে প্রত্যাশিত সেবা ও আনুগত্য পেতে হলে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে হত।

উমাইয়া (ফাতেমি) যুগে বেতন: সরকারি কর্মকর্তাগণ যেমন– কাযি, কর সংগ্রাহক, সিভিল সার্ভেন্ট, পুলিশ প্রধান ও পোষ্টমাস্টার একই ধরনের বেতন গ্রহণ করতেন যা জেলার কর হতে সংগৃহীত হত।[৬]

হত।[৬]

পুলিশের সংখ্যা

পুলিশ প্রধানের মর্যাদাগত অবস্থান প্রাদেশিক গভর্নরের পরেই ছিল। প্রত্যেক নগরীর জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পুলিশ সদস্য ছিল। যারা তাদের কর্মস্থলে বা অফিসে অবস্থান করে অথবা গভর্নরের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করে তাদের দায়িত্ব পালন করতো। তাবারির বর্ণনা মতে, যিয়াদ বিন আবিহি বসরার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর দেখতে পান যে সেখানে পুলিশের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অতঃপর তিনি পুলিশের সংখ্যা চার হাজারে বৃদ্ধি করেন।[৭]

১. Ansab, vol. 5, p. 177
২. *Tarikh al-Islam*, vol. 4, p. 173
৩. Maqdisi, *al-bad' wa'l Tarikh*, Paris, 1919, Vol-6, p. 28
৪. Aghani, vol. 16, p. 277
৫. Ansab, vol. 5, pp. 173, 177
৬. The State-officers, such as the Qadhis, tax-collectors, civil servants, heads of the police and post-masters of a particular district receive the self same pay which in fixed according to the taxable resources of the district. see. Salauddin Khuda Bakhsh and D.S.Margoliouth, *Renaissance of Islam,* Patna : Jubilee Printing Publishing House, 1st edt., 1937, p. 128
৭. Tabari, vol. 5, p. 222

অতঃপর যিয়াদ গভর্নর হিসেবে কুফায় গমন করলে তিনি জনগণকে এ বলে ভীতি প্রদান করেন যে, তিনি বসরা হতে দুই হাজার পুলিশ নিয়ে আসবেন।[১]

তাবারি আরও উল্লেখ করেন যে, মুখতার আল থাকাফি বিদ্রোহ শুরু করলে ইরাকের গভর্নর পুলিশ প্রধানকে চার হাজার পুলিশসহ মুখতারকে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন।[২]

প্রদেশগুলোতে কেন্দ্রের মত এত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুলিশ সদস্য ছিল না। কেননা প্রদেশগুলোতে পুলিশ ব্যক্তিগত অপরাধ মোকাবিলা করতো। ইরাক এবং অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ব্যাপক বিদ্রোহ ছিল না। যুবায়ের বিন বক্কর এর মতে, মুয়াবিয়ার সময় মদিনার গভর্নর মুসাববিন আবদুর রহমানকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। এ সময় দুইশত পুলিশ মদিনা নগরীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল।[৩]

সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুলিশ সদস্যকে সেনাছাউনিতে অবস্থান করতে হত। গভর্নর যখন গোত্র অনুযায়ী সেনাবাহিনী রেজিমেন্ট গঠন করতেন তখন পুলিশ প্রধানকে অধিনায়ক করেও রেজিমেন্ট তৈরি করা হত।[৪]

থানুকির বর্ণনা মতে, একদিন দুইজন পুলিশ সদস্য রাস্তায় টহল দিচ্ছিল এবং জনগণের উদ্দেশ্যে গভর্নরের আদেশ প্রচার করতে ছিল। সুতরাং প্রদেশভেদে পুলিশের সংখ্যার ভিন্নতা ছিল। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুলিশ (প্রায় চার হাজার) ছিল ইরাকে এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক পুলিশ নিয়োজিত ছিল মদিনায়। যাহাবির বর্ণনা মতে, উমর বিন আব্দুল আজিজের সময় প্রাসাদের নিরাপত্তায় তিন শত পুলিশ ছিল।[৫]

উপ-পুলিশ প্রধানের পদবি

দায়িত্ব ও পদমর্যাদার বিচারে পুলিশ প্রধান ছিল প্রদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। পুলিশ প্রধানকে সহায়তা অথবা তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব প্রদানের জন্য একজন উপ-পুলিশ প্রধান থাকতেন। দাপ্তরিকভাবে তাকে Khalif (deputy) of the sahib al-shurta বলা হত। ঐতিহাসিক আবুল ফারায-এর বর্ণনা মতে, সমকামীদের (মুখান্নাছ) শাস্তি খাসি বা খোজা করার কাজটি পুলিশ প্রধান নিজে করতেন না। তার পক্ষে উপ-পুলিশ প্রধান এ কাজটি সম্পন্ন করতেন।[৬]

জাহিযের বর্ণনা মতে, গভর্নর হাজ্জাজ উপ-পুলিশ প্রধানকে জানজ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে প্রেরণ করেন।[৭]

আর এ উপ-প্রধান পুলিশ ছিল পুলিশ প্রধানের পুত্র।[৮] উপ-পুলিশ প্রধানও পুলিশ প্রধানের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্ববান ছিলেন। বালাযুরির বর্ণনা মতে, কুফায় বিদ্রোহ দেখা দিলে গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন মুতি পুলিশ প্রধান ও তার বাহিনীকে বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রেরণ করেন। এ

---

১. Tabari, Ibid, p. 235
২. Tabari, vol. 6, p. 23
৩. Zubayr b. Bakkar, Op.cit, p. 519
৪. Zubayr b. Bakkar, p. 115
৫. Tarikh al-Islam, vol. 4, p. 173
৬. Aghani, vol. 4, p. 276
৭. Thalath, p. 65
৮. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনায় পুলিশ প্রধান নিহত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পুলিশ প্রধানের পুত্রকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন।[১]

জনগণের সাথে পুলিশের সম্পর্ক

জননিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দায়িত্বান হওয়ায় সার্বক্ষণিকভাবে পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক বা বন্ধন ছিল উল্লেখ করার মতো। পুলিশ সাধারণত জনগণের নিকট হতে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া বা সাড়া পেত। পুলিশ জনগণের নিকট থেকে কখনও প্রশংসা পেত আবার কখনও বা জনগণের ঘৃণা বা নিন্দা পেত। আর জনগণের এ মিশ্র প্রতিক্রিয়া জনগণের মুখপাত্র হিসেবে কবিদের রচনার মাধ্যমে কখনও প্রশংসা, কখনও বিদ্রুপাত্মকরূপে ফুটে উঠতো। এজন্য অনেক সময় পুলিশ কবিদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করতো। আবুল ফারাযের বর্ণনা মতে, কবি ফারযাখ তাঁর রচনার মাধ্যমে ইরাকের গভর্নর খালিদ আল কাসরি সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা করেন। এতে গভর্নর কবিকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রধান আবু আইয়ুব নামক কবির গোত্রের এক পুলিশ সদস্যকে তার গ্রেফতারের জন্য প্রেরণ করেন। আইয়ুব ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কবিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।[২]

মুহাম্মদ বিন হাবিবের মতে, কবি ফারযাখ গভর্নর যিয়াদ বিন আবিহির সময়ে পুলিশ প্রধান সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন। অতপর যিয়াদ তাকে গ্রেফতারের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন কিন্তু কবি পলায়ন করে মদিনা গমণ করেন।[৩]

অন্য ঘটনায় এরূপ যে, মুয়াবিয়ার সময়ে মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকামের পুলিশ প্রধান উটের পিঠে আরোহণ করছিলেন। এ সময় অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উটের পিঠে আরোহণ করে সে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় পুলিশ প্রধান আঘাত করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উটের নাক ভেঙ্গে দেন যাতে তিনি আগে যেতে পারেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন প্রতিশোধ হিসেবে পুলিশ প্রধানের উপর আক্রমণ করে তার নাক ভেঙ্গে দেন। তৎপেক্ষিতে পুলিশ প্রধানের পরিবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। যা জনৈক কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।[৪]

অনেক সময় কবিগণ পুলিশের অনৈতিক আচরণের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতো যা পুলিশ প্রধানের উদ্দেশ্যে তাদের রচনার মাধ্যমে ফুটে উঠতো। যখন তারা পুলিশের নিকট হতে কঠোর আচরণ ও শাস্তি পেতেন তখন তাঁরা তাদের কবিতার মাধ্যমে তা প্রকাশ করতেন।

জনগণ কখনও কখনও পুলিশকে ভয় পেত। শুধু সাধারণ জনগণই নয় বরং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও পুলিশকে ভয় করতো। যাহিযের বর্ণনা মতে, আব্দুল বিন হাসান আল বসরি দামেস্কে খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। তিনি দামেস্কে পৌঁছে তার ভ্রমণকালীন পোশাকাদি পরিবর্তন না করে খলিফার প্রাসাদে গমন করেন। কেননা, তিনি ভয় করছিলেন যে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে।[৫] জনৈক মহিলা পুলিশ ও গভর্নরের ভয়ে তার বৃদ্ধ স্বামীর সাথে বসবাস বসবাস করছিলেন যদিও এ মহিলা স্বামীকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন।[৬] অনেক সময় ফকিহ্'গণও

---

১. Ansab, vol. 5, p. 224
২. Aghani, vol. 19, p. 23-24
৩. Muhammad b. Habib, *Diwan Farazdaq*, p. 66
৪. Ibn Asakir, Op.cit, vol. 6, p. 409
৫. Al-Jahiz, *Kitab al-Hayawan,* vol. 4, p. 47
৬. Al-Ajjaj, *Diwan al-Ajjaj*, Berlin : 1903, p. 77; Ibn Manzur, Op.cit, vol. 9, p. 202

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের সমালোচনা করতেন। যেমন হাসান আল বসরি গভর্নরের সমালোচনা করেছিলেন পুলিশকে ব্যবহারের জন্য।[১]

ইবনে কাসিরের বর্ণনা মতে, একদিন হাসান আল বসরি দেখতে পেলেন যে, কিছু বিদ্বান ও ফকিহ্ গভর্নরের প্রাসাদে তার সম্মুখে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি গভর্নরের উদ্দেশ্য সমালোচনা করে বলেন যে, আপনার মজলিস খোদাভীরুদের মজলিস নয় বরং এটি পুলিশের মজলিস।[২]

পুলিশ সরকারের প্রতিনিধি বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো বলে ফকিহ্গণ এরূপ অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারেন। পুলিশের প্রতি ব্যাপক বিদ্বেষ প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। Do not teach orphans to cry. Do not teach Zutti to thieve and do not teach shurta to search.[৩]

পুলিশ প্রধান নিয়োগে আঞ্চলিকতা ও গোত্রের অভাব

পুলিশ প্রধান নির্বাচনে উমাইয়া শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোত্র ও আঞ্চলিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-শাসন ব্যবস্থায় মুদার গোত্র ও ইয়ামেনিয় অঞ্চলের প্রভাব। পুলিশ প্রধান নিয়োগেও এই গোত্র ও আঞ্চলিকতার প্রভাবটি পরিস্ফুটিত হয়। যেমন মুয়াবিয়া (রা) এর পুত্র ইয়াজিদের শাসনামলে ইয়ামেনিদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। শাসন ব্যবস্থায় ইয়াজিদ ইয়ামেনিদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ (Favour) প্রদর্শন করেন। ফলে ইয়াজিদের প্রতি ইয়ামেনিদের পক্ষ হতে বেশি পরিমাণ সমর্থন আসতে থাকে। সম্ভবত ইয়াজিদের মাতা ইয়ামেনি বংশীয় হওয়ার কারণে এরূপ হতে পারে। ইয়াজিদের স্বল্পতম সময়ের রাজত্বকালে পুলিশ প্রধান ছিল ইয়ামেনি বংশের তার নাম ছিল হুমায়িদ বিন হুবাইশ বিন বাহদাল আল কাবলি।[৪]

খলিফা মারওয়ানের রাজত্বকালেও ইয়ামেনিয় গোত্রের লোকদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কেননা ইয়ামেনিরা বিশেষভাবে মারওয়ানের সমর্থক ছিল। এ সময় খলিফা মারওয়ান তার পুলিশ প্রধান হিসেবে ইয়াহিয়া বিন কায়েস বিন হারিস আল গাস্সানিকে নিয়োগ করেন।[৫]

খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদিল মালিক (৭০৫-৭০১৪ খ্রি.) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং এসময় মুদার গোত্রের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। খলিফা মুদার গোত্রের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে মুদার গোত্রের লোকদের পদায়ন করেন। সম্ভবত খলিফার মাতা বনু আস গোত্রের ছিলেন বলে এরূপ হতে পারে। খলিফা আব্দুল মালিক ও ওয়ালিদের পুলিশ প্রধান ছিলেন কাব বিন হামিদ আল আবসি। এ কাব ছিলেন খলিফা ওয়ালিদের মামা।[৬] খলিফা হিশামের রাজত্বকালে তিনি ইয়ামেনিদের প্রতি অত্যন্ত বিরাগভাজন বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং মুদার গোত্রের লোকদের প্রতি বিশেষভাবে উদারতা প্রদর্শন করেন।[৭]

তিনি কাব বিন হামিদ আল আবসি'কে পুলিশ প্রধান হিসেবে বহাল রাখেন। অতঃপর কা'ব আরমেনিয়ার গভর্নর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে একই বংশের ইয়াজিদ বিন ইয়ালা বিন দাকাম আল আবছি'কে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[৮] হিশামের পরিবর্তি খলিফাগণ স্বল্প সময়ের জন্য অধিষ্ঠিত হলেও পরিবর্তনের এ রীতি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। যেমন-ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ

---

১. Mubarrad, vol. 1, p. 270
২. Ibn Kathir, vol. 9, p. 269
৩. Al-Thaalabi, Kitab Khas al-Khas, Beirut: 1966, p. 24
৪. Ansab, vol. 4B, p. 6
৫. Ibn Qutayaba, *Maarif*, p. 107; Ibn Khayyat, vol-1, p. 331
৬. Tabari, vol. 6, p. 548; Ibn Abd Rabbihi, Op.cit, vol. 5, p. 188
৭. Abu Hanifa, Op.cit, p. 432
৮. Ibn Khayyat, vol. 2, p. 379

Dhaka University Institutional Repository

(৭৪৪ খ্রি.) ইয়ামেনীয় বংশের বুকায়ির বিন শামাখ আল লাখনিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।[১]

অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় ওয়ালিদ তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে (৭৪৩-৪৪ খ্রি.) মুদারীয়দের প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি ইয়ামিনিদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইয়ামেনি গোত্রের আবদুর রহমান বিন হামিদকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।[২]

এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে,অধিকাংশ উমাইয়া শাসকগণ যে গোত্র বা অঞ্চলের প্রতি সহানুভূতি ভাবাপন্ন ছিলেন সেই গোত্র থেকেই পুলিশ প্রধান নিয়োগ করতেন। কেননা ক্ষমতারোহণ ও ক্ষমতা রক্ষায় এ গোত্রগুলো খলিফাদের প্রতি বিশেষভাবে আনুগত্যশীল ছিল। কেন্দ্রের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্নরগণও পুলিশ প্রধান নিয়োগে এ রীতি অনুসরণ করতেন।[৩]

খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর খিলাফতকে সুসংহতরূপে প্রতিষ্ঠার পর অত্যন্ত দক্ষ ও কুটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে গোত্রীয় নেতাদের পরিচালনা করতেন। তিনি ইয়ামেনি ও মুদার গোত্রের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সমতাভিত্তিক সম্পর্ক উন্নয়নে সক্ষম হন। ইয়াকুবির মতে, মুয়াবিয়া তাঁর পুলিশ প্রধান হিসেবে ইয়ামেনিয় বংশের কায়স বিন হামজা আল হামাদানিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।[৪] এরপর মুয়াবিয়া (রা.) মুদার গোত্রের কায়স আল ফিহরিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। যিনি মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরবর্তী সময় পর্যন্ত পুলিশ প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৫]

আব্দুল মালিক (৬৮৫ খ্রি.) ক্ষমতা প্রাপ্তির পর গোত্রগুলোকে একত্রিত করে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর পুলিশ প্রধান হিসেবে ইয়ামেনিয় ইয়াজিদ বিন কাবসা আল শাখছাকি নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি ইয়াজিদকে বরখাস্ত করে তার স্থলে আবু নাতিল আল গাসসানিকে নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি মুদার গোত্রের কাব বিন হামিদ আল আবসিকে নিয়োগ করেন।[৬] কাব আব্দুল আব্দুল মালিকের (৭০৫ খ্রি.) মৃত্যু পর্যন্ত পুলিশ প্রধানরূপে দায়িত্ব পালন করেন।[৭]

উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ তার শাসনামলে গোত্রীয় ও আঞ্চলিকতার প্রভাবমুক্ত হয়ে সত্য ও ধর্মভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ৭১৭ খ্রি. তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রায় সকল গভর্নরদের অপসারণ করে ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকদের নিয়োগ করেন।

ঐতিহাসিক তাবারির মতে, উমর বিন আব্দুল আজিজ জানতে পারলেন যে, খোরাসানের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন যাররাহ আল হাকামি অন্য গোত্রদের উপেক্ষা করে ইয়ামেনিদের প্রতি বিশেষ সুবিধা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করছেন। উমর তৎক্ষণাৎ খোরাসানের গভর্নরকে বরখাস্ত করেন।[৮] উমর বিন আব্দুল আব্দুল আজিজ তাঁর পুলিশ প্রধান নিয়োগেও সত্যভিত্তিক ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করেন। ইয়াকুবির মতে, তিনি রাওয়াহ বিন ইয়াজিদ আল সাকসাকিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।[৯]

---

১. Ibn Khayyat, vol. 2, p. 389; Yaqubi, vol. 3, p. 77
২. Yaqubi, Op.cit, vol. 3, p. 76
৩. Tabari, vol. 5, p. 310, vol. 6, p. 320
৪. Tabari, vol. 5, p. 329-330
৫. Tabari, Ibid, p. 323
৬. Ibn Khayyat, vol.1, p. 395
৭. Ibn Khayyat, Ibid
৮. Tabari, ser. 11-3, p. 1348
৯. Yaqabi, vol. 3, p. 52

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়ার শাসনামলে বসরার পুলিশ প্রধানগণ ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত এবং তারা জনবহুল গ্যারিসন শহরে বসবাস করত। অন্যদিকে খলিফার ব্যক্তিগত হারাস প্রধান ছিলেন মাওয়ালি অর্থাৎ অনারব। এটি হতে পারে হারাস প্রধানদের ব্যক্তিগত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততামূলক সম্পর্কের কারণে। বসরার গভর্নর সাধারণত তার গোত্রের মধ্যে থেকে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করতেন। বসরায় যেহেতু আরব-অনারব উভয় শ্রেণির লোক বসবাস করত তাই পুলিশ সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণি থেকেই সদস্য নিয়োগ করা হত। পারিবারিক সম্পর্ক ও গোত্রীয় বন্ধন পুলিশ প্রধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া উমাইয়া শাসকদের প্রতি পূর্বতন সমর্থন ইরাক ও বসরার গভর্নর ও তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক, ধর্মীয়, ব্যক্তিগত গুণাবলী, সামরিক সক্ষমতা ও জনসমর্থন ইত্যাদি বিষয়গুলো পুলিশ প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হত।

উমাইয়া শাসনামলে বসরার পুলিশ প্রধানদের বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আন্তঃগোত্রীয় সখ্য গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের কারণে বসরার 'আজদ' ও 'রাবি' এবং 'তামিম' ও 'কায়িস' গোত্রের মধ্যে অনেক জটিলতা হ্রাস পায়। বিভিন্ন গোত্র নেতা বা তাদের সন্তানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আন্তঃগোত্রীয় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। বসরার অনেক পুলিশ প্রধানের সন্তানগণ পিতার মত পরবর্তীতে পুলিশ প্রধানের পদ গ্রহণ করেন। উমাইয়া যুগে অনেক পুলিশ প্রধান আন্তঃগোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহীদের দমনের ক্ষেত্রে সামরিক কর্মকর্তাদের মত ভূমিকা পালন করেন। অনেক পুলিশ প্রধান এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে বা পরে সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। অনেক পুলিশ প্রধান তাঁদের দায়িত্ব পালন শেষে আবার গভর্ণর হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।[১]

মুহতাসিব

বাজার পরিদর্শক (মুহতাসিব) ও তাঁর সহকারীগণ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতেন এবং পবিত্র আল-কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতেন।[২]

মুহতাসিবের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিত করা যাতে বিক্রিত মালের ক্ষেত্রে কোনো প্রতারণা না ঘটে। রান্না করা ও প্রস্তুতকৃত খাবার মানসম্পন্ন উপাদান দ্বারা যথাযথভাবে তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা মুহতাসিবের দায়িত্ব ছিল। কেউ এটা ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হত। বাজারের দৈনন্দিন চলমান কার্যক্রমের মূল্যবান ও স্পষ্ট ধারণা দিতে মুহতাসিব কর্তৃক তৈরিকৃত হ্যান্ডবুক।[৩]

উমাইয়াগণ অনুরূপভাবে ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় বাইজেন্টাইনদের বাজার পরিদর্শক পদটি অঙ্গীভূত করেন। তার দায়িত্ব শুধু বাজার পরিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং জনগণের নৈতিকতা ও ধর্মীয় মান বজায় রাখার রক্ষাকারী হিসেবে তাঁর অপরিসীম ভূমিকা ছিল।[৪]

---

১. Michael Ebstein, Shurta Chiefs in Basra in the Umayyad Period a Prosonpographical Study, Jerusalem : Al-Qantara, No. XXX1 1, 2010 pp. 116123, see. http://www.academia.edu/545802/, visited on 17.06.2014

২. The market inspector (muhtasib) was a government-appointed officer who, along with his assistants, was charged with a range of duties encompassed in the Quaranic phrase to command the good and forbid worng. see. David Waines, *An Introduction to Islam*, New York : Cambridge University, 2nd edt., 2004, p. 96

৩. These duties included ensuring that vendors employed true weights and measures for the goods they sold, that cheating in the quality of a product did not occur (or if it did, could be punished when detected, that cooked or baked goods were properly prepared in market stalls with good ingredients, and that no one offended against public morality. The inspectors handbooks provide a valuable and lively source of information concerning the daily operations of a medieval market place. see. David Waines, *An Introduction to Islam*, Ibid, p. 97

৪. Similarly, the Umayyads adopted the Byzantine market inspector (the Agoronomus), assimilated him into Islamic practice, and he was responsible not only for market affairs but also for safeguarding the standards of

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিব আল-শুরতা কাযি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা রাখতেন। কাযি তাঁর দরবার বা অধিক্ষেত্র এজলাসের বাইরে যেতে পারতেন না। কিন্তু পুলিশ প্রধান অভিযোগের তদন্ত, অভিযুক্তকে শাস্তি প্রদান, বিনা বিচারে কাউকে আটক, শাস্তি দিয়ে স্বীকৃতি আদায়, সন্দেহের উপর শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সব রকম কার্য করতে পারতেন। কিন্তু কাযি কেবল অভিযোগ পেলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর বিচার কক্ষেই বিচার কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম ছিলেন।[১] কাযির দরবারে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, পুলিশ প্রধান তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারতেন। আব্দুর রহমান ইবন উবাইদ নামক কুফায় হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের একজন 'শুরতা' নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেন। একদিন এক নকীবকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তিনি তার দেহে কাঁটাবিদ্ধ করেন। কোনো খননকারী অভিযুক্ত হলে তিনি তাকে কবর খুঁড়ে তাতে পুতে ফেলতেন; অস্ত্র দ্বারা ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে কাউকেও উপস্থাপিত করা হলে তিনি তাকে হাত কেটে শাস্তি প্রদান করতেন; কেউ গৃহদাহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই তিনি তাকে তিনশত বেত্রাঘাত করতেন।[২] কিন্তু কার্যত কাযির এত ক্ষমতা ছিল না। এমন কি উমাইয়া যুগে আমির কাযি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ কাযির প্রধান দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট; কিন্তু আমির ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতার অধিকারী। কাযি ছিলেন কেবল মুসলমানদের বিচারের জন্য নিযুক্ত বিচারক; কিন্তু আমির ছিলেন মুসলমান ও অমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের শাসক ও বিচারক।[৩]

---

relDgious morality (hisbah). see. David Pearl and Werner Menski, *Muslim Family Law*, London : Sweet & Maxwell, 3rd edt., 1998, p. 8

১. ইমাম শাফিঈ : *কিতাবুল উম্ম*, খ.৬, পৃ. ২৪০; ইমাম আবু ইউসুফ : *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১০৭

২. ইবন কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩. The sahib al-shurta had wider powers than the qadi or ordinary judge concerened with shari affairs. The latter had no authority to go outside his own court for investigation of crimes reported or suspected, nor could he attempt to extract a confession by force from an accused person. Furthermore, he could act only on the complaint of interested parties, for example in cases of theft or adultery, and then only according to the ordinary procedure. see. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, London: Cambridge University Press-1979, p. 333

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
আবক্ষাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবক্ষাসীয় যুগের শাসন ব্যবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উল্লেখযোগ্য শাসকদের আমলে পুলিশি ব্যবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়

আবক্ষাসীয় যুগের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবক্ষাসীয় যুগের শাসন ব্যবস্থা

আবক্ষাসীয় যুগের পরিচিতি

আল-আবক্ষাস[১] মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর অন্যতম চাচা ছিলেন। তাঁর নামানুসারে এ বংশ আবক্ষাসীয় বংশ নামে পরিচিত। তিনি আব্দুল্লাহ, ফজল, উবাইদুল্লাহ এবং কায়সান নামে চার পুত্র রেখে ৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁরা সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং প্রত্যেকেই সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলি (রা.)-এর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা আলি (রা.) এবং তাঁর সন্তানদের সমর্থক ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইতিহাস ও হাদিসে ইবনে আবক্ষাস নামে পরিচিত। ইমাম হুসাইন কারবালার যুদ্ধে নিহত হলে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে ৬৮৬–৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে ৭০ বছর বয়সে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। ইবনে আবক্ষাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলি পরিবারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে আলির ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুহাম্মাদ অতিশয় ক্ষমতাসম্পন্ন এবং উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই ছিলেন মূলত আবক্ষাসীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি সর্বপ্রথম আবক্ষাসীয়গণের জন্য খিলাফাত দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। খিলাফাতে তাঁর ও তাঁর বংশের দাবির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রমাণের জন্য সর্বসাধারণের সামনে একটি সূত্র তুলে ধরেন। এই সূত্রানুযায়ী ইমাম হুসাইনের হত্যার পর ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব তাঁর পুত্র আলির (জয়নুল আবিদিনের) উপর ন্যস্ত না হয়ে হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়ার উপর ন্যস্ত হয়। বিবি ফাতিমার ইন্তেকালের পর হযরত আলি (রা.) হানাফিয়া গোত্রের জনৈকা রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়া তাঁর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাশিম নেতৃত্ব লাভ করেন। হাশিম মৃত্যুর পূর্বে আবক্ষাসের প্রপৌত্র মুহাম্মাদকে (মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ ইবন আবক্ষাস) ইমামতি অর্পণ করেন। মুহাম্মাদ তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হবার পূর্বে ৭৪৪ খিস্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর তিন পুত্র ইবরাহিম, আবুল আবক্ষাস (আস-সাফফাহ) এবং আবু জাফর (আল-মনসুর) পর পর খিলাফাতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ৩৬ জন আবক্ষাসী খলিফার মধ্যে ১৬ জন সরাসরি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।[২] এভাবে আবক্ষাসীয় বিপ্লবের উৎপত্তি লাভ করে।

আবক্ষাসীয়গণ কুরাইশ বংশের হাশিমি শাখা হতে উদ্ভূত। সুতরাং তারা উমাইয়াগণ হতে মহানবী (স.) এর নিকটতম-তাঁরা এই দাবিও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

---

১. "আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিমের দশ ছেলে এবং ছয় মেয়ে। ছেলেরা হলেনঃ আবক্ষাস, হামযা, আব্দুল্লাহ, আবূ তালিব ওরফে আবদে মানাফ, যুবায়র, হারিছ, হাজলা, মুকাবিক্ষম, যিরারা, আবু লাহাব ওরফে আবদুল উযযা। আর মেয়েরা হলেন: সাফিয়্যা, উম্মে হাকীম বায়যা, আতিকা, উমায়মা, আরওয়া এবং বাররাহ।" দ্র. ইবন হিশাম আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাতুননবী (স.)*, ঢাকা: ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২

২. R. P. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration*, Allahabad : Central Book Depot, 1964, p. 3

Dhaka University Institutional Repository

আবক্ষাসীয়গণ হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর পরিবারবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন ভেবে জনসাধারণ, বিশেষ করে শিয়াগণ এই আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। শিয়াগণ উমাইয়াগণকে খিলাফাতের 'জবর দখলকারী' বলে অমান্য করত। মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ এবং কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম জাহানও উমাইয়া শাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাঁদের শাসনের সমাপ্তি কামনা করত। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কঠোর শাসনে এবং নিষ্ঠুরতার ফলে ইরাক, পারস্য ও আবক্ষাসীয়গণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। অবহেলিত এবং অত্যাচারিত মাওয়ালিগণও উমাইয়াগণকে আর সহ্য করতে পারছিল না। সুন্নি মুসলমানগণও ধনলোভী এবং অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত উমাইয়াগণকে ঘৃণা করত। ফলে 'আহলে বায়ত'-এর নামে আবক্ষাসীয় আন্দোলন শুরু হলে সকল সম্প্রদায়ের লোক পরিত্রাণের আশায় আবক্ষাসীয়দের পক্ষ সমর্থন করে। এতে আবক্ষাসীয় আন্দোলন উমাইয়াগণের বিরুদ্ধে সর্বজনীন আন্দোলনের রূপ লাভ করে।

উল্লিখিত অনুকূল পরিবেশে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের শাসনামলে আবক্ষাসীয়দের প্রচারকার্য শুরু হয়। খলিফা হিশামের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনামলে এটা প্রবল আকার ধারণ করে। এ সময় মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইবরাহিম আবক্ষাসীয়দের ইমাম মনোনীত হন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর প্রচারকার্যের জন্য তিনি অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন আবু মুসলিমকে কাছে পান। তিনি আরব বংশোদ্ভুত একজন ইস্পাহানি ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত বাকচাতুর্যে শত্রুগণও বিস্মিত হয়ে মিত্রে পরিণত হত। বৃহত্তম ভাগ্য বিপর্যয়েও তিনি কণামাত্র অস্বস্তি প্রকাশ করতেন না এবং রাগান্বিত হলে তিনি কখনও আত্মসংযম হারাতেন না। আমির আলি বলেন, "মুদারিয়া এবং হিমইয়ারিগণের অহমিকা এবং যে তিক্ত সম্পর্ক উভয়কে উত্তেজিত করেছিল তাকে সুকৌশলে আপন কাজে লাগাবার জন্য ম্যাকিয়াভেলির মত চাতুর্য তাঁর ছিল। এজন্য উভয় পক্ষ হতে যথেষ্ট নিরাপদে থেকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[১] তাঁর সৈন্যদল গঠনের এবং শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষতাও ছিল অসামান্য। ইবরাহিম তাঁকে খুরাসানে আবক্ষাসীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

আলি ও ফাতিমার বংশধরগণ ও তাঁর সমর্থক শিয়া-সুন্নি, মাওয়ালি, খারিজি প্রভৃতি দল ও মতের লোক তাদের সকল পার্থক্য ভুলে আবু মুসলিমের পতাকাতলে এসে সমবেত হল। এরূপে খুরাসানে আবক্ষাসীয় আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। খলিফা মারওয়ান যখন সিরিয়ায় এবং খুরাসানে শেষ উমাইয়া শাসনকর্তা নসর বিন সাইয়ার যখন কিরমানের খারিজি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন আবু মুসলিম এই সুযোগে ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে খুরাসান আবক্ষাসীয়গণের কালো পতাকা উত্তোলন করেন এবং রাজধানী মার্ভ অধিকার করেন। নসর আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা কর্তৃক পরাজিত হয়ে খলিফার নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। সাহায্য এসে পৌঁছার পূর্বে খুরাসান ও ফারগানা আবু মুসলিমের হস্তগত হয় এবং পলায়নরত নসর নিহত হন।

খুরাসানের পর খলিফা মারওয়ান আবক্ষাসীয় আন্দোলনের ব্যাপারে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। গুপ্তচর নিয়োগ করে তিনি জানতে পারলেন যে, ইবরাহিমের জন্য আবু মুসলিম এরূপ কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। খলিফা ইবরাহিমকে বন্দী করে হাররানে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তাঁর গ্রেফতারের পরেও আবু মুসলিমের কার্যকলাপ বন্ধ হল না। আবু মুসলিমে সেনাপতি কাহতাবা এবং খালিদ বিন বার্মিকি

---

১. "A Machiavellian dexterity in playing upon the vanity of Modhar and Himyar and the bitterness which animated both, enabled him to carry out his design with sufficient immunity from either side." see. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* Ibid, p. 172

Dhaka University Institutional Repository

ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হন। এখানে তাঁদের সাথে ইরাকের উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াজিদের একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইয়াজিদ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ফলে ইরাকের রাজধানী কুফা আবু মুসলিমের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে কাহতাবা নিহত হলে তাঁর পুত্র হাসান আবক্ষাসীয় বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে আবু মুসলিমের আর একজন সেনাপতি আবু আয়ুন মারওয়ানের পুত্র আব্দুল্লাহকে পরাজিত করে পারস্যের নাহওয়ান্দ এবং মেসোপটেমিয়া অধিকার করেন। এই দুঃসংবাদে ক্রোধে অন্ধ মারওয়ান ইবরাহিমকে হত্যা করেন। ইবরাহিম মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভ্রাতা আবক্ষাসকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে ইচ্ছাপত্র রেখে যান।

আবক্ষাসীয় খিলাফাতের প্রতিষ্ঠা:

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আবক্ষাসীয় বংশ ক্ষমতারোহণ করে এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতা বহাল থাকে। মিসরে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবক্ষাসীয় খিলাফত বলবৎ ছিল।[১] আবক্ষাসীয় বংশীয় লোকজন নিজেদেরকে নবীর বংশ বলে পরিচয় দেয় এবং এ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে এ বংশের প্রথম ব্যক্তি আবুল আবক্ষাস আল সাফফা আবক্ষাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন। ইবরাহিম বন্দী হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতাগণ কুফায় পলায়ন করেন এবং ইবন কাহতাবা কর্তৃক কুফা দখল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আত্মগোপন করে থাকেন। ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে কুফা বিজিত হয় এবং ঐ বছর অক্টোবর মাসে কুফার মসজিদে আবুল আবক্ষাস ইরাকবাসীগণ কর্তৃক মুসলিম জাহানের খলিফা বলে ঘোষিত হন। আনুগত্য গ্রহণ করার পর আবুল আবক্ষাস উমাইয়াদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার বজ্রকঠিন শপথ করে বসেন এবং তিনি 'আস-সাফফাহ' বা রক্তপিপাসু উপাধি গ্রহণ করেন। এই নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত। ইত্যবসরে আবু আয়ুন মারওয়ানের পুত্রকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

শেষবারের মত খলিফা মারওয়ান বিগত জীবনের কর্মতৎপরতা নিয়ে খিলাফাত পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করলেন। এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যসহ তিনি টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে বড় যাব নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে আবু আয়ুনও আবুল আবক্ষাস কর্তৃক প্রেরিত সৈন্য সাহায্য পেলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি হলেন সাফফাহর জনৈক পিতৃব্য আব্দুল্লাহ। ৭৫০ খিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি বড় যাব নদীর পূর্ব তীরে কুসাফ নামক গ্রামে উমাইয়া বংশের সৌভাগ্য রবি চিরতরে অস্তমিত হল। এ যুদ্ধের পর দামিশকসহ সমগ্র উমাইয়া সাম্রাজ্য আবক্ষাসীয়দের হস্তগত হয়। মারওয়ান প্রথমে মসূল, তারপর হাররান এবং তথা হতে দামিশকে পলায়ন করেন। সেখানেও নিরাপদ মনে না করে তিনি ফিলিস্তিন হয়ে মিসরে পলায়ন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি ধরা পড়েন ও নিহত হন। এভাবে উমাইয়া বংশকে ধ্বংস করে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আবক্ষাসীয় বংশ খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে ফকিহগণ ক্ষমতাবলে খিলাফাত অধিকারকে আইন সম্মত বলে রায় প্রদান করেন। আবক্ষাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আবক্ষাস আস-সাফফাহও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনএবং উমাইয়াদের অনুসরণে আবক্ষাসীয় খলিফাগণ পুত্র কিংবা ভ্রাতাকে খলিফার পদে মনোনয়ন দান করতেন। এরূপ মনোনয়ন দান বা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেও ফকীহগণ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আবক্ষাসীয় বংশের খলিফাগণও খিলাফাতে তাঁদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (স.) সাথে তাঁদের 'আত্মীয়তার নৈকট্যতার' উপর গুরুত্বারোপ করেন। উমাইয়া খলিফাদের ন্যায় আবক্ষাসীয় খলিফাগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা করতেন না। তাঁরা খিলাফাত প্রতিষ্ঠানের উপর

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯০, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

'ধর্মীয় গুরুত্ব' আরোপ করেন। তাঁরা খলিফাকে সিযার ও পোপ-এর ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করতেন। তাঁরা নিজেদের 'যিল্লুল্লাহ আলাল আরদ বা পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া' বলে সম্মানিত বোধ করতেন। খলিফা মনসুরই সর্বপ্রথম সুন্নি মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং প্রজাদের পার্থিব ক্ষমতার সাথে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বও গ্রহণ করেন। সেই হতে খিলাফাতের বিলোপসাধন পর্যন্ত খলিফা মুসলিম মানসজগতে ধর্মীয় প্রধানের আসনে সমাসীন ছিলেন।

আবক্ষাসীয় বংশের সর্বমোট ৩৭ জন[১] খলিফা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজধানী বাগদাদকে কেন্দ্র করে খিলাফাত পরিচালনা করেন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান বাগদাদ ধক্ষংস করে আবক্ষাসীয় শেষ খলিফা মুসতাসিমকে সপরিবারে নিহত করলে মুসলিম বিশ্বে আর কোনো খলিফা ছিলেন না যার নাম জুমুআর খুতবায় উচ্চারণ করা যায়। প্রায় সাড়ে চার বছর মুসলিম জাহানে সেই শূন্যতা বিরাজমান ছিল। সেই শূন্যতা অপসারণের উদ্দেশ্যে মিসরের মামলূক সুলতান বাইবারস আবক্ষাসীয় খলিফা যাহিরের পুত্র মুনতারসিরকে ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন। উক্ত খলিফা বাইবারসকে মিসর, সিরিয়া, দিয়ারবকর, হিজায ও ইয়েমেনের সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি দেন। মিসরের আবক্ষাসীয় খলিফাগণ প্রায় আড়াই শত বছর খিলাফাত পরিচালনা করেন। মামলুকদের দরবারে তাঁদের মর্যাদা ছিল একজন সাধারণ আমিরের ন্যায়। তাদের নাম খুতবায় পাঠ করা হত মাত্র; কিন্তু তাঁদের হাতে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কেবল ওয়াকফ সম্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল নতুন মামলূক সুলতানদের অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। এটা সত্ত্বেও তাঁদের মর্যাদা ছিল এবং মুসলিম সুলতানদের উপাধি প্রদানসহ রাজকীয় সম্মান প্রদান করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে কতিপয় সুলতানসহ উসমানি সুলতান প্রথম বাইযিদ (১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দ) কায়রোর আবক্ষাসীয় খলিফার নিকট রাজকীয় উপাধি লাভের প্রার্থনা করেন। প্রকৃত পক্ষে কায়রোর আবক্ষাসীয় খলিফাগণ আধ্যাত্মিক খলিফা ছিলেন। বাগদাদের আবক্ষাসীয় খলিফাদের ন্যায় তাদের পার্থিব ক্ষমতা ছিল না।

আবক্ষাসীয় খলিফাগণ নিজ সিলমোহর সই সহকারে খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুস্পষ্ট ভাষ্য বা বিবরণ প্রদান করতেন। খলিফাগণ জনগণের সঙ্গে সাক্ষাত দানের সময় তা করতেন। আবক্ষাসীয় যুগের দলিলপত্রে এটা দেখা যায়। খলিফা দরবারে জনসম্মুখে আনুষ্ঠানিক পরিচয় জ্ঞাপক ব্যাজ তথা পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। মহানবী (স.) বলে কথিত আলখেল্লা জাতীয় জামা ও একটি উঁচু পাগড়ি উল্লেখ ঐসব কাগজপত্রে রয়েছে। নিঃসন্দেহে ঐসব পরিধেয়র প্রচলন উমাইয়া যুগে শুরু হয়। হযরত উসমান (রা.) কপি করানো কুরআন শরিফও খলিফাগণ প্রকাশ্যে বহন করতেন। এর উদ্দেশ্য আল্লাহর রসুল (স.) উত্তরাধিকারী বিশিষ্ট গণমাহাত্ম্যকে তুলে ধরা। এগুলোর মধ্যে প্রধান রীতিটি ছিল সার্বভৌম খলিফার সম্মুখে আসলে তার পদ চুম্বন না করলেও কমপক্ষে কার্পেট চুম্বন করা। ভাবগম্ভীর কোনো শোভাযাত্রা বা মিছিলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রতীকী আচরণ-রীতি চালু ছিল। খলিফা যখন প্রাসাদের বাইরে কোথাও যেতেন কিংবা আবির্ভূত হতেন তখন নিয়মানুযায়ী বর্শাধারী পুলিশ তাঁর অগ্রানুগমন করত যা কার্যত কর্তৃত্বের প্রতীক।[২]

---

১. http://en.wikipedia.org/wiki/Abbasid_Caliphate, visited on: 3/3/2016
২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯০, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে আবক্কাসীয় খিলাফাত:

রাষ্ট্রের ধরন	:	আবক্কাসীয় খিলাফাত (**Abbasid Caliphate**) **الخلافة العباسية**
প্রতিষ্ঠিত	:	৭৫০ খ্রিস্টাব্দ
পতন	:	১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ
খলিফার সংখ্যা	:	৩৭ জন
প্রথম খলিফা	:	আবুল আবক্কাস আস-সাফফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ)
শেষ খলিফা	:	আল-মুস্তাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)
খিলাফাতের মেয়াদ	:	৫০৯ বছর
শাসন বিভাগ	:	১৮ টি
প্রদেশ সংখ্যা	:	৩৬ টি
মুদ্রা	:	দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ফলস (তাম্র মুদ্রা)
রাজধানী	:	কুফা (৭৫০-৭৬২) বাগদাদ (৭৬২-৭৯৬) আর-রাক্কাহ (৭৯৬-৮০৯) বাগদাদ (৮০৯-৮৩৬) সামাররাহ (৮৩৬-৮৯২) বাগদাদ (৮৯২-১২৫৮)
ধর্ম	:	সুন্নি ইসলাম
ভাষা	:	সরকারি : আরবি আঞ্চলিক : আরামাইক, আর্মেনিয়, বার্বার, কপটিক, জর্জিয়ান, গ্রিক, কুর্দি, ফারসি, তুর্কি।
পূর্ববর্তী রাজবংশ	:	উমাইয়া খিলাফাত বুওয়াইদ বংশ
পরবর্তী রাজবংশ	:	মোঙ্গল সাম্রাজ্য তাহিরি বংশ ফাতিমি খিলাফাত আঘলাবি বংশ স্পেনের উমাইয়া বংশ

Dhaka University Institutional Repository

আবক্ষাসীয় বংশ তালিকা হলো:[১]

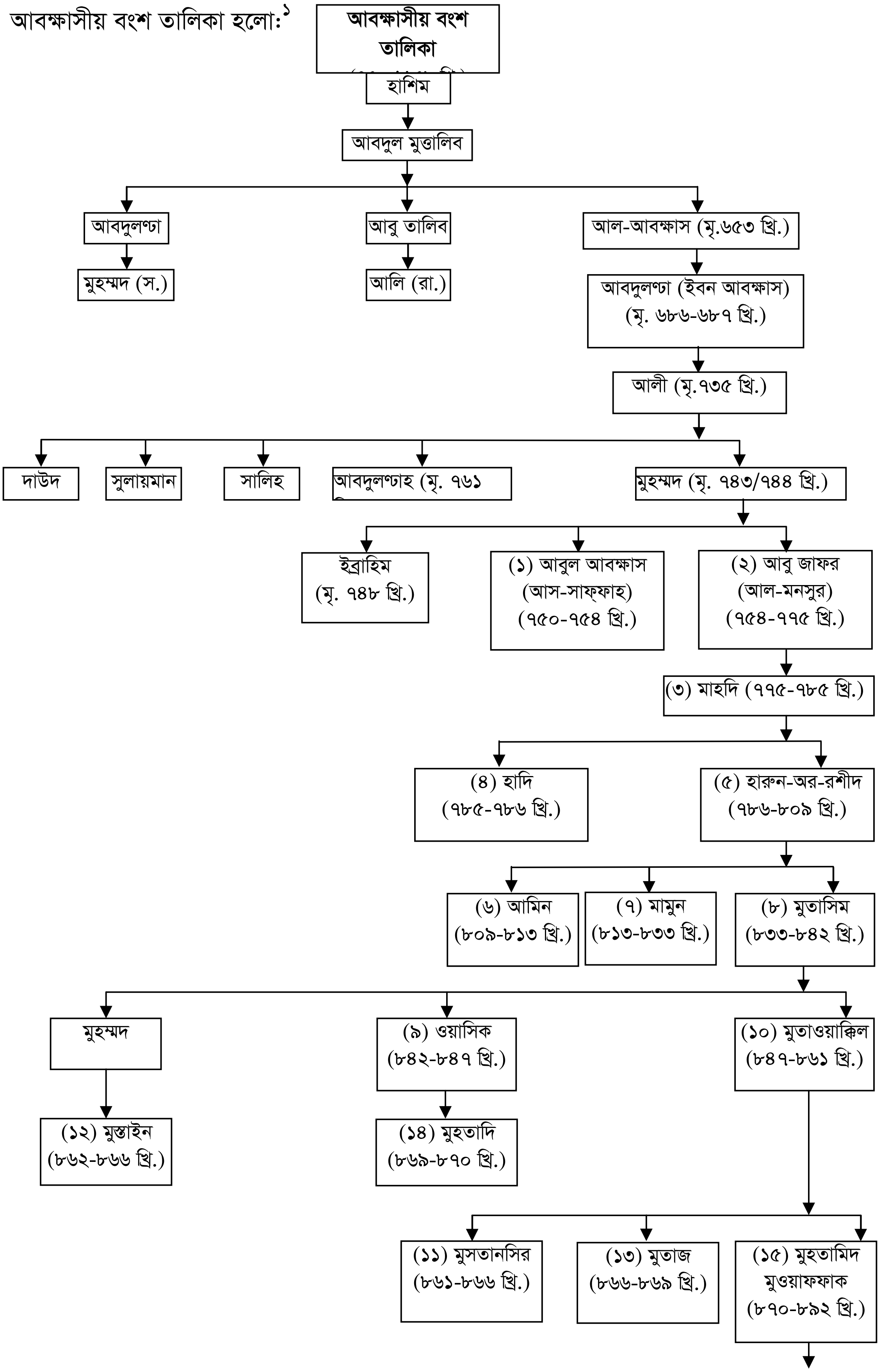

১. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, অনু. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৮, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮৫; ইহাসান আলি চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, নভেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ২৭০-২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

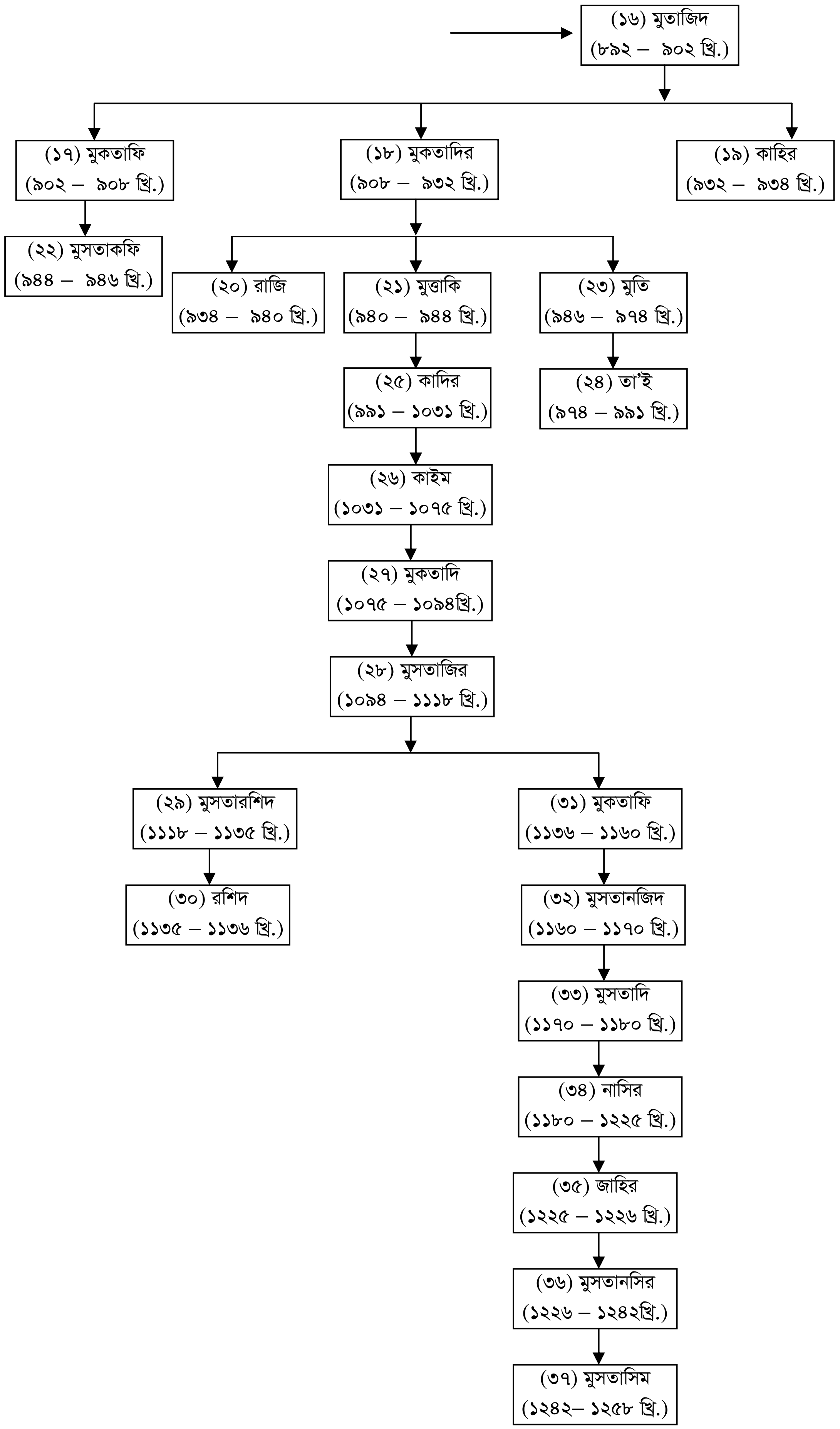

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় যুগের শাসনব্যবস্থা

উমাইয়া শাসনের মত আব্বাসীয় শাসনও ছিল রাজতন্ত্র। উমাইয়া খলিফাদের মত আব্বাসীয় খলিফারাও উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেন। উমাইয়া শাসনে ধর্মনিরপেক্ষতার কিছু আভাষ পাওয়া গেলেও আব্বাসীয় শাসন পুরোপুরি ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। আব্বাসীয়দের সুদীর্ঘ পাঁচশত বছরের শাসনকাল মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ। এ যুগে উমাইয়া যুগের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। উমাইয়া যুগ ছিল প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তারের যুগ। মুসলিম মননশীলতা ও মুসলিম শাসনতন্ত্র বিকাশের যুগ। এ যুগে মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রতিটি শাখায় বিশেষ করে রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থায় অধিকতর সংগঠন ও দক্ষতা অর্জিত হয়। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের শাসনব্যবস্থায় শুধু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধনই করেননি, বরং তাঁরা এতে অনেক মৌলিক নীতিরও সংযোজন সাধন করেন।

আব্বাসীয় খিলাফাতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

আব্বাসীয় শাসনামলে খলিফা ছিলেন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা। খলিফা ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস, রাষ্ট্রীয় শাসনের ব্যাপারে সকল গুরুত্বপূর্ণ আদেশ-নিষেধ তিনিই জারি করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় খলিফার পর ছিল উযিরের স্থান। তিনি ছিলেন খলিফার প্রধান সহযোগী। খলিফা ও উযিরের পর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় হাজিব ছিলেন তৃতীয় প্রধান কর্মকর্তা। খলিফার সচিবালয়ের নাম ছিল দরবারে খিলাফাত বা দিওয়ানে আযিয। যেসব উযির রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হতেন এবং যারা রাষ্ট্রীয় শক্তির চাবিকাঠি বলে বিবেচিত হতেন, তাঁদের দফতর বা সচিবালয়সমূহকেও দিওয়ানে আযিয বলে অভিহিত করা হত। রাষ্ট্রের সমস্ত দফতর ও বিভাগ এ দফতরের অধীনে থাকত। উযিরে আযমকে সংশ্লিষ্ট দফতরের আমলাদের সাথে শলা-পরামর্শ করে বিধি-নিষেধ জারি করতে হত।[১] আব্বাসীয় শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলী প্রধানত নিম্নলিখিত প্রশাসনিক বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল।[২]

(১) দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক বিভাগ) (২) দিওয়ান আল-খারাজ (ভূমিরাজস্ব বিভাগ) (৩) দিওয়ান আল-রাসাইল (সরকারি পত্র রচনা বিভাগ) (৪) দিওয়ান আল-খাতাম (রেজিস্ট্রি বিভাগ) (৫) দিওয়ান আল-বারিদ (ডাক বিভাগ) (৬) দিওয়ান আল-আযিম্মা (হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ) (৭) দিওয়ান আল-নাযর ফিল মাযালিম (অভিযোগ পর্যালোচনা বিভাগ) (৮) দিওয়ান আল-নাফাকাত (রাজকীয় পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগ) (৯) দিওয়ান আল-সাওয়াফি (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বিভাগ) (১০) দিওয়ান আল-দিয়া (খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ) (১১) দিওয়ান আল-সির (গোয়েন্দা বিভাগ) (১২) দিওয়ান আল-আরদ (সামরিক পরিদর্শন বিভাগ) (১৩) দিওয়ান আল-তাওকি (অনুরোধ বিভাগ)[৩] (১৪) দিওয়ান আল-শুরতা (পুলিশ বিভাগ) (১৫) দিওয়ান আল-হিসবাহ (সহযোগী পুলিশ বিভাগ)।

---

১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮

২. Thus the five Central Boards which existed under the Umayyads were continued under the early 'Abbasids, and many more were added to them. By the end of the first century of the 'Abbasid rule, the following Boards seem to have been established; see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration,* Delhi : Idarah-I-Adabiyat-I Delhi, reprint, 1976, p. 159

৩. S.A.Q. Husaini, , *Arab Administration*, Ibid, p. 159

Dhaka University Institutional Repository

Arab Muslim Administration গ্রন্থে আবক্ষাসীয় যুগের নিম্নলিখিত দিওয়ান বা বিভাগসমূহ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়–[১]

(১) **রাজস্ব বিভাগ** (Diwan al-Kharaj); (২) **পত্র বিভাগ বা অনুরোধ বিভাগ** (Diwan al-Rasa'il or Diwan al-khatam or Diwan al-Tawqi) (৩) **হিসাবনিরিক্ষা বিভাগ** (Diwan al-Zimam) (৪) **মাজালিম বিভাগ** (Diwan-Al Nazar fi al-Mazlim) (৫) **বিচার বিভাগ** (Diwan al-Qudat) (৬) **পুলিশ বিভাগ** (Diwan al-Shur'tah) (৭) **হিসবা বা মুহতাসিব বিভাগ** (Diwan Al-Hisbah) (৮) **ডাক বিভাগ** (Diwan Al-Barid) (৯) **সামরিক বিভাগ** (Diwan Al-Jaysh (Jund).

আবক্ষাসীয় আমলের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা বিভিন্ন দিওয়ান বা বিভাগের পাশাপাশি (দিওয়ান-উজ-জিমান), জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা পরিদর্শন বিভাগ, খলিফার সরকারি চিঠিপত্রের যোগাযোগ বিভাগ এবং ডাক বিভাগ ও পুলিশ বিভাগই প্রধান। প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগগুলো ছিল অডিট, বিচারালয় ও পুলিশ। পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুহতাসিব যিনি গণনৈতিকতা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।[২]

পুলিশ বিভাগের প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত। তিনি খলিফার দেহরক্ষী এবং কোনো কোনো সময় মন্ত্রী হিসাবের কাজ করতেন। প্রত্যেক নগরীতেই নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ছিল। তারা নগরবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে যাতে দুর্নীতি প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করত।[৩]

(১) দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক বিভাগ): খলিফা প্রথম উমর কর্তৃক প্রবর্তিত সামরিক বিভাগে উমাইয়া যুগে অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রবেশ করে। আবক্ষাসীয় যুগে সামরিক বিভাগের অনিয়ম ও দুর্নীতি যথাসম্ভব দূর করা হয়। উমাইয়া যুগের মত এই যুগেও কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ দিওয়ানুল জুনদ বা দিওয়ানুল আসকার[৪] নামে অভিহিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য নিয়োগ, সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বন্টন এবং যাবতীয় সামরিক চাহিদা পূরণ কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। উমাইয়া যুগে সামরিক ক্ষেত্রে আরব মুসলমান ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতি প্রচলিত ছিল। সে যুগে সৈন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আরব মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেয়া হত এবং তারা অধিক আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ করত। কিন্তু আবক্ষাসীয় শাসনামলে সৈন্য নিয়োগ এবং সামরিক বেতন ও ভাতা বন্টনের ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। সামরিক বিভাগ প্রধানত সামরিক প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা করত। এ বিভাগের মজলিসুল মুকাবাহ শাখা সৈন্য নিয়োগ, মজলিসুত তাকরির শাখা সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বন্টন এবং দিওয়ানুল আরয শাখা অস্ত্রাগারে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা করত।[৫] মুশরিফুস সানাত বিল মাখযান নামক সামরিক কর্মকর্তা অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধান করতেন।

---

১. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, New Delhi: Kikab Bhavan, 1984, p. 69; সৈয়দ আমির আলি প্রণীত, শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত, ড. মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩

২. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, অনু. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৮, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯১

৩. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৪. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

৫. Another department, but apparently connected with or subordinate to the war office, was the Dewan ul-Araz or military inspection office. The arsenals were under a special officer who was called the Mushrif us-Sanaat bil Makhzan. see. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* Ibid, p. 418

Dhaka University Institutional Repository

(২) দিওয়ান আল-খারাজ (রাজস্ব বিভাগ): এ বিভাগ রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। রাজস্বনীতি নির্ধারণ, রাজস্ব ধার্য ও আদায় করা, রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় বহন যথা– সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বন্টন এবং সরকারের সমুদয় উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ যোগান এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। উমাইয়া যুগের মত আবক্ষাসীয় যুগেও রাজস্ব বিভাগ ছিল সরকারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ। এ বিভাগের প্রধান সাহিব আল-খারাজ ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অতি প্রভাবশালী ও দায়িত্বশীল মন্ত্রী। তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্বের জন্য তাঁকে অনেক সময় 'রাজস্ব প্রভু' নামে অভিহিত করা হত। রাষ্ট্রীয় রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ব্যতীত কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশ সাওয়াদের রাজস্ব আদায় করত। খলিফা মুতাদিদের শাসনকালে দিওয়ানুল খারাজকে দিওয়ানুস সাওয়াদও বলা হত। রাষ্ট্রীয় কোষাগারেরও হিসাব পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্বও এর উপর অর্পিত ছিল।[১] রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনে এ বিভাগের প্রধান সাহিব আল-খারাজকে যে সকল পদস্থ কর্মকর্তা সহযোগিতা করতেন তাঁদের মধ্যে খাযিন (কোষাধ্যক্ষ), কাতিব (সচিব) এবং মুশরিফ (পরিদর্শক) অন্যতম।

(৩) দিওয়ান আল-রাসাইল (পত্র লিখন বিভাগ): আবক্ষাসীয় যুগে রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র ও ফরমান জাঁকজমকপূর্ণ ভাষায় লিখিত হত। সুতরাং প্রতিভাবান, উচ্চ শিক্ষিত, চিঠিপত্র লেখায় পারদর্শী এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকেই রাষ্ট্রীয় পত্র লিখন বিভাগের কর্মকর্তা ও অফিস সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হত।[২] অতি গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এ বিভাগে 'দিওয়ানুস সির' নামে একটি গোপনীয় শাখাও ছিল।[৩] মিসরের ফাতিমীয় খলিফা এবং ভারতের দিল্লি সুলতানদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পত্রলিখন বিভাগ 'দিওয়ানুল ইনশা' নামে অভিহিত ছিল।

(৪) দিওয়ান আল-খাতাম (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ): সরকারি চিঠিপত্র ও আদেশ-নির্দেশে জালিয়াতির সম্ভাবনা দূর করার জন্য আবক্ষাসীয় খিলাফাতের প্রারম্ভিক যুগে খলিফা আল-আমিনের খিলাফাত পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন বিভাগ বলবৎ ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এ বিভাগের কার্যাবলী 'দিওয়ানুত তাওকি' নামে সরকারের অন্য এক বিভাগ পালন করত।

(৫) দিওয়ান আল-বারিদ (ডাক বিভাগ): আবক্ষাসীয় শাসনামলে ডাক ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির মূলে ডাক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর আবক্ষাসীয় খলিফাগণ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। খলিফা মনসুর ও মাহদি ডাক কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ হিসাবে অভিহিত করেন। খলিফা হারুনুর রশিদ তাঁর বাল্য শিক্ষক এবং উপদেষ্টা ইয়াহইয়া বার্মাকির সহযোগিতায় ডাক ব্যবস্থা নতুনভাবে সংগঠিত করেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করণ এবং প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গোপন রিপোর্ট প্রেরণ করা ছিল ডাক বিভাগের প্রধান কর্তব্য। এ বিভাগে নিযুক্ত সকল কর্মচারী

---

১. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam,* Ibid, p. 325
২. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Ibid, p. 416
৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুস আল-জাহশিয়ারী, *কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব*, বৈরুত : দারুল ফিকরিল হাদিস, পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৮ হি., পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় খবরাখবর সংগ্রহে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতায় নিযুক্ত ছিল। অতএব বলা যায়, ডাকবিভাগকে একই সঙ্গে রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগের দায়িত্বও পালন করতে হত। আবক্ষাসীয় গুপ্তচর প্রধান তার অধীনে অনেক বৃদ্ধ মহিলাকে ব্যবহার করতেন।[১]

Arab Muslim Administration গ্রন্থে ডাক বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে,

> The postal department served as a bureau of intelligence and the postmaster-General was the chief of an espionage system and was therefore called Sahib al-barid wa'l akhbar, Controller of the post and intelligence service. He was, therefore, an inspector general of espionage and a confidential agent of the khalifah. Thus he used to gather information about the activities of provincial governors, other officials and chiefs from provincial postmasters whose spies.[২]

সরকারি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলেও ডাক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল না।[৩] ডাক বিভাগের সহযোগিতায় জনগণ দূরদূরান্তে চিঠিপত্র প্রেরণের এবং দূর পথযাত্রায় পথিক ও ব্যবসায়ীরা ডাকগাড়ি ব্যবহারের সীমিত সুযোগ পেত। খবরাখবর আদান-প্রদান ও গোয়েন্দা তৎপরতা ব্যতীত ডাক বিভাগের সাহায্যে সময়ে সময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যও সাধিত হত। জরুরি অবস্থায় দ্রুত পথ অতিক্রমে সৈন্য বাহিনীর জন্য ডাকগাড়ি ব্যবহৃত হত। সরকারি কর্মচারীরাও তড়িৎ গতিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য ডাকগাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পেতেন। নব নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাদের সকল অনুচরবর্গসহ ডাকগাড়ির সাহায্যে নিজ নিজ প্রদেশে পৌঁছতে পারতেন। প্রতিটি ডাকগাড়ি এক সঙ্গে ৫০ হতে ১০০ জন লোক বহন করতে সক্ষম ছিল। ঐতিহাসিক মাসুদির মতে এক সময়ে আবক্ষাসীয় খলিফা মিসরের গভর্নর ইবন তুলুনের জন্য ডাক বিভাগের সাহায্যে একটি শাল প্রেরণ করেন। মিসরের মামলুক সুলতানগণ দামিশক হতে রাজধানী কায়রোতে বরফ সরবরাহের জন্য ডাক বিভাগকে নিয়োজিত করেন।[৪]

ডাক চলাচলের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যের পুরাতন রাজপথের সংস্কার সাধন, নতুন রাজপথ নির্মাণ এবং রাজপথের পার্শ্বে মাইলস্টোন বসানো হয়। রাজধানী বাগদাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ শহর-নগর এবং ব্যবসা কেন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপনকারী বহু রাজপথ নির্মাণ করা হয়। আবক্ষাসীয় যুগের বিখ্যাত রাজপথের মধ্যে বাগদাদ হতে খুরাসান হয়ে চীন সীমান্ত পর্যন্ত বিখ্যাত খুরাসাম রাজপথ, বাগদাদ হতে শিরায, বাগদাদ হতে সিরিয়া এবং বাগদাদ হতে মক্কা মুকাররমা হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত রাজপথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক রাজপথের পাশে নিয়মিত ব্যবধানে ডাক স্টেশন স্থাপন এবং প্রত্যেক ডাক স্টেশনে ডাক বহনের জন্য ডাক বহনকারী পশু (ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও উট) এবং ডাক কর্মচারী মোতায়েন করা হয়। ডাক কর্মচারীরা ডাক এক স্টেশন হতে অন্য স্টেশনে ডাক বহনকারী পশুর সাহায্যে দ্রুত পৌঁছিয়ে দিতে বাধ্য ছিল। এভাবে বিভিন্ন স্টেশনের সহযোগিতায় দীর্ঘপথ অতিক্রমে কোনো অসুবিধা হত না।

উমাইয়া খলিফা মু'য়াবিয়া কর্তৃক প্রবর্তিত 'দিওয়ান-আল-বারিদ' বা ডাকবিভাগ আবক্ষাসীয় আমলে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে জড়িত এ বিভাগের প্রধান কর্তব্য

১. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, অনু. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান, প্রাগুক্ত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯১
২. S.M. Imamuddin, Arab Muslim Administration, Ibid, p. 80
৩. Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* London: The Macmillan Press Limited, 10th edt. 1970, p. 322
৪. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 301

Dhaka University Institutional Repository

ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দ্রুত রাজধানীতে সংবাদ প্রেরণ করা। খলিফা হারুন-আর-রশিদের শাসনামলে বার্মেকি উপদেষ্টা ইয়াহইয়া ডাক বিভাগের সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু বিন্যাস করেন। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রতিটি প্রদেশে একটি করে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নর ডাক বিভাগের মাধ্যমে দ্রুত খলিফার নিকট গোপনীয় রিপোর্ট পাঠাতেন এবং অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় দফতরের নির্দেশনামা দ্রুত প্রদেশে পাঠান হত। ডাকবিভাগের সুবিধার্থে প্রতি চৌকিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল এবং সেখানে পথিক ও কর্মচারীবৃন্দ বিশ্রাম করতে পারতেন। সেখানে জলকূপ, সরাইখানা ও পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। আল-মাহদি এরূপ ব্যবস্থা করেন।

ডাক বিভাগের স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও তিনি প্রদেশ বা দূর-দূরাঞ্চল থেকে কেন্দ্রে গোপনীয় সংবাদাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করতেন। এ কারণে তাঁর প্রকৃত উপাধি ছিল 'সাহিব-আল-বারিদ-ওয়া-আল-আখবার'। মূলত তিনি গোয়েন্দা বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই খলিফার প্রকৃত ও বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন।[১]

(৬) দিওয়ান আল-আযিম্মা (হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ): খলিফা আল-মাহদি সরকারের আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধীয় প্রশাসনিক বিভাগসমূহের দুর্নীতি দমন ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উক্ত বিভাগসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হিসাব নিরীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে দিওয়ানুল আযিম্মা এবং প্রাদেশিক সরকারে দিওয়ানুয যিমাম নামক হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ স্থাপন করা হয়। হিসাব নিরীক্ষণের সুবিধার্থে দিওয়ানুল আযিম্মা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগসমূহের জন্য পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ ও পৃথক হিসাব রেজিস্ট্রার রক্ষা করত। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগসমূহ হলো দিওয়ানুল খারাজ, দিওয়ানুদ দিয়া, দিওয়ানুস সাওয়াফি ও দিওয়ানুন নাফাকাত। প্রাদেশিক হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগও প্রাদেশিক অঞ্চলে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করত। এ দফতরে জিযয়া ও জিম্মি তথা অমুসলিম প্রজাদের সংক্রান্ত দলীল-দস্তাবেজ থাকত। জিযয়া উসুল, জিযয়ার পরিমাণ নির্ধারণ, জিযয়া মওকুফ প্রভৃতি ব্যাপার ছিল এ দফতরের অধীন। এ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের উপাধি ছিল সাহিব দিওয়ান আল-আযিম্মা। তার সহকারীকে 'নায়েব দিওয়ানুল আযিম্মা' বলা হত। দফতর প্রধান অর্থমন্ত্রীর অধীনস্থ বলে গণ্য হতেন। তবে কাযিউল কুযাতের নির্দেশনাও তাঁকে মেনে চলতে হত। কাযিউল কুযাতের নির্দেশাদি সাধারণত জিযয়ার পরিমাণ হ্রাস বা তা মওকুফ করার ব্যাপারেই হত। যেমন তাঁর নির্দেশ হত, অমুক প্রদেশের অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে জিযয়া উসুল করা হবে না, ইত্যাদি।[২]

(৭) দিওয়ান আল-নাযর ফিল মাযালিম (অভিযোগ পর্যবেক্ষণ বিভাগ): সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি, জনগণের উপর অত্যাচার-অবিচার, তহবিল তসরুফ প্রভৃতি অসদাচরণের তদন্ত ও প্রতিকার এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল।[৩] এ দফতরটি মুশরিফে আ'লার অধীনে থাকত। শাহিমহলের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা, রেজিস্টারসমূহের গরমিল খুঁজে বের করা এবং বিভিন্ন

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৮–৫৪৯

৩. 'Al-Ma'mun set apart Sundays for deciding cases of al-mazalim. A woman brought a case against the Khahfah's son. Al-Ma'mun ordered a Qadi to hear and decide the case in his presence. The Qadi decided the case against the prince and the decree was executed." see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 165

Dhaka University Institutional Repository

দফতর পরিদর্শন করা ছিল এ দফতরের প্রধান কাজ। এ দফতর কর্মকর্তাদের দুর্নীতি থেকে বিরত রাখত। অন্যায়ভাবে অধিকৃত জনগণের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া, সরকারি ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভাতা হ্রাস করে বা কমিয়ে দেয়ার অভিযোগ শ্রবণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ, মুহতাসিবের আদেশ-নির্দেশ কার্যকরী করতে তাঁকে সহযোগিতা প্রদান, কাযির রায় আইন সম্মত না হলে সে ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ও পুনঃবিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। দিওয়ানুন নাযর ফিল মাযালিম ছিল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আপিল আদালত।[১]

(৮) দিওয়ান আল-নাফাকাত (রাজকীয় পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগ): রাজদরবার ও রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন, রসদ বন্টন, রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ ও মেরামত এবং রাজ আস্তাবলের তত্ত্বাবধান এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল।

(৯) দিওয়ান আল-সাওয়াফি (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বিভাগ): মুসলিম বিজয়ের সময় প্রাক্তন রাজবংশ ও অভিজাত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের জমি, পারস্যের সাসানিয় শাসনাধীন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় অগ্নিমন্দিরের প্রতি উৎসর্গীকৃত জমি এবং ডাক বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্ধারিত জমি মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসেন। এ সব রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, রাজস্ব আদায় এবং রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ দিওয়ানুস সাওয়াফির উপর ন্যস্ত ছিল।

(১০) দিওয়ান আল-দিয়া (খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ): আবক্ষাসীয় যুগে সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই খলিফাগণ ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার দিওয়ানুদ দিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ইরাক প্রদেশে অবস্থিত খলিফার জায়গীর বলে গণ্য এলাকাসমূহের এবং খলিফার নিজস্ব জমিজমার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এগুলোকে শস্যশ্যামল রাখার উদ্দেশ্যে এ দফতরটি নিয়োজিত ছিল।[২]

(১১) দিওয়ান আল-শুরতা (পুলিশ বিভাগ): নাগরিক জীবনে অপরাধমূলক তৎপরতা দমনে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা অনন্য সাধারণ। পুলিশ বিভাগের দফতরসমূহ এবং এর ব্যবস্থাপনা একজন স্বতন্ত্র কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত থাকত। মুহতাসিব পদও এ বিভাগের অধীন ছিল। পুলিশ বিভাগের সিপাইদের বেতন-ভাতা সাধারণত সামরিক বাহিনীর সিপাইদের চেয়ে বেশি হত এবং এদের নিয়োগের ব্যাপারে যাচাই-বাছাইও হত বেশি।[৩]

(১২) দিওয়ান আল-কাদা (বিচার বিভাগ): বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদে এবং সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক রাজধানীতে ও শহরে কাযি নিযুক্ত ছিলেন। কাযিরা বিচার কার্যে খলিফার প্রতিনিধি। কারণ খলিফা রাষ্ট্রীয় বিচারের উৎস এবং সর্বোচ্চ প্রধান বিচারক। তৃতীয় আবক্ষাসীয় খলিফা মাহদি মুসলিম শাসনব্যবস্থায় কাযিউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতির পদ সৃষ্টি

---

১. 'The board for the inspection of grievances (*diwan al-nazar fi al-mazalim*) was a kind of court of appeal or supreme court intended to set aright cases of miscarriage of justice in the administrative and political departments. Its origin goes back to the Umayyad days, for al-Mawardi tells us that Abd-al-Malik was the first caliph to devote a special day for the direct hearing by himself of appeals and complains made by his subjects." see Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* Ibid, pp. 321-322

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৮-৫৪৯

৩. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৮-৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তিনি খলিফা মাহদি, হাদি ও হারুনুর রশিদের শাসনকাল পর্যন্ত কাযিউল কুযাত পদে নিযুক্ত ছিলেন।[১] কাযিউল কুযাত রাষ্ট্রের বিচার ও ধর্মীয় ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করতেন। খলিফাকে বিচার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়া এবং প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগের বেলায় পরামর্শ দেয়া কাযিউল কুযাতের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে তিনি প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ করতেন বলেও উল্লেখ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ, জটিল দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার কাযিউল কুযাতের মৌলিক এখতিয়ারের মধ্যে গণ্য ছিল। আবক্ষাসীয় যুগে কাযিউল কুযাতকে প্রাচীন পারস্যের সাসানিয় শাসন আমলের মুবিদানে মুবিদের সাথে তুলনা করা হয়। উভয়ই ছিলেন রাষ্ট্রের ধর্ম ও বিচার ব্যবস্থার প্রধান।

(১৩) দিওয়ান আল-তাওকি (অনুরোধ বিভাগ): খলিফার নিকট জনগণের লিখিত আবেদন পত্রের উপর খলিফার সিদ্ধান্ত 'তাওকি' নামে অভিহিত। আবেদন পত্রের উপর খলিফা নিজে কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত সচিব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে সিদ্ধান্ত লিখতেন। কেন্দ্রীয় অনুরোধ বিভাগ খলিফার এসব সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আনুষ্ঠানিক আদেশনামা তৈরি করত এবং অনুলিপি রাখার পর আদেশনামা সীল মোহরকৃত অবস্থায় নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করত।

(১৪) দিওয়ান আল-হিসবাহ (সহযোগী পুলিশ বিভাগ): এটা পুলিশ বিভাগের মত এক প্রকারের আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ। নাগরিক জীবনে সর্ব প্রকারের অপরাধমূলক তৎপরতা দমনে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বিভাগ যথেষ্ট ছিল না। তাই তৃতীয় আবক্ষাসীয় খলিফা মাহদি দিওয়ানুল হিসবাহ নামে এ বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আমির আলি বলেন–

> The municipal police was under a special officer called the Muhtasib. This useful and important office was created by the Caliph Mahdi, and has existed ever since in Islamic countries. The Muhtasib was both superintendent of the markets and a public censor. He went through the city daily, accompanied by a detachment of subordinates, and assured himself of the "due execution of the police orders, inspected the provisions, tested the weights and measures used by tradespeople, and suppressed nuisances. Any attempt to cheat led to immediate punishment. Abu'l Hassan al-Mawardi, "the Hugo Grotius of Islamic public law," after describing the extent and limits of judicial and executive authority, says that the police (hisbat) stand half-way between judicial utterances and the application of executive force."[২]

(১৫) দিওয়ান আল-আযরিয়া (কৃষি বিভাগ): এ বিভাগ রাষ্ট্রের কৃষিকার্যের অগ্রগতি বিশেষ করে পানিসেচ ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ও সেচখাল তত্ত্বাবধান করত। নতুন সেচখাল খনন, পুরাতন খালের সংস্কার সাধন এবং সেচ ব্যবস্থার সাথে জড়িত যাবতীয় কার্যাবলী তদারক এ বিভাগের আওতাধীন ছিল।

(১৬) দিওয়ান আল-মুকাতিয়া (সরকারি ত্রাণ বিভাগ): এ বিভাগ থেকেই জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারি ত্রাণের কার্যক্রম চালানো হত।

---

১. ইবন খাল্লিকান, খ.২, পৃ. ৩৩৪
২. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* Ibid, p. 420

Dhaka University Institutional Repository

(১৭) দিওয়ান আল-মুসাদিরিন (সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বিভাগ): এ বিভাগ পদচ্যুত সরকারি কর্মচারী বিশেষ করে পদচ্যুত উযিরদের নিকট থেকে জোর পূর্বক অর্থ আদায়ের কাজে নিয়োজিত ছিল।

(১৮) দিওয়ান আল-মাওয়ালি ওয়াল গিলমান (দাস-দাসী ও আশ্রিতদের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ): এ বিভাগে খলিফার দাস-দাসী ও আশ্রিত ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষিত থাকত এবং এ বিভাগ থেকে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হত।[১]

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা: শাসনের সুবিধার্থে আবক্ষাসীয় যুগেও সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। খলিফা হারুনুর রশিদ ও আল-মামুনের খিলাফাত কালে আবক্ষাসীয় সাম্রাজ্য ৩৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল।[২] প্রফেসর ফিলিপ কে, হিট্টি অবশ্য ঐ সময়ে সাম্রাজ্যের ২৪টি প্রধান প্রদেশের কথা উল্লেখ করেন।[৩]

ইবনে খলদুন বর্ণিত ৩৬টি প্রদেশ নিম্নরূপ–

(১) আস-সাওয়াদ (২) কাসকার (৩) দিজলা (৪) হালওয়ান (৫) আল-আহওয়ায (৬) ফারস (৭) কিরমান (৮) মুকরান (৯) সিন্দ (১০) সিজিস্তান (১১) খুরাসান (১২) গুরগান (১৩) কুমিস (১৪) তাবারিস্তান (১৫) আর-রাই (১৬) ইস্ফাহান (১৭) হামাদান (১৮) বসরা ও কুফা (১৯) সাহারজুর (২০) মোসুল (২১) আল-জাযিরাহ (২২) আযারবাইজান (২৩) মুকান ও কার্ক (২৪) জিলান (২৫) আর্মেনিয়া (২৬) কিনাসিরিন ও আওয়াসিম (২৭) হিমস (২৮) দামিশক (২৯) জর্দান (৩০) ফিলিস্তিন (৩১) মিসর (৩২) বারকা (৩৩) ইফ্রিকিয়া (৩৪) ইয়েমেন (৩৫) মক্কা ও মদিনা ও (৩৬) মাসাবাদন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

আবক্ষাসীয় যুগেও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন আমির। আমির প্রাদেশিক শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি একই সঙ্গে প্রদেশের সামরিক ও বেসামরিক শাসনের প্রধান। প্রদেশে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনারও অধিনায়ক ছিলেন আমির। প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক অন্যান্য কর্মচারীদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, বিধর্মী ও বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং নাগরিকেদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মীয় নিরাপত্তাবিধান আমিরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে গণ্য ছিল।

উযিরের পরামর্শক্রমে খলিফা আমির নিযুক্ত করতেন।[৪] খলিফার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, খলিফার প্রতি বিশেষভাবে অনুগত ব্যক্তি কিংবা খিলাফতের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিকেই আমির নিয়োগ করা হত। বস্তুত রাজনৈতিক কারণ[৫] এবং খলিফার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন আমির পদে নিয়োগের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে বিবেচিত হত।[৬] রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আবক্ষাসীয় আন্দোলনে নেতৃত্বদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খলিফা আস-সাফ্ফাহ আবু মুসলিম খুরাসানিকে খুরাসানের এবং আবু আইয়ুনকে মিসরের আমির নিয়োগ করেন। খলিফা মামুন

১. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 307
২. ইবন খালদুন, *মুকাদ্দিমাহ*, খ. ১, পৃ. ৩২৩
৩. Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* Ibid, pp. 224, 330
৪. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Ibid, p. 86
৫. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 363
৬. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 364

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ভাই আমিনের বিরুদ্ধে খুরাসানের অধিবাসীদের সক্রিয় সমর্থনের জন্য সে প্রদেশের আমির কিংবা অন্য কোনো সরকারি পদে খুরাসানিদের দাবির অগ্রাধিকার দিতেন।[১] হারুন-অর-রশিদ পুত্র মামুনকে খুরাসানের এবং খলিফা মুতামিদ ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দু'পুত্র জাফর ও আবু আহমদকে যথাক্রমে সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের আমির নিয়োগ করেন। যখন কোনো যুবরাজকে আমির নিয়োগ করা হত তখন তাঁর উপদেষ্টা ও সহযোগী হিসেবে একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক অধিনায়ককে তাঁর সাথে সংযুক্ত করা হত।[২]

আমিরকে সামরিক এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শিতার অধিকারী হতে হত। আমির খলিফা কিংবা উযিরের নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা এবং অসৎ উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জনের মত গুরুতর অপরাধের অভিযোগে আমির খলিফা কিংবা উযির কর্তৃক পদচ্যুত হতেন। পদচ্যুত উযিরের মত পদচ্যুত আমিরের সম্পত্তিও প্রায়ই বাজেয়াপ্ত করা হত। রাষ্ট্রীয় শাসনে অত্যন্ত তৎপর এবং মনোযোগী খলিফা উযিরের সুপারিশ ব্যতীত নিজেই আমির নিযুক্ত করতেন এবং আমিরের পদচ্যুতিও সম্পূর্ণরূপে তাঁর খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করত। আবক্ষাসীয় শাসনের প্রারম্ভিক যুগে বিশেষ করে খলিফা মনসুরের আমলে আমির নিয়োগ, বদলী ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণরূপে খলিফার ইচ্ছাধীন ছিল।[৩] খলিফা মনসুর অসদুপায়ে ধন-সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পদচ্যুত আমিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। এভাবে বাজেয়াপ্তকৃত ধন-সম্পদ জমা রাখার জন্য তিনি 'বায়তুল মাল আল-মাযালিম' (অন্যায় অর্জিত সম্পদের কোষাগার) নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগার স্থাপন করেন।[৪]

আল-মাওয়ারদি আবক্ষাসীয় শাসন আমলে প্রাদেশিক আমিরদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে তাঁদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন।

খলিফার কোনো বিশেষ প্রিয়ভাজন ব্যক্তিকে কোনো কোনো সময় অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে প্রাদেশিক আমির নিয়োগ করা হত। তবে সাধারণত দুর্বল ও অযোগ্য খলিফা কিংবা শাসন ব্যাপারে অমনোযোগী খলিফার আমলে প্রাদেশিক আমিরগণ অসীম ক্ষমতা ভোগ করতেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমির প্রাদেশিক শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রদেশের সামরিক, বেসামরিক, রাজস্ব, বিচার ও ধর্মীয় শাসনের প্রধান। তিনি প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ ও বিচারকদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব ধার্য, রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব ব্যয়ের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পুলিশ বাহিনী নিয়োগ এবং পুলিশের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। কোনো নূতন মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা, শুক্রবারের জুময়ার নামায এবং বাৎসরিক ঈদের নামায পরিচালনা এবং প্রতি বৎসর পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনাতে হজ পার্টি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ আমিরের কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কোনো কোনো সময় আমির নিজে আবার কোনো কোনো সময় তাঁর মনোনীত কোনো ব্যক্তি হজ পার্টির

---

১. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Ibid, p. 86

২. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Ibid, p. 410

৩. আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদি, *কিতাবু দুরারিস সুলূক ওয়া সিয়াসাতিল মুলূক*, রিয়াদ : দারুল ওয়াতান লিন্নাশরি, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি., ১৯৯৭, পৃ. ১১৫

৪. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Ibid, p. 409

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব দিতেন। বেদুঈনদের আক্রমণ হতে হজ পার্টির নিরাপত্তার জন্য হজ পার্টির অধিনায়ক (আমির-আল-হজ) প্রয়োজনীয় সৈন্য-বাহিনী সঙ্গে নিতেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী আমিরের কার্যাবলীতে কেন্দ্রীয় সরকার খুব কমই হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁকে ঘন ঘন বদলী করা হত না। অনেক সময় তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকতেন।

অত্যন্ত দক্ষ এবং শাসনকার্যে খুবই মনোযোগী খলিফার আমলে প্রাদেশিক আমিরগণ সীমিত ক্ষমতা ভোগ করতেন। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমিরের কার্যাবলীতে কেন্দ্রীয় সরকার অহরহ হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁদেরকে ঘন ঘন এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে বদলী করা হত এবং সামান্য অপরাধের অজুহাতে তাঁদেরকে ক্ষমতাচ্যুত ও তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার প্রাদেশিক আমির প্রাদেশিক রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থায় কোনো কর্তৃত্ব করতে পারতেন না।[১]

আবক্ষাসীয় শাসনকালে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশের প্রাদেশিক আমিরগণ সুযোগ পেলেই খলিফার ক্ষমতা উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। সে যুগে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ এবং অন্যান্য কারণে খলিফার পক্ষেও অনেক সময় এসব জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী প্রাদেশিক আমিরগণকে দমন করা সম্ভব হত না। ফলে তারা প্রদেশে স্থায়ীভাবে স্বাধীন বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতেন। খলিফা মামুনের শাসনকালে আবক্ষাসীয় সামরিক শক্তি যখন অক্ষুণ্ন ছিল তখনও ইয়ামেনের আমির মুহাম্মদ ইবন ইবরাহিম ইয়ামেনে এবং খুরাসানের আমির তাহির ইবন হুসেন খুরাসানে স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে আবক্ষাসীয় খিলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাদেশিক আমিরদের স্বাধীনতা স্পৃহা খুবই প্রবল হয়ে উঠে। ফলে বহু স্বাধীন আমিরাতের উৎপত্তি হয়। এসব জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী স্বাধীন আমিরগণ যদিও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন স্বাধীন নরপতি তবুও নিজেদের স্বার্থে তাঁরা খিলাফতের সাথে নামমাত্র সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাঁরা খলিফাকে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রধান হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতেন। জুমু'আর নামাযের খুতবায় তাঁদের নিজের নামের সাথে খলিফার নাম পাঠ করতেন এবং খলিফাকে নামমাত্র বার্ষিক কর প্রদান করতেন। দুর্বল খলিফাগণ তাঁদের শক্তিশালী স্বাধীন আমিরদের এ আনুগত্য প্রদর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকে ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করতেন এবং বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করতেন।

জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী স্বাধীন আমিরকে প্রাদেশিক আমির না বলে খিলাফতের আওতাধীন স্বাধীন মুসলিম নরপতি বলাই যুক্তিযুক্ত। অসীম ক্ষমতার প্রাদেশিক আমির এবং সীমিত ক্ষমতার প্রাদেশিক আমিরের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপারে যতই পার্থক্য থাক না কেন তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। তবে কোনো আমিরের পক্ষে একা প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্ব কতিপয় প্রশাসনিক দফতরের উপর ন্যস্ত ছিল। বলাবাহুল্য প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক দফতরগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক দফতরের শাখা স্বরূপ ছিল। আবক্ষাসীয় যুগে প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে নিম্নবর্ণিত ৯টি প্রশাসনিক দফতর কার্যকর ছিল: (১) দিওয়ানুল খারাজ (রাজস্ব বিভাগ) (২) দিওয়ানুল বারিদ (ডাক বিভাগ) (৩) দিওয়ানুল জুনদ (সামরিক বিভাগ) (৪) দিওয়ানুর রাসাইল (পত্র লিখন বিভাগ) (৫) দিওয়ানুল যিমাম (হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ) (৬) দিওয়ানুদ দিয়া (প্রদেশে খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ) (৭) দিওয়ানুল কাদা (বিচার বিভাগ) (৮) দিওয়ানুশ শুরতা (পুলিশ বিভাগ) ও (৯) দিওয়ানুল হিসবাহ্ (সহযোগী পুলিশ বিভাগ)।

---

১. Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* Ibid, pp. 224, 331

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো

আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশ বিভাগ 'দিওয়ান আল-শুরতা' নামে পরিচিত ছিল এবং এ বিভাগের প্রধান ছিলেন 'সাহিব আল-শুরতা'। তিনি সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীরও প্রধান ছিলেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) সে পুলিশ বিভাগকে পুনর্বিন্যাস করেন। নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য উমাইয়া ও আবক্ষাসীয় যুগেও এ বিভাগ বিশেষ অবদান রাখে। উল্লেখ্য সাম্রাজ্যের বিশালতার কারণে আবক্ষাসীয় খিলাফতে পুলিশ বিভাগের সম্প্রসারণ ঘটে।[১]

এযুগে পুলিশ বাহিনীতে চারটি শাখা ছিলঃ (১) সাধারণ শান্তিরক্ষাকারী বাহিনী বা 'শুরতা' (২) সামরিক পুলিশ বা 'মাউনা' (৩) দেহরক্ষী বাহিনী বা 'হারাস' (৪) বিশেষ পুলিশ বাহিনী বা 'আহদাস'। পুলিশ বিভাগের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন 'সাহিব আল-শুরতা' এবং তারই তত্ত্বাবধানে পুলিশ প্রশাসন দায়িত্বপালন করতেন। সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ এবং প্রদেশে কোনো প্রকার বিদ্রোহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে তা দমন করত 'মাউনা' বা সামরিক পুলিশ বাহিনী। তাবারিস্তান ও মিসরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে এ বাহিনী প্রেরিত হত। অপরাধীদের অনুসন্ধান করে গ্রেফতার করে আইনের শাসনে আনার দায়িত্ব ছিল 'হারাস' বা প্রহরী পুলিশ বাহিনীর উপর। তাছাড়া রাজকীয় অনুষ্ঠানে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় এবং সীমান্তের ফাঁড়ি পাহারার কাজেও তাদের নিয়োজিত করা হত। খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবে 'হারাসের' বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষ পুলিশ বাহিনী 'আহদাস' বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকত। রাজস্ব আদায়ে সহায়তা, হজ মওসুমে মক্কার রাজপথে নিরাপত্তা বিধান, হজযাত্রীদের নিকট হতে যাকাত আদায় প্রভৃতি কর্তব্য পালন করত 'আহদাস'। সাহিব আল-শুরতার পদমর্যাদা ছিল মন্ত্রীর সমতুল্য।[২]

খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সময় শুরতা বা পুলিশ বিভাগ Gendarmerie-এর অধীনস্ত ছিল। সাহিব আল-শুরতা অর্থ দেহরক্ষীদের অধিনায়ক। ইসলামি ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে প্রদেশ এবং শহরের গভর্নরগণ রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা নিরাপত্তার জন্য দায়ী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে একজন কর্মকর্তার উপর অর্পিত হয়। যার প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বা "Chief Constable" বলা হত। পুলিশ কর্মকর্তার সমসাময়িক হিসেবে আরেকজন কর্মকতার নাম শুনা যায়, যাকে সাহিব আল-মাউনা বলা হত। Cahen এর মতে, সাহিব আল-শুরতা এবং সাহিব আল-মাউনা বাস্তবিক পক্ষে একজন আরেকজনের সমতুল্য। Lokkegaard এর মতে, শাহিব আল মাউনা হলেন সামরিক পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।[৩]

---

১. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৬২৩

২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩

৩. "The Shurta (i.e the forces of law and order) under al-Mutawakkil gendarmerie. Sahib al-Shurta means commander of the body guard. In the early history of Islam, the Governor of a province or a town was fully responsible for law and order and for security of the state. These responsibilities developed gradually on an officer called Sahib al-Shurta or æChief Constable"." another parallel designation was also used to designate this police officer. It was 'Sahib al-Mauna.' Cahen says that 'Sahib al-Shurta' and 'Sahib al-Mauna' are practically equivalent one to the other. Lokkegaard takes

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক জীবনে অপরাধমূলক তৎপরতা দমনে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) শুরতা (شُرطة) নামে নগর রক্ষী বাহিনী নিয়োগ করেন। নগর রক্ষী বাহিনীর প্রধান সাহিব আল-শুরতা (صاحب الشرطة) নামে অভিহিত ছিলেন। উমাইয়া খলিফাগণও রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ ব্যবস্থা বলবৎ রাখেন। উমাইয়া যুগের পুলিশ প্রধান 'সাহিব আল-শুরতা' এবং 'সাহিব আল-আহদাস' (صاحب الأحداس) এ দুই নামেই অভিহিত ছিলেন। আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশ সংগঠন ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রসার ঘটার প্রাক্কালে পুলিশ বাহিনী নিম্নলিখিত চারটি বিশেষ শাখায় সংগঠিত ছিল-

ক. আশ-শুরতা (সাধারণ পুলিশ বাহিনী): এ বাহিনীর প্রধান (صاحب الشرطة) 'সাহিব আল-শুরতা' নামে অভিহিত ছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যকে যেমন আশ-শুরতা বলা হত, তেমনি উভয় পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত করা হত।[১] পুলিশ বিভাগের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন 'সাহিব আল-শুরতা' এবং তারই তত্ত্বাবধানে গোটা পুলিশ প্রশাসন পরিচালিত হত।[২]

খ. আল-মা'উনা (সামরিক পুলিশ বাহিনী): এ বাহিনীর প্রধানের উপাধি ছিল (صاحب المعونة) 'সাহিব আল-মা'উনা'।

গ. আল-হারাস (প্রহরী পুলিশ বাহিনী): এ বাহিনীর প্রধানের উপাধি ছিল (صاحب الحرس) 'সাহিব আল-হারাস'।

ঘ. আল-আহ্দাস (বিশেষ পুলিশ বাহিনী): এ বাহিনীর প্রধানের উপাধি ছিল (صاحب الأحداث) 'সাহিব আল-আহদাস'।

(১) আশ-শুরতা (সাধারণ পুলিশ বাহিনী): আবক্ষাসীয় শাসনামলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা, চুরি-ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি, দাঙ্গা প্রভৃতি অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধ করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীতে ও শহরসমূহে পুলিশ বাহিনী নিয়োজিত ছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যকে যেমন আশ-শুরতা বলা হত, তেমনি উভয় পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত করা হত।[৩] পুলিশ বিভাগের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন 'সাহিব আল-শুরতা' এবং তারই তত্ত্বাবধানে গোটা পুলিশ প্রশাসন দায়িত্ব পালন করতেন।[৪] পুলিশ বাহিনী বলতে সাধারণত আশ-শুরতাকে এবং পুলিশ প্রধান বলতে সাধারণত সাহিব আল-শুরতাকেই বুঝানো হত। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদে, প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক বড় বড় শহরেও আশ-শুরতা নামক পুলিশ বাহিনী এবং সাহিব আল-শুরতা নিযুক্ত থাকতেন। কোনো কোনো প্রদেশে সাহিব আল-শুরতা নিজেই প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন

---

the Sahib al-Mauna to be the officer in-charge of the military police. see. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1969, p. 226

১. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩

৩. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৪. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,*আরব জাতীর ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩

Dhaka University Institutional Repository

করতেন।[১] কিন্তু সাধারণত তিনি ছিলেন প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনস্থ পৃথক কর্মচারী। 'সাহিব আল-মা'উনা', সাহিব আল-হারাস' এবং সাহিব আল-আহদাস' সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে ও শহরে নিযুক্ত হতেন না। বিশেষ প্রদেশে জটিল পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য বিশেষ দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য এ সকল পুলিশ কর্মকর্তা নিযুক্ত হতেন।

(২) আল-মাউনা (সামরিক পুলিশ বাহিনী): সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ এবং প্রদেশে কোনো প্রকার বিদ্রোহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে তা দমন করত এ 'মাউনা বা সামরিক পুলিশ বাহিনী। তাবারিস্তান ও মিসরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে এ বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল।[২] আল-মা'উনা পুলিশ বাহিনী সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে ও শহরে দাঙ্গা, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনে নিয়োজিত থাকত। মিসর ও তাবারিস্তানের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে এবং আবক্ষাসীয় কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদে প্রায়ই আল-মা'উনা পুলিশ বাহিনী নিয়োজিত থাকত। কোনো কোনো সময় প্রাদেশিক গভর্নর নিজেই সাহিব আল-মাউনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাঁর অধীনে সাহিব আল-শুরতাও নিযুক্ত হত।

সাহিব আল-মাউনার প্রধান দায়িত্ব ছিল জরুরি প্রয়োজনে সামরিক উদ্দেশ্য কিন্তু অনেক সময় তাকে পুলিশি দায়িত্ব প্রদান করা হত।[৩]

ঐতিহাসিক Levy এর মতে, মাওনা বলতে ছোট এলাকার পুলিশিংকে বুঝায় না। খলিফা ওয়াসিক এর রাজত্বকালে সামাররাহ এর নিয়ন্ত্রণ ছিল মাউনার অধীনে। ইসহাক বিন ইব্রাহীম এ সময় বাগদাদের পুলিশেরও নিয়ন্ত্রণ করতেন। সামররাহ কোনো ক্ষুদ্র এলাকা নয়; এটি ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী। কোনো কোনো প্রদেশে সাহিব আল-শুরতা ছিল না, সাহিব আল-মাউনাই সেখানে যথেষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ দামেস্ক বা হিমস্। বাইজানটাইন কর্তক ৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে দামিয়েতা আক্রান্ত হলে মিসরের গভর্নর আনবাসা মাউনা পুলিশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও আবু আহমদ আল কাম্মি তার পূর্ণ পদমর্যাদার পুলিশ প্রধান ছিলেন। সামরিক স্বভাবের হলেও মাউনা পুলিশি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে হিমসে বিদ্রোহ দেখা দিলে আমিল আব্দুল মুগিদ বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সাহিব আল-মাউনা মুহাম্মদ বিন আবদাহি অবস্থার উন্নতি করেন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জনে আল-মুতাওয়াক্কিল তাকে দামেস্ক এবং রামলার সেনা ছাউনী থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেয়ার অনুমতি দেন। তৎপ্রেক্ষিতে সাহিব আল-মাউনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্রোহী নেতাকে পরাস্ত করেন। অতঃপর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দন্ড কার্যকর করেন।[৪]

(৩) আল-হারাস (প্রহরী পুলিশ বাহিনী): অপরাধীদের অনুসন্ধান করে গ্রেফতার করতঃ আইনের শাসনে আনার দায়িত্ব ছিল এ 'হারাস' বা প্রহরী পুলিশ বাহিনীর। তাছাড়া রাজকীয় অনুষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সীমান্তের ফাঁড়ি পাহারার কাজেও তাদের নিয়োজিত করা হত। খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবে 'হারাসের' বিশেষ ভূমিকা ছিল।[৫] আল-হারাস বা প্রহরী পুলিশ বাহিনী অপরাধ দমন ও অপরাধের কারণ খুঁজে বের করার জন্য নিয়োজিত হত। এ বাহিনী সাহিব আল-শুরতাকে পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের অভ্যর্থনায় এবং রাজ দরবারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মত

১. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 227
২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩
৩. "The sahib ma'una, whose prime concern was with emergency stories for military purposes, but who might also be responsible for certain police duties." see. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 381
৪. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, pp. 228-229
৫. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতা করত। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে সীমান্ত ফাঁড়ি প্রহরার কাজে আল-হারাস পুলিশ বাহিনী নিয়োজিত থাকত।

(৪) আল-আহদাস (বিশেষ পুলিশ বাহিনী): 'আহদাস' এর শাব্দিক অর্থ যুবকবৃন্দ। এক প্রকার শহুরে অনিয়মিত সৈনিক (মিলিশিয়া) যারা সিরিয়া ও উত্তর মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন শহরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং বিশেষ করে 'আলেপ্পো' ও 'দামিশকে' সুপরিচিত ছিল। সরকারীভাবে এ বাহিনী পুলিশের ভূমিকা পালন করত, যাদের দায়িত্ব ছিল সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অগ্নি নির্বাপন ইত্যাদি। আবার প্রয়োজনের সময় তারা নিয়মিত সৈন্যদের অতিরিক্ত শক্তিরূপে সামরিক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকত। এসব কাজের জন্য 'আহদাস' সদস্যগণ কতিপয় নগর শুল্ক দ্বারা গঠিত তহবিল হতে বৃত্তি লাভ করত। সাধারণ পুলিশের সহিত তাদের একমাত্র পার্থক্য, তারা স্থানীয়ভাবে অপেশাদারী তালিকাভুক্ত। তবে এ কারণেই তারা পুলিশের অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক কার্যকারি সংগঠন হয়ে উঠে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র ও যুদ্ধপ্রিয় লোক হিসেবে তারা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের (সচরাচর বিদেশি অথবা বহিরাগত) বিরুদ্ধের 'সংঘাধীন' প্রতিবন্ধকতার গতিশীল উপাদান হিসেবে গড়ে উঠে। এ কারণেই তাদেরকে বারবার শাসকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখা যায়। কখনও কখনও শাসকগণ দুর্বল হলে তারা নগর প্রশাসনে নিজেদেরকে অংশীদার করতে শাসকদের বাধ্য করত। তারা সর্বদা জনগোষ্ঠীর একই স্তর হতে উদ্ভূত ছিল না। সংকট মুহূর্তে যেমন ফাতিমিদের দামিশক দখলের অব্যবহিত পরেই তাদের উপর জনপ্রিয় শক্তিসমূহের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রায়শ তাদেরকে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নির্দেশ গ্রহণ করতে এবং একটি কিংবা দুটি বড় পরিবারের এক বিশেষ সমর্থকগোষ্ঠী গঠন করতে দেখা যায়। এই বড় পরিবার হতে একজন তাদের নেতা বা রাইস মনোনীত হত।[১]

রাজস্ব আদায়ে সহায়তা, হজ মওসুমে মক্কার রাজপথে নিরাপত্তা বিধান, হজযাত্রীদের নিকট হতে যাকাত আদায় প্রভৃতি কর্তব্য পালন করত 'আহদাস' বাহিনী।[২] মোটকথা আল-আহদাস পুলিশ বাহিনী কোনো বিশেষ কাজের জন্যই নিয়োজিত থাকত। প্রাদেশিক গভর্নরকে রাজস্ব আদায়ে সহযোগিতা করা এবং রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বিধান ছিল এই বাহিনীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে হজ অনুষ্ঠানের সময় মক্কার রাজপথে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও হজযাত্রীদের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্য জাফর ইবন দিনারের অধীনস্ত আল-আহদাস পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। খলিফা আল-মাহদির শাসনামলে বসরার গভর্নর আমর ইবন হামজাকে খারাজ রাজস্ব আদায়ে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর অনুরোধে তাঁর অধীনে খলিফা একটি অতিরিক্ত আল-আহদাস পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করেন।

কিছু গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব ছিল আহদাস পুলিশদের তত্ত্বাবধান করা। আহদাস শব্দটি প্রথম শতাব্দিতে ইরাকে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে সপ্তম শতাব্দীতে বসরা, কুফা ও বাগদাদে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও বিতর্ক রয়েছে। Peter von Sivers গবেষণার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে 'আহদাস' শব্দটি প্রাথমিক মুসলিম সমাজে প্রচলন হয়েছে? আহদাস শব্দটির অর্থ হল 'groups of young men' and 'urban militia' অর্থাৎ যুবকদের

---

১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, আগষ্ট-১৯৮৭, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৫
২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩

Dhaka University Institutional Repository

একটি দল এবং শহরের সৈন্যবাহিনী। এ আহদাস বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সম্মিলিতভাবে পুলিশ ও বিচার প্রশাসনের উপর ছিল।[১]

ঐতিহাসিক ইয়াকুবি আবক্ষাসীয় যুগের প্রাথমিক সময়ে 'সাহিব আল-শুরতা' এবং 'সাহিব আল-হারাস' বিষয়ের উল্লেখ করেন। খলিফা মনসুর এবং আল-মামুনের সময়ে বাগদাদ নগরী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে খোরাসানে সাহিব আল-হারাস নিয়োজিত ছিল। Mazyar এর শাসনামলে তাবারিস্তান প্রদেশেও সাহিব আল-হারাস নিয়োজিত ছিল। মিসরে সাহিব আল-শুরতা গভর্নরের অধীনস্ত এবং গভর্নর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। যে সমস্ত প্রদেশে ওয়ালি বা শাসনকর্তা নিজেই পুলিশ প্রধান ছিলেন সেখানে সাহিব আল-হারাস, সাহিব আল-শুরতার অধীনস্থ ছিলেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে ইসহাক বিন ইব্রাহিম বাগদাদ নগরীর এরূপ প্রশাসক ছিলেন। তাবারিস্তানে সাহিব আল-শুরতা এবং সাহিব আল-হারাস উভয়েই আমির Mazyar এর অধীনস্ত ছিলেন।[২]

ঐতিহাসিক ইয়াকুবি সাহিব আল-বালাদকেও সাহিব আল-শুরতার সমকক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সামাহ বিন লুয়াই তার সচিবের সহযোগিতায় সিন্দ প্রদেশের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করেন। সামাহ বিন লুয়াই পূর্বে সিন্দ প্রদেশের সাহিব আল-বালাদ ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি পুলিশ প্রধানের সমকক্ষ ছিলেন। যেহেতু এ পদটি গভর্নরের পরবর্তী পদমর্যাদার ছিল সুতরাং প্রদেশের সাময়িক দায়িত্ব তার নিকটেই আসত।[৩]

পর্যবেক্ষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শহর এলাকায় সাহিব আল-শুরতা এবং সাহিব আল-মাউনা সমমর্যাদার কর্মকর্তা। আঞ্চলিক ও জরুরি পুলিশ প্রয়োজনে এবং যুদ্ধের সময় পুলিশকে মাউনা বলা হয়ে থাকে। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময়ে মিসরের আমির মাউনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং যদিও তাঁর অধীনে একজন সাহিব আল-শুরতা ছিল। বাইজেনটাইন সীমান্ত এলাকায় বাইজেনটাইনদের

---

১. "Some governors had a special deputy for the supervision of the ahdath. The term ahdath is found in earlier centuries in Iraq, sepecially in Basra and Kufa in the first/seventh century, but also in Baghdad and elsewhere. The exact meaning of this term and the purpose of the office attaced to it is still a matter of dispute. In a detailed study Peter von Sivers has discussed the various ways how the word ahdath was used in early Muslim society. It can have the meaning of 'events (touching on public order). 'groups of young men' and 'urban militia.' Often the position of control of the ahdath appears in combination with other officers, such as leadership of stationary armed forces (shurta), or sometimes with the duty of leading the prayer, police, and judicial administrtion." see. Mohsen Zakeri, *Sasanid Soldiers in Early Muslim Society*, Wiesbaden : Harbard & Company, 1995, p. 178

২. "The Sahib al-Haras Ya'qubi mentions appointments to the offices of Sahib al-Shurta and Sahib al-Haras in the early 'Abbasid times. In addition to Baghdad, an important province like Khurasan had a Sahib al-Haras, e.g. in the tie of Mansur and M'amun; the province of TAbaristan, under Mazyar, also had a Sahib al-Haras. In Egypt the Sahib al-Shurta was under the governor, who appointed him, in those provinces, where the Sahib al-Shurta was himself the Wali, the Sahib al-Haras was sub-ordinated to the Sahib al-Shurta as was the case with Baghdad under Ishaq b. Ibrahim in the reign of al-Mutakkil. In Tabaristan both the Sahib al-Shurta and the Sahib al-Haras were subordinate to the Amir Mazyar." see. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, pp. 229-230

৩. "Ya'ubi mentions yet another term which, have been used for the Sahib al-Shurta. Sama b. Luwai managed the affairs of Sid with the asistance of this secretary, 'Abd al-Aziz al-Sami al-Muntah, when the 'Amil of Sind, Harun b. Abi Khaid, died in 240/854. Sama, b. Luwai was previously the Sahib al-Balad in Sind, which indicates that he was holding a post equivalent to that of Sahib al-Shurta. As this post was next in rank to that of the governor, so the charge of the province came in his hands temporarily pending the arrival of new order from the centre." see. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 230

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণ মোকাবিলা, বুজা এলাকার বর্হিঃআক্রমণ প্রতিহত করতে মিসরের গভর্নর জরুরিভিত্তিতে মাউনার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। এছাড়া মিসরের দক্ষিণ অঞ্চলের অভিযানে সহায়তা করার জন্য মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ কাম্মিকে দায়িত্ব দেন। যেমন সাহিব আল-শুরতা ইসহাক বিন ইব্রাহিম সামাররাহ্ এবং ইতকা এলাকায় মাউনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

সাহিব আল-হারাসকে পৃথক পুলিশ দায়িত্ব যেমন– পাহারা কার্যক্রম প্রদান করা হলেও তিনি প্রাদেশিক গভর্নর এবং সাহিব আল-শুরতার অধীনস্থ ছিলেন।

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে সাহিব আল-শুরতা, সাহিব আল-হারাস, সাহিব আল-মাউনা এবং সাহিব আল-আহদাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার গভর্নর আলি বিন ঈসা বিন মুসা হজ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করলেও জাফর বিন দিনার মক্কার রাস্তার নিরাপত্তার জন্য আহদাস বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।[১]

Cahen এর মতে, শুরতা ও মাউনার মত আহদাস ও সামরিক বৈশিষ্ট্য অধিকারী সৈন্য যারা গভর্নর বা আমিরের নিয়ন্ত্রণে থেকে প্রদেশের নিরাপত্তা ও রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করতো।

Jahshiyari এর মতে, খলিফা আল মাহদি এর রাজত্বকালে আম্মারাহ বিন হামযাহ্ খারাজ আদায়ের জন্য বসরায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তিনি খলিফার নিকট অতিরিক্ত আহদাসের জন্য চাহিদা প্রেরণ করেন। খলিফা তার চাহিদানুযায়ী আহদাস প্রেরণ করেন। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি হজের সময় হজ কর (Mawasim) আদায়ের জন্য খলিফা মুতাওয়াক্কিল আহদাস বাহিনী ব্যবহার করেন।

ঐতিহাসিক মাওয়ারদিও মাউনার এবং আহদাসের দমন ও উৎপীড়নমূলক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। হারাস (প্রহরী) অপরাধ দমন ও উদ্ঘাটনে পুলিশ প্রধানকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন রাস্তায় নিয়োজিত থাকত। যেমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংগঠনের প্রধান ও আদালতের আচার অনুষ্ঠানে (Ceremony) অংশগ্রহণ। এছাড়া আসাস (রাত্রিকালীন প্রহরা) প্রদান করার ন্যায় খলিফা আল মাহদি এর শাসনামলে হারাস বাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল অপরাধী ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের দমন ও উদ্ঘাটন।

খলিফা আল মাহদির শাসনামলে মিসরের গভর্নর আবু সালিহ এবং সাহিব আল-শুরতা প্রধান আস সামাহ বিন আমরের যৌথ তত্ত্বাবধানে পুলিশ ব্যবস্থা এত সাবলীল ও দক্ষ ছিল যে, হারাস (প্রহরী) বাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এতে জনগণ রাত্রিকালে দরজা খুলে নিদ্রা যেত। তারা শুধু কুকুর যাতে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নিচু বেঁড়া বা (Fench) ব্যবহার করত।[২]

নৌ-পুলিশ: আবক্কাসীয় যুগে নৌ-পথের নিরাপত্তায়ও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এর কিতাবে ইবনে খুরদাদবিহ উল্লেখ করেন যে, নৌ-পথে ভ্রমণকারী এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার জন্য নৌপথের উভয় পার্শ্বে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়।[৩]

ইমাম ইউসুফের মতে, সরকার নদীপথের নিরাপত্তায় নৌপুলিশের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেন এবং নৌ-পথের বিশেষ করে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর নাব্যতা রক্ষায় সকল জঞ্জাল বা বাধা অপসারণ করেন।[৪]

---

১. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 231
২. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, pp. 232-233
৩. "There were police posts (Mahtat) along the water routes to guard the merchants and travelers." see. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Ibid, p. 93
৪. S. Khuda Bukhsh, *The Orient under the Caliphs*, Delhi : Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 1st published, 1920, p. 239

Dhaka University Institutional Repository

ক. কেন্দ্রীয় পুলিশ ব্যবস্থায় সাহিব আল-শুরতা (পুলিশ প্রধান)

পুলিশকে আল-শুরতা বলা হত। পুলিশ প্রধানকে বলা হত সাহিব আল-শুরতা। হযরত আলি (রা.) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুলিশের কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু উমাইয়াগণ হযরত আলি (রা.) এর কর্তৃক প্রদত্ত নাম গ্রহণ করেনি। তারা পুলিশ অফিসারকে সাহিব আল-আহদাস বলতেন। আবার যখন আবক্ষাসীয়রা ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন পুলিশ প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত। বাগদাদ নগরীর পুলিশ প্রধানের পদ মর্যাদা ছিল গভর্নর বা শাসনকর্তার। পরবর্তীতে আবক্ষাসীয়গণ মন্ত্রী মর্যাদার একটি দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। আবক্ষাসীয়দের প্রাথমিক যুগে খলিফার প্রধান দেহরক্ষী মৃত্যুদণ্ড পরোয়ানাসমূহ কার্যকর করতো।[১]

শহর ও জনপদসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহ দমন ও চোর-ডাকাতরদেরকে গ্রেফতার করে তাদের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকতো, তাঁকে ‘সাহিব আল-শুরতা’ বলা হত। সাহিব আল-শুরতা নিজে বাগদাদে অবস্থান করতেন এবং ইরাকের অন্যান্য শহরে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। কোনো কোনো সময়ে ইরাকের সামরিক বাহিনী প্রধান এবং প্রদেশের আমিল বা গভর্নর নিজেই এ দায়িত্ব নিজে পালন করতেন। বিখ্যাত তাহির ইবন হুসাইন সাহিব আল-শুরতা থেকেই খুরাসানের গভর্নর হয়েছিলেন। মোটকথা, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল এবং কোনো সাধারণ ব্যক্তি এ দায়িত্ব লাভ করতেন না।[২]

কেন্দ্রীয় পুলিশকে বলা হত আস-শুরতা এবং এর প্রধানকে বলা হত সাহিব আল-শুরতা। হযরত আলি (রা.) সর্বপ্রথম এ কর্মকর্তা পদটি সৃজন করেন। যখন আবক্ষাসীয়গণ ক্ষমতায় আসীন হন তখন পুলিশ প্রধান পদটিকে পুনরায় সাহিব আল-শুরতা বলা হয়। বাগদাদের পুলিশ প্রধানের পদটি অনেকটা গভর্নরের সমতুল্য ছিল। পরবর্তী আবক্ষাসীয়দের সময়ে যিনি এই বিভাগের নেতৃত্ব দেন তার মর্যাদা ছিল অনেকটা মন্ত্রীর সমতুল্য। আবক্ষাসীয় যুগের প্রথম দিকে পুলিশ প্রধান খলিফার দেহরক্ষী প্রধানও ছিলেন এবং তিনি মৃত্যুদন্ড কার্যকর ও কারা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ করেন।[৩]

খ. প্রাদেশিক পুলিশ

প্রাদেশিক শাসন ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিচ্ছবি (Replica)। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা আমির কেন্দ্রীয় সরকারি বা খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তিনি প্রাদেশিক শাসন কাঠামোর প্রতিভূ ছিলেন এবং সমস্ত রাজকর্মচারী তাঁর অধীন ছিল। কেন্দ্রের মত সমস্ত দফতর প্রদেশে সৃষ্টি করা হয়নি,ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য। আমির ছিলেন কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে একটি যোগসূত্র। তিনি সামরিক এবং

---

১. "The chief police officer at Bagdad ranked almost as a Governor: and under the later ‘Abbasids presided over a Diwan and held the rank of a minister’. Under the early ‘Abbasids he was the chief of the bodyguard of the Khalifah and executed death sentences." see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 194

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৭

৩. "Central Police the Police was called ash-Shurtah and the police officer Shibu’sh-Shurtah by Ali who was responsible for instituting the officer. When the ‘Abbasids came to power, the police officer once more became Sahibu’sh-Shurtah. The chief police officer at Baghdad ranked almost as a Governor, and under the later’ Abbasids presided over a Diwan and held the rank of a minister. Under the early ‘Abbasids he was the chief of the bodyguard of the Caliph and executed death sentences. Prison Administration." see. http://bit.ly/copynwin http://muslimarealm.blogspot.com/2011_06_01 archive.htm visited on 29.01.2015

Dhaka University Institutional Repository

বেসামরিক শাসন পরিচালনা করতেন। প্রদেশে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিফলনের দায়িত্বও ছিল তার উপর। শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা যুদ্ধে সৈন্য সরবরাহ করা ছিল আমিরের দায়িত্ব।

কৃতকর্মের জন্য আমির খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। শাসন ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে আমিরদের বদলি করা হত। ধর্মীয় কার্যকলাপের পরিচালনা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমিরের প্রধান কর্তব্য ছিল। আয়-ব্যয়ের তদারক ও হিসাব রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ৯টি বিভাগ ছিল: (১) দিওয়ান-আল-খারাজ (২) দিওয়ান-আল-রাসায়েল (৩) দিওয়ান-আল-জিমাম (৪) দিওয়ান-আল-বারিদ (৫) দিওয়ান-আল-দিয়া (৬) দিওয়ান-আল-জুনদ (৭) দিওয়ান-আল-কাযা (৮) দিওয়ান-আল-শুরতা এবং (৯) দিওয়ান-আল-হিসবাহ।[১]

প্রদেশে বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা, চুরি-ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধ করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক রাজধানীতে ও প্রাদেশিক শহরসমূহে পুলিশ বাহিনী নিয়োজিত ছিল। প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনীর প্রধান কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রধানের মত সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত ছিলেন। প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান খলিফা কিংবা প্রাদেশিক আমির কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কোনো কোনো সময় প্রাদেশিক আমির নিজেই সাহিব আল-শুরতার দায়িত্বপালন করতেন এবং প্রদেশের জন্য পৃথক কোনো সাহিব আল-শুরতা নিযুক্ত হত না। সাহিব আল-শুরতার অধীনে প্রদেশের প্রত্যেক শহরে পুলিশ অফিসার নিযুক্ত হতেন এবং তারাও সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত হতেন। প্রাদেশিক সাহিব আল-শুরতার ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পুলিশ শাসন ব্যবস্থায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রদেশের প্রত্যেক শহরে ও নগরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, রাজস্ব আদায়, বিচার পরিচালনা প্রভৃতি প্রশাসনিক দায়িত্বপালনের জন্য আমিল, কাযি, সাহিব আল-শুরতা, মুহতাসিব এবং সাহিব আল-বারিদ এ পাঁচজন বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তবে অনেক শহরে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। এ সব শহরে যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব শহর পরিষদই (দিওয়ান আল-শুরা) সম্পন্ন করত। শহরে বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে প্রাদেশিক আমির শহর পরিষদের সদস্য মনোনীত করতেন। পরিষদের সভাপতি (আল-সদর) পরিষদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। প্রাদেশিক সরকার শহর পরিষদের কার্যাবলীতে সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হলে, শহর পরিষদ সরকার নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রাদেশিক সরকার শহর পরিষদের কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করতেন। বস্তুত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে উৎসাহ দান আবব্বাসীয় শাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পারস্যের বলখ, হিরাত, বুখারা, খাওয়ারিজম, হামাদান প্রভৃতি শহরে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা এত বেশি জোরদার ছিল যে, এগুলোকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের স্বাধীন শহরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।[২]

প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন ওয়ালি। তার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন কাযি বা বিচারক, সাহিব আল-বারিদ, সাহিব আল-শুরতা ও অন্য সচিববৃন্দ।[৩]

স্পেন প্রদেশ

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
২. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৩. S.A.Q. Husaini, Arab Administration, Ibid, p. 213

Dhaka University Institutional Repository

স্পেনে কাযির পদ অতীব সম্মানজনক ছিল এবং প্রধান কাযিকে কাযিউল-কুযাত না বলে সচরাচর কাযিউল জামায়াত (জনসাধারণের কাযি) বলা হত। প্রাচ্যদেশের মতো পুলিশের কর্তাকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত এবং কর্ডোভার খলিফাগণের অধীনে তাঁকে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হত। পরবর্তী রাজবংশের শাসনকালে তিনি কেবল পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীতে পরিণত হন। নগরের শানকর্তাগণ-কে সাহিব আল-মদিনা বলা হত।[১]

কর্ডোভার বিচার ব্যবস্থায় বিচারিকভাবে উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তারা হলেন, (১) সাহিব আল-মাযালিম (২) সাহিব আল-রাদ (৩) সাহিব আল-শুরতা (৪) সাহিব আল-শুলুক বা মুহতাসিব (৫) সাহিব আল-মাওয়ারিদ।

সাধারণত শাস্তিগুলো ছিল যথাক্রমে– জরিমানা, বেত্রাঘাত করা, অঙ্গচ্ছেদন, ধর্মত্যাগের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড। কাযির অধীনস্থ ছিল শহর ম্যাজিস্ট্রেট যাকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত। সাধারণ জনগণ তাকে সাহিব আল-লাইল এবং সাহিব আল-মদিনা নামে অভিহিত করত। কিন্তু দশম শতাব্দীতে এটি স্বাধীন অফিস হিসেবে পরিচালিত হত। অনেক সময় কাযি ও পুলিশ প্রধান একই ব্যক্তি ছিলেন। পুলিশ প্রধানের অফিস সাধারণত রাজপ্রাসাদের তোরণের নিকটই ছিল। তার দায়িত্ব ছিল অপরাধ সনাক্তকরণ এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করা। নগর এবং জেলার জন-আইন রক্ষা করার দায়িত্বও তার উপর অর্পিত ছিল। পুলিশ প্রধান গভর্নরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। প্রাদেশিক পুলিশ প্রধানকে সাহিব আল-আহদাস বলা হত। তার অবস্থান ছিল পুলিশ এবং নিয়মিত সৈনাবাহিনীর মাঝামাঝি। আর দায়িত্ব ছিল অপরাধ-বিশৃঙ্খলা দমন করা।[২]

স্পেনের কার্ডোভায় খলিফা যখন আসনে উপবিষ্ট হতেন তখন মন্ত্রী ও সভাসদদের পাশাপাশি পুলিশ প্রধানও উপবিষ্ট হতেন। স্পেনে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুলিশ বিভাগ সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল-(১) জনসাধারণের নৈতিক বিষয়াদির তদারকি কাজে এবং (২) আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষার কাজে।[৩]

পশ্চিমের খলিফা সাম্রাজ্যে সরকারি প্রশাসন পূর্বের খলিফা সাম্রাজ্যের সরকারি প্রশাসন থেকে মূলগতভাবে আলাদা ছিল না। খলিফার পদটি ছিল বংশানুক্রমিক, যদিও প্রায়ই সামরিক বাহিনীর অফিসার ও অভিজাতরা তাদের পছন্দের লোককে ওই পদে নির্বাচিত করত। হাজিব (রাজ-সরকার) ছিল উজিরের ওপরে এবং তার মাধ্যমেই খলিফার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। উজিরের নিচে ছিল কুততাব (সচিব) এবং এরা উজিরের সঙ্গে মিলিতভাবে দিওয়ান তৈরি করত। কর্ডোভা বাদে প্রদেশের সংখ্যা ছিল ছয়, প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনের দায়িত্বে ছিলেন ওয়ালিদ নামে একজন অসামরিক ও সামরিক গভর্ণর। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরও ছিল এই ওয়ালিদের অধীন। বিচারের ভার ছিল খলিফার

১. সৈয়দ আমির আলি, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

২. "The usal punishment inflicted were fines, scourging, mutilation and, in cases of heresy and apostasy, death. Subordinate to the Qadi was a city magistrate called Sahib al-Shurta, whom the common people called Sahib al-Layl and Sahib al-Madinah (the Night-guard and Chief of the city); but by the 10th century the two officials became independent of each other. Sometimes the Qadi and Sahib al-Shurtah were one and the same man. The office of the Sahib al-Shurtah was located near the palace gate. His duties consisted of detecting and punishing crimes against the public morals or the civil regulations of the city or district entrusted to his care. The head of the police was under the direct control of the Governor. The Chief of the police in the provincial towns known as Sahib al-Ahdath stood half way between the police and the regular soldiery.His duty was to prevent disturbances and other crimes." see. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim* Administration, Ibid, pp. 100-101

৩. S. Khuda Bukhsh, *The Orient under the Caliphs*, Ibid, p. 254

Dhaka University Institutional Repository

হাতে, তিনি প্রথানুযায়ী বিচারের দায়িত্ব তুলে দিতেন কাযিদের হাতে। কর্ডোভার কাযি আল-কুযাহ ছিলেন এই কাযিদের নেতৃত্বে। সাহিব আল-শুরতাহ নামে এক বিশেষ বিচারক অপরাধমূলক ও ফৌজদারি মামলাগুলি শুনতেন। সাহিব আল-মাজলিম নামে কর্ডোভার একজেন বিশেষ বিচারক জনগণের অভাব অভিযোগ শুনতেন। জরিমানা, চাবুক মারা, কারাদণ্ড ও অঙ্গহানি ছিল সাধারণ অপরাধের শাস্তি, আর আল্লাহর নিন্দা, প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা ও ধর্মত্যাগের শাস্তি ছিল মৃত্যু। এক বিশেষ দায়িত্বশীল অফিসার ছিলেন মুহতাসিব (স্পেনিয় ভাষায় আল-মোতাসিন)। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও তিনি ব্যবসা ও বাজারের তত্ত্বাবধান এবং ওজন পরিমানের সঠিকতা দেখাশোনা করতেন। এছাড়াও জুয়াখেলা, যৌন অশ্লীলতা ও অশোভন পোশাক পরার ব্যাপারে তিনিই হস্তক্ষেপ করতেন।[১]

মিসর

মিসরের ফাতেমিয় বংশে সিভিল ও মিলিটারি দু'ধরনের পুলিশ ব্যবস্থা চালু ছিল। সাহিব আল-শুরতা একই সাথে রাজকীয় দেহরক্ষী প্রধান এবং প্রাদেশিক শহর ও রাজধানীর পুলিশ প্রধান ছিলেন। পুলিশ বিভাগ ফাতেমিয়দের সময় খুবই শক্তিশালী ছিল এবং পুলিশ প্রধান কাযির বিচারিক ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং অপরাধীর অভিযোগের শুনানি ও ন্যায় বিচার করার ক্ষমতাও রাখতেন।[২]

মিসরিয়রা তাদের শাসন ব্যবস্থায় পুলিশ প্রশাসনকে স্পেন-উমাইয়াদের আদলে রেখেছিল। অপরাধ দমন এবং আইনানুযায়ী অপরাধের শাস্তি প্রদান পুলিশ প্রধানের দায়িত্বে ছিল।[৩]

মিসরে সাহিব আল-শুরতা এবং সাহিব আল-মাউনাকে 'ওয়ালি' বলা হত। ঐতিহাসিক মাখরিজির মতে, তিনি নগরের পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং দুষ্কৃতিকারীদের দমনে রাত্রিকালীন পাহারা দিতেন। এভাবে তিনি তার অধীনস্থদের মাধ্যমে নগরীতে ঘটমান খবরাখবর সম্পর্কে জানতেন এবং এ সমস্ত খবর একত্রীকরণ করে সুলতানের নিকট প্রেরণ করতেন। ইবনে খালদুনের মতে, তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল আইন সংক্রান্ত। তাকে অপরাধ দমন, অপরাধের অনুসন্ধান এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতে হত।[৪]

মিসর এবং অন্যান্য প্রদেশের পুলিশ প্রধান ছিলেন গভর্নর অথবা শাসকের অধীনস্ত। কুররা বিন সারিক থেকে আল মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত মিসরের সকল পুলিশ প্রধান গভর্নর কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তাবারিস্তানে গভর্নর বিদ্রোহ দেখা দিলে তার পুলিশ প্রধান ইব্রাহিম বিন মিহিরান এবং উপ-পুলিশ প্রধান আলি বিন রাবক্ষান আল কাতিব আল নাসরানি এবং হারাস প্রধানকে

---

১. ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিশ্লেষক: খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, প্রফেসর পি. কে. হিট্টির, দ্যা হিস্ট্রি অব এ্যারাবস্ অবলম্বনে, *আরবের ইতিহাস*, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৩৯২

২. "The Shuratah department was very strong under the Farimids and exercised some of the powers of the Qadi in listening to the complaints against offences, religious and social and in dispensing justice."see. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Ibid, p. 122

৩. "The Fatimids kept the police administration at par with that of the Umayyads of Spain and the 'Abbasids. The control of crimes and imposition of punishments as required by the law was under a special task and was delegated to the Chief of Police called the Sahib ash-Shurtah." see. Anwar Ahmad Qadri, *Justice in Historical Islam,* Lahore : SH. Muhammad Ashraf, pp. 62-63

৪. "In Egypt, he was called the wali, and, according to Maqrizi, he was the officer charged with the policing of the city and with making nocturnal rounds for the purpose of suppressing malefactors. It was part of his duties each day to learn from his subordinates about all the happenings in the city and to compile a written report of them for the sultan. In general, the duties of the sahib al-shurta were, says Ibn Khaldun, concerned with the law. He had to repress crime, to investigate offences committed and to punish those guilty of them." see. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p.332

Dhaka University Institutional Repository

খলিফার সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিছু কিছু প্রদেশে পুলিশ প্রধান গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতেন এমনকি তিনি আবার কোথাও কোথাও তিনি গভর্নরের অধীন ছিলেন।[১]

ফাতেমিয় বিচার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো হল-কাযি, মাজালিম কোর্ট, মুহতাসিব ও পুলিশ বিভাগ। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কাযির অধীনে ছিল। পুলিশ প্রধান জনগণের সাথে সমানভাবে ব্যবহার করবে, বিচারের ভিকটিম/ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকারকে সমুন্নত করবে, হদের নির্দেশনা অনুযায়ী শাস্তি বাস্তবায়ন করবে, এবং প্রয়োজনে বাদী ও বিবাদীকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করবে এগুলো তার দায়িত্ব ছিল। তার সমন্বিত কাজগুলো হল একাধারে প্রসিকিউটর, জিজ্ঞাসাকারী, শাস্তি বাস্তবায়নকারী ও জেলরক্ষক। পুলিশ প্রধান কাযির অধীনে অধিনস্থ হলেও শাস্তি প্রদানে তার বিবেচনা করার সুযোগ ছিল।[২]

বাগদাদ

আবক্ষাসীয় রাজপ্রসাদ সংলগ্ন দামাস্কাস গেটের নিকট সামরিক নিরাপত্তা দল (Haras) 'র অবস্থান ছিল। অন্য অবস্থানে নিরাপত্তা পুলিশের (শুরতা) অবস্থান ছিল। অনুরূপভাবে বসরা গেটের নিকটও পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর অবস্থান ছিল।[৩]

খলিফা আল মনসুর রাউন্ড সিটি হতে মার্কেটকে স্থানান্তর করেন।[৪] আল মাহদির সময়ে পাবলিক ব্রিজ (al-Jisr) নির্মিত হলে খুজায়মা ইবনে খাজিম পুলিশ প্রধান হিসেবে সেখানে দায়িত্বপালন করেন। তিনি পশ্চিম তীরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাইগ্রিস নদীর উপর নির্মিত ব্রিজের উভয় পার্শ্বে আবক্ষাসীয় খলিফাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অবস্থান করতেন।[৫]

নিয়মিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি খলিফাদের ব্যক্তিগত কন্টিনজেন্ট, বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা দল এবং পুলিশ বাহিনীসহ আধা সামরিক বাহিনী ছিল। নিয়মিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি খলিফার নিজস্ব বাহিনী ছিল যেখানে অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে পুলিশ বাহিনীও ছিল।[৬]

---

১. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 227

২. The main Fatimid institutions for the administration of justice included the judiciary (qada), private complaints (mazalim), public complaints (hisba), and the police (shurta), with all these positions supposedly subsumed under the jurisdiction of the Chief Judge (qaddi al-qudat)
The chief of police, sahib al-shurta, was supposed to treat people equally, uphold the rights of the victim of injustice, execute the prescribed hadd punishments upon conviction, and compel the presence of parties before the judge, if necessary. He combined the functions of a prosecutor, interrogator, executioner of punishment, and jailor. Although the chief of police was supposed to be under the jurisdiction of the qadi, there was considerable tension between responsible for the dispensation of the hudud punishments of the Shari'a. see: www.ibrarian.net/.../Abdullahi Ahmed An Na im The Future of S, Visited on: 17/11/2015

৩. "One of these, adjacent to the Damascus Gate, housed the chief of military security forces (haras) and his troops; the other, the location of which is not indicated, contained the quarters of the chief of the security police (shurtah) and presumably for some of his men, thereby providing maximum safety for the area of the Caliph's personal domain. These structures, the only buildings other than the palace-mosque in the plaza, were probably intended for those men actually on duty in the central courtyard. The reminder of he contingent was no doubt quartered in those streets situated in the residential quandrants flanking the arcades of the Basrah Gate and designated for the security forces of the military and police." see. Jacob Lassner, *The Shaping of Abbasid Rule*, New Jersey : Princeton University Press, 1980, p. 188

৪. Jacob Lassner, *The Shaping of Abbasid Rule*, Ibid, p. 188

৫. "When the main public bridge (al-Jisr) was built-probably soon thereafter-its eastern end faced the fiet of Khuzaymah b.Khazim, the director of the security police (shurtah) under al-Mahdi." see. Jacob Lassner, *The Shaping of Abbasid Rule*, Ibid, p. 206

৬. "The addition to the regular army there were the personal contingents of the Caliph the various divisons of security forces and police, and the paramilitary troops of the city garrison altogether a military presence of staggering variety and dimensions." see. Jacob Lassner, *The Shaping of Abbasid Rule*, Ibid, p. 208

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা আল মনসুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের রাউন্ড সিটি একটি বিখ্যাত স্থান। এ জায়গায় প্রশাসনিক রাজধানী, রাজপ্রাসাদ এবং হাজার হাজার আরবীয় ও খোরাসানি সৈন্য বসবাস করত। বাগদাদ যোগাযোগের জন্য খুবই চমৎকার ছিল। বাগদাদের সৈন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল খলিফার নিজস্ব প্রহরী, নগর পুলিশ, হারাস, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী এবং বাগদাদের আধা সামরিক বাহিনী।[১]

বাগদাদের সিভিল স্টাফদের মধ্যে ছিল রাত্রিকালিন পাহারাদার, আলোক প্রজ্বলনকারী, খাদ্য পরিদর্শক, মুহতাসিব বা মার্কেট পরিদর্শক। এছাড়া ছিল নিয়মিত পুলিশ বাহিনী। এর পুলিশ প্রধানের সদর দপ্তর খলিফার প্রশাসনিক অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল।[২]

বুওয়াইয়াদের শাসনামলে বাগদাদের পুলিশের ভূমিকা:

ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত ও স্বাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, বাগদাদে বুওয়াইদের সময় পুলিশের কার্যক্রম ছিল যারা আইন ভঙ্গ ও জনগণকে বিপথে পরিচালিত করত তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া, মন্দ-অসাধু ব্যক্তিদের ধাওয়া প্রদানের মাধ্যমে প্রতিহত করা, আদালতের রায় ও ইসলামি শরিয়াতের হদ কার্যকর করা, জেল প্রশাসন পরিচালনা করা, মন্দ ও অত্যাচারী ব্যক্তিদের মুকাবিলা করা, চবিক্ষশ ঘন্টা রাস্তা ও যানবাহনের নিরাপত্তা প্রদান করা, দস্যু ও ফেরারি অপরাধীদের দমন ও প্রতিহত করা ছিল পুলিশ বিভাগের কাজ।[৩]

আন্দালুসিয়া ও মরক্কো অঞ্চলের গভর্নর ইউসুফ ইবনে তাসহেফিন ও খলিফা আল কাইয়ুম (১০৩০-১০৭৪) এর সময় কালে উল্লিখিত দায়িত্বাবলীর সাথে আরও যোগ করা হয়, আদালতের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্দিগ্ধ অপরাধীদের গ্রেফতার করা, আদালতে রিকলসহ বিচার বিভাগের যে কোনো নির্দেশনা কার্যকর করা। এছাড়া সরকারি রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট জেলাগুলোর প্রতিনিধিদের সহায়তা করা।[৪]

আবক্ষাসীয় খিলাফতকালে বাগদাদ অনেকগুলো জেলা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই জেলা অঞ্চলগুলোকে আল-রাব (কোয়ার্টার) বলা হত। প্রতিটি জেলাতে পুলিশ প্রধানের প্রতিনিধি থাকত। তাদেরকে সাহিব আল-রাদ বলা হত। কালকাশকান্দি এর মতে তাদের দায়িত্ব ছিল, নিরাপত্তা বিষয়ে পুলিশ প্রধানকে প্রতিবেদন দেয়া। শুরতা কর্তৃক তাদের কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনকে 'রিকা' বা 'রোকা' বলা হত। পুলিশ কর্মকর্তাগণ তথ্য ও খবর সংগ্রহ এবং অপরাধীদের সনাক্তকরণসহ (Tracking) তাদের আস্তা খুঁজে বের করার জন্য ওইয়ূন (Spy) এর সহায়তা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মাসুদি একদল বৃদ্ধ দস্যু এর কথা উল্লেখ করেন, যাদেরকে 'তাওয়াবিন' বলা হয়ে

---

১. David Nicolle, Illustrated by Angus Mcbride, *Armies of the Muslim Conquest,* Oxford: Osprey Publishing Ltd. Elms Court, Botley-1993, p. 23

২. Benson Bobrick, *The Caliph's Splendor*, New York: Simon & Schuster-2012, p. 69

৩. "Through studying the historical evidence, it is revealed that the most important functions of Shurta were counteracting with the law breakers and people led astray, cashing the evil and corrupt people, executing the verdict and Hudu'd (the Islamic senences), administrating the prisons, fighting with the evil acts and representations of evil acts and oppressions, establishing security of roads and caravans, 24-hours guarding the passages, and chasing the robbers and escaped criminals. In his governmental command to Fakhr-AL-Dawla AL-Deylami (976-997) the Caliph AL-Tail; (973-991) communicated all of the above mentioned items and emphasized that the ones appointed to this position must have been selected from the pious and God-fearing people." see. Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan : Canadian Centre of Science and Education, 2013, vol. 5, No. 2, p. 67; http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014

৪. "The same time, in a similar command to Yu'suf Ibn-Tashefin (1070-1106), the Anir (Governor) of Andalusia and Moroccan regions, Caliph Al-Qa'im (1030-1074) added a number of functions such as executing the orders of the judicial authorities including recalling and arresting the suspects and guilty people, maintaining the order of the courts, and also supporting the representative of the government in collecting the taxes from the assigned districts." see. Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan : Canadian Centre of Science and Education, 2013, Vol. 5, No. 2, p. 67; http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। যারা বয়সের কারণে অক্ষম হয়েছিল এবং তাদের কর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছিল। কোথায়ও কোনো ডাকাতি সংঘঠিত হলে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য দিত এবং ঘটনাস্থল প্রকাশ করত। তাদের প্রদত্ত তথ্য ও সহযোগিতার জন্য তারা মাসিক ১০ (দশ) দিরহাম করে লাভ করত।[১]

বাগদাদের বিভিন্ন অপরাধী দল

বাগদাদে একদল লোক তাদের কোমরে লম্বা ছোরা রাখত এবং তাদের অভিযানের সময় তা ব্যবহার করত। এ দলকে বলা হয় 'আস-হাব আল সাকাকিন'। এরা সমাজকে কলুষিত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছিল। মুইজ দৌলার সময় এরা বাগদাদ নগরীতে খুবই সক্রিয় ছিল এবং সমাজের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। মুইজ দৌলার উপ-প্রধান গভর্নর মুহাম্মদ আল মুহাল্লাবি এই অপরাধী দলকে গ্রেফতার ও নির্বাসনে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেন। কারণ, তারা নিজ উদ্দেশ্য হাসিলে মন্দ লোকদের ব্যবহার করত। ঐতিহাসিক তানুকির মতে, গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল।

আরেকটি ঘটনা এরূপ যে, মুহাম্মদ বিন আল মুহাল্লাবি একদল সাকাকিনও একটি অপরাধী দলকে নৌকা দ্বারা বেষ্টিত করে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। যাতে এ দলটি পলায়ন করতে না পারে। উপ-প্রধান গভর্নর হিসেবে যারা 'সুফি' ও 'আরিফ' (Mystics) এ ভান করত এবং অশ্লীল কার্যকলাপের দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত করত তাদেরকেও তিনি সমবেত করতেন। এ সমবেত অনুষ্ঠানে সাহিব আল-শুরতা, বিচারক ও জুরিস্ট প্যানেলের উপস্থিতিতে তাদের সাথে আলোচনা হত। এ সময় বাগদাদে প্রায় ৬০ (ষাটটি) দলকে সনাক্ত করা হয়। যাদের প্রত্যেকেরই দস্যুতা বিষয়ে নিজস্ব কৌশল ছিল। তাদের মধ্যে একটি দলের নাম ছিল 'তাররারান' (Tarra'ra'n) এ দল অন্যের সম্পদ চুরি করার বিষয়ে খুবই দক্ষ ছিল। আরেকটি দলের নাম ছিল আসহাব আল ফাসুস (Ashab Al-Fosu's) । তাদের কৌশল এরূপ ছিল যে, তারা রিং বা আংটির উপর তাদের নাম খোদাই করে নিত। অতঃপর সম্পত্তির অধিকারী পরিবারদের নিকটে গিয়ে এ রিং দেখিয়ে সম্পত্তির দাবি করত। আরেকটি দলের নাম ছিল আসহাব আল তাবারজিন (Ashab Al-Tabarzin)। এরা পুলিশের ছদ্মবেশে প্রচিলত অস্ত্র দ্বারা দস্যুতা করত। তাবারজিন হল পুলিশের ব্যবহৃত প্রচলিত অস্ত্র ক্ষুদ্র আকারের কুঠার (Small Axe)।[২]

সেলজুক ও বুওয়াইয়াদের সময় খলিফার হেরেম পলায়নকারীর জন্য নিরাপত্তার স্বর্গ ছিল। ১১২১ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ প্রধান হত্যাকারী সন্দেহে জনৈক ব্যক্তিকে তাড়া করে বাগদাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত বাব আল আম্মার পর্যন্ত নিয়ে যায়।[৩]

---

১. "During Abbasids period, Baghdad was divided into a number of districts and regions each called 'AL-RUB' i.e. QUARTER, (Tanu'khi, 1995, p. 231). The Sahib al-Shurta had a representative in each of these district who was referred to as Sahib al-Rub' (Administrator of the quarter) whose functons was to provide the Sahib al-Shurta with appropriate reports about the security affairs. The written reports of the Shurta forces to the commanders and administrators were Riqa' the plural form of the term Roq'a (Tanu'khi, 1985, p. 273). In order to collect information and news and tracking the criminals and detecting their ambushes, the officers of Shurta got help from Uyu'n and the spies. In this regard, Masu'di quoted from a group of penitent robbers: æTawwa'bi'n (penitent robbers) were the old robbers who were disabled and repented and whenever a robbery took place they were aware of the persons in charge and whold reveal their place" (Masud'di, 1409, p. 160). Apparently, for their cooperation and providing the source of news as a spy, they received 10 Dinars a month" see. Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan : Canadian Centre of Science and Education, 2013, Vol. 5, No. 2, p. 67; http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014

২. Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan : Canadian Centre of Science and Education, 2013, Vol. 5, No. 2, p. 68; http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014

৩. Edited by Christian Lange and Marible Fierro, *Public Violence In Islamic Societies*, Edinburgh: Edinburgh University Press-2009, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

আন্দালোসিয়া প্রদেশ

আন্দালোসিয়া প্রদেশে পুলিশকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমটি হল "al-Shurtah al-Kubra"। তাদের দায়িত্ব ছিল শাসকদের আত্মীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ রাজভক্তদের শাস্তি প্রদান। শুরতা আল কুবরা'র অফিস ছিল সুলতানের প্রাসাদের নিকটেই এবং তিনি সবসময় রাজগৃহধাক্ষের প্রার্থী ছিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলামি সভ্যতায় ধনী-গরিব এবং শাসিতের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। দ্বিতীয়ত, শুরতা আল সুগরা জনসাধারণের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আন্দালোসিয়ার পুলিশ প্রধানকে সাহিব আল-মদিনা বলা হত।[১]

সমরকন্দ: (সমরকন্দে পুলিশ) আল-তাবারিতে উল্লেখ আছে, অন্য কর্মকর্তাদের ন্যায় সমরকন্দেও পুলিশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[২]

ক্ষমতা ও কার্যাবলীর দিক দিয়ে 'সাহিব আল-শুরতা' অন্যান্য পুলিশ প্রধান অপেক্ষা উচ্চমানের ছিলেন বলে অনুমিত হয়। সাহিব আল-হারাস প্রত্যক্ষভাবে সাহিব আল-শুরতার অধীনেই তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। 'সাহিব আল-শুরতার পদমর্যাদা ছিল মন্ত্রীর সমতূল্য।[৩] Ibn Haukl-এর মতে, খুরাসান প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক জেলায় বিচারক, পোস্টমাস্টার, কর পরিদর্শক এবং পুলিশ প্রধান কর্মরত ছিলেন।

কর বিভাগের পাশাপাশি আবব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধীনে একটি নিরীক্ষা বা হিসাব কার্যালয় (দিওয়ান আল-জিমাম) ছিল। এটির সূচনা হয় আল-মাহদির আমলে। আর ছিল চিঠিপত্র লেনদেনের কার্যালয় (দিওয়ান আল-তাওকি)। এই দপ্তরের কাজ ছিল সমস্ত সরকারি চিঠিপত্র, রাজনৈতিক দলিল, সরকারি নির্দেশ এবং উপাধি তৈরি করা। এছাড়া একটি অভিযোগ দপ্তর, পুলিশ বিভাগ এবং স্বতন্ত্র ডাকবিভাগও ছিল।[৪]
পুলিশ বিভাগের (দিওয়ান আল-শুরতাহ) শীর্ষে ছিলেন সাহিব আল-শুরতাহ। তিনিই ছিলেন পুলিশকর্তা এবং রাজকীয় দেহরক্ষী। পরবর্তীকালে এই পুলিশকর্তার পদাধিকারীরা উজিরও হয়ে যান। প্রত্যেক বড় শহরে নিজস্ব পুলিশ দপ্তর ছিল। পুলিশকর্মীরা ফৌজির সমান মর্যাদা পেত এবং তাদের বেতনও ছিল ভাল। নগর পুলিশ বাহিনীর কর্তাকে বলা হত 'মুহতাসিব'। তিনি নৈতিকতা ও নগরের বাজারগুলির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও কাজ করতেন।[৫]

পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উমাইয়া যুগের ন্যায় আবব্বাসীয় যুগেও সর্বপ্রকার অপরাধমূলক তৎপরতা দমন করে সমাজ ও নাগরিক জীবনে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল পুলিশের প্রধান কর্তব্য। অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করে বের করা এবং অপরাধীকে গ্রেফতার ও শাস্তি নিশ্চিত করা ছিল পুলিশের দৈনন্দিন রুটিন

---

১. "The Andalusians divided the police into two important categories. The first was called al-Shurtah al-Kubra (higher police), with the objective of punishing the ruler's relatives and loyalists as well as the influential people. The chief of the higher police has had a seat at the Sultan's door and was always a candidate to the premiership portfolio or chamberlain office. There is no doubt that the creation of this office demonstrates the Islamic civilization respected legislation and societal norms, where there was no difference between the rich or the poor, or between the rulers and the ruled. The second was called al-Shurtah al-Sughra (lower police), which was dedicated to the public and the masses. The chief of police in Andalusia was called Sahib al-Madinah (i.e. chief of the city)." see. http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? Visited on: 31.5.2012

২. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 359

৩. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আরব জাতীর ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩

৪. ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিশ্লেষক: খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান; প্রফেসর পি. কে. হিট্টির, দ্যা হিস্ট্রি অব এ্যারাবস্ অবলম্বনে, *আরবের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৫. ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিশ্লেষক: খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, প্রফেসর পি. কে. হিট্টির, দ্যা হিস্ট্রি অব এ্যারাবস্ অবলম্বনে, *আরবের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ক। আবক্ষাসীয় যুগের প্রথম দিকে বাগদাদের সাহিব আল-শুরতা রাজধানীতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যতীত খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীরও প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশও বাস্তবায়ন করতেন।[১] তিনি প্রকৃতপক্ষে গভর্নরের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করতেন। আবক্ষাসীয় খিলাফাতের শেষের দিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করতেন ও কোনো কোনো সময় তিনি উজিরের দায়িত্বও পালন করতেন। শহর ও জনপদসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহ দমন ও চোর-ডাকাতদেরকে গ্রেফতার করে তাদের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত ছিল, তিনিই 'সাহিব আল-শুরতা'। বর্তমানে আমরা যাকে পুলিশ বিভাগের প্রধান বলে থাকি। এ সাহিব আল-শুরতার কার্যালয় ছিল বাগদাদে। তিনি ইরাকের অন্যান্য শহরে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। আবক্ষাসীয় খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের পদমর্যাদা ভোগ করতেন। পরবর্তীতে পুলিশ বাহিনীর জন্য আলাদা একটা দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পুলিশ প্রধান একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করতেন। আরও কিছু পরে পুলিশ বাহিনী প্রধান খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন।[২]

ক্ষমতা ও কার্যাবলীর দিক দিয়ে 'সাহিব আল-শুরতা' অন্যান্য পুলিশ প্রধান অপেক্ষা উচ্চ মানের ছিলেন। সাহিব আল-হারাস প্রত্যক্ষভাবে সাহিব আল-শুরতার অধীনেই তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। হারাস বাহিনী অপরাধ দমন ও অপরাধের কারণ খুঁজে বের করার জন্য নিয়োজিত হত। এই বাহিনী সাহিব আল-শুরতাকে পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের অভ্যর্থনায় এবং রাজ-দরবারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মত কাজে সাহায্য করত। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালে সীমান্ত ফাঁড়ি প্রহরার কাজে হারাস বাহিনী নিয়োজিত হত। আহদাস বাহিনী কোনো বিশেষ কাজের জন্যই নিয়োজিত হত। প্রাদেশিক গভর্নরকে রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করা এবং রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা বিধান ছিল এর প্রধান কর্তব্য।[৩]

খলিফা মাহদির শাসনকালে বসরার গভর্নর আমর বিন-হামজাকে খারাজ রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করার জন্য তাঁর অনুরোধে একটি অতিরিক্ত আহদাস বাহিনী প্রেরণ করেন। ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালে হজ অনুষ্ঠানের সময় মক্কার রাজপথে শান্তি-শৃঙ্খলাস্থাপন ও হজ যাত্রীদের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্য জাফর বিন-দিনারের অধীনে আহদাস বাহিনী মোতায়েন করা হয়। মাউনা বাহিনী সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে ও শহরে প্রধানত বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দমনে নিয়োজিত থাকত। মিসর ও তাবারিস্তানের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে এবং আবক্ষাসীয় কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদে প্রায়ই মাউনা বাহিনী নিয়োজিত থাকত। কোনো কোনো সময় প্রাদেশিক গভর্নর নিজেই সাহিব আল-মাউনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাঁর অধীনে সাহিব আল-শুরতাও নিযুক্ত হত।[৪]

পুলিশ বাহিনী বলতে সাধারণত শুরতাকে এবং পুলিশ প্রধান বলতে সাধারণত সাহিব আল-শুরতাকেই বুঝাত। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদে, প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে এমনকি প্রত্যেক

---

১. ইবনুল আছীর, *আল-কামীল ফিত-তারীখ*, কায়রো : ১৩০১ হি., ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭

২. "The chief of police officer at Baghdad ranked almost as a Governor; and under the later Abbasids presided over a Diwan and held the rand of a minister. Under the early Abbasids he was the chief of the bodyguard of the Khalifah and executed death sentences." see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 194

৩. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

৪. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক শহরেও শুরতা বাহিনী এবং সাহিব আল-শুরতা নিযুক্ত থাকতেন। কোনো কোনো প্রদেশে সাহিব আল-শুরতা নিজেই প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতেন।[১] কিন্তু সাধারণত তিনি ছিলেন প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনস্থ পৃথক কর্মচারী। সাহিব আল-মাউনা, সাহিব আল-হারাস এবং সাহিব আল-আহদাস সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে ও শহরে নিযুক্ত হতেন না। বিশেষ প্রদেশে জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিশেষ দায়িত্বসম্পন্ন এই সকল পুলিশ কর্মকর্তা নিযুক্ত হতেন।[১]

সাহিব আল-শুরতা, সাহিব আল-হারাসকে রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হত। ঐতিহাসিক যাহশারি উল্লেখ করেন যে, ৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন-অর-রশিদের বায়াত অনুষ্ঠানে সাহিব আল-হারাস, আবুল আবক্ষাস তুসি উপস্থিত ছিলেন। ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মিসরের গভর্নর মুসা বিন উলাই যখন মসজিদের দিকে পদব্রজে গমন করেন তখন সাহিব আল-শুরতা আবুল সাহাবা বল্লম হাস্তে গভর্নরের সাথে গমন করেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময় মহানবী (স.) বল্লমের অগ্রভাগ (Prophets' Spearhead) প্যারেড শুরু হলে সাহিব আল-শুরতা বল্লমটি তার নিজ হাতে প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যান। এই বল্লমটিকে পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বল্লমটি আবিসিনিয়া হতে যুবায়রকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছিল। তিনি বল্লমটি মহানবী (স.) দান করেন।[২]

উমাইয়া যুগের মত আবক্ষাসীয় যুগেও সর্বপ্রকারের অপরাধমূলক তৎপরতা দমন করে সমাজ জীবনে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল পুলিশের প্রধান কর্তব্য। অপরাধের কারণ খুঁজে বের করা এবং অপরাধীকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান করা ছিল পুলিশের দৈনন্দিন কাজ। ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিকে সাহিব আল-শুরতা নিযুক্ত করা হত এবং তাঁকে উৎকোচ গ্রহণ, কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি অসদাচরণ হতে দূরে রাখার জন্য আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হত। আবক্ষাসীয় যুগের প্রথমদিকে বাগদাদের সাহিব আল-শুরতা রাজধানীতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যতীত খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীরও প্রধান ছিলেন এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করতেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে গভর্নরের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করতেন। আবক্ষাসীয় খিলাফতের শেষের দিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করতেন। এই যুগে তিনি কোনো কোনো সময় উযিরের দায়িত্ব পালন করতেন। সাহিব আল-শুরতা সম্বন্ধে আবক্ষাসীয় বিচার ব্যবস্থায়ও আলোকপাত করা হয়েছে।[৩]

প্রত্যেক নগরে 'শুরতা' নামক বিশেষ পুলিশ ছিল; এর প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত। উমাইয়া যুগের মতো শুরতা বা নগররক্ষী পুলিশ সাধারণ পুলিশ হতে পৃথক ছিল। নগরের এলাকানুসারে এদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হত। নাগরিকদের জানমাল রক্ষার ভার তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। তারা এলাকার নায়কের অধীনে নগরে রাত্রে প্রহরা দিয়ে বেড়াত।[৪]

প্রত্যেক শহরে তার নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ছিল। যাদেরকে শুরতা বলা হত এবং এর প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত। যার প্রধান কাজ ছিল-নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা। তার সদস্যবৃন্দ নগরীতে অপকর্ম দূরীকরণে রাত্রিকালে টহল দিত। প্রাদেশিক পুলিশ প্রধানকে দৈনন্দিন রিপোর্ট তৈরি করে বাগদাদের পুলিশ প্রধানের নিকট প্রেরণ করতে হত। ইবনে খালেদুনের মতে পুলিশ প্রধানের

---

১. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫
২. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 235
৩. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫-২৫৬
৪. সৈয়দ আমির আলি, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান কর্তব্য ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং তাকে গ্রামসমূহের যাবতীয় অপরাধ দমনের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি প্রদান করতে হত।

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে প্রচলিত আইন (al-urf) অনুসরণ করতে হত। যা ছিল প্রচলিত শরিয়া আইন হতে ভিন্ন। কাযি বা বিচারকের ন্যায় তিনি অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারতেন এমনকি তিনি তদন্তের স্বার্থে অপরাধী ব্যক্তিকে আটক রাখতে পারতেন এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করতেন। তিনি দাগী অপরাধী এবং সমাজে ক্ষতিকর ব্যক্তিদেরও আটক করার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি অপরাধীর সাক্ষ্যগ্রহণ করতে পারতেন এমনকি মারামারি ও রাহজানির মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন।[১]

আবক্ষাসীয় যুগে মূলত পুলিশ প্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়। পুলিশ প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত। যার দুই ধরনের দায়িত্ব ছিল। প্রথমত, অপরাধের তদন্ত করা; দ্বিতীয়ত, বৈধ সাজা কার্যকর করা। প্রত্যেক শহরে বিশেষ পুলিশ ছিল। সন্দিগ্ধ অপরাধীরে ক্ষেত্রে শরিয়া আইন প্রয়োগ না করা হলেও বৈধ শাস্তির ক্ষেত্রে শরিয়া আইন প্রয়োগ করা হত। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে কাজ করত এবং circumstantial evidence গ্রহণ করা হত। দোষ স্বীকারে বাধ্য করা হত। অনেক সময় পুলিশ প্রধানকে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হত। এমনকি এর জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাও দেয়া হত। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা এবং আদালতের একজন উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা ছিলেন। তার অধিক্ষেত্র শুধু সন্দিগ্ধ বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা পেশাগত অপরাধী ও দাঙ্গা দমন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২]

সাহিব আল-শুরতা (Commander of the bodyguard) বাগদাদ নগরীর জননিরাপত্তা ও শাসকদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। অন্যান্য শহরে পুলিশ প্রধান দায়িত্বপালন করতেন। প্রায় তিনশত বছর বাগদাদের সর্বোচ্চ পদধারী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সমাসীন ছিলেন। মাওয়ারদি ও ইবনে আল তুয়ায়স-এর মতে পুলিশের নানাবিধ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। অনেক সময় টাকশাল, তাঁত ও দাস মার্কেট পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর উপর অর্পিত ছিল।[৩]

---

১. "Everyday he had to prepare and send a report to the police chief at Baghdad. According to Ibn Khaldun the duties of Sahibu'sh Shurtah mainly related to the maintenance of law. He had to suppress crimes, investigate them and punish the guilty. He administered the customary laws (al-urf) which were distinct from the laws of the Shari'at. Sahibu'sh-Shurtah, unlike the Qadi, had to move about to investigate crimes reported or suspected and could use force toe extract confession from the accused. He could imprison a suspected person in order to making investigations and could torture him to force him to make a confession." He could imprison for life a habitual criminal or one who caused great hardship to the community. He could hear the evidence of dhimmis and could hear and decide cases of assaults." see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 217

২. "The main office of the Chief of Police had been originally created by the Abbasids. The chief was called Sahib ush-Shurtah, who had two-fold duty: firstly, he was concerned with crimes in the investigating stage, and secondly, he had to execute the legal punishment. Each city had its own special police and the Shari'ah law was not concerned with the suspected offenders but only with the execution of the legal punishments. Political leadeship, on the other hand, was to concern itself with the investigation work by ascertaining the commission of crimes which required legal punishments. It was accomplished by magistrates, who, having all circumstantial evidence, forced the offenders to confess in the general interest of the public. Often the police chief was given the sole jurisdiction over capital crimes and legal punishments for such matters were taken beyond the judge's jurisdiction." This rank was given only to high military officers and important client of the court entourage and its jurisdiction extended over only to the low and suspected elements and also involved a restraining of turbulant and habitual offenders." see. Anwar Ahmad Qadri, *Justice in Historical Islam,* Ibid, 48

৩. "Apart from the arrangement every community the Persian pre-eminently had its own foreman (Rais) and chief (Qadi). The commander fo the Bodyguard (Sahib-us-Shurtah) was responsible for public safety at the residences of the Prince and of the

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে বাগদাদ নগরীতে বন্দি ও দুর্বৃত্ত কর্তৃক হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনা বৃদ্ধি পেলে পুলিশ প্রধান বিশেষভাবে এ অবস্থার মোকাবিলা করেন।[১] খলিফা আমিন নিহত হওয়ার পর খলিফা আল মামুন যখন বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করেন পুলিশ প্রধানের পুত্র তার সম্মুখ দিয়ে বল্লম হস্তে হেটে চলেন।[২]

বাগদাদের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর খলিফা আল মামুন তাহের বিন হুসাইনকে বাগদাদ পূর্ববর্তী প্রদেশের গভর্নরের পাশাপাশি পুলিশ প্রধান হিসেবেও নিয়োগ করেন।[৩]

পুলিশ প্রধানের অধস্তন সাহিব আল-জিসর নামক একটি পদ ছিল যাদের উপর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ইবনে তাইফুরের মতে, তাহির বিন হুসাইন দুজনকে এ পদে নিয়োগ করেন। তাদের দায়িত্ব ছিল বাগদাদ নগরীর ব্রিজ এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।[৪]

বাগদাদের ব্রিজ এলাকায় কোনো ফৌজদারি অপরাধ সংঘঠিত হলে তা মোকাবিলা কর। সাহিব আল-জিসর কাযি বা বিচারকের আদালতে বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্য অপরাধীদের হাজির করতেন।[৫]

ইবনে তাইফুরের বর্ণনা মতে, একদিন সাহিব আল-খবর ফৌজদারি মামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য সাহিব আল-জিসরের অফিসে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সাহিব আল-জিসর জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে সাহিব আল-খবর যিসর প্রধানকে খুবই তিরস্কার করেন। ফলে জিসর প্রধান খুবই রাগান্বিত হন এবং সাহিব আল-খবরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি যদি চুপ না করেন তবে তাকে বের করে দিবেন। অতঃপর সাহিব আল-খবর রাগান্বিত হয়ে খলিফার নিকট অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় খলিফা পুলিশ প্রধানকে ডেকে পাঠান এবং তার অধস্তন জিসর প্রধানকে তিরস্কার করার জন্য নির্দেশ দেন এবং সতর্ক করেন যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তৎপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রধান আল জিসর প্রধানকে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার ও সতর্ক করেন।

পুলিশ অপরাধীকে ধরে পুলিশ প্রধানের অফিসে নিয়ে আসতো।[৬] সেখানে পুলিশ প্রধানের লেখক বা কাতিব মামলার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করত।[৭] তানুকির বর্ণনা মতে, পুলিশ প্রধানের লেখক বা কাতিব বিশেষ উপলক্ষে গৃহ তল্লাশি বা রেড দিতে পারত।[৮]

এ ছাড়া আবক্ষাসীয় যুগে কোনো গৃহে অপরাধীরা লুকিয়ে আছে বা অবস্থান করছে মর্মে জানতে পারলে, পুলিশ প্রধান সে স্থানে গমন করে প্রতিটি গৃহ তল্লাশি বা রেড দিতে পারতো।[৯]

উপরন্তু পুলিশ মামলা তদন্তের জন্য বিশেষ করে, মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধারে পুলিশ কুকুরের ব্যবহার করতো।[১০]

Governor-in other towns the chief of the police had the same responsibility (Sahib-el-Maunah), (Daneban Stand (P. 393 line 12 from the bottom). About the year 300 he is a well-estabished officer who, as his title shows, is one of the highest in rank at Baghdad. Mawardi and Ibn-el-Tuwais for the first time, tell us what his manifold duties were. Often enough analogous duties such as the supervision of the slave-market, of the mint and of weaving were imposed him." see. Salahuddin Khuda Bakhsh and D.S. Margoliouth, *The Renaissance of Islam*, Patna : Jubilee Printing & Publishing House, 1st edt., 1937, p. 416

১. Tabari, ser. 111-2, p. 881
২. Ibn Tayfur, *Kitab Baghdad*, Cairo : 1949, p. 14
৩. Tabari, ser. 111-2, p. 1039
৪. Ibn Tayfur, Op.cit, p. 20
৫. Ibn Tayfur, Ibid, p. 42-43
৬. Ibn Tayfu, Op.cit. p, 43
৭. Nishwar, vol. 1, p. 341
৮. Ibid, vol. 5, pp. 149-150
৯. Ibid, vol. 1, p. 341
১০. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

এক বর্ণনা মতে, আবক্ষাসীয়দের সময় নতুন নতুন প্রশাসনিক বিভাগ বৃদ্ধি পেলে পুলিশের দায়িত্ব উমাইয়া যুগের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায়। এসময় পুলিশ শুধু তাদের পুলিশি দায়িত্ব যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে। উমাইয়াদের সময় পুলিশ সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে অপরাধের শাস্তি দিতে পারতো। উল্লেখ্য যে, হারাস বাহিনী রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত হয় আর পুলিশ নগরীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত হয়। আবক্ষাসীয় প্রশাসন যন্ত্রে ফকিহ্গণ পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের কিছু গাইড লাইন প্রনয়ণ করেন। ইবনে রাবি পুলিশ প্রধানের আচরণ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন।[১]

সামরিক অধিনায়ক হিসেবে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য আবক্ষাসীয় খলিফা আল মামুন আব্দুল্লাহ ইবনে তাহির ইবনে আল হুসাইনকে বাগদাদের পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। খলিফাগণ দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ প্রধান যারা শরিয়া আইন লঙ্ঘন করে শাস্তি প্রদান করতো এবং সাক্ষী পরীক্ষা করতো না তাদেরকে অপরসারণে কোনোরূপ দ্বিধা প্রদর্শন করতেন না। আবক্ষাসীয় খলিফা আল মুক্তাদির বাগদাদের পুলিশ প্রধান মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুতকে তাঁর স্বীয় অপকর্ম এবং অন্যায় বিচারের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারণ ও বঞ্চিত করেন।[২]

পুলিশ প্রধানের কার্যকলাপ ছিল বহুবিধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। জননিরাপত্তা রক্ষা এবং অপরাধীদের শাস্তির পাশাপাশি তাকে জনৈতিকতার বিষয়েও দেখ-ভাল করতে হত। মিসরের গভর্নর বা ভাইসরয় মুজাহিম ইবনে খাকান তার পুলিশ প্রধান আরজুকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন মহিলাদেরকে সেজেগুজে বের হওয়া ও কবরস্থান পরিদর্শন করা হতে বিরত রাখেন এবং বিলাপকারী ও মেয়েলি কামুক ব্যক্তিদের প্রহার করার নির্দেশ দেন। এছাড়া পুলিশ প্রধান অসৌজন্যমূলক কার্যকলাপ দমন ও মাদকদ্রব্য হতে বিরত রাখার বিষয়ে খুবই সতর্ক ছিলেন।[৩]

পুলিশ বাহিনীর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগকর্তা

কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রধান স্বয়ং খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান খলিফা কিংবা প্রাদেশিক আমির কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কোনো কোনো সময় প্রাদেশিক আমির নিজেই সাহিব আল-শুরতার দায়িত্ব পালন করতেন এবং প্রদেশের জন্য পৃথক কোনো সাহিব আল-শুরতা নিযুক্ত হত না। সাহিব আল-শুরতার অধীনে প্রদেশের প্রত্যেক শহরে পুলিশ কর্মকর্তা নিযুক্ত হতেন এবং তারাও সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত হতেন।

আল-মাওয়ারদি আবক্ষাসীয় শাসন আমলে প্রাদেশিক আমিরদের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে তাদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা–অসীম ক্ষমতার প্রাদেশিক আমির, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার প্রাদেশিক আমির এবং জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী প্রাদেশিক আমির।

---

১. Ibn Abi Rabi, *Suluk al-Malik fi-Tadbir al-Mamalik*, Cairo : 1286 A.H., p. 131

২. "As a result of the efficiency of some military commanders during the Abbasid caliphate, Caliph al-Ma'mun appointed `Abdullah ibn Tahir ibn al-Hussayn as chief of police of the caliphate capital, Baghdad, after he had showed military capabilities in battles and conquests. The caliphate establishment did not hesitate to dismiss corrupt chiefs of police, who violated the limits of the Shari`ah prescribed penalties and did not examine evidence. Abbasid Caliph al-Muqtadir Billah dismissed Baghdad chief of police Muhammad ibn Yaqut and deprived him of assuming a State office because of his misbehavior and injustice." see. http://search.mywebsearch.com/ mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2015

৩. "The task of the chief of police at the time was multiple and diverse. In addition to their public office as meant to preserve security and punish the thieves and the corrupt, the chiefs of police in most Arab regions used to maintain public morality. Muzahim ibn Khaqan, viceroy of Egypt (died. 253 AH), ordered his chief of police Azjur, a Turk, to prevent women from adorning themselves or visiting the graves, and beat the effeminates and (professional female) mourners (Naddabah). The chief of police was also keen to prevent indecent activities and fight against alcohol." see. http://search.mywebsearch.com/ mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2015

Dhaka University Institutional Repository

খলিফার কোনো বিশেষ প্রিয়ভাজন ব্যক্তিকে কোনো কোনো সময় অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে প্রাদেশিক আমির নিয়োগ করা হত। তবে সাধারণত দুর্বল ও অযোগ্য খলিফা কিংবা শাসন ব্যাপারে অমনোযোগী খলিফার আমলে প্রাদেশিক আমিরগণ অসীম ভোগ ক্ষমতা করতেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমির প্রাদেশিক শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রদেশের সামরিক, বেসামরিক রাজস্ব, বিচার ও ধর্মীয় শাসনের প্রধান। তিনি প্রাদেশিক সামরিক বাহিনী পরিচালনায় সর্বময় দায়িত্বপালন করতেন। তিনি প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ ও বিচারকদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব ধার্য, রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব ব্যয়ের দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত ছিল। প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পুলিশ বাহিনী নিয়োগ এবং পুলিশের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন।[১]

পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা

আবক্ষাসীয়গণ পুলিশ প্রধান নিয়োগে ধর্মীয় বিচারক, শিক্ষাগত ও ধার্মিকতার বিষয়ে খুবই সতর্ক ছিলেন। যাতে তারা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে। ইবনে ফারহান তার গ্রন্থ Tabsirat al-Hukkam এ উল্লেখ করেন যে, পুলিশ প্রধান ইব্রাহিম ইবনে হুসাইন ইবনে খালিদ জনৈক মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে চল্লিশ দোর্‌রা মারেন এবং তার দাড়ি কামিয়ে দেন। অতঃপর তার মুখে কালিমা লেপন করে দু'ওয়াক্ত নামাজের ভেতরে এগার বার শাস্তিস্বরূপ প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল মিথ্যা সাক্ষ্য দানের শাস্তি। এ পুলিশ প্রধান ছিলেন অতি ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, আইনজ্ঞ ও কুরআনের ব্যাখ্যা দানকারী। তিনি খলিফা আল আমিন মাহমুদের সময় পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ইমাম মালিকের বন্ধু মুতরিফ ইবনে আব্দুল্লাহ এর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং ইমাম মালিকের হাদিসের বর্ণনা করেন।[২]

সিয়াসত নামায় উল্লেখ রয়েছে যে, সুন্দর চেহারা ও স্বাস্থ্য এবং পৌরুষ ও সাহসী দেখে দুশ' বিশেষ রক্ষী দরবারে রাখা উচিত। তাদের মধ্যে একশ' খোরাসানি আর বাকি একশ' দাইলামি হওয়া উচিত। এই বিশেষ রক্ষীদের কাজ হবে দেশে-বিদেশে সর্বদা রাজার সঙ্গে থাকা। তারা স্থায়ীভাবে দরবারের সঙ্গে জড়িত থাকবে তাই তাদের পোশাক কেতাদুরস্ত হওয়া দরকার। দুশ' জনের অস্ত্র তাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; তারা যখন কাজ শুরু করে তখন তাদের দিতে হবে আবার কাজ শেষ হলে তাদের থেকে নিয়ে নিতে হবে। তবে তার মধ্যে বিশখানা তলোয়ার ঝুলাবার কটিবন্দ্ এবং বিশখানা ঢাল স্বর্ণমন্ডিত হতে হবে এবং বাকি একশ' আশিখানা কটিবন্দ ও ঢাল হবে রৌপ্যমন্ডিত। সঙ্গে খাটের (পারস্য উপকূলের একটি দ্বীপ) বল্লমও থাকতে হবে। রক্ষীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে বেতন ও ভাতা দিতে হবে। প্রতি পঞ্চাশ জনের জন্য একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার থাকবে (সার্জেন্ট) যার

---

১. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭-২৬৮

২. "The Abbasids were keen to appoint the religiously and jurisprudentially educated, pious people as chiefs of police, so that they would not care for anybody when implementing the prescribed penalties. In his book Tabsirat al-Hukkam, Ibn Farhun said: "Sahib al-Shurtah (chief of police) Ibrahim ibn Hussayn ibn Khalid lashed a perjurer 40 whips, and ordered his beard be shaved and his face be blackened with soot and be shown around eleven times between two prayers, with shouters crying: 'This is the punishment of a perjurer.' This chief of police was virtuous, good, jurist, and interpreter of the Qur'an. He was appointed as chief of police during the reign of al-Amin Muhammad. He also met Mutrif ibn 'Abdullah, friend of (Imam) Malik and narrated his Muwatta' (book of Hadith)." see. http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2015

Dhaka University Institutional Repository

কাজ হবে তার অধীনস্থ লোকদের খবরাখবর নিয়ে তাদেরকে শাসনে রাখা। রক্ষীবাহিনীর প্রত্যেককে অশ্বারোহণে পারদর্শী হতে হবে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঘোড়ার সাজ দিতে হবে যাতে জরুরি সময়ে তারা তাদের কর্তব্য পালনে পিছপা না হয়।[১]

পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগে শুধু দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য দেখা হত না পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশীলতার উপর গুরুত্বারোপ করা হত। একটি ঘটনা এরূপ যে, একজন পুলিশ প্রধান দস্যুতার দায়ে দুজনকে হাজির করলেন, অতঃপর এক বোতল পানি তাদেরকে দিয়ে নিক্ষেপের মাধ্যমে বোতলটি ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে একজন ভয় ও ইতস্ততা প্রদর্শন করে অন্যজন খুবই দৃঢ়তা দেখায়। তখন পুলিশ প্রধান ইতস্ততকারী ব্যক্তিটিকে ছেড়ে দেন এবং অপর ব্যক্তিকে দুস্যতার টাকা ফেরত আনতে বলেন। পুলিশ প্রধানকে জিজ্ঞেস করা হয় কিভাবে আপনি এ বিষয় জানতে পারলেন যে এই ব্যক্তিই দস্যুতা করেছে? উত্তরে তিনি জানান যে, চোর অবশ্যই শক্ত হৃদয়ের হয় এবং কোনো বিষয়ে ভীতু হয় না। নির্দোষ ব্যক্তি খুবই ভীতিগ্রস্ত হয় এমনকি তার গৃহে কোনো ইঁদুর ঘুরে বেড়ালেও![২]

ইমাম ইবনে আল কাইয়ুম তার গ্রন্থ al-Turuq al-Hukmiyyah তে আবক্ষাসীয় পুলিশের বুদ্ধিমত্তার কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আবক্ষাসীয় খলিফা আল মুকতাফি-এর সময় একটি বৃহৎ পরিমাণ অর্থ চুরি হয়। খলিফা আল মুকতাফী তাঁর পুলিশ প্রধানকে উক্ত চুরির ঘটনা উদঘাটন করতে নির্দেশ দেন। তৎপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রধান ঘোড়ায় উপবিষ্ট হয়ে দিন-রাত্রি রাস্তা ও প্রতিবেশী এলাকায় বিচরণ করতে থাকেন। একদিন তিনি দূরবর্তী এলাকার একটি গলি অতিক্রম করার সময় একটি গৃহের সম্মুখে প্রচুর পরিমাণ মাছের হাঁড় দেখতে পান। অতঃপর তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করেন যে, এই মাছের হাঁড়গুলো কয়দিনের খাবারের উচ্ছিষ্ট। তখন লোকটি উত্তর দেয় যে, এটি এক রাত্রির খাবারের মাছের উচ্ছিষ্ট হাঁড়। তৎপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রধান চিন্তা করেন যে, মরুভূমিস্থ সীমান্ত এলাকার গলির বাসিন্দাদের পক্ষে এতগুলো মাছ ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। ঘটনাটি রহস্যজনক তাই এটির ক্লু উদঘাটন করতেই হবে। তখন পুলিশ প্রধান প্রতিবেশী মহিলার সাথে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং স্তুপীকৃত মাছের হাঁড়ের পাশের ঘরের দরজার কড়া নাড়েন। অতঃপর তিনি মহিলার নিকট পান করার জন্য পানি চাইলে মহিলাটি তাকে পানি প্রদান করেন। এ সময় তিনি মহিলাকে গলির বাসিন্দাদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন। মহিলাটি এর পরিণতি অবগত না হয়ে তথ্য প্রদান করেন। পুলিশ প্রধান তাকে স্তুপীকৃত হাঁড় সংলগ্ন বাড়িতে কে কে বাস করেন তা জানতে চান? জবাবে মহিলাটি জানান যে, পাঁচজন বলিষ্ঠ যুবক এখানে বাস করেন এবং তাদেরকে ব্যবসায়ী বলে মনে হয়। তারা প্রায় এক মাস যাবত এখানে বসবাস করছেন। তারা দিনের বেলায় খুব কদাচিৎ বের হন। কোনো কারণে তারা বাড়ির বের হলেও দ্রুত বাসায় ফিরে আসেন। তারা সারাদিন খাওয়া-দাওয়া ও দাবা খেলে অতিবাহিত করেন। তাদের সেবার জন্য একজন বালক

---

১. নিজাম-উল-মূলক, *সিয়াসতনামা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৯২

২. "The ruling establishment was keen to choose the intelligent and the thoughtful for the police office, not only stipulating strength and power. The proof is that a police chief brought two persons accused of robbing and "ordered a bottle of water and held it with his hand and then threw it deliberately to be broken. One of them seemed scared, while the other kept firm. The police chief said to the scared man: "Go," and said to the other: "Bring back the money." He was asked: "How did you know?" He said: "A thief is strong-hearted and does not get upset, and the innocent gets troubled if a mouse moves in the house to prevent him from theft!" see. http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2015

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। রাত্রিকালে তারা বের হলে বালকটিকে বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত রাখেন। প্রত্যুষে যখন তারা ফিরে আসেন তখন আমরা ঘুমন্তাবস্থায় থাকি। এগুলো কী চোরের লক্ষণ নয়? তখন পুলিশ প্রধান বলেন হ্যাঁ। অতঃপর তিনি দশজন পুলিশ সদস্যকে আহক্ষান করেন এবং তাদেরকে প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদে নিয়োজিত করেন এবং দরজায় কড়া নাড়েন। বালকটি দরজা খুলে দেয় এবং পুলিশ ভিতরে প্রবেশ করে পাঁচ যুববকে গ্রেফতার করেন। এ ঘটনা দ্বারা পুলিশের বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি ফুঁটে ওঠে।[১]

পুলিশ বিভাগের সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে যাচাই-বাছাই হত বেশি এবং এদের বেতন-ভাতা সাধারণত সামরিক বাহিনীর সিপাইদের চেয়ে বেশি হত। একজন পুলিশ সদস্যকে যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হত তা ছিল নিম্নরূপ:

(১) ন্যায়নিষ্ঠ (২) সচ্চরিত্র/চরিত্রবান (৩) অত্যন্ত ধার্মিক (৪) অসীম ধৈর্য্যশীল ও সহনশীল (৫) কোনোরূপ উৎকোচ গ্রহণে অভ্যস্ত নয় (৬) আমানতদার (৭) যিনি কর্তব্যে অবহেলা করেন না (৮) যিনি অসদাচরণমূলক কর্মকাণ্ড হতে সর্বদা দূরে থাকেন।[২]

দশম শতাব্দীতে বুওয়াইয়াগণ সাসানিয় রাজবংশের নেতা আবু সুজা বুইয়ার নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খলিফা মুসতাকফি তুর্কিদের প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য বুওয়াইদের বাগদাদে স্বাগত জানান। কিন্তু বাগদাদে বুওয়াইদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবক্ষাসীয় শাসন কাঠামোতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খলিফাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। কাযি ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণে খলিফার মতামত উপেক্ষা করা হতে থাকে। এ পরিবর্তন পুলিশ প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মুইজ দৌলা-এর সময় সরকারের কিছু পদে নিয়োগের জন্য উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ করা হয়। Moskovayh উল্লেখ করেন যে, সাহিব আল-শুরতা পদে নিয়োগের জন্য মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) দিরহাম গ্রহণ করা হয়। ধারণা করা হয় খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজস্ব হ্রাস করা হলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইবনে আসিরের মতে, পুলিশের অভিযোগ রেকর্ড ও তদন্তের জন্য তাদমিন নামে এই ফি গ্রহণ করা হয়।[৩]

---

১. "Imam Ibn al-Qayyim (may Allah have mercy on him) stated in his book al-Turuq al-Hukmiyyah (Ways of Government) a story demonstrates the energy and intelligence of an Abbasid chief of police, especially in times of crises. He reported that during the Abbasid Caliph al-Muktafy thieves stole a large amount of money. Al-Muktafy compelled the chief of police to uncover the thieves or fine the (stolen) money. The chief of police then used to ride (his horse) and roam by himself (the streets and neighborhoods) day and night until "he passed one day in an alley in the remote areas of the country. He entered only to find it abominable. In front of a home there were a big amount of fish bones. He asked someone: "How much do you expect for the fish of these bones?" The man said: "One dinar." The chief of police said to himself: "The conditions of the residents of such a remotely desert-bordered alley can't afford this purchase. Nobody, who has some money and is afraid of his money, and nobody with money can spend such an amount of money. Surely there must be something mysterious that must be discovered." The chief of police ruled out this and said: "I need a woman from this neighborhood to talk to her." He then knocked a door other than the one where the fish bones were thrown. He asked for water to drink. A weak, old woman came out of the house and he asked to drink water many times and she gave him water. During this he asked her about the residents of the alley and she informed him, unaware of the consequences, until he asked her: "Who live in that house – referring to the one where fish bones were thrown in front?" She said: "Five strong, young people live in it. They seem to be traders. They have been living in it for about a month. We see them at day very rarely. We see anyone of them comes out of the house quickly to do something and returns back quickly. They spend all the day long eating, drinking and playing chess. They have a boy serving them. At night they leave the house for another one of them in al-Karkh, leaving the boy to guard the house. At twilight they come back while we are sleeping, unaware of them. Aren't these the conditions of thieves?" He said: "Yes." And quickly he called for ten policemen and placed them on the roofs of the neighbors and knocked the door. The boy opened and the policemen broke into and arrested all of them (the five young men), who turned to be the thieves." This story is a proof of the shrewdness of Baghdad chief of police and his enforcement of the caliph's orders immediately." see. http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2015

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

৩. "After dominance of Buyids in Baghdad, their attempts to sieize the government structures of Abbasids increased, the responsibilities of the Caliph limited and his ideas were ignored in appointment and ousting of the judges and administrators of

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের বেতন ও মর্যাদা

খলিফা আল-মনসুর সরকার পরিচালনায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। এ চারটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো-(১) ন্যায়পরায়ণ কাযি (an honorable kadhi) (২) যোগ্য পুলিশ অফিসার (a just chief police officer) (৩) বাণিজ্যবান্ধব অর্থমন্ত্রী (a business like finance minister) এবং (৪) বিশ্বাসযোগ্য পোস্টমাস্টার (a trustworthy post master)।[১]

শুরতা সৈনিক শ্রেণিভুক্ত ছিল এবং মোটা বেতন পেত। তারা সৎ ও কর্মে উৎসাহী ছিল। বাগদাদে পুলিশ বিভাগের কর্তার অফিস প্রাদেশিক শাসনকর্তার অফিসের মতো মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। মামুনের অধীনে সেনাপতি তাহির কিছুকাল যাবৎ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা পদের জন্য আবেদন করে সে পদে নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত পুলিশ বিভাগে ছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিব আল-শুরতা মাঝে মাঝে উযিরের মর্যাদা লাভ করতেন।[২]

আবক্ষাসীয় যুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন 'ওয়ালি'। প্রাদেশিক প্রশাসনের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ওয়ালির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছিল কাযির। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো হল- সাহিব আল-বারিদ, সাহিব আল-শুরতা এবং বিভিন্ন বোর্ডের সচিববৃন্দ।

আবক্ষাসীয় যুগে প্রাদেশিক সকল কর্মকর্তাদের ভাল বেতন প্রদান করা হত যাতে তারা কোনো প্রকার দুর্নীতিতে লিপ্ত না হয়। উমাইয়া যুগে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের মাসিক তিন'শ দিরহাম প্রদান করা হত, আবক্ষাসীয় যুগেও অনুরূপ প্রদান করা হত। সাধারণ করণিকদের মাসিক বেতন ছিল দশ দিরহাম।[৩]

পুলিশের মর্যাদা ও বেতন সামরিক বাহিনীর মতো ছিল। পুলিশ অফিসারগণ সৎ ছিলেন এবং তাঁদের নিজ দায়িত্ব আগ্রহের সহিত পালন করতেন।[৪]

হযরত আলি (রা.) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া যুগে এর প্রধানকে সাহিব আল-আহদাস এবং আবক্ষাসীয় যুগে সাহিব আল-শুরতা বা ওয়ালি আল-আহদাস ওয়াল মাউনা বলা

---

other occupations. The institution of Shurta was also affected by this transfer. On the one hand, in the period of Muizz AL-Dawla, some of the governmental positions were appointed to some people in return for amounts of money received as bribe. The report of Moskovayh directly mentions the process of appointing someone to the position of Sahib Al-Shrta in return for receiving 20,000 Dirhams per month. It seen that this was with the intention of earning more money in the time of reduction of taxes received and earnings of the government because of the draught and catastrophes like that and maybe this act was kind of taxpaying to the treasury of Buyings for the earnings of the Shurta through registering the claims and investigating them which is referred to as Tadmin (guarantee) by Ibn Athir." see. Haitham Shirkosh, Asghar Mahmoudabady & Asghar Foroughi, *Asian Culture and History,* vol. 5, No. 2, Canadian Centre of Science and Education, p. 67-68; 2013

১. S. Khuda Bukhsh, *The Orient under the Caliphs*, Ibid, p. 226

২. সৈয়দ আমির আলি, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

৩. "The most important officer was the Wali who was in charge of the entire administration of the province. Next in rank and importance was the Qadi. Other important officers were Sahibul l-Barid, Sahibu sh-Shur-tah and the secretaries of the various Boards. All the provincial officers were paid well and there was not much corruption under the early 'Abbasids. The chief provincial officers under the Umayyads received 300 dirhams per month each and the same salary was continued under the early 'Abbasids till the days of al-Mamun when al-Fadl bin Sahl raised the salaries further. Under al-Mamun the Qadi of Egypt is reported to have drawn a salary of 4,000 dirhams per month. The salary of an ordinary clerk was 10 dirhams a month, which was equal to the salary of a labourer who was employed in building Baghdad. Sawwqr, the Qadi of al-Basrah under al-Mansur, had two Katibs under him; one was paid 40 dirhams and the other 20." see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 213

৪. "The police held equal rank with the militia and its personnel were well paid. The officers of the Shurtah were honest and discharged their duties with great zeal and ardour." see. S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Ibid, p. 218

Dhaka University Institutional Repository

হত। ইবনে আসির-এর মতে, তিনি (শুরতা) প্রাথমিক আবক্ষাসীয় খলিফাদের পুলিশ প্রধান ও রাজকীয় দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তী আবক্ষাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে মন্ত্রী মর্যাদা লাভ করেন। তিনি উচ্চ বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন। তার দায়িত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল অর্ধেক পুলিশ ও অর্ধেক সামরিক।[১]

পুলিশ প্রধান মর্যাদার চিহ্নস্বরূপ তার কোমরে লম্বা ছুরি রাখতেন এবং রাত্রিকালীন পাহারা সকাল পর্যন্ত চলত।[২]

এ সময় পুলিশ প্রধানের বেতন হারাস প্রধানের তুলনায় কম ছিল। তানুকির বর্ণনা মতে, হারাস প্রধানের বার্ষিক বেতন ছিল দশ লক্ষ দিরহাম আর পুলিশ প্রধানের বার্ষিক বেতন ছিল পাঁচ লক্ষ দিরহাম। ইব্রাহিম আগলাবী'র বংশধর আগলাব খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময় ইফ্রিকিয়ার পুলিশ প্রধান ছিলেন।[৩]

আবক্ষাসীয় খিলাফতের সময় পুলিশ প্রধান ও হারাস প্রধানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। খলিফা আল মনসুরের ছেলে আল-মাহদি তার শাসনামলে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য সেভাবেই অব্যাহত রাখেন যেভাবে এটি উমাইয়া যুগ হতে পরিচালিত হয়ে আসছিল।[৪]

পরবর্তীতে নতুন নতুন অফিস ও বিভাগ সৃজিত হলে পুলিশের দায়িত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। যেমন খলিফা তার আদালতের জন্য একটি প্রাণদন্ড (Court Executioner) প্রদানকারী পদের সৃষ্টি করেন। এ প্রাণদন্ড প্রদানের কাজটি পূর্বে পুলিশ কর্তৃক সম্পাদিত হত।[৫]

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে পুলিশের মর্যাদা পূর্বের মতো সুসংগঠিত ছিল। আল জাহিজের বর্ণনা মতে, খলিফা আল হাদির ভ্রমণকালে পুলিশ প্রধান তার হাতের বল্লম নিয়ে খলিফার সামনে দিয়ে অগ্রসর হতেন।[৬]

সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

রোম সীমান্তে যে সব সৈন্য স্থায়িভাবে সীমান্তচৌকিসমূহে নিযুক্ত থাকতো, অন্য সৈন্যদের তুলনায় তাদের বেতন-ভাতা বেশি ছিল। এরূপ একজন সৈন্য সাধারণত পনের থেকে ত্রিশ টাকা বেতন পেত। একদল সৈন্য সর্বদা রাজধানীতে নিযুক্ত থাকতো। সামরিক বাহিনীর একটি অংশ রাস্তাঘাটের প্রহরায় নিযুক্ত থাকতো। তাদের দায়িত্ব হাজার হাজার চৌকি বা ফাঁড়িতে বিভক্ত করা থাকতো। বড় বড় শহর এবং কেন্দ্রীয় স্থানসমূহেও এক বিপুলসংখ্যক সৈন্য সর্বদা মোতায়েন থাকতো। শহরসমূহের হিফাযতের উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টরের অধীনে এবং সাহিবুশ শুরতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত পুলিশরাও সরকারি

---

১. "This was an institution of Police established by Hadrat Ali. It was headed by Sahib al-Ahdath under the Umayyads and Sahib al-Shurtah or Wali al-ahdath wal ma'awin (Prefect of the Police) under the Abbasids. He was the chief of police as well as of the royal bodyguard under the early Abbasid Caliphs and executed death sentences. During the decadent period of the Abbasids his importance grew so much that he occasionally held the rank of a wazir besides presiding over a diwan. He was a well paid officer but his jurisdiction was confined to cities. Each importance city had its own special police whose function was semi-police and semi-military in character." see. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, Ibid, p. 76

২. "The distinguishing mark of the police was a long knife which they carried in their girdle. Their patrol at night continued till the early morning prayer." see. Salahuddin Khuda Bakhsh and D.S. Margoliouth, *The Renaissance of Islam*, Ibid, p. 416

৩. Yaqubi, vol. 3, p. 149

৪. Aghani, vol. 18, p. 36; Wulat, pp. 144-145

৫. Tabari, ser. 111-1, p. 544

৬. Al-Taj, p. 80-81

Dhaka University Institutional Repository

তহবিল থেকে বেতন-ভাতা পেত। রাজস্বের একটি বিরাট অংশ সামরিক বাহিনীর খাতে ব্যয়িত হতো। ডাক বিভাগের জন্যে নিয়োজিত সৈন্য, সওয়ারীর পশু এবং ওগুলোর দায়িত্বে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীরা এবং ডাক খরচও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

আবক্ষাসীয় যুগে ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্যান্য সংস্থার মত বাজেটে পুলিশের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে বরাদ্দ ছিল। রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের জমাকৃত সম্পদ কিভাবে পুলিশ বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের জন্য ৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্যয়িত হয় তা Reuben Levy তার The Social Structure of Islam গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

	(Dinars)
On the Holy Cities (Mecca and Medina) and the pilgrim routes there to	$315,426\frac{1}{2}$
On the frontier posts …… …… …… …… …… …… …	491, 465
Stipends of qadis in the empire …… …… …… …… …	56, 569
Police officers and magistrates in the empire … … … … … … … …	34, 439
Officers of the barid (Post) … … … … … … … … … … … … … … … …	79, 402

> The total cost of these public undertakings and other State expenditure was less than one million dinars, while the expenditure on the royal household, the minor officials in government diwans, the security police at the capital and other items accounted for over fourteen and a half millions."[২]

আবক্ষাসীয় যুগে পুলিশ প্রধান বাগদাদ এবং সাম্মারাহ-এর পুলিশ প্রধান উমাইয়া যুগের স্বাভাবিক পুলিশ প্রধানদের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তার পদমর্যাদা এবং কার্যাবলী অনেকটা গভর্নরের মত ছিল। উল্লেখযোগ্য পুলিশ অফিসারগণ হলেন-তাহির বিন হুসাইন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, তাহির ইসহাক বিন ইব্রাহিম।[৩]

মুহতাসিব (নৈতিক পুলিশ বিভাগ)

দিওয়ানুল হিসবাহ: এটা পুলিশ বিভাগের মত এক প্রকারের আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ। সমাজ ও নাগরিক জীবনে সর্ব প্রকারের অপরাধমূলক তৎপরতা দমনে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বিভাগ যথেষ্ট ছিল না। তাই তৃতীয় আবক্ষাসীয় খলিফা আল-মাহদি দিওয়ানুল হিসবাহ নামে এই বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ স্থাপন করেন। ধর্ম ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ দমন করে সমাজ ও নাগরিক জীবনে আইন-শৃঙ্খলার অগ্রগতি সাধন করা এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য ছিল। এই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি ছিল আল-মুহতাসিব। হিসবাহ দায়িত্ব পালনের জন্য সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শহরে মুহতাসিব নিযুক্ত থাকত। খলিফা কিংবা উযির মুহতাসিব নিয়োগ করতেন।[৪]

---

১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : ইফাবা, জুন-২০০৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩

২. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 324

৩. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 226

৪. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মুহতাসিবের যোগ্যতা ও বেতন-ভাতা: ইসলামি আইনে পারদর্শী, ধার্মিক, সৎ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মুহতাসিব নিয়োগ করা হত এবং পুলিশ কর্মকর্তার ন্যায় তাঁকেও আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা দেয়া হত।

মুহতাসিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য: মুহতাসিব ছিলেন গণ চরিত্রের পর্যবেক্ষক।[১] মুহতাসিবের কার্যাবলী প্রধানত: তিন প্রকারের। যথা-(ক) নৈতিক কর্তব্য ও কার্যাবলি (খ) ধর্মীয় কর্তব্য ও কার্যাবলি ও (গ) জনকল্যাণমূলক কর্তব্য ও কার্যাবলি।

প্রত্যেকটি বৃহৎ শহরে বিশেষ পুলিশ বাহিনী ছিল যারা সামরিক পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এছাড়া নগর পুলিশকে 'মুহতাসিব' বলা হত। তার দায়িত্ব ছিল বাজার পরিদর্শন ও নৈতিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ। এছাড়া তিনি ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত বাটখারার ওজন ও পরিমাপ সঠিক আছে কি-না তা পরীক্ষা করতেন। কিন্তু তার বিচারিক ক্ষমতা ছিল না।[২]

(ক) নৈতিক কর্তব্য ও কার্যাবলি: মুহতাসিবের নৈতিক কার্যাবলির মধ্যে ছিল–

- সামাজিক অসাধুতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শঠতাসহ সর্বপ্রকারের অনৈতিক কার্যকলাপ দমন করা এবং জনগণকে নৈতিক কার্যকলাপের দিকে আকৃষ্ট করা ছিল মুহতাসিবের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।
- প্রকাশ্যে জুয়াখেলা, মদ্যপান, মদ্য তৈরি, বিক্রয় ও সরবরাহ, পুরুষ ও মেয়েলোকের অবাধে জনসমক্ষে আপত্তিকর বিচরণ ও অশালীন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা প্রভৃতি অপরাধমূলক কার্যকলাপ তিনি দমন করতেন। মাতাল ও জুয়াড়ীকে তিনি প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করতেন।
- চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী এবং গৃহপালিত পশুকে তিনি মনিবের নিষ্ঠুর আচরণ হতে রক্ষা করতেন।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তিনি শিক্ষকদের অমানুষিক শাস্তি প্রয়োগ হতেও রক্ষা করতেন।
- নারী-পুরুষের মধ্যে ইসলামে স্বীকৃত নৈতিক আদর্শ বলবৎ রাখতে তিনি চেষ্টা করতেন।
- নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কোনো পুরুষ সাদা পাকা দাড়ি রং দিয়ে কালো করলে মুহতাসিব তাদের শাস্তি দিতেন।
- দরিদ্র মেয়েদের বিবাহ দেয়া এবং পরিত্যক্ত শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ মুহতাসিবের নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(খ) ধর্মীয় কর্তব্য ও কার্যাবলি: মুহতাসিবের নৈতিক কর্তব্যের ন্যায় ধর্মীয় কর্তব্যও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

- ইসলাম ধর্মের আদেশ-নির্দেশ, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান মুসলমানরা যথাযথভাবে পালন করত কিনা সে ব্যাপারে মুহতাসিব সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

---

১. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 336

২. "Each large city had its own special police who also held military rank and were as a rule well paid chief of municipal police was called muhtasib for the action overseer of markets and morlas. It was his duty to see proper weights and measures were used in trade, that legal debts were paid (though he had no judicial power)." see. Philip K. Hitti, *History Of The Arabs,* Ibid, p. 322

Dhaka University Institutional Repository

- রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তিনি উক্ত মাসে জনসম্মুখে মুসলমানদের পানাহার নিষিদ্ধ রাখতেন। স্থায়ীভাবে রুগ্ন ব্যক্তি, মুসাফির এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না।

- মুহতাসিব শুক্রবারে জুমুআর সালাতে মুসলমানদের শরীক হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

- সরকারি ব্যয়ে নির্মিত কোনো মসজিদ মেরামতের প্রয়োজন হলে তিনি সে ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

- মসজিদে ইমাম সালাত দীর্ঘায়িত করলে এবং তাতে মুসল্লিদের অসুবিধা হলে মুহতাসিব সে ব্যাপারে ইমামকে সতর্কতামূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন।

- কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলিমকে গালাগালি করলে কিংবা উৎপীড়ন করলে মুহতাসিব উক্ত মুসলিমকে শাস্তি দিতেন।

- মুহতাসিব অমুসলমানদের ধর্মীয় কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলমানদের অপপ্রচার দমনে তাঁকে তৎপর থাকতে হত।

- ইসলাম ধর্মের ঐক্য ও পবিত্রতা রক্ষা করা ছিল মুহতাসিবের পবিত্র দায়িত্ব।

- ইসলাম প্রচারকারী এবং ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা প্রদানকারীগণ তাঁদের প্রচারণা ও ব্যাখ্যায় যাতে কোনো প্রকার অনৈসলামি ভাবধারা প্রচার না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও ছিল তাঁর দায়িত্ব।

- জনগণকে ধর্মীয় কাজে উৎসাহিত করা এবং সর্বপ্রকারের ধর্মবিরোধী কাজ হতে বিরত রাখা মুহতাসিবের ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে গণ্য ছিল।

(গ) জনকল্যাণমূলক কর্তব্য ও কার্যাবলি: ইসলামের ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের বাস্তবায়নের প্রচষ্টা ব্যতীত মুহতাসিব পৌর জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।[১] মুহতাসিব জনকল্যাণমূলক যে সব কর্তব্য পালন করতেন সেগুলো হলো-

- শহরের পানীয় জলের অসুবিধা দূর করতে, এর ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীর মেরামত করতে ও মুসাফিরদের তত্ত্বাবধানের জন্য সরকারি তহবিল অপ্রতুল হলে মুহতাসিব শহরবাসীদের আর্থিক সাহায্যে উক্ত অসুবিধাসমূহ দূর করার ব্যবস্থা করতেন।

- শহরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

- শহরে সর্বসাধারণের ব্যবহৃত খেলার মাঠ, বিনোদনের পার্ক, দালান-কোঠা, হাট-বাজার ও রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল।

- শহরে সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তার পাশে কোনো বাড়ি, দালান-কোঠা কিংবা মসজিদ নির্মিত হতে থাকলে তিনি দেখতেন যেন সে বাড়ি, দালান-কোঠা কিংবা মসজিদের কোনো অংশ অন্যায়ভাবে রাস্তার উপর নির্মিত না হয় এবং অন্যায়ভাবে নির্মিত অংশ তিনি ভেঙ্গে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন।

---

১. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 337

Dhaka University Institutional Repository

- কোনো খ্রিস্টান বা ইহুদি নাগরিক বাড়ি তৈরি করার সময় মুহতাসিব বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন যেন তার বাড়ির ছাদ তার প্রতিবেশী কোনো মুসলমানের বাড়ির ছাদ অপেক্ষা উঁচু না হয়। প্রতিবেশী মুসলমানের বাড়ির গোপনীয়তা রক্ষার্থে মুহতাসিব এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতনে।

- বাড়ির খোলা ড্রেন পাইপের পানি পড়ে রাস্তার পথিকের যাতে কাপড়-চোপড় ভিজে না যায় সে জন্য মুহতাসিব কোনো বাড়িতেই খোলা ড্রেন পাইপ রাখতে দিতেন না।

- রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় জমানোর ফলে কিংবা অন্য কোনো কারণে রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তিনি তা দূর করতেন।

- জনস্বার্থ রক্ষাকারী হিসাবে মুহতাসিব হাট-বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর দাম, ওজন ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল পরীক্ষা করতেন। ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল করলে, ওজনে কম দিলে ও বেশি দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করলে মুহতাসিব তাদেরকে শাস্তি দিতেন।

- জনগণের চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি বাজারের সংকীর্ণ রাস্তায় ব্যবসায়ীদেরকে তাদের বিক্রয়ের উদ্দেশ্য আনা জিনিসপত্র স্তুপীকৃত করে রাখতে নিষেধ করতেন।

- বাজারে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয় সেজন্য মুহতাসিব বাজারের ভিতর দিয়ে কাঠ, খড় কিংবা কোনো দুর্গন্ধময় বস্তু বহনকারী গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করতেন। প্রকৃত পক্ষে পৌর জীবনের সুখ-সুবিধা মুহতাসিবের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করত।

মুহতাসিবের প্রকার: ঐতিহাসিক আল-মাওয়ারদির মতে মুহতাসিব দুই প্রকারের ছিলেন। (১) বেতনভোগী ও (২) স্বেচ্ছাসেবী। বেতনভোগী মুহতাসিব ছিলেন রাষ্ট্রের নিয়মিত কর্মচারী। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী মুহতাসিব ছিলেন রাষ্ট্রের সৎ ও ধার্মিক সাধারণ নাগরিক। অনেক সময় সৎ ও ধার্মিক মুসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে মুহতাসিবের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা জনগণকে সৎকাজে উৎসাহ দিতেন এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখতেন। খলিফা, প্রাদেশিক গভর্নর এবং কাযিগণও কোনো কোনো সময় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মুহতাসিবের কিছু দায়িত্ব পালন করতেন। ইসলামের ঐক্য ও পবিত্রতা রক্ষার্থে খলিফা এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের মুসলমানদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতবাদ দমনের প্রচেষ্টা এবং কাযিদের বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা, মসজিদ মেরামত প্রভৃতি কার্যাবলি তাঁদের হিসবাহ দায়িত্ব পালনের শামিল। মুহতাসিবের কার্যাবলির পরিধি আবক্ষাসীয় বিচার ব্যবস্থায়ও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতি শহরে পুলিশ বিভাগের ও কাযির যুগ্ম তত্ত্বাবধানে একজন বিশেষ পুলিশ নিয়োজিত ছিলেন যিনি প্রথমে বাজার প্রধান পরে মুহতাসিব নামে অভিহিত হন। তিনি ইসলামের বিধান অনুযায়ী সৎকর্মে উৎসাহ ও মন্দ কর্মে বাধাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আইন বইসমূহের এবং আইনজ্ঞদের ফাতওয়ায় (সিদ্ধান্ত বা মত) মুহতাসিবদের কর্তব্যের মধ্যে বাজার-হাট পরিদর্শন করে পণ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও সঠিক পরিমাণ ও ওজন নিশ্চিত করণ, ভেজাল ও প্রতারণায় বাধাদান, খদ্দের ও কারিগরদের মধ্যকার ঝগড়া মিটনো, মূল্য স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা, মাদকদ্রব্য তৈরি, ব্যবহার ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, জুয়ার আড্ডা খুঁজে বের করে শাস্তিবিধান, ঋণদাতাকে ঋণ আদায়ে সাহায্য করা, স্ত্রী-পুরুষের আচরণে শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষা করা এবং বিক্রেতার পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারটাই বিশেষ গুরুত্ব পেত। শহরের রাস্তাঘাট চওড়া করার আদেশ দেয়া এবং জন নিরাপত্তার স্বার্থে জীর্ণ দালান কোঠা ধ্বক্ষংস করাও তাঁদের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

পুলিশ বিভাগের মত হিস্‌বাহ বিভাগও একপ্রকারের আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ। ধর্ম ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ দমন করে নাগরিক জীবনে আইন শৃঙ্খলার অগ্রগতি সাধন ছিল এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য। হিস্‌বাহ বিভাগের প্রধান মুহ্‌তাসিব নামে অভিহিত ছিলেন। মুহ্‌তাসিবের কার্যাবলি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রদেশের প্রত্যেক শহরে ও নগরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, রাজস্ব আদায়, বিচার পরিচালনা প্রভৃতি প্রশাসনিক দায়িত্বপালনের জন্য আমিল, কাযি, সাহিব আল-শুরতা, মুহতাসিব এবং সাহিব আল-বারিদ এ পাঁচজন বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন।[২]

আবক্ষাসীয় খলিফা মাহদির সময়কালে মিউনিসিপ্যাল ও বাজার ব্যবস্থা, জনগণের ধর্মীয় ও নৈতিক চরিত্র পর্যবেক্ষণের জন্য হিসবা বিভাগ গঠন করা হয়। উক্ত হিসবা বিভাগের প্রধানকে মুহতাসিব বলা হত। তারা বাজারের দ্রব্যাদির ওজন পর্যবেক্ষণ করতেন ও প্রতারণামূলক বিষয়গুলো দেখভাল করতেন। তাঁর দায়িত্ব কাযি এবং পুলিশ অফিসারের মাঝামাঝি ছিল। তিনি কাযির সমসাময়িক দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি জনগণকে রোজা ও নামাজ পালনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করতে বলতেন এবং কেউ যদি এর ব্যতিক্রম করতো তাকে শাস্তি পেতে হত।[৩]

‘মুহতাসিব’কে Censor of Public Moral অর্থাৎ জনগণের নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের পর্যবেক্ষক বলা হয়। ‘মুহতাসিবে’র কার্যকলাপের সঙ্গে রোমীয় Curule Aedile বা বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী Agnarome এর সাথে তুলনা করা যায়। সম্ভবত আল-মাহদি বাইজান্টাইন প্রভাবে সর্বপ্রথম এ পদের সৃষ্টি করেন। হিট্টি তাঁকে মিউনিসিপ্যাল বাজারের তদারককারী (Overseer) বলেছেন। এই পর্যায়ে তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল হাটবাজার পর্যবেক্ষণ করা, সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যের মান যাচাই ও ওজন নিরীক্ষা করা। প্রকাশ্যে মদ্যপান, জুয়াখেলা, নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা, অশালীন পোশাক পরিধান প্রভৃতি শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ তিনি বন্ধ করতে বাধ্য করতেন এবং অপরাধীদের বেত্রাঘাত ও জরিমানা করতে পারতেন। দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী ও গৃহপালিত পশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। এমনকি শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের মাত্রাধিক শাস্তি দিলে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। হিট্টি বলেন যে, যদি কোনো পুরুষ দাড়িতে মেহেদী লাগিয়ে নারীর মন জয় করার চেষ্টা করে তা হলে মুহতাসিব তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেন। মরিস বলেন যে, “পতিতাবৃত্তি নিরসনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই পতিতাবৃত্তি পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অস্বাভাবিক যৌনাচারের জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হত।”[৪]

মূলত তিনি ‘হিসবা’ (Hisba) বা জনগণের নৈতিক ও শালীনতাবিরোধী কার্যকলাপের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণকারী ছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ‘কাযি’ বা ‘সাহিব আল-শুরতা’ বা পুলিশ কর্মকর্তার কোনো সাদৃশ্য ছিল না। কারণ তিনি অভিযোগ আদালতে পেশ করতে বা বিচারের জন্য ‘কাযির’ দরবারে

---

১. মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

২. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৩. "To maintain discipline in public places and to look after the purchase and sale of goods in the markets and municipal affairs there were Muhtasibs in Baghdad and other big cities." see. S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration, Ibid,* p. 77

৪. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪

Dhaka University Institutional Repository

অভিযুক্ত বা অপরাধীকে প্রেরণ করতে পারতেন না। তাঁর কাজ ছিল তাৎক্ষণিক ও প্রতিরোধমূলক (Preventive); অবশ্য তিনি বেত্রাঘাত, সামান্য ক্ষতিপূরণ দাবি, অর্থদণ্ড দিতে পারতেন। 'মুহতাসিব' দুই প্রকার ছিল: (১) বেতনভুক্ত এবং (২) স্বেচ্ছাসেবী। রাষ্ট্রীয় বেতনভুক কর্মচারী কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অঙ্গ ছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবী অবৈতনিকভাবে রাজ্যের অনৈসলামিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রশাসনকে গোচরীভূত করতে পারতেন।[১]

পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পর্ক

পুলিশ বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যকার সম্পর্ক: ইসলামের জন্মলগ্ন হতেই বিচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। আবক্ষাসীয় যুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রাদেশিক গভর্নর কিংবা অন্য কোনো সরকারি কর্মচারী বিচারকের কার্যাবলীতে অহেতুক হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। বিচারকগণ নিজেদেরকে এক স্বাধীন পৃথক কর্মচারী শ্রেণি হিসেবে মনে করতেন। আবক্ষাসীয় যুগে বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।

তৃতীয় আবক্ষাসীয় খলিফা আল-মাহদি বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মুসলিম শাসনব্যবস্থায় সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতির পদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইমাম আবু হানিফার বিখ্যাত শিষ্য আবু ইউসুফকে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি (কাযি আল-কুয্যাত) নিযুক্ত করেন। তিনি মাহদি, হাদি ও হারুন-অর-রশিদের শাসনকালে বাগদাদের প্রধান কাযির দায়িত্ব পালন করেন। আবক্ষাসীয়দের প্রতিষ্ঠিত কাযিউল কুযযাতের পদ প্রাচীন পারস্যের সাসানিয় শাসনকালের 'মুবিদান মুবেদের' পদের অনুরূপ ছিল; কাযি আল-কুযযাত ও মুবিদান মুবেদ উভয়েই রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করতেন। খলিফাকে ধর্ম আইন ও বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে 'কাযি আল-কুয্যাত' প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করতেন। তিনি জটিল বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করতেন।[২]

মুসলিম মতবাদ অনুসারে শাসকের দুই প্রকার বিচার সম্পর্কীয় কর্তব্য রয়েছে। এদের একটি প্রত্যক্ষ ও অপরটি পরোক্ষ। রাষ্ট্রের শান্তি স্থাপন, জনগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির উন্নয়ন এবং সবলের হাত হতে দুর্বলকে রক্ষা করা তাঁর প্রত্যক্ষ কর্তব্যের অন্তর্গত। অন্যায়কারীর শাস্তি প্রদান ও নিপীড়িতদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁর পরোক্ষ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (স.) নিজেই রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বপালন করতেন। তিনি একদিকে সরাসরি জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন এবং অন্যদিকে সৎ, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ এবং ইসলামি আইনে পারদর্শী ব্যক্তিগণকে বিচারক (কাযি) নিযুক্ত করে সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করতেন। ন্যায় বিচারে মহানবীর আদর্শ পরবর্তীকালে খলিফারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেন। আবক্ষাসীয় খলিফাগণও ন্যায় বিচারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। খলিফা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারপতি। তিনি ছিলেন বিচারের শেষ উৎস। কতিপয় ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর শাস্তি তিনি মওকুফ করে দিতে পারতেন। যেকোন অত্যাচারিত ব্যক্তি তার অভিযোগ খলিফার নিকট পেশ করতে ও প্রতিকারের সুযোগ লাভ করতে পারত।

---

১. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫
২. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও প্রতিকারের জন্য আবক্ষাসীয় খলিফাগণ দিওয়ান আল-নযর ফিল-মাযালিম কোর্টে বিচার করতেন। মাযালিম কোর্ট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আপিল আদালত। উমাইয়া যুগেও মাযালিম বিচারের প্রচলন ছিল। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ও দ্বিতীয় ওমর জনগণের অভিযোগ শ্রবণের জন্য সপ্তাহের কোনো একটি দিন নির্দিষ্ট করে রাখতেন। আবক্ষাসীয় যুগে মাযালিম বিচারের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সরকারি প্রশাসনিক বিভাগসমূহের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের বিধান ছিল এই কোর্টের প্রধান দায়িত্ব। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, তহবিল-তসরুফ, জনগণের উপর অত্যাচার এবং এক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অন্য সরকারি কর্মচারীর অসদাচরণের প্রশ্নে মাযালিম কোর্ট কারও কোনো অভিযোগ ব্যতীতই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করত। জনগণের উপর সরকারি রাজস্ব কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে কর ধার্যের ব্যাপারেও মাযালিম কোর্ট অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই কোর্টের অন্য কার্যাবলীর মধ্যে ছিল: (ক) সরকারি ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভাতা কমিয়ে দেয়া কিংবা বন্ধ করে দেয়ার অভিযোগ শ্রবণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ, (খ) বেআইনিভাবে অধিকৃত জনগণের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া (গ) ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, (ঘ) সৈন্যবাহিনীর বেতন বণ্টন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান, (ঙ) মুহতাসিবের কার্যাবলী পরিদর্শন, বিশেষ করে অন্যায় নিবারণে আদেশ নির্দেশ কার্যকরী করতে মুহতাসিবের ক্ষমতা না থাকলে তাকে সেই ব্যাপারে উপযুক্ত সাহায্য প্রদান, (চ) শুক্রবারে জুময়ার নামায ও ঈদের নামায এবং হজ অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, (চ) উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কাযির রায় কার্যকরী হতে বাধাপ্রাপ্ত হলে তা কার্যকরী করণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি কাযির রায় আইনসম্মত হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা এবং (জ) রায় আইনের পরিপন্থী হলে সে ব্যাপারে কাযির দৃষ্টি আকর্ষণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাযির অধিক্ষেত্র সাধারণত মুসলিম আইনের সহিত সম্পর্কিত। রাষ্ট্রেও বসবাসকারী অমুসলিমদের বিষয়গুলো তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। মুসলমান ও ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সহিত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে শুধু ইসলামি আইন প্রয়োগ করা হত। কাযির অধিক্ষেত্র মাজলিম কোর্ট ও পুলিশের সাথে সম্পর্কিত ছিল। অন্যদিকে পুলিশ *Criminal Justice* এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। ফৌজদারি আইন এবং পদ্ধতিগত জটিলতার ক্ষেত্রে পুলিশ দ্রুত প্রতিকার প্রদান করত। কাযির ফৌজধারি অধিক্ষেত্রে পুলিশের প্রতি স্থানান্তরিত হলে পুলিশ শাস্তি প্রক্রিয়া ও অন্যান্য পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটায় এবং কাযি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত, সম্পত্তি, ব্যক্তিগত বিষয় ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করত।[১]

১. "The jurisdiction of a qadi was theoretically coestensive with the scope of the law that he applied. That law was fundamentally a law for Muslims and the internal affairs of the non-Muslim, or dhimmi, communities living within the Islamic state were left under the jurisdictions of those communities. Islamic law governed dhimmis only with respect to their relations to Muslims and to the Islamic state. In actual practice, however, the jurisdiction of a qadi was hemmed in by what must be regarded as rival jurisdictions, particularly that of the mazalim court and that of the shurtah. The shurtah on the other hand, was the state apparatus responsible for criminal justice. It too provided a remedy for a deficiency in the law, namely the incompleteness and procedural rigidity of its criminal code. Although in theory a qadi exercised a criminal jurisdiction, in practice this jurisdiction was removed from his sphere of competence and turned overentirely to the shurtah, which developed its own penalties and procedures. What was left to the qadi was a jurisdiction concerned mainly with cases having to do with inheritance, presonal status, property, and commercial transactions." see. http://en.wikipedia.org/wiki/Qadi, visited on 07.02.2012

Dhaka University Institutional Repository

আবক্ষাসীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় একটি অভিনব দফতর প্রবর্তিত হয়। খলিফা আল-মাহদি এই বিভাগ চালু করেন এবং এর প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রজাদের অভাব অভিযোগ যাচাই করা। এটি 'দিওয়ান আল-নজর ফিল-মাজালিম' নামে পরিচিত ছিল। অবিচার হলে তদন্ত করার দায়িত্ব ছিল এ বিভাগের। তাছাড়া আপীল বিভাগ হিসেবেও এই দফতর কাজ করতো। উপরন্তু, সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করার দায়িত্ব ছিল এই বিভাগের Highest Court of Appeal এবং এ ব্যবস্থা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের (মৃ. ৭০৫) সময় থেকে বলবৎ ছিল।[১]

মাযালিম বিচারের জন্য আবক্ষাসীয় খলিফাগণ সপ্তাহে কোনো বিশেষ দিন নির্ধারিত করে রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় আবক্ষাসীয় খলিফা আল-মাহদির শাসনকাল হতেই আবক্ষাসীয় শাসনে পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনের অনুকরণে মাযালিম বিচারের প্রবর্তন হয়। খলিফা মাহদি হতে খলিফা মুহতাদি পর্যন্ত আবক্ষাসীয় খলিফাগণ নিজেরাই মাযালিম কোর্টে বিচার করতেন। খলিফাকে বিচার কার্যে সাহায্য করতেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি, হাজিব, বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের কর্মকর্তাগণ এবং কতিপয় আইন বিশারদ (মুফ্‌তি)।

মিসরে ফাতিমীয় শাসনামলে উজির রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা রূপে সপ্তাহে দু'দিন মামলার নিষ্পত্তি বা মামলা রিভিউ করার জন্য কায়রোর গোল্ডেন গেইটের নিকট উপবেশন করতেন। এ সময় তার সম্মুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গৃহধাক্ষ, সমন প্রধানকারী কর্মকর্তা উপস্থিত থাকত এবং অভিযোগগুলো কায়রো অথবা মিসরের হলে তা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টারের বিচার বা পুলিশের নিকট প্রেরণ করা হত।[২]

কেন্দ্রীয় মাযালিম কোর্টের অনুকরণে প্রত্যেক প্রদেশেও মাযালিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাদেশিক গভর্নর কিংবা প্রাদেশিক প্রধান বিচারপতি কিংবা খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধি প্রাদেশিক মাযালিম বিচার পরিচালনা করতেন।

ইসলামি বিধান অনুযায়ী যাতে সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচার সংঘটিত হয় এবং যাতে নিরীহ ও নির্দোষ ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হত। এ কারণে মামলার বিচারের সময় ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, চরিত্রবান সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত। সাক্ষীদের সততা, নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বিচারক পূর্বেই মহল্লা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন। খলিফা আল-মনসুরের আমলে সর্বপ্রথম এ ধরনের সাক্ষীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সাধারণভাবে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত সাক্ষীদের 'কাহিদ' বলা হয়।
ডিমমবিনিস বলেন যে, বিচারককে সাহায্যের জন্য কয়েকজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, যেমন- আদালত, পুলিশ, পেশকার, অপরাধীকে তলবকারী ইত্যাদি। কাযি প্রয়োজনবোধে শরিয়তের সূক্ষ্ম ধারাগুলোর বিশ্লেষণের জন্য 'আদিল' বা পরমার্শদাতা এবং 'মুফতি'দের পরামর্শ নিতেন। সামরিক অপরাধের জন্য সামরিক কোর্ট ছিল এবং অপরাধী সৈন্যদের বিচারের জন্য সামরিক বিচারক নিয়োগ করা হত। তাকে বলা হত 'কাযি আল-আসকার'।[৩]

---

১. পি.কে. হিট্টি, অনূঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলাম : একটি জীবনব্যবস্থা*, ঢাকা : আলেয়া বুক ডিপো, ১ম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১২০
২. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 350
৩. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

ডিমমবিনিস দিওয়ান আল-মাযালিম সম্পর্কে বলেন যে, "ইসলামি বিচার ব্যবস্থা এতই ন্যায়নিষ্ঠ ছিল যে যদি কোনো অপরাধী মনে করত যে, তার সুবিচার হয়নি বা তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে তাহলে সে "নাযির-আল-মাযালিম' নামক এক বিশেষ আদালতে তার মামলা নিয়ে যেতে পারত।" অবশ্য খলিফা ছিলেন সর্বাপেক্ষা উচ্চতর আদালত, যার কাছে সাজা মওকুফ অথবা লাঘব করার জন্য আপিল করা যেত। ধর্মীয় ও দিওয়ান বিষয়বস্তুর মামলা কাযি সম্পন্ন করতেন কিন্তু অপরাপর, বিশেষ করে ফৌজদারি মামলা তিনজন রাজকর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হত। তারা হচ্ছেন নাযির-আল-মাযালিম, সাহিব আস-শুরতা এবং মুহতাসিব। ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় 'দিওয়ান আল-নযর ফিল-মাযালিম' নামে যে বিশেষ আদালতের প্রবর্তন হয় তা নির্যাতিত, ভুক্তভোগী অন্যায়ভাবে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের নতুন করে সুযোগ দান করে। আগেই বলা হয়েছে যে, মাযালিম কোর্ট ফৌজদারি মামলার সর্বোচ্চ আপিল আদালত। উমাইয়া যুগে এটি প্রবর্তিত হয় এবং খলিফা আব্দুল মালেক ও দ্বিতীয় উমর সপ্তাহে একটি দিন জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ শ্রবণের জন্য নির্ধারিত করে রাখতেন।[১] এসব আদালতে সম্পত্তি, ভূমিস্বত্ব, ফৌজদারি সংক্রান্ত ঘটনা, কর ও পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় মীমাংসিত হত।[২]

দ্বিতীয় স্তরে ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করতেন সাহিব আল-শুরতা। সাধারণ অপরাধ, যেমন-চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনজখম, রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতেন সাহিব আল-শুরতা। কোনো প্রকার গোলযোগের সংবাদ পেলে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী যে কোনো কার্যকলাপে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে বিচার করার ব্যবস্থা করতেন। দাগী অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হত। সাহিব আল-শুরতা কাযি প্রদত্ত সাজাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব পালন করতেন।[৩]

আবক্ষাসীয় সাম্রাজ্যে দুই ধরনের বিচার ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু তাদের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) নির্ধারিত ছিল। সকল পুলিশি বিষয়গুলো মাযালিম কাযির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। যা কাযি কর্তৃক পরিচালিত হত। যে সকল বিষয় কাযির জন্য অস্পষ্ট ও বিব্রতকর ছিল এবং যে বিষয়গুলোতে আরও গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন ছিল তা মাজালিম কোর্টে উপস্থাপন করা হত। মুসলিম দেশসমূহে দু'ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এদের অধিক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ পুলিশি বিষয়গুলো মাজালিম কোর্টে বিচারের জন্য উপস্থাপিত করা হলেও কিছু মামলা কাযি কর্তৃক সমাধা করা হত।

উজির বা মন্ত্রী প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ করতেন এবং পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আনুশাসনিক (Canonical Law) আইন প্রয়োগ করেন। ৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা আল মুক্তাদির পুলিশ প্রধানকে শহরের বিভিন্ন কোয়ার্টের জন্য জুরিস্ট নিয়োগ করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং অভিযোগ ও দরখাস্তগুলো বিবেচনা করার নির্দেশ দেন। এরা ছিল প্রশিক্ষিত পুলিশ কর্মকর্তা। আল হাকাম তার দু'জন জুরিস্ট সহকারীসহ পুলিশকে নিয়ে স্বীয় অধিক্ষেত্রের অপরাধের তদন্ত করেন।[৪]

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

২. মফিজুল্লাহ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৪. "All matters, for which the Qadi was considered too weak or for which a masterful hand was needed, came up before this Court.' In all Muslim countries these two courts existed side by side. But their respective jurisdiction was no where clearly defined. Most police matters came up before the Mazalim which was

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্বপালনের জন্য আবক্ষাসীয় যুগেও বিচারককে উচ্চ বেতন দেয়া হত। খলিফা মনসুর ও মাহদির শাসনকালে প্রাদেশিক বিচারকের মাসিক বেতন ছিল ৩০ দিনার। খলিফা মামুনের শাসনকালে মিসরের প্রাদেশিক বিচারকের মাসিক বেতন ছিল ৪০০০ দিরহাম। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনকাল মিসরের কাযি বাক্কার বিন-কোতায়বা বিভিন্ন ভাতা ব্যতীত মাসে ১৬৮ দিনার করে বেতন পেতেন। উচ্চ বেতন ব্যতীত বিচারক উচ্চ সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণ তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। আবক্ষাসীয় যুগে বিচারক কালো সরকারি পোশাক পরিধান করতেন এবং নবম শতাব্দী হতে তিনি উঁচু কোনাকৃতি টুপি ব্যবহার করতেন।

আবক্ষাসীয় শাসনকালে উযির এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের মত প্রাদেশিক কাযিগণও অসীম ও সীমিত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অসীম ক্ষমতার কাযি সাক্ষ্য প্রমাণ কিংবা সালিসের মাধ্যমে অপরাধ অভিযোগের বিচার সম্পাদন ব্যতীত এতিম, নাবালক ও মস্তিষ্ক-বিকৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, মৃত ব্যক্তির অছিয়ত বাস্তবায়ন, বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, ধর্মীয় আইন লঙ্ঘনকারীর শাস্তি বিধান, পৌর আইন লঙ্ঘনের প্রতি বিধান, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তাঘাট, দালান-কোঠা ও মাঠ-ঘাটের নিরাপত্তা বিধান এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। এতদ্ব্যতীত কোনো প্রদেশে সাদকাহ্ আদায়ের জন্য কোনো বিশেষ কর্মচারী না থাকলে অধিক ক্ষমতার অধিকারী কাযি নিজেই সাদ্‌কাহ আদায় ও যথারীতি বণ্টনের ব্যবস্থা করতেন। শুক্রবারের জুময়ার নামায পরিচালনার জন্য খলিফা কর্তৃক কোনো ব্যক্তি নিযুক্ত না হলে কাযি নিজেই উক্ত নামায পরিচালনা করতেন। কিন্তু সীমিত ক্ষমতার কাযির ক্ষমতা ও কার্যাবলী তাঁর নিয়োগপত্রের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হত। সীমিত ক্ষমতার কাযির সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষ অপরাধের বিচার করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। যে সকল অপরাধে অপরাধী নিজেই দোষ স্বীকার করত তিনি কেবল সে সকল অপরাধের বিচার করতে পারতেন। তিনি ঋণ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ অভিযোগের বিচার তাঁর ক্ষমতার বাইরে ছিল। সাধারণত দেওয়ানি এবং ধর্মীয় অপরাধে বিচার কাযিদের উপর ন্যস্ত ছিল। ফৌজদারি অপরাধের বিচার প্রধানত মাযালিম বিচারক (সাহিব আল-মাযালিম), পুলিশ কর্মকর্তা (সাহিব আল-শুরতা) এবং মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যাবলীর তত্ত্বাবধায়ক ও নৈতিক চরিত্রের পরিদর্শক (মুহতাসিব) সম্পাদন করতেন।

সেই যুগেও বিচারে সাক্ষীদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। কেবলমাত্র ন্যায়-নিষ্ঠ, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের সাক্ষ্যই আদালতে গৃহীত হত। পূর্বে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে বলে প্রমাণিত ব্যক্তির সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

---

sometimes presided over by a Qadi-especially the court of the sovereign by the chief judge. The Wazir appointed temporal judges in the provinces. Twice, indeed, did the canonical law attempt the control of the police. In 306/918 the Caliph directed the police commissioner at Baghdad to appoint a jurist in every quarter of the town to receive and deal with complaints and petitions: these to receive and deal with complaints and petitions: these the were legally trained police commissioners. Also al-Hakim associated two jurists with the police in every town, who had to investigate every offence reported to them within their jurisdiction." see. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 348; Salahuddin Khuda Bakhsh and D.S. Margoliouth, *The Renaissance of Islam*, p. 231

Dhaka University Institutional Repository

বাদী বিবাদীকে হাজিরের জন্য অনুরোধ জানাতে পারতেন। বাদী যদি বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত হয়ে তার মোকদ্দমার জবাব দেয়ার জন্য বিচারকের সাহায্য কামনা করতেন তখন বিচারক বিবাদীকে শহরে থাকলে তাকে হাজির হওয়ার জন্য বলতে পারতেন। বিবাদী আদালতে হাজির হতে অস্বীকৃতি জানালে বাদী দু'জন সাক্ষীকে শপথের জন্য উপস্থাপন করতেন। অতঃপর পুলিশ কর্তৃক বিবাদীকে জোরপূর্বক উপস্থিতির জন্য নির্দেশ দেয়া হত। বিবাদী শহর হতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করলে এবং সেখানে কোনো বিচারক না থাকলে কাযি দুপক্ষের মধ্যে বিষয়টি মিমাংসার জন্য একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতেন।[১]

বিচারে কাযি বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকে সমান চোখে দেখতেন। তবে এক পক্ষ অমুসলমান হলে মুসলমান পক্ষকে অধিক মর্যাদা দেয়া হত। বিবাদীপক্ষ বিচারে অনুপস্থিত থাকলে একতরফা বিচার হয়ে যেত। বাদী ও বিবাদী পক্ষের সম্মতিক্রমে কাযি সালিসের মাধ্যমে অভিযোগ মীমাংসার ব্যবস্থা করতে পারতেন। শালিসদারকে কাযির মত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হত। মহিলাদের অভিযোগের মীমাংসার জন্য মহিলা শালিসদার এবং অমুসলমানের অভিযোগের মীমাংসার জন্য অমুসলমান শালিসদার নিয়োগ করা হত। বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকেই তাদের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ কাযির সম্মুখে উপস্থিত করতে হত। সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এক সাক্ষীর বিবরণ যাতে অন্য সাক্ষী না শুনতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হত। প্রত্যেক পক্ষকে অন্তত পক্ষে দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মেয়ে সাক্ষী হাজির করতে হত। সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে অভিযুক্ত পক্ষ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারত। অভিযোগকারী তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ দাখিল করতে না পারলে কাযি কৌশলে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেতেন। উভয় পক্ষের মন্তব্য শ্রবণ ও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর বিচারক অন্যভাবে সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য রায় প্রদানের পূর্বে কিছু সময় গ্রহণ করতেন। প্রদত্ত রায়ে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়েছে মনে করলে বিচারক রায় পুনঃপর্যালোচনা করে দেখতেন। কাযির রায় কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক গভর্নরের। মসজিদ ছিল সাধারণত কাযির আদালত। মসজিদে বসে কাযিরা বিচার কার্য্য সম্পাদন করতেন। তবে মসজিদ ব্যতীত কাযি স্বীয় অফিস কক্ষে বা অন্যত্র বসেও বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন।

ফৌজদারি বিচারের ভার প্রধানত মাযালিম বিচারক, সাহিব আল-শুরতা এবং মুহতাসিবের উপর প্রধানত ন্যস্ত ছিল। মাযালিম বিচারকের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তি বিধান সাহিব-আল-শুরতার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনো অপরাধের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সাহিব আল-শুরতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করতেন। তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে দোষ স্বীকারে বাধ্য করতেন। দাগী অপরাধীকে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতেন। সাহিব আল-শুরতা কাযি অপেক্ষা বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অপরাধ তদন্তের, সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেফতার করার ও শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে

---

১. "If the plaintiff invokes the judge's assistance in bringing the defendant into court to answer a claim, the judge may send for him to appear, if he is in the city. If he refuses to appear he (the plaintiff) shall produce two witnesses to swear to the fact and shall then approach the chief of police with the request to enforce his attendance. If the defendant is absent from the city and in a place where there is no judge, the qadi shall write to a man of understanding to mediate between the parties." see. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p.345

Dhaka University Institutional Repository

দোষ স্বীকারে বাধ্য করার, অভিযোগ ব্যতীত কোনো অপরাধের বিচারের এবং অমুসলমান সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের অধিকার কাযির ছিল না। কিন্তু সাহিব আল-শুরতা এই সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১]

মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ব্যতীত মুহতাসিব কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত দায়িত্বপালন করতেন। জনসমক্ষে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে তিনি ঘটনাস্থলেই শাস্তি দিতেন। মুহ্তাসিবের বিচার সংক্ষিপ্ত বিচার। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের চেয়ে অপরাধ তৎপরতা বন্ধ করার কাজেই মুহতাসিব বেশি তৎপর ছিলেন। ক্ষমতার দিক দিয়া মুহতাসিব কাযি ও সাহিব আল-শুরতা অপেক্ষা কিছুটা নিম্নমানের ছিলেন। তাঁকে কাযি ও সাহিব আল-শুরতার মধ্যবর্তী কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হত। তাঁর কিছু কার্যাবলী কাযির কার্যাবলীর মত এবং কিছু সাহিব আল-শুরতার কার্যাবলীর মত। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার খাতিরে তিনি সাহিব আল-শুরতার মত অপরাধ তৎপরতা দমনে ব্যস্ত থাকতেন। তবে তিনি কেবল জনসমক্ষে সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। সাহিব আল-শুরতার মত জনচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে তৎপরতা চালাবার অধিকার তাঁর ছিল না। সাহিব আল-শুরতার মত সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে কিংবা সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতে পারতেন না। সাহিব আল-শুরতার ক্ষমতা প্রধানত অনুসন্ধানমূলক কিন্তু মুহতাসিবের ক্ষমতা অনেকাংশেই পর্যবেক্ষণমূলক। অত্যন্ত সীমিত অর্থে মুহতাসিবকে বিচারক বলা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র যেসব অপরাধের বিচারে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হত না (কারণ অপরাধী নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করত কিংবা মুহতাসিব নিজেই অপরাধে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন) সেই সব অপরাধেরই বিচার করার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন তিনি। পক্ষান্তরে সাক্ষ্য প্রদান সাপেক্ষ বিচারের ভার কাযির উপর ন্যস্ত ছিল।[২]

ইসলামে বিচার ব্যবস্থা প্রধানত ধর্মীয় আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় আইন অমুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং সেই কারণেই অমুসলমানগণের বিচারের ভার অমুসলমানদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। অমুসলমানদের বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার অমুসলমান ধর্মীয় প্রধানগণ তাদের ধর্মীয় আইন অনুসারে সম্পন্ন করতেন। কিন্তু ফৌজদারি অপরাধে অর্থাৎ খুন, যৌনব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমান একই আইনের আওতাধীন ছিল। ফৌজদারি বিচারে মুসলমান-অমুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। ইসলামি আইন অনুসারে যদি কোনো মুসলমান অমুসলমানকে হত্যা করত তবে এই ক্ষেত্রে অমুসলমান কর্তৃক মুসলমান হত্যার শাস্তি প্রযোজ্য হত।[৩]

অপরাধের শাস্তি বিধান বিচারের অপরিহার্য অঙ্গ। আবক্ষাসীয় যুগে ইসলামি আইন অনুসারে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান বলবৎ ছিল। ইসলামে অপরাধ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত: (১) খোদাবিরোধী অপরাধ (২) মানবতাবিরোধী অপরাধ ও (৩) রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ, মদ্যপান, চুরি, প্রকাশ্যে ডাকাতি এবং যৌন-ব্যাভিচার প্রভৃতি খোদাবিরোধী অপরাধের জন্য শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা হত। শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, মদ্যপানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত, চুরির শাস্তি চোরের ডান হাত কর্তন, প্রকাশ্যে ডাকাতির

১. ড. মুহম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১
২. ড. মুহম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-৩১২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি হাত-পা কর্তন, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা ও অবিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত প্রদান। কাযি কিংবা খলিফারও খোদাবিরোধী অপরাধের শাস্তি ক্ষমা করার অধিকার ছিল না।[১] কেবল নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও অত্যাচারিত পক্ষই এই ব্যাপারে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারত। হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের নিকট সমর্পণ করা হত এবং তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে বা তার নিকট হতে আল্-দিয়াৎ (Blood-Money) আদায় করে তাকে মুক্তি দিতে কিংবা তাকে পূর্ণ ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারত। বিদ্রোহ, সরকারি তহবিল তসরুফ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের জন্য অপরাধীকে শারীরিক নির্যাতন, অঙ্গচ্ছেদ, মৃত্যুদণ্ড কিংবা কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে খলিফা ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ মাফ করে দিতে পারতেন।[২]

কোথাও জনগণ কর্তৃক খলিফার নির্দেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে কিংবা কোনো অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের প্রয়োজন হলে পুলিশিং ও বৈধ আইনগত বিষয়গুলো পুলিশ ও কাযির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত। এক্ষেত্রে পুলিশ রাজনৈতিক আইন (Urf) যা জনপদে প্রসার ঘটেছে, স্থানীয় অধিবাসীগণ যা সংরক্ষণ করছে ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর এবং যে বিষয়গুলো শরিয়া আইন থেকে পৃথক সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। অনুরূপভাবে কাযি কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী (শরিয়া আইন মোতাবেক) ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।[৩]

খলিফা আল-মামুনের স্বীয় দু'জন রক্ষী প্রধানের মধ্যে একজন ছিল খুবই ভাল প্রকৃতির এবং অপর জন ছিল খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। এ দুজন রক্ষী প্রধান সম্পর্কে সিয়াসতনামা'য় একটি কাহিনী বর্ণনা আছে: বর্ণনাটি এরূপ যে, পরের দিন ভৃত্যটি সকালে উঠে অন্য রক্ষীপ্রধানের বাড়িতে গেল। সে অপেক্ষায় থাকল। পুলিশ ও জনসাধারণ এক এক করে আসতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না আদালত-কক্ষ ভরে গেল। সূর্য উঠার সাথে সাথে রক্ষীপ্রধান তাঁর কামরা থেকে এসে আদালতে বসলেন। তাঁর ভুরু ছিল কোচকান আর মদের নেশায় চক্ষু ছিল পূর্ণ। পুলিশরা তাঁর সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। যদি কেউ তাঁকে আসসালামু-আলাইকুম বলত তাহলে তিনি তার জবাব দিতেন না, আর দিলেও খুব রুক্ষভাবে দিতেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অপরাধী কেউ আছে কিনা। তারা বলল, 'কাল রাত্রে একজন যুবককে ধরা হয়েছে। সে এত মাদকাসক্ত ছিল যে তার কোনো জ্ঞান ছিল না।' তিনি তখন বললেন, 'তাকে ভিতরে নিয়ে আস।' যুবকটিকে আমিরের সামনে আনলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ সেই যুবক কিনা?' তার জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এ সেই যুবক।' আমির তখন বললেন, 'অনেকদিন ধরে আমি তাকে খুঁজছি। সারা বাগদাদে তার মত দুশ্চরিত্র, দুরভিসন্ধিকারী ঝগড়াটে, অধার্মিক এবং রাজদ্রোহী পাজি আর নেই। বেত্রাঘাতে তাকে দমন করা যাবে না, তরবারি দিয়ে তাকে দমন করতে হবে। সে জনসাধারণকে কুপথে পরিচালিত করে এবং প্রত্যেকদিন কমপক্ষে দশজন তার বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে আসে।[৪]

---

১. Dr. S.A.Q. Husaini, *The Constitution of the Arab Empire*, Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf-1958, p. 126
২. Ibid, p. 127
৩. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, pp. 332-333
৪. নিজাম-উল-মুলক, *সিয়াসতনামা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ফিকাহ কাযিদের বিভিন্ন রকমের দায়িত্বের অতিরিক্ত বিশেষ অধিক্ষেত্র প্রদান করেছে। বর্ণিত আছে যে, বিশেষ কাযি, দেউলিয়া সংক্রান্ত, বৈবাহিক বিরোধ ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর জন্য নির্ধারিত ছিলেন। বিশেষভাবে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটকে কাযি 'আল-শুরতা' বলা হত এবং তারা পানিপথ ও অভিভাবক সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখাশুনা করতেন। যা হোক, পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে পুলিশ বিভাগের উপর অর্পিত ছিল। এটি একটি বিশেষ সংস্থা যাকে Shurta বলা হত এবং বিভিন্ন অপরাধ ও আইন ভঙ্গ এবং যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা পুলিশের কর্তব্য ছিল।[১]

আরব শাসন ব্যবস্থায় শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের নিরসনের জন্য এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত হতেন, যেমন-'মুহতাসিব', 'সাহিব-আস-শুরতা' এবং 'নায়িব-আল-মাযালিম'। অষ্টম শতাব্দীতে, বিশেষ করে আবক্ষাসীয় যুগে মুহতাসিব মদ্যপান, ওজনে কারচুপি, দূষিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি দমনে সচেষ্ট থাকতেন। কাযির সঙ্গে 'সাহিব-আস-শুরতা' বা পুলিশ কর্মকর্তার সম্পর্ক নিবিড় ছিল এবং উভয়ের সহযোগিতায় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত। সমাজবিরোধী কাজ দমনের দায়িত্ব ছিল পুলিশ বিভাগের কিন্তু কাযির সহায়তা ব্যতীত অপরাধীর দন্ড হত না। কখনো কখনো নির্দোষ ব্যক্তি অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপিল করার সুযোগ পেতেন। যিনি এই আপিল কোর্টেও প্রধান ছিলেন তাকে বলা হত 'নাজির-আল-মাযালিম।'[২]

আবক্ষাসীয় প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের সাথে পুলিশের সম্পর্ক: আল-মাওয়ারদি আবক্ষাসীয় শাসন আমলে প্রাদেশিক আমিরদের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে তাদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা– অসীম ক্ষমতার প্রাদেশিক আমির, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার প্রাদেশিক আমির এবং জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী প্রাদেশিক আমির।

খলিফার কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে কোনো কোনো সময় অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে প্রাদেশিক আমির নিয়োগ করা হত। তবে সাধারণত দুর্বল ও অযোগ্য খলিফা কিংবা শাসন ব্যাপারে অমনোযোগী খলিফার আমলে প্রাদেশিক আমিরগণ অসীম ক্ষমতা ভোগ করতেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রাদেশিক আমির প্রাদেশিক শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রদেশের সামরিক, বেসামরিক রাজস্ব, বিচার ও ধর্মীয় শাসনের প্রধান। তিনি প্রাদেশিক সামরিক বাহিনী পরিচালনার সর্বময় দায়িত্বপালন করতেন। তিনি প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ ও বিচারকদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন। প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব ধার্য, রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব ব্যয়ের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পুলিশ বাহিনী নিয়োগ এবং পুলিশের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন।[৩]

---

১. "The literature on Fiqh provided specialized jurisdictions of the Qadi in addition to the enumerations made above. Thus, it is narrated that special qadis were designated in deciding insolvency cases, marital dispute cases, or cases of specific pecuniary values. The magistrate specially appointed for the purpose, called the Qadi of Shurtah (police), was concerned with waterways and guardianship cases. However, the complete police cases were left to the police departments and officers connected therewith. It was a special organization termed Shurtah with the main function of investigation of crimes and other breaches of law and their disposition." see. Tauqir Mohamad Khan, *Jurisprudence in Islam*, Ibid, p. 350

২. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৩. ড. মুহাম্মদ আলি আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৭-২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আবক্কাসীয় যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পূর্বের মতই ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে আমির বলা হত। তিনি উযিরের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হতেন এবং প্রাদেশিক শাসন, রাজস্ব আদায়, শান্তি রক্ষা, পুলিশবাহিনী গঠন, জুমা ও জামাআত কায়েম ইতাদি কাজ সমাধা করতেন।[১]

প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে অডিট, চেন্সেরি এবং পুলিশ বিভাগ ছিল। মুহতাসিব পুলিশ জনগণের নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি দেখাশোনা করতো।[২]

ডাকবিভাগের সাথে পুলিশ বিভাগেরও সম্পর্ক ছিল। Qodamah, Paris fol. গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বিচার বিভাগ, পুলিশ ও কর বিভাগের রিপোর্ট আলাদা-আলাদাভাবে ডাকবিভাগে রাখা হত।[৩]

সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পর্ক

যখন জন বিশৃঙ্খলা শুরতা বা মাউনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত তখন নিয়মিত সেনাবাহিনীকে বিশৃঙ্খলা দমনে তাদের পক্ষে নিয়োজিত করা হত। ৮৫৫ খ্রি. হিমস্ প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে শহর থেকে গভর্নরসহ অন্য কর্মকর্তাদের বের করে দেয়া হয়। মুহাম্মদ বিন আবদাওয়াহ কিরদাস আল আনবারী হিমসের সাহিব আল-মাউনা ছিলেন। বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করে আলোচনার জন্য খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল তখন আততাব বিন আততাবকে সাহিব আল-মাউনার সাথে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে রামলা ও দামেস্ক সেনাছাউনী থেকে সালিহ আল আবক্কাস আল তুর্কি সাহিব আল-মাউনাকে সহায়তা করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যান। সে সময় সেনাবাহিনীর ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ইবনে আবদাহিকে নির্যাতনমূলক নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি বিদ্রোহীদের অবরুদ্ধ, পিটিয়ে হত্যা এবং বিদ্রোহীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য হিমসের গেইটে তাদের ঝুলিয়ে রাখেন। অতি শ্রীঘ্রই বিদ্রোহ দমিত হয়, খ্রিস্টানদেরকে তাদের ভূমিকার জন্য হিমস থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এখানে মাউনা তাদের অ-সামরিক ভূমিকার চাইতে সামরিক ভূমিকায় পথ প্রদর্শন করেন।[৪]

সিয়াসতনামা গ্রন্থে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দৃষ্টি রাখার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কর আদায়কারী, বিচারক, পুলিশ-প্রধান এবং নগরাধ্যক্ষদের আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের উপর নজর রেখে রিপোর্ট প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যাতে শাসকগণ যুক্তিযুক্ত আদেশ দিতে পারেন।[৫]

অনেক সময় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রাদেশিক পর্যায়ে অফিস ছিল। অনেক সময় ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রদেশে দুই বা ততোধিক বিভাগকে একত্রিকরণ করা হত। এরূপ একত্রিকরণ করার পর যে বিভাগগুলো ছিল তা হলো-দিওয়ানুল খারাজ, দিওয়ানুল রাসায়িল, দিওয়াল জিমান, দিওয়ানুল বারিদ, দিওয়ানুল জায়িস, দিওয়ানুল শুরতা, দিওয়ানুল কাদা, দিওয়ানুল হিসবা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ

---

১. মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
২. "Other department of administration were audit, chancery, and police. One of the functionaries of the Police Department was the muhtasib, who was in charge of public morals and religious observance." see. Yahya Armajani, *Middle East Past and Present*, Newjersy: Prentice Hall, 1970, p. 85
৩. "The reports of each individual department, such as the judiciary police, taxation, were to be kept separaatge." see. Yahya Armajani, *Middle East Past and Present*, Ibid, p. 79
৪. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 235
৫. নিজাম-উল-মূলক, *সিয়াসতনামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

ইফ্রেটিসের ছোট শহর রাকায় সাহিব আল মাউনা (পুলিশ প্রধান) কর সংগ্রহ, পোস্ট মাস্টার, ভূমি অফিসার ইত্যাদি ছিল।[১]

১. All the important central Diwans had their branches in the provinces and to minimise the expenditure sometimes two or more cental diwans had only one in the provinces. Thus after amalgamation there were eight main diwans in the provinces and they were Diwan al-Kharaj, Diwan al-Rasail, Diwan al-Zimam, Diwan al-Barid, Diwan al-Jaysh, Diwan al-Shurtah, Diwan al-Qudat and Diwan al-Hisbah. Among the local officers, as for example in the small town of Raqqah on the Euphrates, there was commander of the garrison who also held the office of Sahib Maunah (Chief of the Police) a qadi, a tax-collector, a post-master and an administration of the crown lands (Saqafi). Considerable portion of revenue was spent on irrigation and public works. see: S.M. Imamuddin, Arab Muslim Administration, Karachi: Najmahsons, 1976, p. 87-88

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উল্লেখযোগ্য শাসকদের আমলে পুলিশি ব্যবস্থা

খলিফা আল-মনসুরের সময় পুলিশি ব্যবস্থা: আবু জাফর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবন আলি আবক্ষাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি আনুমানিক ৯০-৪/৭০৯ খ্রি. জর্দানের পূর্বদিকে অবস্থিত আল-হুমায়মা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ বাহিনীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

ইবনে হাওকল উল্লেখ করেন যে, খলিফা আল মনসুরের মতে, সম্মানিত কাযি, ন্যায়পরায়ণ পুলিশ অফিসার, দক্ষ অর্থনৈতিক প্রশাসক বা আমিল এবং বিশ্বাসযোগ্য পোস্টমাস্টার সরকারের চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এ চারটি পদের কর্মকর্তাগণ গভর্নর কর্তৃক নিয়োগকৃত হতেন।[২]

খলিফা আল মনসুরের সময় বিপুল সংখ্যক গোয়েন্দা পুলিশের অস্তিত্ব ছিল। তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সম্পর্কে বিশেষ করে ব্যবসায়ী এবং পথিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং পরবর্তীতে তা খলিফার নিকট প্রেরণ করতেন। কোনো অভিযান পরিচালনার সময় খলিফা হারুন-অর-রশিদ এবং পরবর্তী খলিফাগণ গোয়েন্দা কার্যক্রম চালু রাখতেন (যখন কোনো অভিযান পরিচালনা করতেন)।[৩]

খলিফা আবু জাফর বাগদাদ নগরী থেকে বাজারগুলো অন্যত্র স্থানান্তর করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, অপরিচিত আগন্তুক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বাজারগুলোতে রাত্রিযাপন করেন কিন্তু কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, এদের মধ্যে কোনো গুপ্তচর নেই যারা তথ্য সংগ্রহ করছে। ফলে তিনি বাজারগুলোকে শহরের বাইরে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন এবং পুলিশকে উক্ত বাজারগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪]

খলিফা আল মনসুর হাসিম বিন মুয়াবিয়াকে অপসারণ করে তার স্থলে কাযি সরওয়ার বিন আব্দুল্লাকে অভিষিক্ত করেন। এরপর তিনি সাইদ বিন দালাছকে পুলিশ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করেন।[৫]

আবু মুসলিম খোরাসান প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ শুরু করলে তিনি তার পুলিশ প্রধান হিসেবে মালিক বিন আল হাশিমকে নিয়োগ করেন।[৬]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামি বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২

২. Al-Mansur is reported to have remarked that an honorable Qadi a just police officer, a business like financial administrator and a trustworthy postmaster formed the four pillars of a government. All these four officers were appointed by the government in every twon-a Qadi a Sahibus's Shurtah, an 'Amil and a Sahibu'ls-Barid. see. M.A.SHABAN, *Islamic History A new Interpretation*, Cambridge University, First Published 1976, p. 118

৩. "Under Mansur a very large number of detective police came into being, who turned their attention to all conditions of society. For this Espionage Service people from all classes and conditions of life were chosen; particularly merchants, pedlars, etc. with whose reports of the important affairs the Caliphs were kept continually informed. It need scarcely be mentioned that this spy system, which is in the nature of a despotic Government, was kept up till later times. Under Harun it put forth its blossom and bloom, and later on the Caliphs even took their own detective into camp when they went out on an expedition." see. S. Khuda Bukhsh, *The Orient under the Caliphs*, Ibid, pp. 239-240

৪. al-Tabari, translated by John Alden Williams, *The Early Abbasi Empire*, New York : Cambridge University Press, edt. 1, vol. 1, 1988, p. 182

৫. al-Tabari, *The Early Abbasi Empire*, Ibid, p. 227

৬. Tabari, ser. 11-3, p. 1989

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনীকে সংগটিত করার সময় আবু মুসলিম উমাইয়াদের পছন্দ করতেন এবং সেনাবাহিনীর জন্য একজন পুলিশ প্রধান নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সেনাবাহিনীর জন্য এমন একজন অধিনায়ক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যিনি সেনা ছাউনীর নিরাপত্তার সাথে সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভূমিকা রাখবেন।[১]

আবু মুসলিম যখন বাইরে গমন করতেন তখন উপ-পুলিশ প্রধান তার সম্মুখে পদচারণা করতেন।[২] আবক্ষাসীয় সেনাবাহিনী যখন উমাইয়া সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিল তখন আবক্ষাসীয় সেনাপতি কাহতাবা বিন সাহিব পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন নদী অতিক্রমকারী সেনাবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। নদীর অপর প্রান্তে অপেক্ষমাণ উমাইয়া সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে যারা অগ্রসর হচ্ছে।[৩]

প্রথম আবক্ষাসীয় খলিফা আবুল আবক্ষাস আল-সাফফাহ্ তাঁর রাজধানীকে কুফায় স্থানান্তর করেন এবং আব্দুল জবক্ষার বিন আবদুর রহমান আল আসদিকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।[৪] ইবনে আসাম-এর বর্ণনা মতে, খলিফা আল-সাফফাহ্ একদিন হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পুত্রসহ কিছু উমাইয়া বংশের বেঁচে (Survivors) থাকা সদস্যদের নিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় একজন কবি সেখানে প্রবেশ করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যার অর্থ হলো, উমাইয়ারা হাশিমিদের ধক্ষংস করেছে। কেন খলিফা তার প্রকৃত শত্রুদের প্রতি এত আস্থা রাখছেন। এদ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে সেখানে অবস্থানরত উমাইয়াদের বের করে হত্যা করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন।[৫] এদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবক্ষাসীয় যুগেও পুলিশ প্রানদন্ড প্রদান করতো এবং খলিফার আশে-পাশে অবস্থান করতো। খলিফা আল-সাফফাহ্ এর শাসনামলে মিসরের গভর্নর সালিহ্ বিন আলি (৭৫৩ খ্রি.) দুজন পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। একজনকে তিনি ফুসতাত শহরে এবং অন্যজনকে তিনি নতুন জেলা আসকারে পদায়ন করেন। এ আসকারে আবক্ষাসীয় সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে সেনাছাউনি স্থাপন শুরু করছিল ফলে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গভর্নর দুজন পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন।[৬]

এছাড়া আল-সাফফাহ মদিনার গভর্নরকে সকল সমকামী বা মুখান্নাছকে মদিনা থেকে নির্বাসনের নির্দেশ দিলে গভর্নর পুলিশ প্রধানকে তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[৭] আবুল আবক্ষাসের ভ্রাতা আল মনসুর আবক্ষাসীয় খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৪ খ্রি. খলিফা আল-মনুসরের চাচা আব্দুল্লাহ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সময় আল মনসুর আবু মুসলিমকে তার সেনাবাহিনী সহ আব্দুল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দামেস্কে প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ যখন জানতে পারেন যে, আবু মুসলিম খোরাসান হতে সেনাবাহিনীসহ তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে তখন তিনি সিরিয়ায় অবস্থানরত সত্তর হাজার লোককে হত্যা করার জন্য তার পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আবু মুসলিম তার সৈন্যবাহিনীসহ যখন সিরিয়ায় উপস্থিত হবেন তখন এ খোরাসানবাসীরা আবু মুসলিমের সাথে যোগদান করবে এবং আব্দুল্লাহকে

---

১. Anon, ed. A-A- Duri and A.J al-Muttalibi, *Akhbar al-Dawlat al –Abbasiyya*, Beirut : 1971, p. 279
২. Anon, *Akhbar al-Dawlat al –Abbasiyya*, Ibid, p. 279-280
৩. Tabari, vol. 7, p. 414
৪. Yaqubi, vol. 3, p. 101
৫. Ibn Atham, vol. 8, p. 201
৬. Walhat, p. 124
৭. Ansab, vol. 3, p. 161

Dhaka University Institutional Repository

আবু মুসলিমের বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এরূপ হত্যাকান্ডের পরও আব্দুল্লাহ তার পরাজয় ঠেকাতে পারেনি।[১]

আবু মুসলিম খলিফা আল মনসুরের নিকট আব্দুল জবক্ষার বিন আব্দুর রহমান, সালিহ বিন হাশিম এবং খালিদ বিন বার্মাকি-এর জীবননাশের জন্য খলিফার নিকট প্রস্তাব করেন। তিনি খলিফাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, এ হত্যার মাধ্যমে খলিফা উপকৃত হবেন কারণ এ ব্যক্তিরা খলিফার জন্য বিপজ্জনক।[২]

প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তিগণ ছিলেন আবক্ষাসীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। এ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর মধ্যে পুলিশ প্রধান এবং মন্ত্রী পর্যায়ের লোকও ছিলেন।[৩]

আবু মুসলিম ক্ষমতা আরোহণের জন্য খুবই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে হত্যার ব্যাপারে এজন্য প্ররোচিত করেছিলেন যে, তারা খলিফার প্রতি খুবই বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে খলিফা আল মনসুর কৌশলে আবু মুসলিমকে তার প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। আবু মুসলিম খলিফার প্রাসাদে উপস্থিত হলে খলিফা হারাস প্রধানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আড়ালে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর খলিফা নির্দেশে তারা বের হয়ে আবু মুসলিমকে হত্যা করেন।[৪]

৭৫৮ খ্রি. খলিফা আল মনসুর রাওয়ান্দিহ বিদ্রোহীদের দ্বারা রাজপ্রাসাদে আক্রান্ত হন। এ সময় তার হারাস প্রধান নিহত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল-মনসুর বাগদাদ নগরীতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। খতিব আল বাগদাদের বর্ণনা মতে, খলিফা প্রাসাদের প্রত্যেকটি তোরণ (Gate)-এ একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে এক হাজার প্রহরী নিয়োগ করেন। এ সময় একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়, পুলিশ হাউজ।[৫]

পুলিশের গুরুত্বের বিষয়টি খলিফা আল-মনসুরের নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে ফুঁটে ওঠে–

> "I want and need four men in front of my door, each one of whom is honest. When asked who such men might be, al-Mansur said that these men were the foundation of the state and that the state could not function without them, just as a fhrone could not stand up without four support. The first of these four is the qadi who is impervious to criticism, as he works in God's service. The seconed of the four is the sahib al-shurta who defends the weaker people in society against the stronger. The third is the shaib-al-kharaj who exercise justice in collecting money from the people. When he came to a description of the fourth of theses crucial government posts, al-Mansur bit his nails three times and sobbed continuallly before announcing that the was thinking about the sahib al-barid whose job it was to record the actions of the three others."[৬]

খলিফা মাহদির সময় পুলিশি ব্যবস্থা

১. Tabari, ser. 111-1, p. 94
২. Ibn Atham, vol. 8, p. 215
৩. Ibn Atham, Ibid
৪. Tabari, ser. 111-1, pp. 129-131
৫. Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad wa Madinat al-Salam*, Cairo : 1931, vol. 1, pp. 77-89
৬. Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Ibid p. 398

Dhaka University Institutional Repository

আবক্ষাসীয় প্রশাসনে খলিফা আল-মাহদি কর অফিসের পাশাপাশি 'অডিট এন্ড একাউন্ট' অফিস প্রবর্তন করেন। অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য 'দিওয়ান-আল-তাওকি' প্রবর্তন করেন। এ বিভাগটি সাধারণত সরকারি চিঠিপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ এবং রাজনৈতিক-কুটনৈতিক দলিল দেখাশুনা করত। এছাড়া জনগণের অভিযোগ শুনার জন্য একটি বিভাগ ছিল। পুলিশ ও ডাকবিভাগ তার সময়ে ছিল। এ সম্পর্কে পি.কে হিট্টি বলেন–

> "Besides the bureau of texes the 'Abbasid government had an audit or accounts office (diwan al-zimam) introduced by al-Mahdi; a board of correspondence or Chancery office (diwan al-tawqi) which handeled all official letters, political documents and imperial mandates and diplomas; a board for the inspection of grievances; a police department and a postal department. The police department (diwan al-shurtah) was headed high official designated sahib al-shurtah, who acted as chief police and the royal bodyguard and in later times occasion held the rank of vizir."[১]

খুজাইমা ইবনে খাজিম খুরাসান বংশের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর পিতা খাজিম আবক্ষাসীয় খিলাফতের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। খুজাইমা খলিফা আল মাহদির সময় বাগদাদের পুলিশ প্রধান ছিলেন। তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যখন ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা আল হাদির মৃত্যুর পর তার ছোট ভ্রাতা হারুন অর রশিদের সিংহাসনে আরোহন করেন। খলিফা হাদি তার ছোট ভাই খলিফা হারুন অর রশিদকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে তার পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পরিকল্পনা করেন। হঠাৎ খলিফা হাদির মৃত্যু হলে হারুনের সমর্থকগণ দ্রুত তাকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন। অন্যদিকে জাফরের সমর্থকগণ তার আনুগত্য শপথ গ্রহণ করেন। খুজাইমা খলিফা হাদির একজন ঘোর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ হাজার সমর্থকসহ হারুন অর রশিদের পক্ষে সমর্থন দেয় এবং নব রাজপুত জাফরকে তার বিছানা থেকে টেনে এনে সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য করেন। পরবর্তীকালে খুজাইমা হারুন অর রশিদের সময় বাগদাদের গভর্নর নিযুক্ত হন। হারুন অর রশিদের রাজত্বের শেষ দিকে খুজাইমা তাঁর পুলিশ প্রধান ছিলেন।[২]

খলিফা হারুন অর রশিদ-এর সময় পুলিশি ব্যবস্থা

খলিফা হারুন অর রশিদ বিখ্যাত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আবক্ষাসীয় খলিফা'। খায়যুরানের গর্ভজাত, খলিফা আল-মাহদির দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। হারুন ১৪৮ হিজরিতে খুরাসানের রাজধানী আর-রায় এ জন্মগ্রহণ করেন। হারুন অর রশিদের শাসনে দফতর ও বিভাগসমূহের বিভাজন ও ব্যাখ্যা অধিকাংশ

---

১. Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, Ibid, pp. 321-322

২. "Khuzama served as sahib al-shurta (Chief of Police) of Baghdad under Caliph al-Mahid (r. 775-785) His power was shown in 786, at the death of al-Hadi (r. 785-786), when he was instrumental in securing the accession of al-Hadi's younger brother Harun al-Rashid (r. 786 – 809) against the claims of al-Hadi's son Jafar. At the time of his sudden death on 14 September, al-Hadi was planning to remove Harun from the succession in favour of Jafar, but the had not yet done so. Thus, on the night when al-Hadi died, Haruns supporters hastened to acclaim his as Caliph, while others gave the oath of allegiance to Jafar. Although Khuzama had been a staunch supports of al-Hadi, the Caliph's decision to srip his brother Abdallah from the post of Sahib al-shurta probably alienated him. Khuzayma reportedly gathered and armed 5,000 of his own followers, dragged the young prince from his bed and forced him to publicly renounce his claims in favour of Harun." see. http://en.wikipedia. Org/wiki/Khuzayma-ibn-khazim, visited on 12.10.2014

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে বর্তমান কালের অনুরূপ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দফতর ছিল দিওয়ান-ই-যামাম। সরকারি বিভাগসমূহের হিসাবের যাচাই হত এই বিভাগে। দিওয়ানুর রাসাইল এ রাজনৈতিক পত্রাবলীর খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লিপিবদ্ধ হত এবং তাতে খিলাফাতের মোহরও এ স্থানেই অঙ্কিত করা হত। দিওয়ানুর রাসাইল এ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রচনাকারীগণ দায়িত্ব পালন করতেন। দিওয়ান-ই খারাজ এর দায়িত্ব ছিল খারাজ ও জিযয়া ইত্যাদির হিসাব তৈরি করা। দিওয়ানুল জুনদ এর দায়িত্ব ছিল সৈন্যদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা।

দিওয়ানুশ শুরতা অর্থাৎ সাধারণ পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। দীওয়ানুল বারীদ ওয়াল-আখবার নামে ডাকবিভাগ চালু ছিল। এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল সরকারি পত্রাবলী ও নির্দেশসমূহকে গভর্নর ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিকট পৌছান। ডাক বিভাগের প্রধান খলিফার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতেন। ডাক পৌছানোর জন্য দ্রুতগামী উষ্ট্রী, বিদ্যুত গতিসম্পন্ন ঘোড়া ও খচ্চর এবং ভোরের পূবালী বাতাসের গতিসম্পন্ন কবুতর ব্যবহৃত হত। হারুনুর রশিদের দেহরক্ষী তাঁর নির্ভরযোগ্য ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহের অন্যতম ছিল "বিচার" বিভাগ, যা ন্যায়বিচারের রক্ষক ছিল। এ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতেন প্রধান বিচারপতি। ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর সঠিক বিবেচনায় সাম্রাজ্যে বিচারক নিযোগ করা হত। বিচার বিভাগ রায় ঘোষণা করত এবং বিচারকদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা হত। ওয়াক্ফ দেখাশুনা করত এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও ইয়াতীমদের অভিভাবক নিয়োগ করত।[১]

খলিফা আল-মামুনের সময় পুলিশি ব্যবস্থা

খলিফা আল-মামুন এর পুরো নাম আবুল আবক্ষাস আব্দুল্লাহ ইবন হারুনুর রশিদ। তিনি সপ্তম আবক্ষাসীয় খলিফা। তিনি ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হারুনুর রশিদের এগার জন পুত্র সন্তানের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ।[২] সিংহাসনের দাবির বিষয়ে খলিফা আল-মামুন এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ইব্রাহিম বিন আল মাহদি এর গ্রেফতার করণের বিষয়ে হারাস বাহিনী বিশেষ শিষ্টাচারপূর্ণ দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়। ইব্রাহিম আল মাহদি মহিলাদের অবগুণ্ঠন করে ছদ্মবেশে পলায়নের চেষ্টা করলে হারাস বাহিনী তাকে চ্যালেঞ্জ করে গ্রেফতার করেন। তিনি ঘুষ বা উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং তাকে পুলিশ প্রদানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আল-তাবারির বর্ণনাতেও, হারাস বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারের বিষয়টি ও তাদের সততার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।[৩]

সাবেক মাউনা প্রধান ইতকাকে বাগদাদে কৌশলে অবরুদ্ধ করণের জন্য হারাস বাহিনী ইসহাক বিন ইবরাহিমকে সহায়তা করেন। এ সময় খুজাইমা বিন খাজিম অন্যান্য সশস্ত্র সদস্যদের সহায়তায় ব্রিজ এলাকায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং এ স্থানেই ইতকাকে ধরার পরিকল্পনা ছিল।[৪]

খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল এর সময় পুলিশি ব্যবস্থা

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামি বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, ২৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭
২. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামি বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩
৩. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 233
৪. Ibid, p. 234

Dhaka University Institutional Repository

আবক্ষাসীয় খিলাফতের দশম খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭ খ্রি. খিলাফতে আসীন হন এবং ৮৬১ খ্রি. পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন। মুতাওয়াক্কিলের খিলাফতকালে সরকারের যেসব প্রশাসনিক দফতরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তার মধ্যে পুলিশ বিভাগও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

পুলিশ প্রধান খলিফা ও স্ব-স্ব প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনস্ত ছিলেন। খলিফা, কাযি ও গভর্নর কর্তৃক কোনো রায় বাস্তবায়নের প্রয়োজন হলে পুলিশ প্রধান তা কার্যকর করতেন। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল এবং তার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত রায় পুনঃবাস্তবায়নে পুলিশের ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) ৮৫০ খ্রি. ইয়াহইয়া বিন উমরকে বাগদাদে খলিফার নির্দেশে প্রহার করা হয়েছিল। কেননা, তিনি তার চতুর্দিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিয়াদের সমবেত করেছিলেন।[২]

(খ) ৮৫৫ খ্রি. খলিফার নির্দেশে বাগদাদের কাযি আবু হাসান যাইদির প্রদত্ত রায় পুলিশ প্রধান কর্তৃক কার্যকর করা হয়। পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ বিন তাহির কর্তৃক খান আছিমকে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ৫০০ দৌররা মারা হয়। এ সময় তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সূর্যতাপে রাখা হয় এবং তার মৃতদেহকে টাইগ্রিস নদে নিক্ষেপ করা হয়।[৩]

(গ) ৮৫৮ খ্রি. খলিফা কর্তৃক আলি বংশের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কারণে ইবনে আল সিক্কিতকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। তার পেটকে বিদীর্ণ করা হয়। খলিফা তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করণে পুলিশকে দেরি করতে দেননি।

(ঘ) ৮৪৭ খ্রি. খলিফা কর্তৃক সাবেক মন্ত্রী ইবনে আল যাইয়াতকে দোষীসাব্যস্ত করে জেলে প্রেরণ করা হয়। এসময় সামাররার সাহিব আল-মাউনা ইতকাকে সাবেক মন্ত্রী যাইয়াদকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ইবনে যাইয়াতকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জেলে নির্যাতন করা হয়।

শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ বৃহৎ আকারের লোহার লণ্ঠন তৈরি করে তাতে ধারালো লোহার পেরেক স্থাপন করে লোহার পেরেকের সুঁচালো মাথা মানব দেহে প্রবেশ করিয়ে শাস্তি প্রদান করা হত। ইবনে যাইয়াত যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি এ পদ্ধতির মাধ্যমে অপরাধী ও প্রশাসনের সিভিল কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অর্থ আদায় করতেন। অতঃপর ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে তাকেও এ যন্ত্রে শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল। ইতকা কর্তৃক যাইয়াতকে হত্যা করা হয় শুধু তাই নয় খলিফা, মুতাসিম এবং ওয়াসিক কর্তৃক কাউকে হত্যা বা নির্যাতন করার প্রয়োজন হলে ইতকাহর ওপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত হত।

(ঙ) ইসহাক বিন ইব্রাহিম বাগদাদের পুলিশ প্রধান ছিলেন। তিনি ৮৪৯ খ্রি. আল মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশে ইতকাহকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করেন। এতে বুঝা যায় যে, পুলিশ প্রধান জেলা প্রশাসনেরও দায়িত্বে ছিলেন। ইতকাহ-এর সেক্রেটারিসহ তার দুই পুত্রকেও গ্রেফতার করা হয়। বিশাল ওজনের বস্তু শাস্তিস্বরূপ ইতকার ঘাড়ের উপর রাখা হয় এবং তাকে পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা হত না। ইতকাহ তার দুই সন্তানের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য পুলিশ প্রধানের

১. S. Khuda Bukhsh, *The Orient under the Caliphs*, Ibid, pp. 237-238
২. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 263
৩. Ibid, p. 263

Dhaka University Institutional Repository

নিকট অনুরোধ করলে পর তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা হয়। সম্ভবত জেলখানার ভেতর বিশাল ওজন ও খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে ইতকাহ-এর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পুলিশ প্রধান ইসহাক বাগদাদের কাযি, ডাক প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতকাহকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়নি এটি প্রমাণ করার জন্য তাদের সমর্থন জরুরি হয়ে পড়ে। যেহেতু তার মৃত দেহের উপর কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি তাই ধরে নেয়া হয়েছে যে এটি ছিল স্বাভাবিক মৃত্যু।[১]

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশে আজারবাইজানের বিদ্রোহী নেতা ইবনে আল বাইসকে জেলে রাখা হয় এবং তার দায়িত্ব প্রদান করা হয় ইসহাক বিন ইব্রাহিমের উপর। ইবনে বাইস পলায়ন করলে তার মৃত্যুদণ্ডের স্থলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এ সময়ে তার তিন পুত্র জাফর, হাবলিস ও বাইসকে বাগদাদের কাসর আল দাহাবে আটক রাখা হয়।[২]

উল্লেখ্য যে, ২৩৫ হিজরিতে মুতাওয়াক্কিল ফৌজের উর্দি পরিবর্তন করে এ বছরই হাসান ইবনে সাহল এবং তাহির ইবন হুসাইনের ভ্রাতুষ্পুত্রও মামূনুর রশীদের আমল থেকে বাগদাদের পুলিশ প্রধান ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হুসাইন ইবন মুসআব মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মদ ইবন ইসহাককে পুলিশ বিভাগের প্রধান নিয়োগ করেন।[৩]

খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দাঙ্গা দমন ও গণআন্দোলন দমনে সাহিব আল-শুরতা ও সাহিব আল-মাউনা এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ৮৫২ খ্রি. আহমদ বিন নাসর আল খুজাইয়ের মৃতদেহের সৎকার করতে গেলে এক ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের নিদের্শনা সত্ত্বেও জনগণ সমবেত হতে থাকে। খলিফা জনতার সমবেত হওয়ার কথা জানতে পেরে নাসর বিন লাইসকে প্রেরণ করেন। লাইস বিশজন ক্রুদ্ধ জনতাকে সাময়িকভাবে আটক করে প্রহার করেন। আহমাদ বিন নাসরের মৃতদেহ তার আত্মীয়দের নিকট হস্তান্তরের পর আটক ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয়া হয়। আহমাদের সমাধিস্থ না হওয়া পর্যন্ত অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।[৪] ২৩৭ হিজরিতে খলিফা মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহির ইবন হুসাইন ইবন মাসআবকে বাগদাদের পুলিশ প্রধান নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, তাঁর ভাই তাহির ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহির তখন খুরাসানের গভর্ণর ছিলেন।[৫]

খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল কারবালার ইমাম হুসাইন (রা.)-এর সমাধি যিয়ারতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। যে এ নির্দেশ অমান্য করলে তাকে কারারুদ্ধ করা হত। আমির বা গভর্নরের পুলিশ প্রধান (সাহিব আল-শুরতা) এ নির্দেশনাটি জনসম্মুখে প্রচার করেন। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল রাষ্ট্রের

১. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 264
২. Ibid, p. 264
৩. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২
৪. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 234
৫. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্ন করে এমন সভাসমাবেশ ও মিছিল বন্ধের জন্য আব্দুল্লাহ বিন তাহিরের প্রতি লিখিত নির্দেশনা দেন।[১]

(চ) দোষী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হত। খলিফা ওয়াসিক আহমদ বিন ইসরাইলকে সাহিব আল-হারাস ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন মুদাহ-এর নিকট হস্তান্তর করেন এবং তাকে প্রতিদিন দশটি করে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। দণ্ডস্বরূপ আহমাদ প্রায় এক হাজার দোররা ভোগ করেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময় উমর বিন খারাজ যখন জেলে ছিলেন তখন তার মুখে প্রতিদিন চপেটাঘাত করার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে, তিনি প্রায় ছয় হাজার চপেটাঘাত হজম করেন। তাকে মোটা উলের বস্তা পরতে দেয়া হয়। ৮৫১ খ্রি. উপ-পুলিশ প্রধান উবায়দুল্লাহ আল সিররি কর্তৃক মাযালিম কর্মকর্তা আবু ওয়ালিদকে গ্রেফতার করা হয়।[২]

(ছ) হিমস প্রদেশে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল তার সাহিব আল-মাউনাকে বিদ্রোহীদের প্রহার করার নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীদের নাটের গুরুকে তার গৃহের ফটকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। সাহিব আল-মাউনা তার নির্দেশ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত খলিফার নির্দেশ মানতে বাধ্য হন এবং কিছু বিদ্রোহীকে জনসম্মুখে ঝুঁলিয়ে হত্যা করেন।

(জ) কাযি হারিশ বিন মিসকিন জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে অপরাধের জন্য চাবুক মারার নির্দেশ দেন। নবীর প্রতি অসম্মান করার কারণে জনৈক খ্রিস্টানকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং দু'জন খ্রিস্টান যাজককে দণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। মিসরের দক্ষ পুলিশ এটা সম্পন্ন করেন।[৩]

(ঝ) বিচার বিভাগের নিদের্শনা এবং বিচারকদের বৈধ আদেশ এবং বিচারিক বৈশিষ্ট্যের যে কোনো আদেশ পালন পুলিশের কর্তব্যভুক্ত ছিল।[৪]

খলিফা মুতাজ্জ বিল্লাহ

তিনি ৮৬৫ খ্রি. সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। তিনি আহমদ ইবন ইসরাঈলকে তাঁর উযির মনোনীত করেন। মুহাম্মদইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহিরকে তিনি পুলিশ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন।[৫]

খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ

আবদুল্লাহ ইবন মুতাজ্জ সিংহাসনে বসে আল-মুরতাযা বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করলেন। তিনি মুকতাদিরকে লিখে পাঠালেন যে, খলিফার প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসো এবং চিরতরে খিলাফতের মায়া ছেড়ে দেয়াই তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। মুকতাদির জবাবে লিখে পাঠালেন যে, আপনার নির্দেশ শিরোধার্য। রাত পর্যন্ত আমাদের সময় দিন। রাতের বেলা ভৃত্যু মুনিসের সাথে

---

১. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, p. 235

২. Ibid, p. 265

৩. Ibid, p. 265

৪. "The judicial aspect of the shurta thus included compliance in a wide range of matters, with the orders of Hakin or a qadi in fulfilment of a legal judgement or an order having a judicial character." see. M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil*, Ibid, pp. 265-266

৫. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ভৃত্যরা হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা করল। হুসাইন ইবন হামদান খলিফার প্রাসাদের দরজায় পা দিতেই তারা তীর বর্ষণ করতে লাগলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুকতাদিরের সপক্ষে দাঁড়াল। ফলশ্রুতিতে নব্য খলীফা আবদুল্লাহ ইবন মুতাজ্জ তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীসহ আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। মুকতাদির ভৃত্য মুনিসকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রোহী তৎপরতা দমনের আদেশ দিলেন। আবুল হাসান ইবন ফুরাতকে তিনি উযিরে আযম মনোনীত করেন।[১]

খলিফা ওয়াসিকের সময় কুরআন সৃষ্ট এবং কুরআনের চিরন্তনতা ও অবিনশ্বরতার একটি ঘটনা এরূপ যে, আহমাদ বিন নাসর বিন আল হাশেম আল খোজায়ি আবক্ষাসীয় বংশীয় একজন বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের চিরস্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। যারা আল-কুরআনকে সৃষ্ট বলে মনে করতেন তিনি তাদের বিরোধিতা করতেন। এ সময়ে খলিফা ওয়াসিকের কঠোরতা ও আবক্ষাসীয় বংশের তার পিতার অবস্থান নির্বিশেষে তিনি এ বিরোধিতা করেন। আহমাদ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের মোকাবেলা করেন।

একদা আহমাদ তার সঙ্গীদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন এমন সময় খলিফা আল ওয়াসিকের নাম উচ্চারিত হলে তিনি তাকে অবিশ্বাসী বলে অভিহিত করেন; এ বিষয়টি জনগণের নিকট প্রচারিত হয়। আহমাদকে সুলতান কর্তৃক ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে এবং খলিফা ওয়াসিকের নিকটও বিষয়টি পৌঁছেছে মর্মেও প্রচার করা হয়। জনগণের মধ্যে আহমাদের মতাদর্শ সমর্থন করে তার সাথে যারা সাক্ষাত করতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-আবু হারুন আল সাররাজ, তালিব, ইসহাক বিন ইব্রাহিম বিন মুসা এবং পুলিশ প্রধান। আহমাদ এর সমর্থকগণ এবং বাগদাদের জনগণের মধ্যে যারা কুরআন সৃষ্ট এ ধারনার বিরোধিতা করেন তারা আহমাদকে আল-কুরআন সৃষ্ট এ মতবাদ প্রত্যাখান এর বিষয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্ররোচিত করে। তাঁর সুনাম, খ্যাতি এবং আবক্ষাসীয় বংশে তাঁর পিতা ও পিতামহের অবদানের জন্য জনগণ ব্যক্তিগতভাবে তাকে পছন্দ করতো। তাঁর দক্ষতাপূর্ণ কাজের জন্য খলিফা মামুন তাঁকে পছন্দ করতেন এবং ৮১৯ খ্রি. বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন।

আবু হারুন আল-সাররাজ এবং তালিব এ আন্দোলনে প্রত্যেকের মাঝে এক দিনার করে বণ্টনে কিছু লোককে দায়িত্ব দেন। একটি নির্দিষ্ট রাত্রিতে সংকেত হিসেবে জড়ো হওয়ার জন্য ঢোল বাজানো হবে যাতে সে নির্ধারিত সকালে খলিফার প্রাসাদ আক্রমন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তালিব এবং আবু হারুন প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা গ্রুপে যোগদান করেন। তালিব শহরের পশ্চিম দিকে দারুল সালামে এবং আবু হানিফ শহরের পূর্ব দিকে গমন করেন। তালিব এবং আবু হারুন বিশ্বাস করে আল-আসরাছের দুই সন্তানকে কিছু দিনার দেন তার প্রতিবেশিদের মাঝে বিতরণ করার জন্য। ঘটনাটি এরূপ যে, এ সমস্ত লোকজন মদ নিয়ে আসে এবং মদ পান করে মাতাল হয়ে মঙ্গলবার রাত্রিতে ঢোল বাজাতে থাকে। এ রাত্রিটি ছিল পরের দিন আক্রমনের নির্ধারিত বুধবারের পূর্ব রাত্রি। তারা জোরে জোরে ঢোল বাজাতে লাগলো কিন্তু অন্য দল তাতে সাড়া দিল না।

এ সময় ইসহাক বিন ইব্রাহিম এবং পুলিশ প্রধান বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন না। পুলিশ উপ-প্রধান মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম তার ভৃত্য রাকেসকে ঢোল বাজানোর কারণ সম্পর্কে প্রেরণ করেন কিন্তু কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। তখন রাকেসকে ইসা আল আওয়ার-এর নিকট যোগাযোগের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং ইসাকে এ বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে, যদি তিনি প্রকৃত সত্য প্রকাশ না করেন তবে তাকে প্রহার করা হবে। ইসা এ সময় আল-আসরাছ এর দুই পুত্র, আহমাদ বিন নাসর এবং অন্যদের নাম প্রকাশ করে।

---

১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম তাদের সন্দিগ্ধ দলকে অনুসরণ করে কিছু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। তিনি শহরের পশ্চিমদিকে তালিবের প্রাসাদকে এবং পূর্বদিকে আবু হারুন সাররাজ-এর প্রাসাদ অবরোধ করেন। ইসা আল আওয়ার-এর তথ্য মতে অন্যান্য ব্যক্তিদের ধরার জন্য দিন-রাত সন্ধান চলতে থাকে। উপ-পুলিশ প্রধান তাদের অনেককেই পাকড়াও করে ফেলেন এবং শহরের পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কারাগারে অন্তরীণ করে রাখেন। প্রাসাদ সূত্রে জানা যায়, যাদের ধরা হয়েছিল তাদেরকে লোহার শিকল পড়ানো হয়েছিল এবং আবু হারুন ও তালিবের প্রত্যেককে সত্তর পাউন্ড ওজনের শিকল পড়ানো হয়েছিল। এই তল্লাশীর সময় দুটি লাল ও সবুজ পতাকা আল-আসরাছের সন্তানদের গৃহে পাওয়া যায় এবং বাগদাদের পশ্চিম দিকে তাদের সহযোগী মুহাম্মদ বিন আয়িসকে খুঁজে পাওয়া যায়।

এছাড়া পুলিশ আহমাদ বিন নাসার-এর একজন নপুংশ দাসকে আটক করে তথ্য প্রদানের জন্য ভীতি প্রদর্শন করে। উক্ত নপুংশটি ইসা আল আওয়ার-এর মতই অপরাধের তথ্য প্রদান করে। অতঃপর পুলিশ আহমাদ আল নাসারের গৃহে গমন করে। এ সময় আহমাদ পুলিশকে জানান যে, "এটি আমার নিজ গৃহ, এটি তল্লাশি কর। যদি কোন পতাকা, সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র পাও যা বিদ্রোহে আলামত প্রদর্শন করে তবে তোমাদের অধিকার আছে যে, আমার রক্তপাত এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।" এ জাতীয় কোন কিছুই তার গৃহে পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও পুলিশ আহমাদ বিন নাসরের পায়ে শিকল পরায় এবং তার দুই সন্তান ও নপুংশ সেবকদের তার হেফাজতে নেয়। অধিকন্তু তার অনুসারী যারা পশ্চিমের জেলায় বসবাস করতেন এবং তার আস্তানায় গমন করতেন তাদেরকেও পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়।

খলিফা আল ওয়াসিক সামাররায় আহমাদ বিন নাসার ও তার সহযোগিদের আগমনের সংবাদ জেনে প্রকাশ্য আদালতে তাদের বিচারের পরিকল্পনা করেন। এ সময় আহমাদ নাসারকে জিজ্ঞাসা করেন "আল-কুরআন সম্পর্কে তোমার মতামত কী?" আহমাদ বিন নাসার অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উত্তর দেন যে, এটি আল্লাহর বাণী। ওয়াসিক আরও জিজ্ঞাসা করেন, আল-কুরআন কী সৃষ্ট? প্রত্যুত্তরে আহমাদ বলেন, এটি আল্লাহর বাণী। খলিফা ওয়াসিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, "পুনরুত্থান দিবসে তোমার কী সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত হবে?" আহমাদ প্রত্যুত্তরে জানান যে, মহানবী রসুলুল্লাহ (স.) আমাদের শিখিয়েছেন যে, "পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত হবে। যেরূপ তোমরা পূর্ণিমার চাঁদকে কোনরূপ বাঁধা ছাড়াই দেখতে পাও। সুতরাং আমরা সেটি বিশ্বাস করি।"

পুলিশ প্রধান ইসহাক বিন ইব্রাহিম এ সময় আহমাদ বিন নাসারকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার প্রতি বিপদ আসবে। তুমি যা বলছো তা চিন্তা করে বলছো তো। তখন আহমাদ ইসহাককে বলেন তুমি আমার প্রতি এরূপ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছো। ইসহাক মূলত তার নিজের প্রতি কী পরিণিত হয় এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। তিনি আহমাদকে জিজ্ঞেস করেন আমি কী তোমাকে এরূপ বলতে নির্দেশ দিয়েছি।

খলিফা ওয়াসিক বিচার কাজে তার সহযোগিদের জিজ্ঞেস করেন যে, "কীভাবে তার বিচার করা যায়? তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকের বিচারক আবদুর রহমান বিন ইসহাক খলিফাকে বলেন যে, আহমাদ বিন নাসর হত্যারযোগ্য।"[১]

---

১. Zamel Al-Rasheed, *The Reign of the Caliph Al-Wathq* (842-847 A.D), According To Al-Tabari's History: Institute of Islamic Studies-, Published: McGill University-1972; p. 55-60 ; http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1456819198576~797, visited on: 28.2.16

Dhaka University Institutional Repository

গভর্নর মুইজদ্দৌলার সময় শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায়ে পুলিশ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাঁর পুলিশ প্রধান আবু আল হাসান আবজা আজ্জি খুবই কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি স্বীকারোক্তি আদায়ে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি অপরাধী ব্যক্তিকে দু'জন ব্যক্তির মাঝখানে দাঁড় করাতেন এবং কিছু পুলিশ সদস্যকে তার পিছনে দাঁড় করাতেন। যখনই তিনি অপরাধীর মাথায় আঁচড় দিতেন তখন পুলিশ সদস্যরা আচমকা পিছন থেকে অপরাধী ব্যক্তিকে কষে চাবুক মারতেন। এ সময় পুলিশ প্রধান রাগান্বিত হওয়ার ভান করে শুরতা সদস্যদেরকে জিজ্ঞেস করতেন কে তাকে আঘাত করছে। তিনি আরও বলতেন আল্লাহ তার হাত-পা কর্তন করুন যে তোমাকে এরূপ আঘাত করছে। অতঃপর তিনি অপরাধীর নিকট গিয়ে বলতেন চিন্তা করো না যদি তুমি সত্য কথা বল তবে তোমাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। এরপরও যদি অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার না করতো তাকে পুনরায় মাথায় আঁচড় দেয়া হত এবং পূর্বের ন্যায় প্রহারের শাস্তি চলতে থাকত। দোষ স্বীকারের জন্য প্রদত্ত এরূপ শাস্তির ফলে অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

মাসুদি খলিফা আল মুক্তাদিদের সময় আরেকটি শাস্তি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন, তা হলো অপরাধীকে দোষ স্বীকারে বাধ্য করার নিমিত্তে রাত্রিকালে নিদ্রা যাপনে ব্যাঘাত ঘটানো হত।[১]

এসময় ঘন ঘন দস্যুতার ফলে দস্যুতার শাস্তি ছিল খুবই কঠোর। মুইজ দৌলার পুলিশ প্রধান আবুল হাসান আবযা আযযি গভর্নরের অনুমতিক্রমে কোনো এক দ্বিপ্রহরের পরে কতিপয় দস্যুকে কয়েদখানা হতে বের করেন এবং তাদেরকে ঝুঁলিয়ে রাখেন। পরের দিন সকালে তাদের শিরচ্ছেদ করা হয়। অপরাধীদের ঝুলানো কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না; তাদেরকে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলানো হত ফলে তাদের শিরচ্ছেদ না হওয়ায় খুবই কষ্ট ভোগ করত।[২]

সাধারণত মামলুকরা নিজেদের মধ্য থেকে বিশ-পঁচিশ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁদের উপরই শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এই কুড়ি-পঁচিশ ব্যক্তিই শাসক পরিষদের সদস্য বা নির্বাহীবৃন্দ বলে গণ্য হতেন। এদের মধ্য থেকে কাউকে তারা সদর বা আমীর নিযুক্ত করতেন। এই নির্বাচিত সদর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বাদশাহদের মত মসনদে আরোহণ করতেন এবং সুলতানা বা মালিক নামে অভিহিত হতেন। মসনদে আরোহণ করে সুলতানা নির্বাহী পরিষদের অপর সদস্যদেরকে বড় বড় সামরিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দান করতেন। এই কুড়ি-পঁচিশ ব্যক্তির মধ্য থেকে কেউ

১. "In this period, the Sahib Al-Shurta used to used special methods to make he criminals to confess. Abu AL-Hasan Abza' Ajji was the Sahib al-Shurta of Mizz AL-Dawla government who was extremely strict. He had a special way to make the criminals and guilty people confess. He made the criminal stand between two guys and a number of Shurta forces standing behind him. Whenever he scratched his head, they suddenly gave the criminal a lash on his back. Sahib Al-Shurta pretended to be angry with the Shurta who gave the lash and told him: 'God may cut your hands and legs! Who let you hit him?" then he turned to the criminal and said: don't worry! Tell the truth to get free. If you confess, it won't happen again!" If the man did not confess, he would scratch his head again and this would continue until the criminal confess whatever he did (Tannu'khi, 1995, p. 217). This method demonstrated that the methods of making criminals confess were simple and at the same time very cruel and there was possibility of judging mistakenly. There might even be cases in which someone confessed something that he did not actually do or someone died under the pressure of the tortures. In other periods of Abbasid era, other mehtods were used. One of the methods which was mentioned by Masu'di in a report of Caliph AL-Mutadid Period, was allowing those guilty people not to sleep order to force them to confess." see. Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan : Canadian Centre of Science and Education, 2013, Vol. 5, No. 2, p. 69; http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014

২. "Due to the frequencey of robbery during this period, the robber's punishment was burdensome. In the time of Muez Al-Dowla Deylami, Abulhasan Abza Ajji, the Sahib Al-Shurta in Bagdad, used to get Muez Al-Dowlas permission for punishment of the robbers and then, in the afternoon, took the robbers out of the jail and hung them up and later in the next morning they cut their head off (Ibid, p. 214). Apparently in that time, it was not common to hang the guilty ones, they hung the guilty person from hands and shoulders. Therefore, they would suffer very much until their heads were cut by them." see. Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan : Canadian Centre of Science and Education, 2013, Vol. 5, No. 2, p. 69; http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014

Dhaka University Institutional Repository

উযিরে আযম বা প্রধানমন্ত্রী, কেউ রঈসুল আসফার বা সেনাধ্যক্ষ, আবার কেউ পুলিশ বাহিনী প্রধান, কেউ অর্ধ বিভাগ প্রধান নিযুক্ত হতেন। এদের ছাড়া অন্যদের মর্যাদা হতো অপেক্ষাকৃত কম।[১]

পুলিশ বিভাগের প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত। যাবতীয় পুলিশ বাহিনী তাঁর তত্ত্বাবধানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য জেলখানা ছিল। পুলিশের জেলখানা (হাবস আল-মাউনা) ও কাযির জেলখানা (হাবস আল-কাযি) ভিন্ন ছিল।[২]

আবক্ষাসীয় যুগে মুসলিম আইনজ্ঞগণ দু'ধরনের কারাগারের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল কাযির কারাগার আর অন্যটি হল রাজনীতিক এবং সামরিক কারাগার। কাযির কারাগারে প্রশাসনিক আটক, শারীরিক শাস্তি ও ঋণখেলাপীদের আটক রাখা হত এবং রাজনীতিক-সামরিক কারাগারে চোর, হত্যাকারী ইত্যাদি অপরাধীদের রাখা হত। এটি সরকার বা পুলিশ প্রধান কর্তৃক পরিচালনা করা হত। পুলিশ প্রধান কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদি আটক ও ফৌজদারি বিচারিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা হত। খলিফা মাহদির সময় ইফ্রিকিয়া প্রদেশেও এ ব্যবস্থা প্রচলন ছিল। আবক্ষাসীয় বাগদাদেও কাযি কর্তৃক দোষীসাব্যস্তকৃত ব্যক্তিদের পুলিশি কারাগারে প্রেরণ করা হত।

> "Muslim jurists distinguish between two types of prison, one being the prison, one being the prison of the judge (habs al-qadi), designed for protective custody or administrative detention whilst prisoners awaited corporal punishment, where debtors were mainly held. The other was the political-military prison, where thieves and assassins (habs al-lusus) were kept; it was managed by governors or by the sahib al-shurta, the chief of police who oversaw the prosecution of criminals, for both protective custody and long-term detention."
>
> The sahib al-shurta was among the highest officials in both central and provincial government, æwhen the sahib al-shurta was powerful he could trespass extensively on to jurisdiction of both hisba and that of the qadi, taking charge of enforcing proper conduct in public places, dispensing criminal justice and supervising the implementation of retaliation or qisas.[৩]

পুলিশ বিভাগ বিচার বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল এবং কাযির রায় বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। পুলিশ প্রধানকে সাহিব আল-শুরতা বলা হত এবং তাকে বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হওয়াসহ ধর্মীয় ও আইন বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হতে হত।

আবক্ষাসীয়রা পুলিশকে চারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে একজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খলিফা আল মনসুর তার নিকটবর্তী সাহিব আল-শুরতাকে প্রাসাদের সন্নিকটে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন।[৪]

---

১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭

২. মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩. Al-Qantara, XXXV 1, enero-junio 2014, Doi: 10.3989/alqantara.2014.007, pp. 163-164

৪. "The instituation of the shurta, or police force, was closely related to the judiciary and was responsible for the implementation of the qadis judgements. The chief of the force, known as the sahib ash shurta, was required to be well educated in the religious and legal sciences and to be of strong character. The importance with which the 'Abbasids viewed the shurta can be seen in that of the four important men whom al-Mansur ordered

Dhaka University Institutional Repository

আবক্ষাসীয় প্রশাসনের ব্যাপক বিস্তারের কারণে নতুন নতুন অফিসের উদ্ভব হয়। ফলে উমাইয়া যুগে পুলিশ প্রধান যেরূপ দায়িত্ব পালন করতেন ও সুবিধা ভোগ করতেন তা ক্রমান্বয়ে কিছুটা হ্রাস পায়। একইভাবে পুলিশের নির্ধারিত কার্যের বাইরে উমাইয়া যুগের ন্যায় ঘটনার তাৎক্ষণিক বিচারের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। তাছাড়া হারাস বাহিনী রাজপ্রাসাদ ও খলিফাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। অপরদিকে শুধু পুলিশ বাহিনীর উপর নগরীর নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

আবক্ষাসীয় ফকিহগণ পুলিশ বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য কিছু নির্দেশনা (Guide Line) তৈরি করেন। ইবনে রাবিও পুলিশের অনুসরণের জন্য কিছু নীতিমালা উল্লেখ করেন। ইবনে ওয়াহাব বিন আল-কাতিব পুলিশের জন্য কিছু আচরণবিধি (Code of conduct) প্রস্তুত করেন।

ইবনে ওয়াহাব তাঁর রচিত 'আল বুরহান ফি উজুহুল বয়ান' গ্রন্থে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন– সাহিব আল-শুরতা পদটির প্রধানত দু'টি দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমত, শাসক, মাজালিম আদালতের বিচারক, বিভিন্ন দিওয়ানের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদের নির্দেশে কাউকে কারা বন্দি করা অথবা ছেড়ে দেয়া বা নির্বাসনে পাঠানো বা কারো সাথে কঠোর আচরণ করা ইত্যাদি। একে মাউনা নামেও অভিহিত করা হত। দ্বিতীয়ত, তার অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল ফৌজদারি বিষয়গুলোর উপর নজর রাখা, নির্ধারিত শাস্তি (হদ) ও জরিমানা কার্যকর করা, সন্দিগ্ধ, দূর্নীতিগ্রস্ত ও বিরক্তিকর ব্যক্তিদের উপর নজর রাখা ও তাদেরকে অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা। এছাড়া চোর-দুস্য, জুয়াড়ি ও পাপী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা এবং যারা শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা।

'শুরতা' নামটি তাদের ইউনিফর্ম (Ziyy) থেকে উদ্ভব হয়েছে। কারণ পুলিশ প্রধান তার অভ্যাস বা রীতি অনুযায়ী তার অফিসে পতাকা (al-alam) স্থাপন করে থাকে। আল আশরাত অর্থ al-alam (পতাকা) এর থেকে বলা হয়ে থাকে আশরাত আল-সা (Portents of the Day of Judgement) অর্থাৎ চিহ্ন এবং প্রতিপত্তি। সুতরাং পুলিশ প্রধান যখন নিজেকে বিশেষ চিহ্ন দ্বারা বিশিষ্ট ব্যক্তি বা মর্যাদাবান মনে করেন তখন তিনি তার অফিসে এরূপ চিহ্ন ব্যবহার করেন।

'শুরতা আল খামিস' সম্পর্কে বলা হয় যে, খলিফা আলি (রা.)-এর অধিনায়ক ছিলেন এবং নামটি সেনাবাহিনীর 'খামিস' শব্দ থেকে এসেছে। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্যান্য সৈন্যদের থেকে আভিজাত্যমন্ডিত ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল বলে তাদেরকে 'শুরতা আল খামিস' বলা হয়।

পুলিশকে আল্লাহ তায়ালার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাতে সে 'হদ', 'দিয়াত', আঘাত (আল জিরাহ) ও অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারেন। তাকে অবশ্যই দরিদ্র ও ধনী বা বিখ্যাত ব্যক্তি উভয়ের সাথে সদয় আচরণ করতে হবে। শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকলে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীলতাকে প্রাধান্য দিবে। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, শাস্তিকে এড়িয়ে চল যদি সাক্ষ্য প্রমাণ অস্পষ্ট (Obscure) হয়। আর যদি অপরাধী ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ সুস্পষ্ট হয় তবে অপরাধীকে অবশ্যই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে; কৃত অপরাধের জন্য কোনোরূপ ক্ষমাপ্রদর্শনের সুযোগ নেই এবং অপরাধের শাস্তি বিমোচনেরও কোনো সুযোগ নেই। পুলিশ প্রধান

should stand at his door, one was the sahib ash-shurta." see. Idris El Hareir and Revne Mbaye edited, *The Differnt Aspects of Islamic Culture*, Paris : UNESCO, 2011, vol. 3, p. 222

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর অপেক্ষা অতি দয়াবান নয়! এবং তিনি এর ক্ষমা করারও দায়িত্বপ্রাপ্ত নন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনু: "ব্যভিচারিণী ও ব্যাভিচারী– তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাতি করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[১]

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন–

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰأُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অনু: "হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[২]

অপরাধী ও দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে শাস্তি বৃদ্ধি করা বা তাদের বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ করা পুলিশ প্রধানের কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ط لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا.

অনু: "এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে নিজেরই ওপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় করে দিবেন।"[৩]

মানবজাতিকে অবশ্যই সে সকল বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে হবে যে সব বিষয়ে বিরত বা নিবৃত্ত থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা অপরাধীদের শাস্তি বাড়িয়ে তাদেরকে নিবৃত্ত বা বিরত করা প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই তিনি তা বৃদ্ধি করতেন।

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হল মৃতের আত্মীয়স্বজন প্রতিশোধ চাইলে মৃত্যুদন্ড আর ক্ষমা করলে রক্তমূল্য 'দিয়া' গ্রহণযোগ্য। মৃতের আত্মীয়-স্বজন না থাকলে ইমাম সিদ্ধান্ত নিবেন। তিনি চাইলে শাস্তি বিপরীতে না চাইলে রক্তমূল্য গ্রহণ করা যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কাউকে আঘাত করলে বা কোনো অঙ্গ ক্ষতিসাধন করলে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা নিম্নরূপ–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّه ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অনু: "আমি তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ

১. আল-কুরআন, ২৪:২
২. আল-কুরআন, ২: ১৭৯
৩. আল-কুরআন, ৬৫: ১

Dhaka University Institutional Repository

জখম। অতপর কেউ ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই জালিম।"[১]

পুলিশ প্রধান অবশ্যই প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি ছাড়া কাউকে শাস্তি প্রদান করবে না। ব্যভিচারী কর্তৃক চারবার শপথগ্রহণ পূর্বক ঘোষণা না করা পর্যন্ত তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবে না। যদি কেউ অপরাধ স্বীকার করে তার জন্য 'হদ' আবশ্যক। সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি সে শাস্তি কার্যকর করার আগে তার পূর্বের দেয়া বক্তব্য প্রত্যাহার করে বা অস্বীকার করে তবে শাস্তি বা 'হদ' কার্যকর করা হবে না। যদি হদের ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষীর স্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং ব্যভিচারের জন্য চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে কোনো সাক্ষী যদি তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে অথবা এড়িয়ে চলে বা নিবৃত্ত থাকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করা হবে না। আল্লাহর নির্দেশ এরূপ যে, সাক্ষ্য প্রমাণে সন্দেহ থাকলে 'হদ' কার্যকর করা হবে না। এটি হদ সমাপ্তির সাধারণ বিধান।[২]

প্রতিটি অপরাধ যা ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদন করা হয় তার জন্য প্রতিশোধমূলক শাস্তি (কিসাস) এবং নির্ধারিত শাস্তি 'হদ' রয়েছে। পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব হল এ ধরনের মোকদ্দমা বা তদন্তের বিষয়গুলো ইমাম বা উধর্ক্ষতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। যদি ইমাম বা উধর্ক্ষতন কর্তৃপক্ষ এ সকল বিষয়ে বিচার বা গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দেয় কেবল তখনই তা কার্যকর করা হবে। অপরাধ থেকে বিরত রাখা এবং ভুলক্রমে কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের প্রতি লক্ষ রাখা তার দায়িত্ব। বিচারের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য তাকে কিছু মানদন্ড (Criteria) এবং উপাদান অনুসরণ করা উচিত। যেমন– কোনো আঘাতের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রধানের নির্দিষ্ট জ্ঞান ও স্বাধীন বিবেচনা প্রয়োগ করা উচিত। কিছু বিষয় যেগুলো দিয়াকে (Diaya) কে আবশ্যক করে না।

সাহিব আল-শুরতা বা পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব হল তার অধিক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতি কোয়ার্টারে (তিন মাস অন্তর) সভার আয়োজন করা। যাতে তিনি যোগ্য ও শালীন কর্মকর্তাদের কার্যক্রম এবং তাদের বিচারের বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। তার অফিসে আগত অভিযোগগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন করণিক (Clerk) বা মুন্সি নিয়োগ করা আবশ্যক। পুলিশ কর্মকতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো একত্রিত করে তার উধর্ক্ষতন কর্তৃপক্ষ আমির বা ইমামের নিকট প্রেরণ করা পুলিশ প্রধানের কর্তব্য। এ রিপোর্ট পেয়ে উধর্ক্ষতন কর্তৃপক্ষ আমির বা ইমাম যাতে প্রতিটি রিপোর্টে দস্তখত দিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন যে, কোনোটির বিষয়ে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, কোনোটির বিষয়ে শাস্তিমূলক হদ কার্যকর এবং কোনোটিতে কারাবরণ ও ছেড়ে দেয়া হবে।

পুলিশ প্রধান এ অভিযোগগুলো এবং উধর্ক্ষতন কর্তৃপক্ষ ইমাম বা আমির কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলো যেমন হদ, কিসাসের বিষয়গুলো তার অফিসে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া তিনি বাদী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি এবং দাবিকেও লিপিবদ্ধ করাবেন। পুলিশ স্টেশনের বৈঠকে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে। 'দিওয়ান আল হুকম'-এর নথিগুলো তিনি লিপিবদ্ধ করাবেন।

---

১. আল-কুরআন, ৫: ৪৫

২. ARSSAN MUSSA RASHID, *THE ROLE OF THE SHURTA IN EARLY ISLAM*, Ibid, pp. 227-231

Dhaka University Institutional Repository

আবক্কাসীয় যুগে মুহতাসিব, পুলিশ, রাজকীয় চিকিৎসক, আস্তাবলের রক্ষকসহ আরও কিছু কর্মকর্তাকে ব্যবহারিক নোটবুক রাখতে হত। পুলিশ স্টেশনেও এরূপ নোটবুকগুলো পরামর্শের জন্য রাখা হত।

আবক্কাসীয় যুগে পুলিশ প্রধানকে বিভিন্ন বই যথা-খলিফা ও শাসকবর্গের ইতিহাস এবং বিভিন্ন সময়ে ঘটমান ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে-The book of brigands গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।[১]

পুলিশ প্রধান অবশ্যই সন্দিগ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং ইতোমধ্যে বিশৃঙ্খলাকারী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিদের ব্যতিরেকে কাউকে তাজির অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবে না। জুয়াড়ি, ইতর, দুর্বৃত্ত, মদ উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা, ব্যভিচারের দালাল, কুটনা ব্যক্তি, পায়ুকামীদের শাস্তি অবশ্যই তাজির অনুযায়ী প্রদান করা হবে। তাদেরকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনা এবং এ ধরনের অপরাধ হতে বিরত থাকার জন্য 'তাজির' প্রয়োগ করা হবে। যদি তারা পুনরায় এ ধরনের অপরাধ করে তবে অবশ্যই তাদেরকে কারাবন্দী করা হবে। কিন্তু যদি তারা অনুশোচনা করে এবং এরূপ অপরাধ না করার নিশ্চয়তা দেয় তবে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।

পুলিশ প্রধান মিথ্যা অভিযোগের উপর ভিত্তি করে কাউকে বন্দি বা গ্রেফতার করবে না যদি না তার প্রতিবেশী কর্তৃক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সন্দিগ্ধ বা দোষী বলে পরিচিত হয়। এ সারসংক্ষেপ পুলিশ প্রধান এবং তার কাতিবের জন্য প্রযোজ্য।[২]

---

১. It is desirable that the chief of police (sahib al-shurta) reads the books and chronicles of kings and learn form the events that occurred to them..... He must frequently consult the work by Adu 'Uthman 'Amir ibn Bahr al-Gahiz, It is distinguished work, describing the various ruses (of brigands) and the best ways to pre-empt them. While there were those who chastised [al-ahiz] for writing this book. https://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/article/view File/138/116, Visited on: 17/11/15

২. ARSSAN MUSSA RASHID, *THE ROLE OF THE SHURTA IN EARLY ISLAM*, Ibid, pp. 234-236

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পুলিশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং ও ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থা
প্রথম পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশ পুলিশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশ একটি অতি প্রাচীন দেশ। প্রাচীনকাল থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভৌগোলিক অঞ্চল বলে তা পরিচিত ছিল। আর এ ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর একটি পৃথক সত্তা অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং বর্তমান বাংলাদেশ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী একটি প্রাচীন দেশ।

সুদীর্ঘ প্রায় দু'শত বছর যাবত ভারতীয় উপ-মহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুসারে পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনিবার্য পরিণতি।[১] বর্তমান স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ[২] এবং এর অধিবাসী বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিস্তৃত জনপদের একটি অংশ মাত্র। এ অঞ্চলের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের কিছু অংশে এবং বার্মার আরাকানে বাংলা ভাষা-ভাষী লোক বাস করে। বর্তমান বিশ্বে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ২১ কোটি।[৩]

বাংলাদেশ পুলিশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১ সালে আমাদের রক্তস্নাত মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে। মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের এই জনযুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনতার সাথে পুলিশবাহিনী একাত্মতা ঘোষণা করে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে পাকসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সদ্য গঠিত রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনী নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। পুলিশবাহিনী মূলত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রধান (Core) প্রতিষ্ঠান। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান।[৪] বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী সংগঠিত ও সুসংগতরূপে বিভিন্ন পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপে উন্নীত হয়েছে। প্রাচীন, মৌর্য, গুপ্ত আমল ও উমাইয়া এবং আবক্ষাসীয় যুগ (ইসলামি যুগ)-সহ দিল্লির সুলতানি আমল, মোগল আমলের বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রম যেমন বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে ঠিক তেমনি আধুনিক ইংরেজ শাসনামলের (ব্রিটিশ পুলিশের) কার্যক্রম ও বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও প্রসার ঘটেছে।

উল্লেখ্য যে, সমুদ্রপথে আরবদের ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছিল একদিকে আবিসিনিয়া অপরদিকে দূরপ্রাচ্যের চীন পর্যন্ত। দূরপ্রাচ্যে গমনাগমনে মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা মালাবারে ছিল তাদের

---

১. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫১
২. বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, পৃ. ২
৩. কে. এম. রইছ উদ্দীন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৬, পৃ. ২২
৪. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On : 3/12/2015

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ঘাঁটি। ভারতবর্ষের সাথে আরবদের যোগসূত্র ছিল যেমন পুরনো, তেমনি সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। মালাবারের উপর দিয়ে আরব বণিকগণ চট্টগ্রাম, সেখান থেকে সিলেট ও কামরূপ হয়ে চীন পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে আরব বণিকদের দ্বারা ইসলামের মহান বাণী আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচার হতে থাকে। মালাবারে বসবাসকারী আরব মুহাজিরগণ হিজরী প্রথম সনে দীন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে থাকেন। স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর বর্ণভেদ প্রথা ও নিম্ন শ্রেণীভুক্তদের সামাজিক অস্পৃশ্যতার পরিবর্তে ইসলামের সাম্য-মৈত্রী ও উদারতার বাণী অনারব, অধিবাসীগণকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। তারা মুসলমানদেরকে বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও মানবিক মুক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করে। মালাবারের চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করায় মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যেও ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। মালিক ইবন দীনার (রা.) পেরুমলের রাজধানী কোড়ঙ্গনূরে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। মালাবারে পর পর দশটি মসজিদ নির্মিত হয়। কোন রকম রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াই ভারতের মালাবার প্রভাবশালী মুসলিম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। এভাবে আরবীয় বণিক মিশনারিদের ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত প্রচেষ্টার কারণে ভারতবর্ষে ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশ ও প্রসার ঘটে এবং ভারতে মুসলমানদের আদি সম্প্রদায়টির গোড়াপত্তন হয়।[১] হযরত উমর (রা.) এর সময় ৬৩৬ খ্রি. প্রথম ভারতের দিকে যুদ্ধ পরিচালনা করলেও সাফল্য পায়নি। হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রি. একটি অভিযান পরিচালনা করেন।[২]

বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এদেশের পুলিশের উত্তরাধিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান পুলিশের আইনগত ভিত্তি ১৮৬১ সনের পুলিশ আইন (পাঁচ আইন Act V of 1861)। মুসলিম শাসনামলে সুবে-বাংলায় যে পুলিশি কাঠামো তৈরি হয়েছিল ইংরেজরা তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেনি। কাজেই এদেশের পুলিশের মূলভিত্তি মুসলিম শাসনামল।

মোগল আমলে সামরিক আভিজাত্য জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল। একে-অপরের পরিপূরক ও সহায়ক এমন অনেক এজেন্সি ছিল আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে, যেমন ফৌজদার, কোতোয়াল, জমিদার, পঞ্চায়েত। অপরাধীকে সনাক্ত করা এবং পাকড়াও করে বিচারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করা ছিল গ্রামপ্রধান, পঞ্চায়েত, স্থানীয় জমিদার, ফৌজদার-কোতোয়ালের অন্যতম দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, জমিদারি সনদে উল্লিখিত শর্ত তালিকায় একটি প্রধান শর্ত ছিল স্ব-স্ব মহলকে অপরাধমুক্ত রাখা। অপরাধ দমনে এবং অপরাধীকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করতে ব্যর্থ হলে জমিদারকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করার বিধান ছিল এবং এজন্য অনেক সময় তার জমিদারি সনদ পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হত। থানার দায়িত্বে ছিল একজন থানাদার। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বরকন্দাজ বা সশস্ত্র সিপাই থাকত থানাদারের নিয়ন্ত্রণে। থানাদারের উপরে ছিল ফৌজদার, যার পূর্ণকালীন কর্তব্য ছিল অপরাধ দমন এবং আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা। শহরের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত ছিল কোতোয়াল। জমিদার, থানাদার, ফৌজদার, কোতোয়াল সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শহুরে ও গ্রামীণ জীবন ছিল নিরাপদ।[৩]

---

১. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১১

২. প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১২

৩. সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, ঢাকা: বাংলা একাডেমী-১৯৮৯, পৃ. ২১৪-২১৫

Dhaka University Institutional Repository

সুবে-বাংলার রাজধানী শহরে একজন মুহতাসিব নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রাজধানীতে অবস্থান করে পুলিশ প্রধানের দায়িত্বপালন করতেন। কে এম রাইছ উদ্দিন তাঁর 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা' বইতে মুহতাসিব সম্বন্ধে লিখেছেন, "মুহতাসিব রাজধানী শহরের লোকদের ধার্মিক চরিত্র ও নৈতিক জীবন তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত হতেন। ধর্মকর্মে জনগণের শৈথিল্য ও নৈতিক জীবনে অধোগতি দেখা দিলে তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। তিনি প্রয়োজনবোধে শাস্তিও প্রদান করতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল সমাজের কলুষতা দূর করে সমাজ জীবনে ধর্মভাব ও নীতিবোধ রক্ষা করা।

শহরের অপরাধ দমন, উদ্ঘাটন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন কোতোয়াল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নগরপালের দায়িত্বপালন করতেন। তার অধীনে ২০-২৫ জন বরকন্দাজ থাকত। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমন, মামলা তদন্ত প্রভৃতি তার দায়িত্ব ছিল। তিনি কিছু কিছু অপরাধের বিচারও করতেন। তিনি শহর এলাকায় বসবাসকারীদের তালিকা তৈরি করে তা সংরক্ষণ করতেন এবং তাদের কার্যকলাপ ও জীবনধারণের বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখতেন। শহরে চোলাই মদ তৈরি, বাজার দর, দোকানদার ওজন ঠিক দিচ্ছে কিনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। বরকন্দাজগণ শহরে টহল দিত এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো পাহারা দিত। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি নাগরিকদের সহযোগিতা নিতেন। শহরকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ওয়ার্ডেন হিসাবে নিয়োগ দেয়া হত। কে এম রাইছ উদ্দিন লিখেছেন, "কোতোয়াল ছিলেন পুলিশ প্রধান। নগরে প্রবেশ করতে হলে কোতোয়ালের অনুমতির প্রয়োজন হত। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্বৃত্ত দমন এবং চোরাইমাল উদ্ধার প্রভৃতি দায়িত্বপালন করতেন। তিনি সুবে-বাংলার সুবেদারকে গুরুত্বপূর্ণ খবরাদি সরবরাহ করতেন।"[১]

মফস্বল বা গ্রাম এলাকার জন্য সুবে-বাংলাকে ১৯টি সরকার বা জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। সরকারের দায়িত্বে ছিলেন একজন ফৌজদার। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। সরকার বা জেলার অধীনে থানা ছিল। থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন থানাদার বা দারোগা। গ্রাম পাহারা দেয়ার জন্য চৌকিদার নিয়োগ করা হত। গ্রামবাসীরা চৌকিদারদের বেতন দিত।

ইংরেজরা তাদের শাসন আমলে পুলিশি কার্যক্রমের নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। প্রথমদিকে পুলিশকে তারা তালুকদারি প্রদান করে এবং বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭২৬ সালে মেয়র আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৭২০ থেকে ১৭৫১ সালের মধ্যে তারা জমিদারদের পুলিশবাহিনী পোষণ ও আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলাকে পরাজিত করে মীর জাফরকে ক্ষমতায় বসালেও মূলত কর্তৃত্ব ইংরেজদের হাতে চলে আসে।

১৭৭২-৭৩ সনে ফোর্ট উইলিয়াম গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ব্রিটিশ বাংলার জন্য এক সার্বিক প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরি করেন। সে রূপরেখায় গুরুত্ব পায় আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন ও পুলিশ ব্যবস্থা। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সচেতন ছিল যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে শাসিত শ্রেণির নিকট গ্রহণযোগ্য করার প্রথম শর্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তা ছাড়া, ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ গ্রাম পর্যন্ত বিস্তার করতে হলেও দরকার ছিল কার্যকর পুলিশ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। মোগল ফৌজদারি পুলিশব্যবস্থা আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে বিলুপ্ত করা হলো।[২]

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি ও ফৌজদারি অপরাধের বিচারের জন্য ইংরেজ জজ নিয়োগ করা হয়। জমিদারকে পুলিশের ক্ষমতা অর্পণ করে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। কর্ণওয়ালিস গভর্নর

১. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল থাকার সময় (১৭৮৬ সাল থেকে ১৭৯৩) দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে পুলিশ কর আদায় করত। ১৭৯৩ সালে বাংলাকে পুলিশি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং জমিদারদের পুলিশের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। ১৮০৫ সালে একজন চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ অফিসারকে জাস্টিস অব পিস ও পুলিশ সুপার (Justice of Peace and Superintendent of Police) নিয়োগ দেয়া হয়। পুলিশ সুপারের অধিক্ষেত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর অধিক্ষেত্রের অনুরূপ ছিল।

বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম সংগঠিত পুলিশবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯২ সনের ডিসেম্বর মাসে ২২ নম্বর রেগুলেশন নামে জারি করেন তাঁর পুলিশ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় তিনি 'জমিদারি পুলিশ ব্যবস্থা' বিলুপ্ত করে পুলিশকে পুরোপুরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। প্রতি জেলাকে কয়েকটি থানায় বিভক্ত করা হয়। প্রতি থানার আয়তন ধরা হয় কমবেশি ৪০০ বর্গমাইল।[১] একজন দারোগা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। চৌকিদারদের দারোগার অধীনে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ অফিসারগণ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতেন। দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করে ইংরেজরা দেওয়ানি গ্রহণ করে অর্থাৎ খাজনা আদায়ের কাজ হাতে নেয়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ খাজনা আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। খাজনা আদায়ে তাঁদের সাহায্য করার জন্য মূলত পুলিশকে ব্যবহার করা হত। এ সময় আইন-শৃঙ্খলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুলিশবাহিনীকে আরও সুসংগঠিত করার চিন্তা করা হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর পুলিশবাহিনীকে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার তাগিদ অনুভব করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৮৬০ সালে কমিশন গঠন করা হয়। পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক ১৮৬১ সালে পুলিশ পাঁচ আইন (Act V of 1861) এর মাধ্যমে পুলিশবাহিনী গঠন করা হয়।[২]

পুলিশ সংস্থা বা পুলিশের কার্যক্রম সভ্যতার মতই প্রাচীন। সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার বিষয়টির উদ্ভব ঘটেছে। আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থার মত তৎকালীন পুলিশি কার্যক্রম এতটা সুসংগঠিত না হলেও সভ্যতার বাহক মানবজাতি কোনো না কোনো ভাবে (Form) নিরাপত্তার বিষয়গুলোর প্রতি অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। প্রাচীন মনুসংহিতায় (Manu Sanhita) তৎকালীন সমাজের আইনশৃঙ্খলার বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে।[৩] প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে জননিরাপত্তায় পুলিশের অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তীকালে তা বিলীন হয়ে যায়। যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে গ্রামগুলোতে স্ব-শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রাম প্রধান জনগণের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ-বিসম্বাদ এর মীমাংসা করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেন এবং বিভিন্ন অনুশাসন জারি করতেন। চন্দ্রগুপ্ত যিনি তার সাম্রাজ্যকে বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর এবং হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে নারবাদা পর্যন্ত বিস্তৃত করছিলেন। যা পরবর্তীকালে আলেকজান্ডারের জেনারেল সেলুকাস কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। তিনি তার সাম্রাজ্যে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করলেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।[৪]

মনুসংহিতায় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের (চতুর্থ শতাব্দী) রাষ্ট্রীয় গোপন পুলিশের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দে গুপ্ত রাজাদের আমলেও গোয়েন্দা পুলিশের অস্তিত্ব ছিল।

---

১. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

২. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৩. Aparna Srivastava, *Rule of Police in a Changing Society*, NewDelhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1999, p. 4

৪. "Chandra Gupta Mauray (320 B.C. to 297 B.C) who attended his empire from the Bay of Bengal to the Arabian Sea and from the Hindukush Mountains to the Narbada and repulsed Alexander's general Saleucus. Set up a successful system of policing in his territory but no detailed account of the system is now available." see. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administraion*, Dhaka: Sumi Printing Press and Packaging, Oct. 2001, p. 10; এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, ঢাকা: জ্বালাময়ী প্রকাশনী, মার্চ-২০১৪, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে সামন্ত কিংবা করদ রাজারাও তাদের নিজস্ব এলাকাসমূহে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য, এমনকি এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা উৎপীড়ন, নিপীড়ন করার জন্য নিজেরাই লাঠিয়াল বাহিনী রাখত যারা প্রয়োজনে অনেকটা পুলিশি কর্তব্য পালন করত। বাংলাদেশে মূলত মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে পুলিশি ব্যবস্থাতেও উন্নতি সাধিত হয়। তেমনি সুলতান নাসিরউদ্দিনের আমলেও রাষ্ট্রীয় পুলিশ ছিল বলে জানা যায়।[১]

প্রাচীন যুগে অপরাধ দমন ও তদন্ত সম্পর্কে এ. এল. বাশাম The Wonder That was India, গ্রন্থে বলেন–

> "Crime was suppressed through the local officers and garrison commanders, who had large staffs of police and soldiers, as well as secret agents who served as detectives. Watchmen kept guard through the night in city and village, and in some medieval kingdoms special officers (duhsadhasadhanika) were deputed to track down and apprehend bandits"[২]

প্রাচীন যুগে পুলিশি ব্যবস্থা: (ক) মৌর্যযুগ (খ) গুপ্ত আমল (গ) পাল ও চন্দ্র যুগের পুলিশি ব্যবস্থা।

ক. মৌর্য আমলে পুলিশ ব্যবস্থা (খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী): মৌর্য যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সুসংহত, সুবিস্তৃত, সুবিন্যস্ত এবং সমকালীন বিশ্বশাসন ব্যবস্থার মধ্যে সাফল্যমণ্ডিত ও সুসংগঠিত ছিল। মৌর্য যুগের বিভাগগুলো হল– ভূক্তি (প্রদেশ), মণ্ডল (বিভাগ), বিষয় (জেলা), বীথি (থানা), বর্গ (ইউনিয়ন)। মহামহত্তর পদবিধারী জনৈক রাজ পুরুষ কেন্দ্রে ও প্রত্যেক প্রদেশে নিয়োজিত হতেন। তার কাজ ছিল রাজ্যে চুরি-ডাকাতি নিরোধ করা, শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা, রাজাদেশ তার অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচার করা। রাজকীয় বিধি-বিধান অমান্যকারীকে শায়েস্তা করা, ছোটখাট প্রজা বিদ্রোহ দমন করা, এবং রাজস্ব বিষয়ক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে সহযোগিতা করা। রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা ও মহা-মহত্তের কাজ ছিল।[৩]

Dharma Sutras and Shastras গ্রন্থের লেখক Vedic Period (2000 to 1400 B.C) খ্রিস্টপূর্ব সময়ে তৎকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা ও সবলদের হাত থেকে দুর্বলদের রক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় Jivagribhs নামে ঋগবেদে এবং Ugras নামে উপনিষদে একজন অফিসারের বর্ণনা পাওয়া যায় যার কার্যকলাপ পুলিশ অফিসারের মতই প্রতিভাত হয়। Epic period (1400 to 800 B.C) রাম যখন নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন পুলিশই রাস্তার ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করেন বলে জানা যায়।[৪]

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত আরো অনেক রাজ পুরুষের কর্তব্য নিরূপণ ও অনুশীলন করে দেখা যায় যে, শান্তি শৃংখলা রক্ষায়– 'বিষয়ে' (জেলায়) আরো একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত হতেন, তিনি হলেন: নাগরিক। 'বিষয়' বা জেলায় প্রধান শহরে ছিল তার কার্যালয়। তিনি শহরের সকল নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করতেন।[৫]

Inside Indian Police গ্রন্থে মৌর্যযুগের প্রশাসনিক সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, All the officials were paid adequate emoluments in cash. However, in some cases, the payment was made, by way of assigning land, or villages. This was the beginning of feudalism. Wherever the land or the villages were assigned to any person, generally the revenue, police and

---

১. এ এসএম সামছুল আরেফিন, মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, ঢাকা: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, জুন-২০১২, পৃ. ১
২. A. L. Basham, *The Wonder That Was India*, Calcutta: Rupa & Co. 1992, p. 116
৩. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭
৪. S.K. Ghosh, *Police Administration*, Calcutta: Eastern Law House, 1st edt., 1973, p. 1
৫. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

administrative functions, were also transferred to him. The criminal offences were dealt with harshly and this indirectly helped to control the crime.[১]

Kautilya's তার Arthashastra অর্থ শাস্ত্রে নজরদারি (সার্ভিলেন্স) সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন মৌর্যযুগে একটি দক্ষ পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব গড়ে উঠে।[২] Dr. R.K Mookerji তার Chandragupta Maurya and his times গ্রন্থে Arthashastra থেকে উদ্ধৃত করে এ সময় ১৮ জন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করেন। এদের মধ্যে Atavika ও Dauvarika রাজপ্রাসাদের বাইরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করত। Antarvansika অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করত। Dandapala, Durgapala, Antapala সামরিক অফিসার হলেও পুলিশের দায়িত্ব পালন করত।[৩] Dandapala পরবর্তীতে পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব পালন করে এবং Durgapala Kotapala রূপান্তরিত হয়। এই Kotapala থেকে পরবর্তীতে katuala (or Kotwal) শব্দের উৎপত্তি হয়।[৪]

The Political Institution & Administration of Northern India During Medieval Time গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

> "The police department may be conveniently considered at this point. Unfortunately the records of our period do not clearly distinguish between the police and military officers. It is likely that Dandanayakas do our period were both military and police officers. Sometimes the military officers did the duty of the police officers and vice versa. They had a number of subordinate officers like Dandapasikas, Chauroddharanikas, Dandikas, Dandasaktis, chatas and Bhatas, who are frequently referred to in our records."[৫]

নিম্নে মৌর্য যুগের কিছু পুলিশ কর্মকর্তার পদবি উল্লেখ করা হল–[৬]

প্রশাসনিক কেন্দ্র	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ভূক্তি (প্রদেশ)	মহা মহত্তর
মণ্ডল (বিভাগ)	মহত্তর
বিষয় (জেলা)	নাগরিক
বীথি (থানা)	স্থানিক
বর্গ (ইউনিয়ন)	দাশবর্গিক

মৌর্যযুগের প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে Ancient India, vol-1 গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সময়ের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষদের ক্ষমতা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। মৌর্যযুগে প্রাদেশিকস্তরের মুখ্যাধিকারিক বা প্রধান নির্বাহী (Chief Exectutive) ছিল

---

১. Joginder Singh, Inside Indian Police, Delhi: Gyan Publishing House-2002, p. 28
২. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ-মার্চ-২০০৯, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫
৩. Aparna Srivastava, *Rule of Police in a Changing Society*, Ibid, p. 5
৪. S.K. Ghosh, *Police Administration*, Ibid, p. 3
৫. Padma B. Udgaonkar, *The Political Institution and Administration of Northern India During Mediveval Times*, New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd.-1969, p. 120
৬. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত 'প্রদেষ্ট' (pradeshtri) এবং কখনও কখনও 'প্রাদেশিক' (pradesika) নামক একজন শীর্ষস্থানীয় অমাত্য বা রাজপুরুষ।[১]

খ. গুপ্ত আমলে পুলিশি ব্যবস্থা:

খ্রিস্টিয় ৩য়-৪র্থ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের করতলগত হয় এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে অপ্রতিহত গুপ্ত শাসন অব্যাহত থাকে। গুপ্ত রাজাদের উপাধি ছিল পরম দৈবত, অর্থাৎ সম্রাট স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি।[২] গুপ্ত আমলে মৌর্য আমলের মতই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে কয়েকটি ভূক্তিতে (প্রদেশ), প্রত্যেকটি ভূক্তি কয়েকটি বিষয়ে (বিভাগ), প্রত্যেকটি বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে (জেলা), প্রত্যেকটি মণ্ডল কয়েকটি বিথিতে, প্রত্যেকটি বীথি (থানা) কয়েকটি কুলে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল একটি কুল। গ্রাম ছিল সর্বনিম্ন দেশ বিভাগ, গ্রামের প্রধান ছিল গ্রামিক।[৩]

গুপ্ত আমলে শিল্প বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে, ফলে জল ও স্থলপথে বণিকদের আগমন অত্যধিক বেড়ে যায়। কৃষিবহুল জনপদের হাট-বাজার এবং রাস্তা-ঘাটগুলোর শান্তি রক্ষা ও চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে দেশি-বিদেশি বণিকদের রক্ষার জন্য বীথির অধীনে অনেকগুলো চৌকি (ফাঁড়ি থানা) নির্মিত হয়। এসময় বাংলাদেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। রাস্তাঘাট হাট- বাজারে দস্যু ও তস্করদের উৎপাত বেড়ে যায়। রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃংখলা জোরদার করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়।

নিম্নে গুপ্তযুগের কিছু পুলিশ কর্মকর্তার পদবি উল্লেখ করা হল–[৪]

প্রশাসনিক কেন্দ্র	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা[৫]
ভূক্তি (প্রদেশ)	মহা প্রতিহার
মণ্ডল (বিভাগ)	প্রতিহার
বিষয় (জেলা)	চৌরদ্বরণিক[৬]
কুল (ইউনিয়ন)	খড়গ গ্রাহ
গ্রাম	(দশজন খড়্গী প্রহরীর নায়ক)

সম্রাট আশোক তাঁর সময়ে Mahamatras ছিলেন প্রদেশের সর্বোচ্চ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তা।[৭] ৭ম শব্দাতীতে King Harsha's সময় হিন্দু রাজনীতিতে দক্ষ পুলিশ বাহিনী ও এর অংশ হিসাবে গোপন সার্ভিলেন্স গড়ে উঠে।[৮]

---

১. Upendra Nath Ghoshal, *Contributions to the History of the Hindu Revenue System*, Sarasat Libraray-1972, p.414
২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৬. Aparna Srivastava, *Rule of Police in a Changing Society*, Ibid, p. 8
৭. Ibid, p. 6
৮. In the 7th century A. D. king Harsha's frined Bana es-pressly repudiated the cynical ruthlessness of Kautilya's treatise, which he called "merciless in its precepts and rich in cruelty." But some form of secret surveillance,

Dhaka University Institutional Repository

গ. পাল ও চন্দ্র আমলে পুলিশি ব্যবস্থা

পাল ও সেন যুগে এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যে বঙ্গের বিভিন্ন জনপদকে সংযুক্ত করা সম্ভব হলেও বঙ্গ জনপদটি তখনও গৌড়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিগণিত হত। কিন্তু তথাপি বঙ্গের বাইরে বাঙ্গালী বলতে গৌড়ের বা গৌড় দেশীয় বুঝাত। পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন জনপদ তার পুরাতন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করে বঙ্গের সঙ্গে একীভূত হয় এবং বঙ্গ বা বাংলা নামে পরিচিত হতে থাকে।[১]

মুসলিম শাসনামলেই বিভিন্ন জনপদকে একত্রিত করার চেষ্টা সফলকাম হয়। বাংলার পাঠান যুগের পূর্ব থেকে পশ্চিম বঙ্গ 'গৌড়' ও পশ্চিমবঙ্গ 'বঙ্গ' এই দু'নামে চিহ্নিত হত। ষোড়শ শতকে মোগল শাসনামল থেকে সমগ্র এলাকা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হয়।[২]

সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পাল ও চন্দ্র আমলে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠে। এ সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র আরো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।[৩]

পাল আমলে মহাসান্ধিবিগ্রহিক শান্তিকালে রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন, আবার যুদ্ধকালীন সময়ে সৈন্যবাহিনীর একটা অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, অন্যদিকে প্রয়োজনবোধে শত্রুপক্ষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এ মহা সান্ধিবিগ্রহিকের অধীনে নিয়োজিত ছিল গুপ্তচর বিভাগ। মোগল আমলে ফৌজদার যেমন সামরিক ব্যক্তি হয়েও বে-সামরিক পুলিশ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতেন, তেমনি পাল আমলের মহাসান্ধিবিগ্রহিকও পুলিশ বাহিনী, স্বরাষ্ট্র ও গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন।[৪]

পাল ও চন্দ্র আমলের প্রশাসনিক কেন্দ্র ও পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তার একটা তালিকা নীচে দেয়া হলো–[৫]

প্রশাসনিক কেন্দ্র	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ভূক্তি (প্রদেশ)	মহা সন্ধিবিগ্রহিক
মণ্ডল (বিভাগ)	সান্ধি বিগ্রহিক
বিষয় (জেলা)	চৌরদ্ধরনিক
দাশগ্রাম (থানা)	খড়ক গ্রাহ

মধ্যযুগে পুলিশি ব্যবস্থাঃ মধ্যযুগে পুলিশি ব্যবস্থাগুলো নিম্নোক্ত পর্যায়ে প্রচলিত ছিল যেমন- (ক) বর্মণও সেন আমলের পুলিশি ব্যবস্থা (খ) দিল্লির সুলতানি আমলের পুলিশি ব্যবস্থা এবং (গ) মোগল আমলের পুলিশি ব্যবস্থা।

ক. বর্মণ ও সেন আমলে পুলিশি ব্যবস্থাঃ

সেন আমলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণরা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ ও সেনাবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় সামন্তবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ যুগে প্রজাদের উপর সামন্তবাদের বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। এ যুগে পুলিশ ও গুপ্ত বিভাগের বিভিন্ন

---

as a part of an efficient police administration, has always existed in the Hindu political system. see. S.K. Ghosh, *Police Administration*, Ibid, p. 3

১. অধ্যাপক কে. আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬, পৃ. ৩
২. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃ. ১২
৩. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়ঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী "The Gupta Empire" গ্রন্থে উল্লেখ করেন অন্তত সেনযুগে 'চৌরোদ্ধরণিকে' ছিলেন কেন্দ্রীয় পুলিশ-প্রধান, অন্তত পুলিশের একজন অত্যন্ত শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক। তিনি একে Inspector–General of Police বলে অভিহিত করেছেন।[১] অন্যদিকে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক হলেও শ্রীরামশরণ শর্মা একে মধ্যযুগীয় 'চৌধুরী' নামীয় ভূস্বামীদের পূর্বসূরী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায়–

"Another officer charged with this duty in the rural areas was the cauroddharanika, the predecessor of the medieval chaudhari who maintained law and order as one of the leading landed magnates"[২]

State and Government in Ancient India গ্রন্থে A. S Altekar বলেন, বস্তুত শুধু আধুনিক বাংলাদেশেই নয়, সারাবিশ্বব্যাপী পুলিশ যে দৈনন্দিন ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড নির্বাহ করে তার সঙ্গে বলাবাহুল্য যে, বর্ণিত 'দ(া)ণ্ডপাশিক' ও 'চৌরোদ্ধরণিক'-এর কাজের চমৎকার মিল রয়েছে; যে-কারণে অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক এদেরকে বিশেষত 'দ(া)ণ্ডপাশিক'-কে জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক (The District Superintendent of Police) বা অন্ততপক্ষে পুলিশ বিভাগীয় কর্মকর্তা বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩]

সেন ও বর্মণ আমলে পুলিশ বিভাগের সাথে বিচার, প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের নিম্নরূপ নামের তালিকা পাওয়া যায়।[৪]

প্রশাসনিক কেন্দ্র	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ভূক্তি (প্রদেশ)	মহাশান্তকিক
মণ্ডল (বিভাগ)	শান্তকিক
খণ্ডল (জেলা)	খণ্ডরক্ষ
অষ্টকুল (থানা)	চৌরোদ্ধরণিক
কুল (ইউনিয়ন)	চাট
গ্রাম	ভাট (কনস্টেবল)

খ. দিল্লির সুলতান আমলে পুলিশি ব্যবস্থা

পারস্য বিজয়ের পর ৭১১ খ্রি. মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ভারত ইসলামি খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলিমরা ভারত অধিকারে আগ্রহী ছিল। কেননা ভারত ছিল একটি প্রাচীন সভ্যতা। এছাড়া ভারতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল।

উত্তর ভারতে কয়েকটি হিন্দু রাজ্য ও ইসলামি খিলাফতের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে উত্তর ভারতে সুলতানি শাসন কায়েম হয়। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সুলতানি শাসন উত্তর ভারতে

১. Radhakumud Mookkerji, *The Gupta Empire*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd. 1973, p. 153
২. R.S Sharan, *Aspects of PoliticalIdeas and Institutions in Ancient India*, New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd. 1971, p. 337
৩. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৪. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারিত হয়। তুর্কি অভিযানের আগে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের সুবাদে দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে মুসলিম বণিক সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠে। ধীরে ধীরে হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে মুসলিমরা শিকড় গড়তে থাকে। পরবর্তীতে বাহমনি সালতানাত ও দাক্ষিণাত্য সালতানাত দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি ও পশতুভাষীরা সাবেক রাজপুত ভূখণ্ড দিল্লিতে মুসলিম সালতানাত কায়েম করে।[১]

৭১২ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসকগণ কর্তৃক সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।[২] উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুফী-সাধকগণ ধর্ম প্রচারার্থে এবং ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন। তাদের সংস্পর্শে বহুসংখ্যক জনতা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। শাসন ব্যবস্থাতেও মুসলিম অনুশাসনের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংগঠন, কর্মধারা ও রীতিনীতির দিক দিয়ে সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থা প্রধানত মুসলিম শাসনব্যবস্থা। তবে এতে ভারতের হিন্দু শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু রীতিনীতি এবং উপাদান-উপকরণেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। শাসনব্যবস্থায় সুলতানের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বাগদাদের আবক্ষাসীয় খলিফার পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলীর অনুকরণ মাত্র। আবক্ষাসীয় খলিফার মত দিল্লির সুলতানও ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মপ্রধান। ইসলাম ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও ইসলামি আইনকানুন প্রয়োগ সুলতানের রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের সংগঠন ও কার্যাবলী, এমনকি প্রশাসনিক দফতরের নাম ও কর্মকর্তাদের উপাধি আবক্ষাসীয় শাসন ব্যবস্থা হতে গৃহীত হয়। বিচার ও সামরিক সংগঠনের কার্যক্রম ও রীতিনীতিতে আবক্ষাসীয় শাসনের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কাযি-আলকুযযাত, কাযি, মুহতাসিব ইতাদি বিচার বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের উপাধি আবক্ষাসীয় শাসনামলে বিচার ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মচারীদের উপাধি আবক্ষাসীয় শাসনামলে বিচার ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মচারীদের উপাধির অনুরূপ।[৩]

১২২৯ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের আবক্ষাসীয় খলিফা আবু জাফর মনসুর আল মুস্তানসির-বিল্লাহর দূত ইলতুৎমিশের জন্য খলিফার স্বীকৃতিপত্র ও সম্মানসূচক পোষাক নিয়ে দিল্লিতে উপস্থিত হন। খলিফার স্বীকৃতি লাভ ভারতে নব প্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতের পক্ষে ছিল এক পরম গৌরবের বিষয়। এর ফলে সালতানাত্ দারউল-ইসলামের (ইসলাম জগত) অংশ এবং সুলতান খলিফার বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হলেন। ইলতুৎমিশ গর্ব সহকারে বলতেন যে খলিফার প্রতিনিধি হওয়া অপেক্ষা বড় সম্মানের পদ আর কিছুই হতে পারে না। তিনি তাঁর মুদ্রিত মুদ্রায় নিজেকে খলিফার সাহায্যকারী (নাসির আমির উল-মুমিনিন) বলে অভিহিত করেন। জনগণ তাঁহাকে সুলতান-ই-আজম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে সম্মান প্রদর্শন করতেন। ইলতুৎমিশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর পরবর্তী সুলতানগণও আবক্ষাসীয় খলিফাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তবে তাঁদের মধ্যে খুব কম সুলতানেরই খলিফার প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি লাভের সৌভাগ্য হয়।

১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণকারী হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধক্ষংস ও শেষ আবক্ষাসীয় খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ নিহত হওয়ার ফলে মুসলিম জগত খলিফাশূন্য হয়।[৪]

---

১. সাহাদত হোসেন খান, *মোগল সাম্রাজ্যের সোনালী অধ্যায়*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ১৩
২. V.D. Mahajan, *History Of Medieval India*, Ibid, p. 35
৩. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪-৫
৪. প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

আবব্বাসীয় খলিফাদের প্রতি দিল্লির সুলতানদের আনুগত্য প্রদর্শনের ফলে আইনত সুলতানদের উপর খলিফাদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ও 'সালতানাত্' বহিঃশক্তি আবব্বাসীয় খিলাফতের অধীনস্থ হয়। ফলে সুলতানগণ খলিফাদের প্রতিনিধি এবং খলিফাগণ সুলতানদের প্রভু হিসেবে স্বীকৃত হন। কিন্তু খলিফাদের প্রতি সুলতানদের আনুগত্য প্রদর্শন ছিল সম্পূর্ণরূপে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। এটা ছিল মুসলিম জগতের একটি চিরাচরিত প্রথার প্রতি বাহ্যিক শ্রদ্ধার প্রকাশ মাত্র। কার্যত দিল্লির সুলতানগণ তাঁদের রাজ্যে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১]

ভারতীয় মুসলিম শাসকগণ তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় উমাইয়া ও আবব্বাসীয় খিলাফতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উমাইয়া ও আবব্বাসীয়দের অনুকরণ ও অনুসরণ করেন।[২]

এ যুগে কোতোয়াল ও মুহতাসিব-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে নিম্নরূপ জানা যায় যে, আরব খিলাফতকালে পুলিশ প্রধান সাহিব আল-শুরতা নামে অভিহিত ছিলেন। কিন্তু দিল্লি সুলতানদের শাসনকালে পুলিশ প্রধানকে কোতোয়াল বলা হত। সর্বপ্রকারের অপরাধমূলক তৎপরতা দমন করে নাগরিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কোতোয়াল ও তাঁর পুলিশ বাহিনীর কর্তব্য। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শহরে কোতোয়াল ও পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত থাকত। কোতোয়াল বেসামরিক কর্মকর্তা হলেও কোনো কোনো লেখক কোতোয়ালকে সামরিক কর্মকর্তা হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। শহরে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কর্তব্য। কোতোয়ালের পুলিশ বাহিনী রাত্রিকালে শহরে পাহারা কাজে নিযুক্ত থাকত এবং রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বজায় রাখত। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কোতোয়াল জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। শহরের প্রত্যেক অঞ্চলে তিনি একজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিকে সে অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করতেন। তিনি শহরের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের নামের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের কার্যকলাপ এবং জীবিকার উপায় সম্বন্ধে অবহিত হতেন। তিনি শহরের প্রত্যেক নবাগত ব্যক্তি ও বিদায়ী ব্যক্তির খোঁজখবর রাখতেন। কোতোয়ালের ক্ষমতা শুধুমাত্র শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ক্ষমতার কার্যকারিতা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রাম অঞ্চলে তিনি গ্রাম প্রধানদের সহযোগিতায় অপরাধ দমনে তৎপর ছিলেন।[৩]

V.D. Mahajan, History Of Medieval India সুলতানি আমলে পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করেন, সুলতানগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। পুলিশের কার্যক্রম কোতোয়াল কর্তৃক সম্পাদিত হত। কোতোয়ালের সদস্যগণ রাত্রিকালীন টহল দিত এবং জনপদকে পাহারা দিত। কোতোয়াল তাঁর দায়িত্ব পালনে জনগণের সহযোগিতা পেতেন। তিনি কোয়ার্টারে বসবাসরত নাগরিক সম্পর্কে রেজিষ্ট্রার রাখতেন ও তাদের জীবনযাত্রা, কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর এবং নতুন আগন্তুকের আগমন ও প্রস্থান লিপিবদ্ধ করতেন। তার অধিক্ষেত্র গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও কাজ করতেন। ফৌজদারি বিধি ও শাস্তি ছিল কঠিন। বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীদেরকে শাস্তিস্বরূপ রাস্তায় ঘোরানো হত। দস্যুদের জীবন ও সম্পত্তি সুলতানের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি দস্যুদের পরিবারকে শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি চালু করেন।[৪]

---

১. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত,৫ম খন্ড, পৃ. ১২-১৩

২. "Under their advice and inspiration the Muslim sovereigns of India took for their model the administrative system of the Abbasid Caliphs of Iraq, the Umayyad Caliphs of Spain, and the Fatimide Caliphs of Egypt. Their judicial machinery was also set up on the same model." see. Wahed Husain, *Administration of Justice During the Muslim Rule in India*, Delhi: reprint, 1977, p. 10

৩. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৯

৪. V.D. Mahajan, *History Of Medieval India*, Ibid, pp. 297-298

Dhaka University Institutional Repository

জনস্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে মুহতাসিব হাটবাজার পরিদর্শন করতেন, ওজন ও মাপ পরীক্ষা করতেন এবং যেসব ব্যবসায়ী ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করত ও ক্রটিপূর্ণ দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করত তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন। সুলতানি আমলে বাজার তত্ত্বাবধানের ভার অবশ্য মুহতাসিব অপেক্ষা নিম্নপদস্থ এক কর্মচারীর (রইস) উপর ন্যস্ত থাকত। রইস উৎপাদনকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করতেন। রইসের দফতর দিওয়ান-ই-রিয়াসত বা আদল নামে অভিহিত ছিল। সালতানাতের প্রারম্ভ হতেই দিওয়ান-ই-রিয়াসত কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাফল্যের পশ্চাতে এই বিভাগের দক্ষতা উলেখযোগ্য। সৈয়দ, লোদি ও শুর শাসনামলেও এই বিভাগ চালু ছিল। আদিলশাহের প্রধান সেনাপতি হিমু এক সময়ে রইসের দায়িত্বপালন করেছিলেন।

দিল্লির সুলতানগণ হিসবাহ ব্যবস্থা কার্যকরীকরণে অত্যন্ত সতর্ক ও তৎপর ছিলেন। সুলতান বলবন উপযুক্ত হিসবাহ ব্যবস্থাকে দক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান শর্ত মনে করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন হিসবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজজীবন থেকে মদ, জুয়া ও অন্যান্য অশালীন কার্যকলাপ দূরীভূত করেন। মুহম্মদ বিন তুগলকও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতার সাথে সমাজজীবন থেকে সমুদয় অশালীন কার্যকলাপ বন্ধ করেন। পর্যটক ইবনে বতুতা মুহাম্মদ বিন তুগলকের রাজদরবারে ধর্মীয় অনুশাসনের কড়াকড়ি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন-তুগলক মাঝে মাঝে স্বয়ং মুহতাসিবের দায়িত্ব পালন করতেন এবং মুসলমানেরা ইসলামের রীতিনীতি মেনে চলত কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতেন ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি মাতালকে আশি বেত্রাঘাত ও তিন মাসের নির্জন কারাবাসের শাস্তি দিতেন। ধর্মপ্রাণ সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক এবং সিকান্দার লোদির আমলেও হিসবাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল।[১]

দক্ষ পুলিশ প্রশাসনের জন্য শেরশাহ এখনো খ্যাতিমান। অপরাধ দমনে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। চুরি-ডাকাতির মতো অপরাধগুলোতে মুকাদ্দামের ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব কঠোর ছিল। অপরাধীকে সনাক্ত করে বিচারের জন্য কাযির নিকট প্রেরণের দায়িত্ব মুকাদ্দামের উপর ন্যস্ত ছিল। পুলিশী কার্যকলাপের হিসাব ও তদারকি করতেন 'মুহতাসিব'।[২]

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার জন্য পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের উন্নয়নে শেরশাহ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। গ্রামে শান্তি রক্ষার ভার তিনি গ্রামের প্রধানের উপর অর্পণ করেন। কোনো দুষ্কৃতিকারী আত্মগোপন করলে এবং তাকে বন্দী করতে না পারলে দুষ্কৃতিকারীর গ্রামের আমিল, শিকদার বা মুকদ্দামকে দায়ী করা হত এবং দুষ্কৃতকারী কর্তৃক যে ক্ষতি হত তা উক্ত প্রধানদের নিকট হতে আদায় করা হত। কোনো হন্তা আত্মগোপন করলে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারী তাকে ধরতে না পারলে আসামির স্থলে উক্ত কর্মচারীর শাস্তি হত। শান্তি রক্ষার জন্য আইন-কানুনের এরূপ কড়াকড়ি ছিল বলে দেশে চুরি ডাকাতি হত না। মুসাফির নির্বিবাদে পথ চলতে পারত এবং বণিকগণ নির্ভয়ে তাদের বাণিজ্যিক দ্রব্য নিয়ে গমনাগমন করতে পারত। কোনো স্থানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সেখানকার সরকারি কর্মচারীসহ সেখানকার প্রধানকে দায়ী করা হতো। ফলে সকলেই শান্তি রক্ষার জন্য চেষ্টা করত ও দুষ্কৃতকারীকে সকলেই ধরে দেওয়ার ব্যবস্থা করত।

---

১. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৩
২. আবদুস সালাম মামুন, *উপ-মহাদেশের আইন ও শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৬, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

শহরে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশবাহিনী নিয়োগ করা হত। পুলিশ প্রধানকে কোতোয়াল বলা হত। পুলিশবাহিনী জনগণসহ সরকারি কর্মচারীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখত। তারা অপরাধ নিবারণ ও দমনের চেষ্টা করত এবং অপরাধীকে ধরে বিচারের জন্য কোর্টে হাজির করত।[১]

কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য সুলতানি আমলের কোতোয়ালের সংগে খিলাফত যুগের আরবীয় শাসন ব্যবস্থার সাহিব আল-শুরতার (পুলিশ বাহিনীর অধিক্ষক) কর্তব্যের মিল লক্ষ্য করে কোতোয়ালকে সুলতানি আমলের পুলিশ প্রধানরূপে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। এখানে স্পষ্টত লক্ষণীয় যে, কোতোয়াল একজন নগর রক্ষক মাত্র । তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বৈধ-সকল কাজকর্মও একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভাগ পরিচালিত হয়। এতে পদমর্যাদা অনুযায়ী কাজের একটা শ্রেণিবিন্যাস ঘটে মাত্র। কিন্তু পুলিশ বিভাগের সকলেরই কর্মধারা প্রায় এক ও অভিন্ন। কোতোয়ালের দায়িত্ব শুধু নগরের নৈশকালীন প্রহরার ব্যবস্থা করা, শহরের চুরি-ডাকাতি বন্ধ করা, শহরের আগন্তুকদের নামের তালিকা প্রণয়ন করা ও তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা, বর্হিগমণকারীদের তালিকাবদ্ধ করা এবং শহরে প্রত্যেক অংশের অধিবাসীদের নাম-ঠিকানা, কর্তব্য কাজের প্রকৃতি ও আয়-ব্যয়ের তালিকা সংরক্ষণ করাও তার কর্তব্যের মধ্যে শামিল। প্রত্যেক মহল্লায় মহল্লায় লোক নিযুক্ত করে অপরাধীদের সনাক্তকরণ ও তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাকে নগর পুলিশ প্রধান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।[২]

দিল্লির সুলতানগণ আরবের খলিফাদের কাছ থেকে খিলাফত গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে খিলাফতের অনুকরণ ও আর্দশ অনুসরণ করেন। সুলতানগণ তাদের রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মদিনায় ইসলামি শাসন কায়েম হওয়ার পর শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন গঠিত হয়। মহানবী (স.) এর ওফাতের পর উমাইয়া বংশের শাসন আমলে ‘আহদাস’ নামক একটা শান্তি কমিটি গঠিত হয়, এ কমিটির অধিনায়কের পদবি ছিল ‘সাহিব আল-আহদাস’। এর কার্যক্রম ছিল অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। পরবর্তী আবক্ষাসীয় বংশের শাসন আমলে গঠিত হয় ‘শুরতা’ নামক অপর একটি প্রতিষ্ঠান, এর অধিনায়কের পদবি ছিল ‘সাহিব আল-শুরতা। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল আইন-কানুন ও শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা।[৩] এ যুগে পুলিশ বিভাগের নিম্নলিখিত প্রশাসনিক বিভিন্ন পদবি সম্পর্কে জানা যায়।[৪]

প্রশাসনিক কেন্দ্র	**পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা**
ইকলি (প্রদেশ)	মুহতাসিব
শিক (বিভাগ)	ফৌজদার
পরগণা (জেলা)	থানাদার
গ্রাম	পাঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদার

১. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩
২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে দিল্লির সালতানাতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি তালিকা এখানে সংযোজিত করা হল–[১]

হল–[১]

প্রশাসনিক কেন্দ্র	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ইকলিম (প্রদেশ)	ফৌজদার
শিকাহ (বিভাগ)	ফৌজদার
আরছা (জেলা)	কোতায়াল
পরগণা (থানা)	দারোগা
মৌজা (ইউনিয়ন)	গ্রাম চৌকিদার

বাংলার স্থানীয় মুসলিম শাসক বা সুলতানেরা, যাদের অনেকেই প্রথমে দিল্লিস্থ কেন্দ্রীয় সুলতানের প্রতিনিধি হয়ে শাসনকার্য শুরু করলেও সময়-সুযোগ বুঝে এরা হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন এবং পরে নিজেরাই স্বাধীনভাবে স্থানীয় শাসন-কাঠামো খাড়া করার চেষ্টা করতেন, যদিও তাতে কেন্দ্রের নিয়ম-নীতি-অবকাঠামোর অনেক কিছুই বিধৃত ও প্রতিফলিত হত। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলার স্থানীয় সুলতানদের প্রাথমিক মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে ঘন ঘন বিদ্রোহ ঘোষণার ফলে এখানে বড়-ছোট যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়শই লেগে থাকত বললে অত্যুক্তি হয় না।[২]

এটি ভারতবর্ষগত মধ্যকালীন বিভিন্ন বিদেশি পরিব্রাজকের দৃষ্টিতেও পড়েছে। যে কারণে এদের কেউ কেউ যেমন ফরাসি পরিব্রাজক ফাঁসোয়া বার্নিয়ের তখনকার বাংলামুলককে ‘যুদ্ধ-বিগ্রহের পীঠস্থান’ (Seat of war) বলতে দ্বিধা করেননি। তিনি অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অবিশ্বাস্য বিশাল আকারের বা বিস্ময়-জাগানিয়া বৃহৎ সেনাবাহিনীর কথাও বলেছেন।[৩] তাঁর এ বক্তব্য আমাদেরকে আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণকালে তৎকালীন দেশ-নগরী ‘প্রাসি’ ‘গঙ্গারিডই’ সমন্বিত বৃহত্তর বাংলার সম্মিলিত সমরশক্তির কথাই নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। যাহোক, বার্নিয়ের বলেন–

> "In Bangle, so frequency the seat of war, the number is much greater and as there is no province which can dispense with a military force, more or less numerous, according to its extent and particular situation, the total amount of troops in Hindustan is almost incredible."[৪]

অন্যদিকে ছিল বাংলার ‘বারো ভূঁইয়া’রা। এঁরাও চেষ্টা করতেন নিজস্ব অধিক্ষেত্রে মনগড়া প্রশাসন চালাতে। ফলে নানা কারণে দিল্লির কেন্দ্রীয় সুলতান ও সম্রাটগণের অধীনে বাংলায় প্রশাসনিক অবকাঠমো গড়ে উঠার কথা থাকলেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তা তেমনটা হয়নি বরং তাতে স্থানীয় রীতি-নীতি ও প্রাচীন প্রথার অনেক কিছুরই মিশেল ঘটেছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদ এবং সেগুলোতে কর্তব্যরতদের পদবি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ করা যায়।

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

তবে এই উভয়পর্বেই গ্রাম্য সমাজ ও গ্রামপ্রশাসন অনেকটা প্রাচীন আদলে কম-বেশি অবিকৃত ছিল ধরে নিয়েও বলতে হবে, সেখানেও মহাকালের অমোঘ নিয়মে ছিটে-ফোঁটা পরিবর্তনের ছাপ পড়েছিল।[১]

দিল্লির সালতানাত আমলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ

নানা প্রতিকূলতা ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা (Criminal Justice System) অবশেষে পাঠান শাসক শেরশাহ-এর সময়ে কার্যকারিতা লাভ করে। সম্রাট আকবরের সময়ে এ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও ফৌজদারি অপরাধ দমনকল্পে মুসলিম শাসকগণ নিরপেক্ষ বিচার, ফৌজদারি শাসন ব্যবস্থার ব্যক্তিগত তদারকি ও দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি কৃত অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। মুসলিম শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ শহর ও রাজধানীর পুলিশ প্রধানকে কোতোয়াল (Kotwal) বলা হত। উপমহাদেশের যেমন– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের শহরের পুলিশ স্টেশন এখনও কোতওয়ালি (Kotwali) থানা হিসেবে পরিচিত।

Criminal Justice System Administration গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে–

> "The chief Police officer in important towns, including the capital of the empire was the Kotwal. The city police stations in the sub-continent Bangladesh, India and Pakistan are still known as Kotwalis."[২]

কোতওয়ালির অধীনে বরকন্দাজ, ফৌজদার ও থানাদার কর্মকর্তাবৃন্দ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করতেন। দিল্লির কোতোয়াল সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং প্রাদেশিক কোতোয়ালগণও কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। ছোট ছোট শহরের কোতোয়াল সুবেদার অথবা নাজিম কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তিনি রাত্রিকালীন টহল, জনপথের পাহারা, অপরাধের তদন্ত ও অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করতেন। এ বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট একটি রেজিষ্ট্রারও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। যাতে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের কার্যকলাপ, উপার্জনের উপায় এবং নতুন আগন্তুকের আগমন ও প্রস্থানের বিবরণ থাকতো। এছাড়া তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও কাজ করতেন। Criminal Justice System Administration গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরও উল্লেখ আছে–

> "His force patrolled the city at night and guarded the thorough-fares, he prevented crime and investigated and reported offences. He maintained a register of local inhabitants kept himself informed of their activities and means of livelihood and took notice of every new arrival and departure. He also acted as: committing Magistrate."[৩]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর বাংলা অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থাও দিল্লির অনুকরণে গঠিত হয়েছিল এবং পুলিশ ব্যবস্থাও দিল্লির ধাঁচে বিন্যস্ত ছিল। এম, আর, তরফদার তার হোসেন শাহি বেঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইলিয়াস শাহির শাসন আমলে ক্রিমিনাল কোর্টকে বলা

---

১. Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire,* Translated by Archibald Constable, revised by V.A. Smith, Calcutta: Low Price Publications, 1989, p. 219

২. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration*, Ibid, p. 11

৩. Ibid, p. 12

Dhaka University Institutional Repository

হত– দিওয়ান-ই-কোতোয়ালি ২, ক্রিমিনাল কোর্টেও বিচারকের পদবি ছিল 'মুনসিফ-ই-দিওয়ান-ই-কোতোয়ালি' আর প্রধান কোতোয়াল বা চীপ পুলিশ অফিসারের পদবি ছিল–কোতোয়াল-ই-বাকালি।[১]

প্রাদেশিক রাজধানী ও বড় বড় শহরগুলোয় কোতায়াল-ই-বাকালির অধীনে অন্যান্য পদের কয়েকজন কোতোয়াল (পুলিশ অফিসার) নিয়োজিত ছিল যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব পালন করত। দিওয়ান-ই-কোতয়ালিতে নিযুক্ত কোতায়ালকে বলা হত দিওয়ান-ই-কোতোয়াল বা কোর্ট পুলিশ অফিসার। তিনি আসামি বা অপরাধীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আদালতে পাঠ করে শুনাতেন। আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা এবং আদালতের রায় কার্যকরী করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। শাহি দরবারে যিনি পুলিশ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন, তাকে বলা হত– শাহি কোতোয়াল।[২]

শেরশাহ এর সময় দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে পুলিশ প্রশাসনও গড়ে উঠে। পরগনায় শিকদার এবং আমিন আইন শৃঙ্খলার দেখাশোনা করতেন এবং একই সাথে স্থানীয় সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। শহর এলাকার পুলিশ প্রধান ছিলেন কোতোয়াল। তিনি শুধু আইন-শৃঙ্খলার দেখাশোনা করতেন না বরং জনগণের নৈতিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করতেন।

খিলজি বংশের সময়েও কোতোয়াল আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অনেকটা কেন্দ্রে খলিফার Shahibi-Shurth এর মতই ছিলেন। মোগল যুগে প্রচলিত গ্রাম পুলিশ ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রাদেশিক শাসন Subahdar এবং তার অধীনে Foujdaris ব্যবস্থা চালু ছিল। পুলিশ দায়িত্বের জন্য Thanadar ছিল। তারা সামরিক কর্মকর্তা হলেও kotwal ছিল পুলিশ প্রধান এবং তার দায়িত্ব ছিল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাত্রিকালীন পাহারা, ও জন সম্মুখে পকেটমারদের উপর নজরদারি রাখা, জেলখানায় কয়েদিদের দেখাশুনা এবং দোষীদের শাস্তি প্রদান করা।[৩]

History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra, গ্রন্থে ঐতিহাসিক আবদুল হালিম বলেন–

> "The Metropolitan Police was under the Shahna or the Kotwal and almost every town in the kingdom had one… His chief function was to maintain peace and tranquility in the city by preventing theft, robbery and breach of the law in the municipal area; investigate crime or procure the arrest of a criminal evading justice. These things he did through secret reports gathered from his spies and subordinates, and himself parading the streets of the city during late hours of the night and arresting criminals and suspects and keeping a close watch on every new arrival into the city. It was also his duty to release prisoners who were innocent and bring the guilty before the court of the criminal law (Qazi), to keep political prisoners in custody and execute the sentence of death passed by the king or the Qazi."[৪]

সরকার নামক প্রশাসনযন্ত্রে নায়েব বা নায়েব-ই-সুলতান ও কোতোয়াল ছিল আজকের হিসাবে যথাক্রমে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোতোয়াল ছিল মূলত শহর বা নগর পুলিশ-প্রধান এবং স্থান বিশেষে নিযুক্ত কোতোয়ালের মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্ভর করত অনেকটা তার পদায়ন বা পোষ্টিং কোথায় হচ্ছে, তার ওপর। রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগরীতে নিযুক্ত কোতোয়ালেরা কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী ও অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলোর

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
৩. S.K. Ghosh, *Police Administration*, Ibid, p. 5-6
৪. Abdul Halim, *History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra*, University of Dacca, 1961, pp. 238-239

Dhaka University Institutional Repository

কোতোয়ালদের চেয়ে স্বভাবতই অধিক মর্যাদায় ও সম্মানে অভিষিক্ত হত, কেননা সম্রাট বা স্থানীয় শাসনকর্তা তথা নায়েব-সুবেদারদের সঙ্গে তাদের নিত্য উঠা-বসা হত বা থাকত। জিয়াউদ্দিন বারানির 'তারিখ-ই ফিরোজশাহি' সূত্রে জানা যায়, সুলতানিযুগে এমনও দেখা গেছে অনেক বিশ্বস্ত কোতোয়ালকে (এরা অবশ্য এমনিতেই উচ্চ পর্যায়ের 'আমির' ছিল) সুলতানেরা রাজধানীতে তাঁদের সাময়িক অনুপস্থিতি বা অবর্তমানে সামগ্রিক প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পর্যন্ত দিয়েছেন[১] ইউসুফ আলী খানের তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহবক্ষত জঙ্গি সূত্রে আবদুস সোবহান বলেছেন–

> "Faujdari was the office of the magistrate or head of police or judge of criminal court. Faujdar was an officer of the Moghul government who was invested with the charge of the police and all criminal matters were within his jurisdiction."[২]

Mullah Abdul-Hamid Lahori, তার Badshah Nama গ্রন্থে উল্লেখ করেন, প্রত্যেক ফৌজদার তার অধীনে ন্যস্ত পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং থানাদারদের সহায়তায় সম্ভাব্য অপরাধের খোঁজখবর রাখত অর্থাৎ কোথাও কোনো অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা থাকলে বিভিন্ন গোপন তৎপরতায় তাকে তা আগে-ভাগে চিহ্নিত বা উদঘাটনের চেষ্টা এবং বিদ্রোহীদের দমন করতে হতো।[৩]

প্রাচীন কাল হতেই ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রাম প্রধানগণ পুলিশি দায়িত্ব পালন করতেন। মোগল আমলেও উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল এবং গ্রাম প্রধানগণ তাঁদের সহকারীর সাহায্যে গ্রামের শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতেন। এই প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সার্থকভাবে বলবৎ ছিল। ফলে চুরি, ডাকাতি এবং রাহাজানি কদাচিৎ সংঘটিত হত এবং অপরাধী কোনোক্রমেই রক্ষা পেত না। আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ করেছেন যে শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়াল নামক পুলিশ অফিসারের উপর। কোতোয়ালের দায়িত্ব ছিল চোর ধরা, বাজার মূল্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, রাত্রিকালে নগর পাহারা দেয়া, গৃহ, রাস্তাঘাট নাগরিক, আগন্তুক ও পর্যটকদের হিসাব সংরক্ষণ করা, আগন্তুকদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা, গোয়েন্দা নিযুক্ত করা, বিভিন্ন লোকের আয়-ব্যয়ের গোপন হিসাব সংরক্ষণ করা, উত্তরাধিকার বিহীন মৃতব্যক্তিদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করা ও তার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো হিন্দু মহিলাকে মৃত স্বামীর সাথে দাহ থেকে রক্ষা করা। সরকারের ফৌজদার নামক যে সামরিক অফিসার থাকতেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর তাঁরও কার্যকরী ভূমিকা ছিল। বিদ্রোহী ও দলবদ্ধ দস্যুদের তিনি দমন করতেন। রাজস্ব অফিসার, বড় বড় অপরাধীবৃন্দ এবং ফৌজদারি বিচারক ফৌজদারকে খুব ভয় করে চলত।[৪]

Administration of Justice During the Muslim Rule in India উল্লেখ আছে যে–

> "The Kotwal of the city, or of a district town, or of a parganah resembles the Commissioner of police of the Presidency town, or the Superintendent of Police of a district. The Kotwal investigated the cases of offence and sent up the offenders for trial, just as the police officers do in our time. The former was responsible for peace and tranquility like the latter."[৫]

---

১. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩
২. Yusuf Ali Kha, Trans. Abdus Subhan, The Tarikh-I-Mahabatjangi, Calcutta: The Asiatic Society, 1982, p. 4
৩. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৪. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
৫. Wahed Husain, *Administration of Justice During the Muslim Rule in India*, Ibid, p. 101

Dhaka University Institutional Repository

মোগল আমলে পুলিশ ব্যবস্থাকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। মফস্বল পুলিশ ব্যবস্থা ও নগর পুলিশ ব্যবস্থা। নগরগুলোতে সাধারণত রাজ পুরুষ, অভিজাত শ্রেণি এবং ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শ্রেণির অধিবাস ছিল, যার জন্য প্রত্যেকটি নগর ও বন্দরে একজন কোতোয়ালের অধীনে একটি সুবিন্যস্ত পুলিশ বাহিনী কর্তৃক জোরালো নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আন্তর্জাতিক নদী ও সমুদ্র বন্দরগুলোর জন্যও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মোগল আমলে দক্ষিণ ভারতের বন্দর নগরী সুরাটে আলাদাভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সহ পুলিশ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেও মোগল যুগের অনেক গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরীর বিবরণ অনুসারে দেখা য়ায় যে, কোতোয়ালের কার্য পরিধি শুধুমাত্র নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে কোনো অভিযুক্ত আসামি মফস্বল অঞ্চলে আত্মগোপন করলে কোতোয়াল তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করতে পারতেন। মফস্বল এলাকায় শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল স্থানীয় ফৌজদার ও গ্রাম-পাঞ্চায়েতের উপর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোতোয়াল হল নগর পুলিশের প্রধান। কারণ তার কর্তব্য তালিকার সমস্ত কাজকর্মই শহরের নিরাপত্তা ও শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য নিদিষ্ট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১]

মোগল আমলে মুহতাসিব ছিলেন জনসাধারণের নৈতিকচরিত্রের তত্ত্বাবধায়ক। ইসলামি আইন-কানুন, আহকাম-আরকান যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা ছিল মুহতাসিবের কার্য। তিনি অনৈসলামিক কার্যকলাপ, জুয়া বা মদ্যপান ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যত্নবান ছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে ঘটনাস্থলে বিচারের ক্ষমতা রাখতেন। তাছাড়া বাজার পরিদর্শন, বাজারদর তদারক, খাদ্যে ভেজাল বা ওজনে কম ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি তদন্ত করতেন এবং অপরাধ অনুসারে বিচার করতেন।

কাযি ও মুহতাসিবের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে কাযির দরবারে মোকদ্দমা দায়ের হলে তবেই তিনি উভয়পক্ষের জবানী শুনে বিচার করতেন। কিন্তু মুহতাসিব হাতে-নাতে দোষী ব্যক্তি ধরে ঘটনাস্থলে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখতেন। (মুহতাসিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সুলতানদের শাসন ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[২]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে পৌর এলাকায় সচরাচর সংঘটিত গণউৎপাতমূলক কিছু অপরাধ নিরোধের জন্য মুহ্তাসিবকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়ে যে 'ফরমান' জারি হয়েছিল, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্বৃত হল। যেমন তাদেরকে বলা হয়েছিল–

> "In the bazars and lanes observe if any one, contrary to the regulations and customers, has screened off (abru) a part of the street, or closed the path, or thrown dirt and sweepings on the road, -- or if any one has seized the portion of the bazar area reserved for public traffic and opened his shops there; you should in such cases urge them to remove the violation of regulations."[৩]

মোগল শাসকগণ ফৌজদারি প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা অপরাধ দমন ও দ্রুত প্রতিকারের উপর জোর দেন। জনগণের আস্থা ও সম্মান-সমীহ অর্জনের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ শহর ও রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য কোতোয়াল নিয়োগ করা হয়।

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৩. Sir Jadunath Sarker, *Mughal Administration,* Calcutta: Sarkar & Sons Ltd. 1935, p. 31

Dhaka University Institutional Repository

জেলায় কোতোয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মুহতাসিব ও মিউনিসিপ্যাল প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। কোতোয়াল সাধারণত উচ্চ বেতনভূক্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরুর পিতৃব্য গঙ্গাধর নেহেরু ১৮৫৭ সালের পূর্বে কিছু সময়ের জন্য দিল্লির কোতোয়াল ছিলেন।[১]

থানা ও থানাদার : মধ্যযুগে বিশেষত মোগল ও নবাবি আমলে প্রতিটি 'পরগনা'-কে আবার একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে এবং পুলিশ চৌকিতে বিভক্ত করা হয়েছিল; এগুলো মূলত বহু সংখ্যক গ্রাম সমবায়ে গড়ে উঠেছিল। এজাতীয় এককগুলোকে বলা হত 'থানা'। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, মধ্যযুগের প্রায় শুরু থেকে এবং পরবর্তীকালেও বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক ও দরবারি লেখকদের রচনায় 'থানা' (Thana) এর উল্লেখ লক্ষ করা যায়। যেমন খাজা নিজামউদ্দিন আহমদ রচিত তবকাত-ই-আকবরি গ্রন্থে আছে 'লখনৌতি' (লক্ষ্মণাবতী)-র একটি 'থানা'র কথা। 'থানা' ছিল মূলত পরিখা, প্রাচীর, কামান ইত্যাদি দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গ বা 'fortified base'। থানার জন্য যে কর্মকর্তা নিযুক্ত হত, তার পদবি হতো থানার সঙ্গে ফারসি 'দার' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে 'থানাদার'। থানাদারকে অবিভক্ত বাংলার 'সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ' (Sub Inspector of Police) এবং বাংলাদেশের বর্তমান পদোন্নয়ন অনুযায়ী 'ইন্সপেক্টর' (Inspector) বলা যায়। থানা ছাড়াও ছিল ছোট ছোট পুলিশ বা আধা-সামরিক 'চৌকি'।[২]

আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল প্রত্যেক কোতোয়ালের জন্য জরুরি চারিত্রিক দৃঢ়তা, অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি গুণের যে তালিকা দিয়েছেন, তা প্রাসঙ্গিক বিধায়, তা এখানে উদ্ধৃত করা হল–

"The Kotwal. The appropriate person for this post should be vigorous, experienced, active, deliberate, patience, astute and humane. Through his watchfulness and night patrolling the citizens should enjoy the repose of security, and the evil-disposed lie in the slough of non-existence."[৩]

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে স্বভাবতই ধারণা করা যায়, এ পদটি সৃষ্টির পিছনে সম্রাটের সদিচ্ছা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তথা রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাংলার সুলতানদের বিভিন্ন লিপি-অনুশাসনে (Inscriptions) 'কোতোয়ালি দরজা' (Kotwali Gate) এর উল্লেখ থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রতিটি শহরে বিশেষ করে রাজধানী নগরে ও গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রবেশ বা আসা-যাওয়ার পথের প্রধান প্রধান ফটকগুলোতে একজাতীয় চেকপোষ্ট (Check Post) ছিল বা থাকত, যেখানে স্বয়ং কোতোয়াল এবং তার অধীনে নিযুক্ত সাধারণ সিপাহিরা আগন্তুকদের দেহ-তল্লাশি করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিত।[৪]

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে কোতোয়ালদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হলো[৫]

১। নিজস্ব অধিক্ষেত্রকে ছোট ছোট বহুসংখ্যক ভাগে (থানা?) বিভক্ত করে প্রতিটির দেখ-ভালের জন্য একজন বিশ্বস্ত অধস্তনকে দায়িত্ব দেয়া; যার কাজ হবে তার নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতিদিন বাইরে থেকে আসা-যাওয়াকারীদের নাম-পরিচয় এবং বিশেষ ঘটনা তাকে (কোতোয়াল) লিখিতভাবে জানানোর ব্যবস্থা করা।

---

১. "In the district, the kotwal performed the duty of a Magistrate, a Prefect of police and a Municipal Chief. The Kotwal was a highly paid respectable person of loyal households. Gangadhar Nehru, paternal grandfather of Pundit Jawaharlala Nehru, was the Kotwal of Delhi for sometime before 1857." see. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Ibid, p. 18

২. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; Jamshid H. Bilimoria, *Ruka' at-Alamgiri or Letters of Aurangzebe*, Delhi: Idarah-I-Adabiyat, 1972, p. 57

৩. Abul Fazl, Trans. By Colonel H.S. Jarrett, *The Ain-I-Akbari*, ...: Oriental Books Reprint Corporation, reprint, 1978, vol. II, p. 43

৪. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

২। অখ্যাত বাসিন্দাদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিয়ে নিজের 'চর' (spy) নিযুক্ত করা এবং তাদের কাছ থেকেই একজনের অজ্ঞাতসারে অন্যজনের সম্পর্কে ও অন্যান্য তথ্য হাসিল করা।

৩। সরাইখানা এবং সেখানে আগত ও রাত্রি যাপনকারীদের বিষয়ে গোপন অনুসন্ধানের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেয়া।

৪। শহরের প্রবেশপথে ফটক তৈরী এবং সন্ধ্যা নামার পরে রাত্রি গভীর হতে শুরু করলে শহরের মধ্যে নতুন কাউকে ঢুকতে ও শহর থেকে বের হতে নিবৃত করা।

৫। চোরকে ধরা ও চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করা। আর এ কাজে ব্যর্থ হলে ক্ষতিগ্রস্তকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকা।

৬। মুদ্রা জালিয়াতি নিরোধ এবং হাট-বাজারের বাটখারার ওজন ও গজের মাপ পরীক্ষা করা এবং ওজনে কারচুপি ও মুদ্রা জাল নিরোধে ভূমিকা রাখা।[১]

৭। ধর্মোন্মত্ত, গোঁড়া গোষ্ঠী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের (Religious enthusiasts, calenders, and dishonest tradesmen)-কে তাদের পথ থেকে ফিরে আসতে তথা শোধরাতে বলা; আর এতে অস্বীকৃত হলে, তাদেরকে বহিস্কার করা (expel)। তবে এ ব্যাপারে কোনো প্রকৃত খোদাভীরু সাধু (God-fearing recluse) যাতে করে লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত (molest) না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা।

৮। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দু বিধবাদের অগ্নিতে আত্মাহুতিতে বাধা দান। যদুনাথ সরকার অবশ্য এ সমস্ত কর্মকাণ্ডকে আদর্শ কর্তব্য বলেছেন। মনুচ্চী তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কোতোয়ালের কর্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কোতোয়ালের উপর শহরে দুর্গাধিপতি বা 'ফৌজদার' নিযুক্ত হতেন, যার সঠিক দায়িত্ব ছিল আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।[২]

এছাড়া সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণী ও বিভিন্ন সূত্র থেকে নিম্নলিখিত দায়িত্বের বিষয়ে জানা যায়:

(১) দুশ্চরিত্রের লোকদের তথা সম্ভাব্য অপরাধ সংঘটনকারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজরদারি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি স্থাপন। (২) চোর-ডাকাত ও দস্যুদের ধরে আইনের অধীনে নিয়ে আসা। (৩) রাত্রিকালে নগরীতে গোপনে পরিভ্রমণ। (৪) ঐ সরকারি রাস্তার নিয়মিত প্রহরা, যৌনকর্মীদের নিরোধ এবং অগ্নিনির্বাপন। (৫) অসাধু ব্যক্তিরা যাতে নিরীহ জনসাধারণকে কোনোভাবে প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে না পারে সেদিকে নজর রাখা। (৬) সরকারি খাজাঞ্চিখানা বা কোষাগারের প্রহরা।[৩]

Joannes De Laet তার The Empire of the Great Mugal গ্রন্থে বলেন, কোতোয়ালরাও শুধু নগর ও শহর পুলিশ-প্রধানের কাজ করত না, এরা রাজকীয় প্রাসাদ, দুর্গ ও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভবনাদিরও দেখভাল করত। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গের একদা অন্যতম সদস্য ও লাতিন পরিব্রাজক জোয়ান দা লায়েটও তদীয় ভ্রমণপঞ্জিতে প্রাসাদ-রক্ষক কোতওয়াল ও অন্যদের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়–

১. Aparna Srivastava, *Rule of Police in a Changing Society*, Ibid, p. 10
২. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
৩. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

"There is also a Governor of the Palace called the Cutwall. There are similar officers also in all the chief cities and towns, who perform the duties of city-governors."[১]

রাজধানী শহর ও শহরতলী এলাকায় পুলিশি কর্তব্য পালন করতেন কোতোয়ালধারী একজন রাজ কর্মচারী, তাকে সাহায্য করার জন্য দারোগা ও নিম্নপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা ছিল। এরা হলেন: (১) কোতোয়াল (২) দারোগা (৩) জমাদার (৪) হাবিলদার (৫) নায়েক (৬) সওয়াল ও বরকন্দাজ বাহিনী (কনস্টেবলগণ)।

এছাড়া মোগল আমলে পুলিশের যে সব পদবির পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:[২]

নগর পুলিশ কর্মকর্তা কোতোয়াল অধীনস্থ কর্মচারী:	ফৌজদারের অধীন থানার লোকবল:
১। দারোগা।	১। থানাদার।
২। জমাদার।	২। জমাদার।
৩। হাবিলদার (প্রসাদরক্ষী)।	৩। দফাদার।
৪। নায়ক।	৪। হাবিলদার।
৫। জানদার (দেহরক্ষী)।	৫। নায়ক।
৬। সিলাহদার (বর্মরক্ষী)।	৬। সওয়ার, বরকন্দাজ, পাইক।
৭। জল্লাদ (মৃত্যুদণ্ড কার্যকরণকারী)।	৭। পেয়াদা (পিয়ন)
৮। পাইক/বরকন্দাজ (কনস্টেবল)	
৯। পেয়াদা (পিয়ন)	

মোগল শাসনামলে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করত কোতায়াল পুলিশ। কোতোয়ালের অধীনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বরকন্দাজ, ফৌজদার ও থানাদার নামক কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত ছিল।[৩]

মোগল আমলের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুলিশের ভূমিকা

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রদর্শিত পথে মানবাধিকার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সু-শাসনের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে। এর মাধ্যমে নৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইসলামিক শাসন ব্যবস্থায় মানবাধিকারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সামাজিক অনাচার ও অবিচার দূর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় প্রশাসনে মুসলিমদের প্রভাব খুব একটি পরিলক্ষিত হয়নি। মোহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযানের পর কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনের যাত্রা শুরু হয়। দাস বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন বলবন দস্যুতা ও অপরাধ দমনের জন্য নিষ্ঠুর শাস্তির প্রথা শুরু করেন। তুঘলক শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ঘুষ দাতাদের শাস্তি প্রদান করেন।

---

১. Joannes De Laet, Translated by J.S Hoyland, *The Empire of the Great Mugal*, Orintal Books Corporation, 1978, p. 94

২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩. "In Dacca which was the city of the provincial Government for quite a long time the Kotwal though his administration was harsh sometimes, maintained public peace effectively. The Kotwals maintained a force of sowers and Barkandazes. The Faujdars who were appointed in every sarkar performed semi military functions with a contingent of horse-men and Barkandazes under his command. He was responsible for controlling crime in the rural areas. He had under him a numder of Thanadars, in-charge of smaller areas into which sarkars and parganas were divided for better policing." see. A.B.M.G. Kibria, *Police Administration in Bangladesh,* Dacca: Khosroz Kitab Mahal, 1st edt., 1976, p. 4

Dhaka University Institutional Repository

শেরশাহ্ এর সময় বিখ্যাত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের যাত্রীদের নিরাপত্তা ও ডাকবিভাগের কর্মচারী ও তাদের অশ্বগুলোর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পুলিশ নিয়োগ করেন। তিনি সিভিল ও ফৌজদারি আইনের সংস্কার করেন এবং পুলিশ বাহিনীর জন্য নীতিমালা তৈরি করেন। গ্রাম্য কাউন্সিল প্রধান তার অধীনস্ত এলাকায় চুরি ও দস্যুতা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। কোনো কারণে অপরাধীকে ধরতে ব্যর্থ হলে বা তার সন্ধান না পেলে তাকে ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। আইন ভঙ্গ করে বড় বড় অপরাধের অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য একজন জেলা প্রধান নিয়োগ করা হত। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক সরকারি অর্থ আত্মসাৎ সহ তাদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য একজন মুন্সেফ নিয়োগ করা হয়। আর গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন-শহর ও নগরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোতোয়াল নিয়োগ করা হয়। এ সময় অমুসলিম কর্তৃক সংঘটিত বিবাদের বিচার তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও ধর্মযাজক কর্তৃক সম্পাদিত হত। রাষ্ট্র শুধু আইন-শৃঙ্খলার জন্য হুমকিস্বরূপ বিষয়গুলোর লক্ষ্য রাখত।[১]

এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব শুধু সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল না। জনগণকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হতো। আর পুলিশকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হত।

ইসলামি আইন অনুসারে অপরাধ তিন প্রকারের। সেগুলি হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধে অপরাধ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ। অপরাধের তারতম্য অনুসারে বিচার ও শাস্তির বিধানও রয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব হিসেবে শাস্তিকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সেগুলি হচ্ছে হদ, তাযির, কিসাস এবং তাশহির।

(১) হদ্: নিম্নতালিকাভুক্ত অপরাধসমুহ হদ্ এর আওতাভুক্ত ছিল এবং এদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তিদানের বিধান ছিল।[২]

অপরাধ	শাস্তি
ক. বলাৎকার/ব্যাভিচার	রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু
খ. অবিবাহিত নর-নরীর ব্যভিচার	১০০ দোররা
গ. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ	৯০ দোররা
ঘ. মদ্যপান	৮০ দোররা
ঙ. চুরি	দক্ষিণ হস্ত কর্তন
চ. রাহাজানি	হস্ত ও পদদ্বয় কর্তন
ছ. হত্যা করে ডাকাতি	তলোয়ার দ্বারা হত্যা বা শুলবিদ্ধ করে হত্য
জ. ইসলামধর্ম ত্যাগী	হত্যা

(২) তাযির: হদের বহির্ভূত অপরাধ তাযির শ্রেণিভুক্ত। এই অপরাধের জন্য বিচারক স্বীয় মতামত প্রয়োগ করতে পারতেন। এই শ্রেণির অপরাধের শাস্তির উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে সংশোধন করা। কাজেই তাযির শ্রেণিভুক্ত অপরাধের জন্য অপরাধীকে কোর্টে তোলা হত, সাধারণভাবে ভৎর্সনা করা

---

১. "During the rule of Sher Shah, police controlled the grand trunk roads to facilitate safe travels and provide security to postal runners and their horses. He drew up a digest of civil and criminal laws and introduced police regulation. The village Council Head was responsible for prevention of theft and robbery, and in case of failure to trace out the criminals he was made to compensate the loss sustained by the victim. A District Head was appointed to inflict heavy punishment on the lawless, and a Munsif to watch the conduct of officials in respect of embezzlement of revenue. Kotwal was appointed in important places to maintain law and order and do a lot of other jobs. The settlement of disputes among non-Muslims was left to their own elders and priests; the ruler interfered only when the situation threatened law and order." see. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Ibid, p. 17

২. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

হত, কারারুদ্ধ বা নির্বাসন দেয়া হত। ৩ হতে ৭৫ দোররা মারা হত, কর্ণে ঘুষি মারা হত বা জরিমানা হত।

(৩) কিসাস: এই শ্রেণির অপরাধের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা হত। অন্যথায় বিচারের জন্য কাযীর দরবারে মোকদ্দামা করা হত। হত্যা কিংবা গুরুতর আঘাত করা হাক্কুল ইবাদ বা মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা। এর জন্য দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ দিয়া বিবাদীকে সম্মত করতে পারলে সরকারের আর কোনো দায়িত্ব থাকত না। কারণ উক্ত অপরাধের শাস্তি প্রতিশোধ। বিবাদী ও বাদী নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হলে তবেই কাযী উক্ত মোকদ্দমা শুনানী করতেন এবং জীবনের জন্য জীবন, হস্তের জন্য হস্ত ও চক্ষুর জন্য চক্ষুনীতিতে বিচারের রায় প্রদান করতেন।[১]

(৪) তাশহির : অপরাধীকে তাশহির বা সমাজে নিন্দা করা এই শ্রেণির অপরাধের শাস্তি ছিল। এই অপরাধের শাস্তি হিসাবে সাধারণ অপরাধীর মস্তক মুণ্ডন করা হত, তাকে জুতার মালা পরান হত, কখনও বা তার মুখে কালি লেপন করা হত ও লেজমুখী করে অশ্বে আরোহণ করিয়ে সদর রাজপথ বেয়ে কোলাহলের মধ্যে নগর হতে বের করে দেয়া হত।[২]

সাধারণত হত্যা করে দস্যুবৃত্তি, হত্যা (মৃতব্যক্তির ওয়ারিশগণ বাদী হলে), বলাৎকার, ইসলাম ধর্মদ্রোহিতা, রসুলুল্লাহ (স.) নিন্দা প্রভৃতি অপরাধের জন্য শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ড কার্যকর হত।

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ও অন্যান্য ছোটখাট অপরাধের জন্য হাজত দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সরকারি তহবিল আত্মসাৎ, নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ে গাফলতি প্রভৃতি অপরাধের জন্য ইসলামে কোনো নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান না থাকায় সম্রাট ইচ্ছামত শাস্তি প্রদান করতে পারতেন।

সম্রাট আকবরের আমলে গুরুতর অপরাধের বিচার স্বয়ং সম্রাট করতেন এবং অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তবে শাস্তির হুকুম প্রদান করতেন। ঈশ্বরী প্রসাদ আকবরের আমলে শাস্তি সম্বন্ধে মুনশারেটের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন–

> "Moral offences were severely dealt with Seducers and adulterers were either strangled or gebbeted. He had such a hatred of debauchery and adultery that neither influences nor entreaties nor the great ransom which was offered would induce him to pardon his chief trade-commissioner, who had outraged the modesty of an unmarried girl. The wretch was remorselessly straggled."[৩]

উল্লেখ্য যে, দিল্লির সুলতান ও মোগল শাসকবর্গ জনগণের নৈতিকমান সংরক্ষণের জন্য "Department of moral check" ব্যবস্থা চালু করেন। এ বিভাগের কাজ ছিল জনগণ কর্তৃক জুয়া খেলা, মদ্যপান ও নৈতিক অসৎ চরিত্রতা বা লাম্পট্য নিবারণ করা। ভারতীয় মুসলিম শাসকবর্গ স্বাধীনভাবে সুসংহত ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করেন। বিচার ব্যবস্থা ছিল উন্মুক্ত এবং সকল পক্ষের উপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পাদিত হত। সেই সাথে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনানী করা এবং মামলার আলামত পরীক্ষা করা হত। বিচারকগণ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য ব্যক্তিগত তদন্ত পরিচালনা করতেন। অপরাধী ব্যক্তি ফেরারি হলেও অভিযোগের শুনানি করা হত। বাদী ও বিবাদী অথবা তাদের আইনজীবী উপস্থিত না থাকলে বিচারের রায় প্রদান করা হত না। বিচারের সময় বাদী অনুপস্থিত

১. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫১
২. প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫১
৩. প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে অভিযুক্তকে মুক্ত করা হত। ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যও (Circumstantial Evidence) গ্রহণ করা হত।[১]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় কাযির মাধ্যমে পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের (Remand) ব্যবস্থা চালু করা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ কর্মকর্তাগণ যে কোনো বাড়ি অথবা ব্যক্তিদেহ তল্লাশী করতে পারতো। এছাড়া যৌক্তিক কারণে পুলিশ কর্মকর্তাগণ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোনো গৃহে প্রবেশ করতে পারতেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। মুসলিম শাসনামলে ফৌজদারি প্রশাসনে স্থানীয় জনতার মুখ্য ভূমিকা ছিল। এ ব্যবস্থায় জনগণ কর্তৃক স্ব-শাসনের চেতনার (Sence of self-governing) উন্মেষ ঘটে। এ সময় জমিদারগণ স্বাধীনভাবে নিজস্ব এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকেন। মুসলিম ভারতে গোয়েন্দাগিরি তথ্য ডাকবিভাগ কর্তৃক সরকারের কাছে সরবরাহ করা হয়। পুলিশ কর্তৃক গুপ্তচর ভিত্তিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ কর্তৃক যে তথ্য (Intelliegence) সংগ্রহ করা হতো তা অপরাধ উদ্ঘাটন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[২]

প্রাচীন বাংলার জনগণ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ছিল। গ্রাম্য বিবাদ-বিসম্বাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ সাধারণ গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে মীমাংসা করে দিত। গ্রামবাসীরা সাধারণত গ্রাম প্রধানের রায়কে মেনে নিত। এ রায় সমাজের সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে দেয়া হত।[৩]

মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট আকবর তার প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থায় ফৌজদার, মির আদিল, কাযি ও কোতোয়ালের পদ সৃষ্টি করেন। বৃহৎ শহরগুলোতে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করা হত। এ সময় মোগল সাম্রাজ্যে কিছু সংগঠিত পুলিশ সার্ভিস গঠন করা হয় যার মাধ্যমে সাধারণত বৃহৎ শহর'সহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে শান্তি বজায় রাখা হত। কোতোয়ালের অধীনে বরকন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। এ সময় প্রতিটি সরকার বা পরোয়ানায় ফৌজদার নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। তার দায়িত্ব ছিল গ্রাম্য এলাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা। তার অধীনে অনেকগুলো থানাদার ছিল।[৪]

প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলাদেশে দু'রকম পুলিশ ব্যবস্থা ছিল: (১) ফৌজদারি পুলিশ (২) জমিদারি পুলিশ। জমিদারি পুলিশি ব্যবস্থা ত্রি-স্তর বিশিষ্ট ছিল-(ক) গ্রামীণ পুলিশ (খ) থানাদারি পুলিশ এবং (৩) কেন্দ্রীয় পুলিশ। কেন্দ্রীয় পুলিশ আবার পাইক দল বা সাধারণ পুলিশ এবং বরকন্দাজ বা সশস্ত্র পুলিশ। এরা অস্ত্র হিসেবে লাঠি, তরবারি ও বর্শা ব্যবহার করত।[৫]

ব্রিটিশ আমলের পুলিশ ব্যবস্থা

---

১. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Ibid, p. 19

২. "Muslim India followed the system of secret reporting by the postal department. There is no evidence that police was ever used for the purpose of espionage. Police intelligence remained limited to the needs relating to crime matters." see. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Ibid, p. 20

৩. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Ibid, p. 39

৪. "In the Mughal Period, Akbar, the great, organized the administrative set up with Faujdar, Kazi, Kotwal-the chief Police Officer in the larger town. There was some sort of organized police service under the Mughals, which could effectively maintain peace in the larger town and the countryside. The Kotwals maintaing a force of Sowers and Barkandazes. The Faujdars who were appointed in every Sarkar performed semi-military function with a contingent of horsemen and Barkandazes under his command. He was responsible for controlling crime in rural areas. He had under him a number of Thandars in-charge of smaller areas into which Sarkars and Parganas were divided for better policing. see. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Ibid, pp. 40-41

৫. এ এসএম সামছুল আরেফিন, মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সাথে প্রোথিত এবং সামন্তবাদী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত। ব্রিটিশ পুলিশের দর্শন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ১৭৫৭ সালে ইস্টইন্ডিয়া কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভের পর তারা রাজস্ব আদায় ও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করে।[১] ব্রিটিশ শাসকবর্গ নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যাকে "myrmidon of law" নীতি বলে উল্লেখ করা যায়। এ সময় পুলিশ বাহিনীকে জনসেবার পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হতো।

১৮৬১ সালে পুলিশ আইনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সুসংগঠিত পুলিশ ব্যবস্থা চালু হয়। এ আইনে পুলিশবাহিনীর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও কর্মপরিধি; অপরাধীর শাস্তির মাত্রা; পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পদচ্যুতি ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নিয়মাবলি; তদন্তের ধরন এবং অপরাধী অনুসন্ধান; সাধারণ ডায়েরি (জি.ডি), এজাহার বা প্রাথমিক অবহিতি (এফ.আই.আর); পুলিশবাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খলা বিধান ও মোতায়েন; বিভিন্ন অফিসারের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয় সংজ্ঞায়িত হয়। বাংলার পুলিশ বিভাগের ব্যয় নির্বাহ বাবদ বার্ষিক ৪০ লক্ষ রূপি বরাদ্দ দেওয়া হয়। মি. কারনক বাংলার প্রথম মহাপুলিশ পরিদর্শক নিযুক্ত হন।[২]

আঠারো শতাব্দীতে মোগল সম্রাজ্যের পতনের পর মুসলিম শাসকবর্গ কর্তৃক অনুসৃত পুলিশ ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে সম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলের শুরুতে ইস্টইন্ডিয়া কর্তৃক অধীকৃত এলাকায় গভর্নর জেনারেল ওয়ারেনহেস্টিং (১৭৭২–১৭৮৫) সংঘটিত পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি। এ সময় ডাকাতি, দস্যুতা ও গণহত্যাসহ নানাবিধ জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হতে থাকে। তার উত্তরাধিকারী লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৭-১৭৯৩) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কিছু পুলিশ রেগুলেশন পাশ করেন।

১৭৯৩ সালে বাংলার জেলাগুলোকে ভেঙে পুলিশ অধিক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি এলাকায় ৪০০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল যার প্রধান ছিল দারোগা। বহু সংখ্যক পাইক, চৌকিদার ও গ্রাম্য প্রহরিগণ দারোগার অধীনস্ত ছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থাও প্রত্যাশিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রণভার ১৮৮৫ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে বিট্রিশ সরকার গ্রহণ করে। Robbert Peel's Act ১৮২৯ সালে পাশ হওয়ার পর তা লন্ডনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সফলতা লাভ করে। এ পথ অনুসরন করে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ কন্সটিবিউলারি (British Constabularies) পদ্ধতিতে পুলিশের সংস্কার করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৬০ সালে গঠিত পুলিশ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পুলিশ আইন (Police Act V of 1861) পাশ হয়। এ আইনের অধীনে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিটি প্রদেশে প্রাদেশিক গভর্নরের

১. Aparna Srivastava, *Rule of Police in a Changing Society*, Ibid, p. 11
২. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ-মার্চ-২০০৯, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়। উপমহাদেশের পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণভার প্রদান করা হয় ইন্সপেক্টর জেনারেল এর উপর।[১]

"London Bobby" হিসেবে খ্যাত সিভিল পুলিশ Royal Irish Constabulary হতে উদ্বুদ্ধ। যা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পুলিশের বিভিন্ন মডেল হিসেবে পরিচিত। এই বাহিনীর বৈশিষ্ট্য হলো তারা জনগণ হতে পৃথক হয়ে ব্যারাকে অবস্থান করতো এবং তারা আধা সামরিক বাহিনী হিসেবে টহল দিত।[২]

The World Book Encyclopedia গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

> At the heart of the British conception of uniformed police work is the idea of the constable patrolling his beat. He is regarded as the main instrument of crime prevention in a police service that, since 1829, has believed that "the primary object of an efficient Police is the prevention of crime." Most police officers are employed in the uniformed branch. Up to 10 percent of any force will be in the Criminal Investigation Department, or detective branch, whose members work usually in plain clothes and undertake the investigation and classificaton of crime reports, the collection of information relating to crime or suspected crime, and the preparation of crime statistics.[৩]

১৭৬৪ সালে মির কাশেম এর পরাজয়ের পর ইংরেজরা বাংলার দিওয়ানি গ্রহণ করে। ১৭৭২ সালে কয়েকটি জমিদারি অঞ্চলকে বাদ দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে ১৪টি জেলায় বিভক্ত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, মেদেনীপুর ও বর্ধমানকে প্রদেশ ঘোষণা করা হয়। ১৭৮১ সালে বাংলাদেশকে ১৩ টি কালেক্টরশিপ জেলা ঘোষিত হয় এবং ১৩ টি কালেক্টরেটে ১৩ টি সিভিল কোর্ট স্থাপিত হয়।[৪]

এছাড়া ওয়ারেন্ট হেস্টিং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি দেওয়ানি ও ফৌজাদারি আদালতকে শক্তিশালী করেন। ওয়ারেন্ট হেস্টিং ডাকাতি দস্যুতা ও আইন শৃংখলা উন্নয়নে ১৭৭৪ সালে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি থানার ফৌজদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন এবং ডাকাত দলকে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি।[৫]

১৭৭২ সালে বাংলার গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিং গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। ১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হিস্টিং পুলিশ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১৪ টি পুলিশ জেলা বিভক্ত করেন। এ সময় ফৌজদার পুনরায় নিয়োগ করা হয়। এবং থানাদার পদটি পুনঃপ্রর্বতন করা হয়। ফৌজদার ও থানাদারকে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় জমিদার ও কৃষকদের বাধ্য করা হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ নিয়মিত পুলিশ বাহিনী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এলাকায় পুলিশ রেগুলেশন জারি করা হয়।[৬]

---

১. এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০; Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administraion*, Ibid, p. 12-13

২. "The antihesis of civil policing, as epitomised by the æLondon Bobby, was the Royal Irish Constabulary, which became a model for a very different style of policing throughout the British Empire. This force was characterised by the intake of officers who were housed in barracks segregated from the local populations and who housed in barracks segregated from the local population and who patrolled in armed quasi-military columns." see. Muhammad Nurul Huda, *Bangaldesh Police Issued and Challenges*, Dhaka : The University Press Limited, 1st published, 2009, p. 45

৩. The World Book Encyclopedia, London: World Book, Inc-1989, vol-5, p. 666

৪. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৫. A.B.M.G. Kibria, *Police Administration in Bangladesh,* Ibid, pp. 5-6

৬. Ibid, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ ফৌজদারি ও পুলিশ প্রশাসন পূর্ণগঠন করেন। এ সময় গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়।[১]

A Contribution Towards a History of the Police in Bengal গ্রন্থে লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর সময়ে পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পুলিশি নতুন ব্যবস্থা কার্যকরের জন্য বাংলা সুবার ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের পাটনা-এই তিন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের বলা হয়েছিল প্রয়োজনে শহরগুলোর সীমানা পুনর্বিন্যাস এবং শহরকে একাধিক 'ওয়ার্ডে' বিভক্ত করে সেগুলোর দায়িত্ব একজন করে দারোগার ওপর ন্যস্ত করতে। নবাবি প্রশাসনের ঐতিহ্যে দারোগার দেখভাল অর্থাৎ এদের ওপর কর্তৃত্ব (Authority) দেয়া হয়েছিল নবনিযুক্ত 'কোতওয়াল'দের। এজন্য নিযুক্তির পর প্রত্যেক কোতওয়ালকে ৫,০০০ টাকার মুচলেকাপত্র দিতে হত। অবশ্য প্রতিটি জেলায় কতগুলো থানা স্থাপিত হবে এবং তাতে কতজন পুলিশ সদস্য বা ফোর্স দায়িত্বপালন করবে, সেটি নির্ধারণের ভার ছিল সম্পূর্ণ ম্যাজিস্ট্রেটের উপর।[২]

লর্ড ময়রা (১৮১৪-১৮২৩) বলেন, গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর লর্ড কর্নওয়ালিশের 'থানাদারি' ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যদিও তার উদ্যোগ খুব একটা সফল হয়নি। তৎকালীন জেলা ও সেশন জজ ফ্রেডারিক শোর জনগণের চোখে ভারতীয় পুলিশ ও ব্রিটিশ পুলিশের ভাবমূর্তির তুলনার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি পুলিশের উন্নতি প্রসঙ্গেও কিছু ইতিবাচক মন্তব্য করছিলেন।[৩]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট প্রবর্তনের অব্যহতির পরেই বোর্ড অব ডিরেক্টরসগণ দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জানমাল ও শান্তিরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি ফলপ্রসু সংস্কারের উপর জোর দেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে প্রবর্তিত হয় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ রেগুলেশন একাদশ, যার লক্ষ্য ছিল সমস্ত প্রেসিডেন্সি এলাকা জুড়ে একটি পুলিশ প্রশাসন চালু করা। এ প্রসঙ্গে স্যার থমাস মুনরো বলেছিলেন–

> "We have now in most places reverted to the old police of the country, Executed by village watch man, mostly hereditary, under the direction of the heads of the village, tahsildar of districts and the collector and magistrate of the province the establishment of the tahsildars are employed without distinction either in police or revenue duties, as the occasion require."[৪]

১৮২৭ সালে বম্বে পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য দ্বাদশ রেগুলেশন পাশ হয়। ১৮২৯ সালে রেগুলেশন ১ এর অধীনে সমগ্র বাংলাদেশকে ২০ টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। এ সময় পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল অপরাধ অনুসন্ধান, অপরাধ নিবারণ ও আসামিকে বিচারের জন্য দ্রুত কোর্টে উপস্থাপন করা।[৫]

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, পৃ. ৭৫-৭৬

২. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫

৩. "The police established by the British-Indian Government is, in its outline, precisely similar to that of London; the former is considered by the people as an intolerable evil, the latter is universally allowed to be a most admirable establishment, highly conducive to the public good. The requisites for the improvement of our Indian police are, first, respectable salaries for those employed; second rewards and promotion for good conduct; third, additional powers in certain petty cases, thus destroying the anomaly which at present exists in the extent of the authority,-----------lastly, that there should be the strictest surveillance on the part of the Magistrate, overy one connected with the establishment." see: W.R. Gourlay, *A Contribution Towards a History of the Police in Bengal*, Calcutta: Secretariat Press, 1916, p.57

৪. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, পৃ. ৮৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচনের লক্ষ্যে ১৮৬০ খ্রি. একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন ১৮২১, ১৮৩২, ১৮৪৩, ১৮৪৯ খ্রি. সকল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে একটি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করে। এ কমিশন কিছু সুপারিশসহ একটি খসড়া আইন সভায় উপস্থাপন করলে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ আইন সভায় এটি অনুমোদিত হয়। এই এ্যাক্টটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের এ্যাক্ট (৫) নামে পরিচিত। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এ্যাক্ট (৫) এর উদ্দেশ্য ছিল পুলিশ বাহিনীকে স্বীকার করে নেয়া এবং আরও অধিকতর শক্তিশালী ও দক্ষরূপে গড়ে তোলা। এ সময় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদটি সৃষ্টি হয়। আরও উল্লেখ্য যে, ১৮৬১ খ্রি. সারা দেশব্যাপী একটি বাহিনী গঠিত হয় এবং প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর সমান্তরালে পুলিশ প্রশাসন গড়ে ওঠে। জেলা পুলিশের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ছিলেন পুলিশ সুপার।[১]

১৮৬১ সালে এ্যাক্ট (৫) এর ক্ষমতাবলে আইজিপি সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশবাহিনী পরিচালনা কল্পে যে বিধি বিধান প্রণয়ন করছিলেন তাই পিআরবি বা পুলিশ রেগুলেশন বেঙ্গল নামে পরিচিত। ১৮৬১ সালে পুলিশ আইনের ২, ৩, ৭ ও ১২ ধারা অনুযায়ী এ প্রবিধান গঠিত হয়। এটি সাংবিধানিক আইন ও সংসদীয় আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রণীত ও অনুমোদিত বলে এটি মূল আইনের মতই শক্তিশালী।[২]

বর্ণিত 'পুলিশ কমিশন' রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং The Madras police Act (Act XXIV of 1859) এর আলোকে ২৯/০৯/১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে Sir Bartle Frere কর্তৃক একটি 'পুলিশ বিল' ব্রিটিশ আইনসভায় উত্থাপিত হয়েছিল এবং যথারীতি কিছু সংশোধন-সংযোজন সাপেক্ষে বিলটি পাশ হয়ে আইনের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এটিরই আনুষ্ঠানিক পরিচিতি দাঁড়িয়েছিল The (Indian) Police Act বা Act v of 1861।

আইনটির মূল প্রতিপাদ্য হল–[৩]

> "The administration of the police throughout a general police district shall be vested in an officer to be styled the Inspector-General of police, and in such Deputy Inspectors-General, and Assistant Inspector-General, as the Local Government shall deem fit. The administration of the police throughout the local jurisdiction of the Magistrate of the district shall, under the genral control and direction of such Magistrate, be vested in a District Superintendent and such Assistant District Superintendents as the Local Government shall consider necessary."

সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ'কে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুলিশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা ও বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হলেও জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাকে একক ও সম্পূর্ণ ক্ষমতা না দিয়ে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষার জন্য এ বিষয়ে তাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনাধীন করা হয়েছিল।[৪]

Police Administration in Bangladesh গ্রন্থে A.B.M. Kibria বলেন যে, কোর্ট অব ডিরেক্টরস ব্রিটিশ-আইরিশ কন্সটিবিউলারির আদলে বাংলার পুলিশ সংগঠন সংস্কারে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৩. *Report of the Indian Police Commission*, 1902-03, Simla : Government Central Printing, 1903, p. 76
৪. B.M. Sharama, *Police Magistracy Relationship*, Jaipur, Printwell, 1991, p. 76

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬০ সালের পূর্বে কমিশন গঠন হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকগণ এ সংগঠনটির গঠন সম্পর্কে অনেকটা অন্ধকারে ছিলেন।[১]

নতুন ব্যবস্থায় পুলিশকে পূর্বেকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনতা থেকে পৃথক করে একটি আলাদা কেন্দ্রীয় বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। নতুন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল আইরিশ পুলিশ মডেলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি কার্যকর কনস্টেবল বাহিনী গঠন করা, যে কনস্টেবল বাহিনীর উপর মিলিটারি পুলিশের দায়িত্বও অর্পিত থাকবে। পুলিশ থাকবে আলাদা পুলিশ বিভাগের অধীনে, আগের মতো ডিভিশনাল কমিশনারের অধীনে নয়। আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে এখন থেকে অন্যান্য সকল বিভাগের সহযোগী হবে পুলিশ। পুলিশ বিভাগের প্রধানের পদবি হয় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। ডিভিশনাল কমিশনারে পুলিশ ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ইন্সপেক্টর জেনারেল এর নিচে নিযুক্ত হন একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, যিনি জেলাস্থ পুলিশ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকবেন। বড় জেলাগুলির জন্য নিযুক্ত হন এসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট পদবির একজন অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তা। জেলা সুপারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, ওভারসিয়ার ও চৌকিদার। অপরাধ দমন ও তদন্তের জন্য ডেপুটি আইজিগণের এখতিয়ার থাকে বাংলার সকল জেলার উপর।[২]

১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা নিম্নরূপ–

ধারা-(২) দেশের সকল পুলিশ কর্মচারী এই আইনের অধীনে সরকারের একটি মাত্র পুলিশ বাহিনী বলে বিবেচিত হবে। এ বাহিনী গঠনে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ কর্মচারী ও অফিসার নিযুক্তি ও তার সংখ্যা, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আদেশবলে নির্ধারিত হবে।[৩]

ধারা-(৩) সরকার দেশের সকল অংশের পুলিশ বাহিনীর সকল কার্য তত্ত্বাবধান করবেন এবং সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়ে অন্য কেহ বা কোনো অফিসার বা আদালত পুলিশের কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।[৪]

ধারা-(৪) দেশের সকল অংশের পুলিশের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে বিশেষ কোনো ডেপুটি অথবা সহকারী ইন্সপেক্টর-জেনারেলের উপর অর্পিত হবে। জেলার পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীনে জেলা সুপারিন্টেডেন্ট অথবা সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে কোনো সহকারী সুপারিটেনডেন্টের উপর ন্যস্ত থাকবে।[৫]

ধারা-৪-ক. (১) সরকার প্রয়োজন মনে করলে যেকোন সময় পুলিশের একজন অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল নিয়োগ করতে পারবেন। (২) অনুরূপভাবে নিযুক্ত পুলিশের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্তরূপ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেলের অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।[৬]

---

১. "The Court of Directors expressed their desire to reform police organization in Bengal on the lines of Irish Constabularies. It was not until 1860 that a police commission was appointed, So, for adout a century, the British administrators grouped in darkness to find out a correct organizational pattern capable of keeping peace and combating crime." see. A.B.M.G. Kibria, *Police Administration in Bangladesh,* Ibid, pp. 12-13
২. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৩. The Police Act V of 1861, sec. 2, see. The Bangladesh Code, Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, 2007, p. 256
৪. The Police Act V of 1861, sec. 3, see. The Bangladesh Code, Ibid, p. 257
৫. The Police Act V of 1861, sec. 4, see. The Bangladesh Code, Ibid, p. 257
৬. The Police Act V of 1861, sec. 4A, see. The Bangladesh Code, Ibid, p. 257

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-(১২) সরকারের সম্মতিক্রমে ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশ বাহিনীর গঠন, কর্তব্য, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং বাসগৃহ সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারবেন এবং পুলিশের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ এবং তার আদান-প্রদান, কর্তব্য পরিদর্শন এবং পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন বা আদেশ জারি করতে পারবেন।[১]

ধারা-(১৭) কোনো স্থানে বেআইনি জনতা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা ব্যাপক শান্তিভঙ্গ ঘটলে অথবা ঘটার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে অথবা ১৯৫২ সালের চোরাচালান প্রতিরোধ আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে অথবা সংঘটিত হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে এবং তা আয়ত্তে আনা সাধারণ পুলিশ বাহিনীর পক্ষে সাধ্যাতীত বলে বিবেচিত হলে তজ্জন্য এই বিষয়ে স্পেশাল পুলিশ চেয়ে কোনো ইন্সপেক্টর অথবা উধর্ক্ষতন পুলিশ কর্মচারী স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত এলাকার অধিবাসীগণের মধ্য হতে স্পেশাল পুলিশ নিযুক্ত করার প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করলে ম্যাজিস্ট্রেটের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার কোনো কারণ না থাকলে, তা মঞ্জুর করবেন। স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে স্পেশাল পুলিশ কর্মচারীরূপে নিয়োগ করবেন। অথবা অনুরূপ পরিস্থিতিতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নিজ উদ্যোগেও তা করতে পারেন।[২]

ধারা-(১৮) এইভাবে নিযুক্ত স্পেশাল পুলিশ, পুলিশ কর্মচারীর সকল ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও সুযোগের অধিকারী হবে এবং পুলিশ বাহিনীর ন্যায় অপরাধ, শৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য একই কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে।[৩]

ধারা-(২২) এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুলিশ কর্মচারী সর্বদা কার্যে রত (on duty) বলে বিবেচিত হবে এবং যেকোন সময় জেলার যেকোন স্থানে তাকে পুলিশ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে।[৪]

ধারা-(২৩) নিম্নলিখিত কার্যগুলি সকল পুলিশ অফিসারের কর্তব্য বলে গণ্য হবে: (ক) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সকল বৈধ আদেশ দ্রুত পালন বা কার্যকরী করা; (খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সর্বপ্রকার বৈধ পরওয়ানা জারি ও দ্রুত কার্যকরী করা (গ) সর্বসাধারণের শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ ও যথাস্থানে তার রিপোর্ট দান করা (ঘ) কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে উক্ত অপরাধ প্রতিরোধ বা নিবারণ করা (ঙ) সর্বসাধারণের বিরক্তিকর কার্য অর্থাৎ পাবলিক ন্যুইসেন্স নিবারণ করা (চ) অপরাধের বৃত্তান্ত অনুসন্ধান বা উদ্ঘাটন করা[৫] (ছ) অপরাধীকে বিচারার্থে আদালতে সোপর্দ করা (জ) আইনসঙ্গতভাবে গ্রেফতারযোগ্য সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা।[৬]

উপরোক্ত কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য সকল পুলিশ কর্মচারী যেকোন সরাবখানা, জুয়ার আড্ডা বা সন্দিগ্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোকদের সমাগমের স্থানে বিনা পরওয়ানায় প্রবেশ করতে পারবেন ও তথায় কি আছে, না আছে তা পরিদর্শন করতে পারবেন।

ধারা-(২৫) কোনো বেওয়ারিশ বা দাবিদারহীন সম্পত্তি পাওয়া গেলে প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হবে তা হেফাজতে নেয়া এবং সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট

---

১. The Police Act V of 1861, sec. 12, see. The Bangladesh Code, Ibid, p. 259
২. The Police Act V of 1861, sec. 17, see. *The Bangladesh Code*, Ibid, p. 263
৩. The Police Act V of 1861, sec. 18, see. *The Bangladesh Code*, Ibid, p. 264
৪. The Police Act V of 1861, sec. 22, see. *The Bangladesh Code*, Ibid, p. 264
৫. Aparna Srivastava, *Rule of Police in a Changing Society*, Ibid, p. 15
৬. The Police Act V of 1861, sec. 23, see. *The Bangladesh Code*, Ibid, p. 265

Dhaka University Institutional Repository

দাখিল করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী পুলিশ অফিসার এ ব্যাপারে পরিচালিত হবেন এবং তার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করবেন।

ধারা-(৩০) (ক) জেলার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট অথবা সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় ৫

নির্ধারিত ফরমে জেনারেল ডায়েরি রাখতে হবে। এই ডায়েরিতে যাদের নালিশ থাকবে আগে তাদের নাম, ঠিকানা, নালিশের বিবরণ এবং কেহ গ্রেফতার হলে তার নাম, ঠিকানা, ধৃত ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র কিংবা কোনো সম্পত্তি বা সাক্ষীগণের নাম প্রভৃতি লিখতে হবে। প্রয়োজন হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই ডায়েরি তলব করতে পারেন।[১]

লর্ড কার্জন পুলিশ প্রশাসনের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি Secretary of State এর নিকট প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশ বাহিনীর সমস্যা নিয়ে যেন একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯০২ সালে কমিশন একত্রিত হয় এবং ১৯০৩ সালের মে মাসে কমিশনের প্রতিবেদন দাখিল করে। ভারতীয় সরকার কিছু পরিবর্তন করে কমিশনের প্রতিবেদন গ্রহণ করে। বেঙ্গল পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই গঠিত হয়।

কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই বেঙ্গল পুলিশের নিম্নলিখিত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়:

(১) জেলা পুলিশ (District Police) (২) রেলওয়ে পুলিশ (Railway Poice) (৩) নৌ পুলিশ (River Police) (৪) নগর পুলিশ (Municipal and Cantonment Police) (৫) প্রধান শহর পুলিশ (Police of the Presidency towns) (৬) অপরাধ তদন্ত বিভাগ (Criminal Investigation Department)[২]

পাকিস্তান আমলের পুলিশ ব্যবস্থা:

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পুলিশের কাঠামোগত তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বেঙ্গল পুলিশ ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে East Bengal Police হিসেবে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে এটি East Pakistan Police বাহিনী হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং এটি প্রাদেশিক পুলিশ হিসেবে ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে।[৩]

পুলিশ প্রাদেশিক সরকারের অধীনে থাকলেও মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থরক্ষাই ছিল পুলিশের কাজ। কনস্টেবল ও অধস্তন অফিসারগণ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং বেতন-ভাতাও প্রাদেশিক সরকারের তহবিল থেকে তাদের দেয়া হত। সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তরা সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার ছিলেন। তারা পিএসপি ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪]

---

১. The Police Act V of 1861, sec. 44, see. The Bangladesh Code, Ibid, p. 271

২. Abdul Hamid, *The Pakistan Police Journal*, Lahore : Well-Wisher Press, October, 1960, pp. 12-13

৩. "After partition of the sub-continent in 1947 the police force in Bangladesh was first named as East Bengal Police and then as East Pakistan Police and it continued to function as a provincial force in the same line as during the British rule." see. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administraion*, Ibid, p. 13; http://www.police.gov.bd/history.php?id=51, visited on 12.07.2014; এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৪. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৬

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ ভারতীয় পুলিশের মতই ব্রিটিশ পুলিশের প্রতিলিপি (replica)। ভারত এবং পাকিস্তানের পুলিশ ব্যবস্থা ব্রিটিশ পুলিশ ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী। ব্রিটিশ পুলিশ এবং পাক-ভারত পুলিশের মধ্যে পার্থক্য হলো ব্রিটিশ পুলিশ আংশিকভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত এবং পাক-ভারত পুলিশ প্রাদেশিকসহ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো মূলত ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

পুলিশ বাহিনী প্রধান হলেন, মহা-পুলিশ পরিদর্শক (Inspector-General of Police)। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় দায়িত্ব পালন করেন। তাকে সহযোগিতা করেন উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা ডিআইজি। এসময় পুলিশের উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক ইউনিটগুলো হলো-

(১) গোয়েন্দা বিভাগ Intelligence Branch (for political matters) এর প্রধান ছিল ডিআইজি বা উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক।

(২) অপরাধ তদন্ত বিভাগ Criminal Investigation Department (for cirme) যার প্রধান ছিল ডিআইজি বা উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক।[১]

(৩) দুর্নীতি দমন বিভাগ (Anti-corruption Department) যার প্রধান ছিল উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক। ১৯৫৭ সালে এটি সিআইডি থেকে পৃথক হয়ে যায়।

(৪) সীমান্ত পুলিশ (Border Police) যার প্রধান ছিল উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক। এটি ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে East Pakistan Rifles হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

(৫) পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ (East Pakistan Rifles) যা মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৫৮ সালে এটি পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। "Which was under the general control and administration of the Inspector-Geneal of Police was placed with the Home Department of the Government of East Pakistan from the 1st July, 1958. "

(৬) রেলওয়ে পুলিশ (**Railway Police**)**:** পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে পুলিশ দুটি জোনে বিভক্ত ছিল। একটি হেড কোয়ার্টার হলো চট্টগ্রাম, অপরটির হেড কোয়ার্টার হলো সৈয়দপুর। এগুলোর প্রধান ছিলেন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা। উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ ও রাজশাহী রেঞ্জ এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করত।

(৭) নৌ-পুলিশ (**River Police**)**:** নৌ-পুলিশ সদর দপ্তর ছিল নারায়ণগঞ্জ। সঠিক ভাবে নৌ-পুলিশের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নৌ-পুলিশ মেঘনা এবং বরিশাল নামে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিকভাবে এটি সিআইডি'র নিয়ন্ত্রণে ছিল।

(৮) বন্দর-পুলিশ (**Port Police**)**:** চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বন্দর পুলিশ দায়িত্ব পালন করে। চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ সুপারের নিয়ন্ত্রণে একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চট্টগ্রাম বন্দর পুলিশের তদারকি করতেন।

(৯) ট্রাফিক পুলিশ (**Traffic Police**)**:** দ্রুত এবং কার্যকারী ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য ট্রাফিক পুলিশের জনবল অনুমোদন করা হয়।[১]

---

১. Abdul Hamid, *The Pakistan Police Journal*, Ibid, pp. 23-24

Dhaka University Institutional Repository

(১০) মাউন্টেড পুলিশ (Mounted Police): তৎকালীন মহামান্য বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ঢাকায় ৩০ সদস্যদের অশ্বরোহীসহ মাউন্টেড পুলিশের জন্য প্রস্তাব করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা শহরের সভা ও সমাবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩০ সদস্যের মাউন্টেড পুলিশ গঠন করা হয়।

(১১) পূর্ব পাকিস্তানের বিভাগ ও জেলাসমূহ (Range and District): [২]

ক্র. নং	রেঞ্জ	সদর দপ্তর	জেলা
১.	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ
২.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম জিআরপি.
৩.	রাজশাহী	সৈয়দপুর	রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, সৈয়দপুর জিআরপি
৪.	খুলনা	খুলনা	খুলনা, যশোর, ফরিদপুর এবং কুষ্টিয়া

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের জনবল, যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্রসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখী হয়। বিভাগীয় নানা অসুবিধার মোকাবেলা করে এদের সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হয়। লোকবল, যানবাহন-এর অভাবের উপর নতুন করে আরোপিত সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান সমস্যা উদ্ভব হয়। এ সময় পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। যার ফলে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একটি পুলিশ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এসময় পুলিশের উন্নয়নে ১৯৫৩ সালে সাহাবুদ্দিন রিপোর্ট, ১৯৫৬ সালে Hatch-Barnwell রিপোর্টসহ ১৯৬০-৬১ সালে পুলিশ কমিশন ও ১৯৬৯ সালে আরেকটি কমিশন ঘটিত হয়। এ সম্পর্কে Police Administration in Bangladesh গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

> "With the birth of Pakistan in 1947, the police Department had to encounter numerous problems for shortage of personnel and equipment. It was a difficult and strenuous period for the service. In addition to the normal police duties the force had to cope with hitherto unknown problems of smuggling and the border. The shahabuddin Report of 1953, the Hatch-Barnwell Report of 1956 and the committee regarding increase of forces in Dacca and Narayanganj in 1957 examined different aspects of the questions connected with improvnment of the police force but no substantial measure was taken by the Government to improve the effectiveness of the force. A police Commission was set up in 1960-1961 to make a comprehensive enquiry into the working of the police force and some of the recommendations were accepted by the Government for implementation. Another police commission was set up in 1969, but no action could be taken on its recommendation." [৩]

---

১. Abdul Hamid, *The Pakistan Police Journal*, Ibid, pp. 24-25
২. Ibid, p. 26
৩. A.B.M.G. Kibria, *Police Administration in Bangladesh,* Ibid, pp. 14–15

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলে প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখে পুলিশ প্রশাসনকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। যেমন থানা পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা ছিল পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আর থানার সিভিল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিল সিও (ডেভ), সিও'র পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল থানার ওসি'র উপর। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে মহকুমা প্রশাসকের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ ছিল মহকুমা পুলিশ অফিসার, জেলা প্রশাসকের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল জেলা পুলিশ সুপারের উপর। বিভাগীয় কমিশনার-এর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল বিভাগীয় ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের উপর। আইজিপি ছিল প্রাদেশিক সর্বোচ্চ পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।

প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগ আইজিপি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। পুলিশ সদর দফতরে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি বিভাগ একজন সহকারি ইন্সপেক্টর জেনারেল-এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছিল। এসব সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেলগণ অধীনস্থ কর্মচারিদের কাজ তত্ত্বাবধান করেন এবং এরাই ইন্সপেক্টর জেনারেলকে প্রশাসনে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

বিভাগ বা রেঞ্জে নিয়োজিত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলগণ রেঞ্জের আওতাধীন জেলার পুলিশ সুপারের কার্যক্রম পরিচালনার তত্ত্বাবধান করতেন। জেলার অন্যান্য সকল পুলিশ কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করতেন জেলায় নিযুক্ত পুলিশ সুপার। অবশ্য জেলার অন্যান্য ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোর প্রত্যেকটি সুপারের অধীনে আরো ক'জন তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা দায়িত্বপালন করতেন। যেমনঃ মহকুমা পুলিশ অফিসার (ডেপুটি পুলিশ সুপার), সার্কেল পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং থানার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সাব-ইন্সপেক্টর। পুলিশ প্রশাসনের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ইউনিট ফাঁড়ি।[১]

পূর্ব বাংলার পুলিশ বিভাগ আই.জি.পি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। পাকিস্তান শাসনামলের পুলিশ প্রশাসনের তালিকা: [২]

প্রশাসনিক একক	-	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
প্রদেশ	-	মহাপুলিশ পরিদর্শক (আই.জি.পি)
পুলিশ সদর দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগ	-	সহকারী মহাপুলিশ পরিদর্শক
বিভাগ (রেঞ্জ)	-	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক
জেলা	-	জেলা পুলিশ সুপার
মহকুমা	-	মহকুমা পুলিশ অফিসার (ডেপুটি পুলিশ অফিসার)
সার্কেল (একাধিক থানা নিয়ে গঠিত)	-	সার্কেল ইন্সপেক্টর
থানা	-	সাব-ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
ফাঁড়ি	-	হাবিলদার

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭–৮৮
২. এ এসএম সামছুল আরেফিন, মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

মানবজীবনে স্বাধীনতা অর্জনকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা ও উৎসাহিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো প্রকারের পরাধীনতা ইসলামে সমর্থিত নয়।বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এক উজ্জ্বল গৌরবগাঁথার ইতিহাস। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ জনযুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, বেসামরিক বাহিনীর সাথে পূর্ব বাংলার অকুতোভয় বীর বাঙালি পুলিশ সদস্যগণও অংশগ্রহণ করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের বাঙালি সদস্যগণ এবং তারাই প্রথম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়, অবিচার, শোষণ-নিপীড়ণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে শাহাদত বরণ করেন।

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে দূরত্ব ১৫০০ মাইল। পাকিস্তান ছিল দুইটি অংশে বিভক্ত। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে ছিল ভারতের বিশাল অংশ। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের যথাযথ প্রাপ্যতা ও মর্যাদা প্রদান না করে বৈষম্যমূলক আচরণ, দমিয়ে রাখার প্রবণতা, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা ও অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সূচনা করে। আর এর প্রথম আঘাত শুরু হয় আমাদের প্রিয় মাতৃভাষার উপর আক্রমণের মাধ্যমে।

৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে মুক্তির পথনির্দেশনা দেন। জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ৭ মার্চের ভাষণেই বঙ্গবন্ধু আরও ঘোষণা করেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষারভার সম্পূর্ণরূপেই পুলিশ এবং বাঙালি ইপিআর বাহিনীর হাতে থাকবে। বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে পুলিশ বাহিনীর উপর আস্থা রেখেছিলেন এবং পুলিশ বাহিনীও সে আস্থা পুরোপুরি রক্ষা করে।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মানচিত্র লক্ষ করলে বাংলাদেশের জনযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝা যায়। দেশের প্রতিটি নগরে, জেলাশহরে, মহকুমায়, থানায়-থানায়, বড় বড় গঞ্জে-বন্দরে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, মেহেরপুর থেকে তামাবিল, কুয়াকাটা থেকে পঞ্চগড় একসাথে জনগণের রোষানলে জ্বলে উঠেছিল ১৯৭১ সালের মার্চের সংগ্রামী দিনগুলিতে। গোটা বাঙালি জাতি ফুঁসে উঠেছিল পশ্চিমাদের নৃশংস আক্রমণের খবর পেয়ে। জাতির ঐ ক্রান্তিলগ্নে আমাদের স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা জনগণের বাহিনী, সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীগুলো, স্থানীয় প্রশাসন জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক কাতারে। যুদ্ধ করেছে একসাথে, শহিদও হয়েছে একই আদর্শের জন্য। তখনো তো কোনো ভেদাভেদ ছিল না। জনগণের বিভিন্ন স্তর থেকে নেতৃত্বও এসেছে স্বতস্ফূর্তভাবে-কখনও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধিরা, কখনও সেনা নায়কেরা, আবার কখনও স্থানীয় প্রশাসন বা উপস্থিত স্বনামধন্য কোনো ব্যক্তি।
এই জনযুদ্ধে সীমান্তবর্তী জেলা বা অঞ্চলগুলিতে স্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটা বাড়তি সুবিধা ছিল। পার্শ্ববর্তী ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে প্রচুর সাহায্য এসেছে। প্রয়োজনে অস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে খুব সহজেই। বিপদে আশ্রয় পাওয়া গেছে, যেখান থেকে আবার নবোদ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।[১]

১. এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথমদিকে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সঙ্গে একজন পূর্ণ সচিব দায়িত্বপালন করেন। পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল এই বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার নিকট তা প্রেরণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রধান কাজ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে ৪টি রেঞ্জের জন্য ৪ জন ডিআইজি এবং প্রতি জেলায় একজন এসপি নিয়োগ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদগুলোর (Zonal Administrative Councils) দায়িত্ব পালন করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিম্নলিখিত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১]

পদবি	সংখ্যা
ডিএসপি	৫ জন
ইন্সপেক্টর	১০ জন
দারোগা (এস.আই)	২০ জন
করণিক (ক্লার্ক)	১ জন

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুক্তির সংগ্রামে পুলিশের সম্পৃক্ততা হঠাৎ বা কাকতালীয় কোনো ঘটনা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দীর্ঘ দিনের শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে উঠা একটি বাস্তবতা। মার্চের উত্তাল দিনগুলিতে সপ্তাহব্যাপী গোলযোগে ১৭২ জনের প্রাণহানি ও ৩৫৮ জনের হতাহতের ঘটনা ঘটে যা সাধারণ জনগণের মত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি পুলিশ সদস্যদের মর্মাহত করে। বিশেষ করে ২৫ মার্চের কালো রাতে পাক হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে যে গণহত্যা ও ধক্ষংসযজ্ঞ চালায় সে ঘৃণ্য আক্রমণে রাজারবাগের শত শত পুলিশ সদস্য প্রতিরোধ যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং প্রথমে বিজয়ী হন। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের পুলিশেরা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রথম মুক্তিযুদ্ধের প্রচারকারী। প্রতিরোধ মুক্তি সংগ্রাম, গণআন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম কর্মের মাধ্যমে আত্মদানকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে প্রতিরোধকারী পুলিশ সদস্যগণের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁরা দেশ ও জাতির গৌরব। ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁরা শহিদ; শাহাদতের মর্যাদায় ভূষিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণের পটভূমি

পুলিশ সদস্যগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের দৃশ্যমান অঙ্গ (Visible Organ) হিসেবে সরকার তথা সামরিক জান্তার আচরণ ও এদেশের জনসাধারণের মনোভাব তাদের খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সংগত কারণেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমার শেষ পর্যায়ে দেশব্যাপী ফুঁসে উঠা নিরস্ত্র বাঙালির অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালি পুলিশ পেশাগত ও প্রথাগত শৃঙ্খলা ও নিয়মের বেড়াজাল ভেঙ্গে সাড়া দেয় দেশ মাতৃকার আহক্ষানে, যোগ দেয় আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা সংগ্রামে। আজন্ম পেশাদার, রাজনীতিবিমুখ পুলিশ সদস্যগণের মাঝে জেগে উঠে একটি বিপ্লবী সত্তা। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর এ মনোভাব অজানা ছিল না শাসকগোষ্ঠীর। এ ক্ষোভ এবং হতাশার কারণে ২৫ মার্চের কালরাত্রিকে গণহত্যার জন্য প্রণীত বিভীষিকাময় অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম টার্গেট করা হয় পুলিশকে, আর পুলিশ বিভাগের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সকে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের পুলিশ সদস্যগণকে নিরস্ত্রীকরণের মহা পরিকল্পণা গ্রহণ করা হয়।

---

১. এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম তার 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "পাকিস্তান সরকার বুঝতে পেরেছিল যে, ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীই হবে এই অঞ্চলের লোকের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান উৎস। এও পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক কার্যক্রমে ইপিআর এবং পুলিশ অস্ত্র ধরবে না।" পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নীতিনির্ধারকদের এই ধারণা ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' এর পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ জেলার পুলিশ সদস্যদের নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে।[১]

কলকাতার পার্ক সার্কাস এভিনিউতে (পূর্বের পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দপ্তর এর সঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। ডি.আই.জি আব্দুল খালেক বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে নিযুক্তি লাভ করেন (২৫ মার্চের পূর্বে তিনি সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল পদে কর্মরত ছিলেন)। একই সাথে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) স্বরাষ্ট্র সচিবও ছিলেন। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকারের এক নিয়োগ আদেশে বলা হয়-In pursuance of the cabinet decision of the Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Mr. Abdul Khaleque is appointed to act as Secretary, Home Department with immediate effect. The appointment is made in the interest of the public service. [২]

(ক) মানবাধিকার রক্ষায় বৈষম্য : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি যথাযথ প্রাপ্য দেয়া হয়নি। ১৯৭০ সালে ২৩ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলায় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১২ লক্ষ লোক নিহত হয় এবং কলেরা ও মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার লোক অকালে প্রাণ হারায়। এ মানবিক বিপর্যয়ে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ১২ লক্ষ লোকের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়নি এবং লক্ষ লক্ষ লোকের দাফন কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয়নি। মাওলানা ভাসানী বলেন, এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হতে পারে? [৩]

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষাখাতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছরের পরিস্থিতির উপর Dr. Mankekar এর Pak Colonialism in East Bengal পৃষ্ঠা ২০-২১ এ তাঁর রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য:

"এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো প্রকার উন্নতির পরিবর্তে লক্ষ্যণীয় অবনতি হয়েছে। অশিক্ষিতের সাধারণ স্তর শতকরা ৮০ ভাগের মধ্যেই স্থির রয়েছে। ১৯৫১ খৃ. হতে ১৯৬১ খৃ. সময়কালে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ম্যাট্রিক পরীক্ষা (বর্তমান এস.এস.সি) পাশের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৪৩.৭ ভাগ সেখানে পূর্ববঙ্গে বেড়েছে মাত্র ৬.৩ ভাগ।"[৪]

(গ) শিল্পক্ষেত্রে বৈষম্য: কাঁচামালের যোগান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সুষম হারে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তানের শিল্পের মন্তব্য করতে গিয়ে Dr. Mankekar এর Pak Colonialism in East Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সামান্য যে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পূর্ব

---

১. এ এস এম সামছুল আরেফিন সম্পাদনায় *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮
৩. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনর্মুদ্রণ, জুন-২০০৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫
৪. লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা : চারুলিপি, ১ম প্রকাশ, মে ২০১০, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার বেশির ভাগই মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কেন্দ্রের ডঃ গুসতাভ এফ পাপানেক-এর এক সমীক্ষায় উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের বড় বড় শিল্পপতিদের তালিকায় বাঙালিদের স্থান ছিল না। ২৯ টি সর্ব বৃহৎ শিল্পায়নের মাত্র ২টির মালিক বাঙালি, তাও তালিকার সর্বনিম্নে। পূর্ববঙ্গে অবস্থিত শিল্প কারখানার বহুলাংশের হেড অফিস করাচীতে অবস্থিত যার কারণে প্রায় সময়েই পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমে মূলধন ও মুনাফার অর্থ পাচার হয়েছে।[১]

(ঘ) কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য: কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের সমস্ত উপকারই গম উৎপাদনকারী পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটেছে, কিন্তু ধান উৎপাদনকারী পূর্ববঙ্গের ভাগ্যে সামান্যতমও জোটেনি। ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ ১৯৭১ বর্ষ বহি এর তথ্যানুযায়ী"-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তান যখন গম-উদ্বৃত্তের তালিকায় তখন অধিক জনবহুল (Over populated) পূর্ববঙ্গ চাউল-ঘাটতির অভিশাপে রয়েছে।[২]

(ঙ) চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য: চাকুরীর ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। সামরিক বাহিনীতে বাঙালি সৈন্যের অনুপাত ছিল ৪%, প্রতি ৬০ জন সামরিক অফিসারের মধ্যে বাঙালি মাত্র ১ জন। বেসামরিক চাকুরীতে বাঙালির অনুপাত মাত্র ১১% জন। ১৯৬৭-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের ২০ জন সেক্রেটারীর মধ্যে ১ জনও বাঙালি ছিল না। কেন্দ্রীয় বাজেটের চাকুরির খাতে শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত।[৩]

Central Government Civil Service (1955)		
Position	**East Bengal**	**West Pakistan**
Secretary	0	19
Joint Secretary	3	38
Deputy Secretary	10	123
Asistant Secretary	38	510

Source: Dawn, Karachi (1955)[৪]

(চ) অর্থনৈতিক বৈষম্য: অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইবনে খালদুন আল মুকাদ্দিমার ২য় খণ্ডে লিখেছেন, "জনগণের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতন চালানো হলে তাদের সম্পদ উপার্জনের স্পৃহা নস্যাৎ হয়ে যায়। যখন স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায় তখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রম ও সাধনা থেকে তারা হাত গুটিয়ে নেয়। আর জনপদ যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে তখন বাজারে মন্দা দেখা যায়। দেশের বাসিন্দা হয়ে উঠে কর্মবিমূখ এবং উজাড় হয়ে যায় নগর, বন্দর আর জনপদ।[৫] Dr. Mankekar এর Pak Colonialism

১. লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২. "Acording to the : Far Economic, Review 1971 year book, "During 1970 while the west wing found itself in the situation of wheatsurplus, the overpopulated Eastern Province contin ued to be deficit in rice." see. লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৩. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০
৪. http://www.virtualbangladesh.com/history/overview_akram.html visited on 20.05.2014
৫. আব্দুর রহমান ইবন খালদূন, *মুকাদ্দিমাহ ইবন খালদূন*, তিউনেশিয়া: আদ দারুত তিউনেশিয়া লিন নাশরি, ১৯৮৪, ২য় খণ্ড, পৃ, ৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

in East Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেন– ১৯৫০-১৯৭০ খ্রি. সময়কালে সর্বমোট রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ১৩০০ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের পাঁচ ভাগের এক অংশ) ব্যয় করা হয়েছে পূর্ববঙ্গে, কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে ৫০০০ কোটির বেশি। ঐ সময়ে মোট উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে ৩০০০ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের তিন ভাগের এক অংশ) খরচ করা হয়েছে পূর্ববঙ্গে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৬০০০ কোটি টাকা।[১]

পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্যের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

Central Government Development outlay 1947-48 to 60-61[২]

Description	East Pakistan		West Pakistan	
	Total (Rs. In crore)	Per Capita (R.s)	Total (Rs. In crore)	Per Capita (R.s)
Investment	172	38	430	117
Loans	184	40	224	61
Grants-in-aid	76	15	101	28

(ছ) রাজনৈতিক বৈষম্য : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায্য রাজনৈতিক প্রাপ্যতা প্রদান করেনি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে সরকার গঠনের পর নানা তালবাহানা দেখিয়ে দ্রুত সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ৩১৩ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ (৭টি কোটাসহ) লাভ করে ১৬৭টি আর প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ (১০টি কোটাসহ) ২৯৮ টি আসন লাভ করে।[৩] কোটা ছাড়া আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬২টির মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।[৪]

সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো বলেন–

> "He had all regards for Sheikh Mujibur Rahman who had returned with great majority of the Awami League in the national Assembly. But he added majority does not count in national politics." যা পাকিস্তান টাইমস, ২১ ডিসেম্বর ১৯৭০ উল্লেখ করা হয়েছে।[৫]

ভুট্টো আরও বলেন, "গত ২৩ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তান দেশ শাসনের ন্যায্য হিস্যা পায়নি তাই বলে আগামী ২৩ বছর পাকিস্তানের উপর প্রভূত্ব করবে তা হতে পারে না।"[৬]

---

১. লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২. Moudud Ahmed, *Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy*, Dhaka: Universty Press Limited,1979, p. 84
৩. লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২
৪. এম.এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ৬২-৬৩
৫. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫
৬. এ এস এম সামছুল আরেফিন সম্পাদনায় *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

(জ) পুলিশের অস্ত্রের ক্ষেত্রে বৈষম্য : তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের কাছে কোনো অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিল না। বাঙালি জাতির মত পুলিশও ছিল বৈষম্যের শিকার। পুলিশকে আধুনিক ঢালের পরিবর্তে বেতের তৈরি ধামার মত দেখতে ঢাল দেয়া হত। আর অস্ত্র দেয়া হত থ্রি নট থ্রি রাইফেল।[১]

(ঝ) স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য : পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৫৬% ভাগ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি স্বাস্থ্য খাতে যে চরম অবিচার ও অন্যায় করে তা নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানেই ভেসে উঠে।

স্বাস্থ্য সেবাঃ

Description	Number in East Pakistan	Number in West Pakistan
(a) Hospitals	76	393
(b) Dispensaries	489	1754
(c) Beds in Hospitals & Dispensaries	6984	26200
(d) Population/Bed ratio	9000:1	2000:1

Source : 20 Years of Pakistan in Staistics. C.S.O.[২]

মার্চের উত্তাল দিন গুলিতে পুলিশের ভূমিকা

১৯৭১ সালের মার্চের এই অগ্নিঝরা দিনে পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনীসহ সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর আহক্ষানে ছিলেন উজ্জীবিত। সকলের ধারণা ছিল পরিস্থিতি দ্রুত চরম পরিণতির দিকে এগুচ্ছে। সাত কোটি বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাই ছিল সেদিনের সকল ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স সে সময় দখলদার বাহিনীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মূলত এ সময় পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের বাঙালি সদস্যগণ জনগণের কাতারে এসে দাঁড়ায়।

৭ মার্চের পরের এক রাতে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা প্রধান মেজর জেনারেল আকবর রাতে সেনাবাহিনীর কন্ট্রোলরুম থেকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত হয়ে পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপের মধ্যে বলেন,

> "বর্তমানে পুলিশ বিভাগ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। সে সময়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত আইজিপি জনাব তসলিম উদ্দিন আহমেদ জবাবে বলেন, "আপনারা নিজেরাই সব উল্টা-পাল্টা কাজ করছেন আর দোষ দিচ্ছেন আমাদের। আপনাদের উচিত রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করা।"[৩]

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, পুলিশের তৎকালীন আইজি তসলিম উদ্দিন আহমেদ অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙালির অধিকার আন্দোলনের অনুকূলে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাপী পুলিশ প্রশাসন পাকিস্তান সরকারের অনুগত না থাকায় সমস্ত দায়ভার তার উপর আরোপিত হয়। পাকিস্তানের জেনারেল রাও ফরমান আলির লেখায় তার প্রতি ক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। তিনি

১. সম্পাদনা পরিষদ, *অর্জন*, স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১, ঢাকা : বাংলাদেশ পুলিশ, জুন ২০১১, পৃ. ২১
২. Moudud Ahmed, *Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy*, Ibid, p. 85
৩. এ এস এম সামছুল আরেফিন সম্পাদনায় *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন, পুলিশ প্রধান সবার আগে তার বাহিনীসহ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগ কমাণ্ডের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সামরিক সরকার ২৬ মার্চের পর জনাব তসলিম উদ্দিন আহমেদকে আইজি পদ থেকে সরিয়ে অবাঙালি মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরীকে নিয়োগদান করেন।[১]

সে সময় পুলিশ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল যা কামাল হোসাইনের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। ২৫ মার্চ সারাদেশ থেকে মিলিটারি আক্রমণের আশঙ্কার কথা আমাদের জানানো হলে আমাদের নির্দেশনা ছিল যা কিছু আছে তাই দিয়ে প্রতিরোধ করা। পুলিশ বা অন্য সোর্স থেকে অস্ত্র সংগ্রহের কথা বলা হয়েছিল।[২]

রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স : ২৫ মার্চের ঘটনাপঞ্জি

দুপুর ২টায় বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে নানারকম সংবাদ আসতে থাকে। পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে সারা শহরে পেট্রোল পার্টি পাঠনো হয়। পেট্রোল পার্টি বেতার মারফত সংবাদ পাঠাতে থাকে শহরের অবস্থা থমথমে ও আতঙ্কগ্রস্ত। এ সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এর অনেক পুলিশ সদস্য ক্লোজ হওয়ার নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও রাজারবাগে চলে আসে।[৩]

সন্ধ্যা ৭টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পুলিশি সূত্রসহ নানা রাজনৈতিক সূত্র থেকে সংবাদ আসতে থাকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ চালানো হতে পারে। এ সংবাদে বাঙালি পুলিশ সদস্যগণ বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন আনসার ডিরেক্টর আউয়ালকে এবং পুলিশের এসপি ই.এ চৌধুরীকে অস্ত্র বণ্টন করে দেয়ার আদেশ দেন।[৪]

রাত ১০.০০ তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে টহলরত একটি পুলিশ পেট্রল পার্টি (চার্লি-৭) বেতার মারফত জানায় যে, সেনাবাহিনীর একটি বড় কনভয় যুদ্ধসাজে শহরের দিকে এগুচ্ছে।

এক স্মৃতিচারণে তৎকালীন সময়ে ওয়ারলেস বিভাগের কনস্টেবল শাহজাহান মিয়া বলেন, রাত আনুমানিক ১০.৩০ মিনিটের সময় ঢাকা শহরে পেট্রোলরত একটি মোবাইল ওয়ারলেস ষ্টেশন থেকে একটি সংবাদ আসে। সংবাদটি ছিল- "Charly seven for Base how do you hear me, over. জবাবে তিনি বলেন Base for Charly seven send your messages, over. তখন তেজগাঁও এলাকায় টহলরত টহল বেতার যন্ত্র থেকে জানানো হয়-About thirty seven trucks loaded with pak army are proceeding towards Dacca City, over."[৫]

রাত ১১.৩০: সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া যানসমূহ রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের চারদিকে অবস্থান নিতে থাকে। পাক বাহিনীর এ আক্রমণের সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে সারাদেশের জেলা ও মহকুমাসমূহে পুলিশ বেতার মারফত কং মোঃ শাহজাহান মিয়া কর্তৃক যে বার্তা প্রেরণ করা হয় তা ছিল নিম্নরূপ–

"Base for all station of East Pakistan Police, keep listening, watch, we are already attacked by the Pak Army. Try to save yourself, over."

---

১. এ এস এম সামছুল আরেফিন সম্পাদনায় *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২. Kamal Hossain, *Road to Bangladesh Series, Banglades Quest for Freedom and Justice*, Dhaka: The University Press Ltd., May 2013, p. 103

৩. প্রযোজনা : বাংলাদেশ পুলিশ, প্রামান্য চিত্র *'মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ'* লেজার ভিশন লিঃ, ২০১২

৪. এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, প্রাগুক্ত, মার্চ-২০১১, পৃ. ৩৩

৫. এ এস এম সামছুল আরেফিন সম্পাদনায় *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় রাজারবাগ ওয়ারলেস বেজে উপস্থিত ছিলেন এএসআই ইয়াছিন আলী তরফদার, কং. মুসলিম আলী শরীফ, কং. মনির হোসেন, কং. মতিউর রহমান মতিন, কং. আব্দুল লতিফ, কং. সোহরাব হোসেনসহ আরও অনেকে।

রাত ১১.৩৫ রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স এ অবস্থারত পুলিশ কন্সটেবল আবদুল আলী খান প্রথম এ্যালার্ম ঘন্টা বাজিয়ে ছিলেন ও সবাইকে সতর্ক ও একত্রিত করছিলেন। অস্ত্রাগারে কর্তব্যরত সেন্ট্রির রাইফেল থেকে গুলি করে অস্ত্রাগারের তালা ভাঙ্গে এবং তৎকালীন আরআই মফিজ উদ্দিনের নিকট থেকে জোর পূর্বক অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে নিজেদের মাঝে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিতরণ করে। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যবৃন্দ পুলিশ লাইন্সের চারদিকে, ব্যারাক ও বিভিন্ন দালানের ছাদে অবস্থান নেয়।

কামান আর মর্টারের আক্রমণ এক সময় থামে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স করায়ত্ব করে দখলদার বাহিনী। তার আগেই রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের কিছু বীর বাঙালি পুলিশ অস্ত্র, গোলাবরুদসহ রাজারবাগ ত্যাগ করেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে।

ভোর ০৫.০০: পাক হানাদার বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে ঢুকে পড়ে এবং পুলিশ সদস্যদেরকে হত্যা ও বন্দী করা শুরু করে। এ সময় প্রায় ৫০০ জন বাঙালি পুলিশ বন্দি হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মাঝ রাতের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাম্মদ নূরুল কাদির বলেন, সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত ঢাকা শহরের সকল ইউনিটে ঘুরে সবার শেষে রাজারবাগে পৌঁছলাম। সেই মাঝরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতের আধারে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চুপিসারে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, পুলিশ ব্যারাকসমূহ, পীলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেডকোয়ার্টার্স, সেখানকার সেনাবাহিনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ঢাকার বিভিন্ন বস্তি এলাকা ইত্যাদি ঘেরাও করে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করেছিল। গোলাগুলির বিকট শব্দে কানে তালা লাগার অবস্থা হল।[১]

২৫ মার্চ রাত্রিতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর ট্যাংক ও ভারী অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশ ও ইপিআর তাদের যে অস্ত্র ছিল তাই দিয়ে যুদ্ধ করে।[২]

রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স এ বাঙালি পুলিশ সদস্যরা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেন। তাদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ কারণে তারা বাঙালি জাতির হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকবেন। যারা দেশ ও জাতির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন তারা চিরদিন মানুষের হৃদয়পটে অমর হয়ে থাকবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلَكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ.

অনু: "আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।"[৩]

এ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী বলা যেতে পারে যারা শোষণ, নিপীড়ণ ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জীবন বিসর্জন করেন, তারা অমর।

---

১. মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা : মুক্ত প্রকাশনী, ১৪ আগষ্ট ১৯৯৭, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৮
২. Faruk Aziz Khan, *Spring 1971*, Dhaka: Agronee Prokasoni, February 1993, p. 55
৩. আল কুরআন, ২ : ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়–

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই-
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই ......"[১]

২৫ মার্চ '৭১ রাতে প্রথম প্রতিরোধযুদ্ধে উপরোক্ত ১৪ জন পুলিশ সদস্যের শহিদ হওয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।[২]

সাইমন ড্রিংস বলেন, একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হয় অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ সদর দপ্তর রাজারবাগ আক্রান্ত হয়। ঐ সময় সেখানে অবস্থানকারী ১১০০ পুলিশের মধ্যে অল্প ক'জন রেহাই পেয়েছিল।[৩] পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাটি ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স আক্রমণ করে শত শত পুলিশকে হত্যা করে।[৪]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের কাল রাতে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ বাংলাদেশের ক্যান্টনমেন্ট শহর ও তার নিকটবর্তী শহরগুলোর পুলিশ লাইনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক যে পরিকল্পিত ধক্ষংসাত্মক আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল তার মূল নিহিত ছিল বাঙালি পুলিশের দেশপ্রেমের মধ্যে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে যখন বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ, সকল সরকারি ও বেসরকারি শ্রমিক কর্মচারি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

২৫ মার্চের কালোরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সকাল না হতেই ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে। সমগ্র দেশে পুলিশ বাহিনীর প্রতিরোধ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। থানা, মহকুমা ও জেলা শহরগুলোয় পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইষ্টপাকিস্তান রাইফেলস্‌, আনসার, মুজাহিদ ও তরুণ ছাত্র এবং রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ।

প্রথম দিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া এসব জেলায় সশস্ত্র সংঘর্ষে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। বাঙালি সৈনিক ও ইপিআর বাহিনীর সহযোগিতায় ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য হলেও পুলিশ আপন আধিপত্য কায়েম করেন। কিন্তু পরবর্তী সময় আধুনিক সমরাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার, প্লেন ও হেভি হাতিয়ারের আক্রমণে পুলিশ বাহিনীর নড়বড়ে প্রতিরোধ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্রাধিক পুলিশ হানাদার বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে ৩৫ হাজার পুলিশ কর্মচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক নতুন নজির স্থাপন করেছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে।

অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনীকে আপন অবস্থান স্থির করে নিতে হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংগঠিত গোষ্ঠী হিসেবে পুলিশ বাহিনী মানসপটে খোদিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে কর্তব্যপালন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে চলার অনন্যদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের

---

১. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, সং. ৪, ই-বুক, ৮ ডিসেম্বর ২০১১, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
২. সম্পাদনা পরিষদ, *মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ*, ঢাকা : বাংলাদেশ পুলিশ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপপরিষদ, ২৫ মার্চ ২০১০, পৃ. ৩০-৩১
৩. নীল কমল বিশ্বাস সম্পাদিত, *যুদ্ধে যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ৬৩
৪. সিরাজউদদীন আহমেদ, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১১, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৫-দফা নির্দেশনামার ৩-খণ্ডতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপালন করবে এবং প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে।' অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্বপালন করেছিল পুলিশ বাহিনী। এর ফলে ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাক সামরিক বাহিনী নৃশংস গণহত্যাভিযান শুরু করলে তাদের আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে রাজারবাগে পুলিশ বাহিনীর সদর-দপ্তর, যে সদরদপ্তর, তারা ভালোভাবে বুঝেছিল পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনীর নয়, ছিল বাংলাদেশ পুলিশের। পাকবাহিনীর পরিচালিত গণহত্যা পরিকল্পনার দলিল 'অপারেশ সার্চলাইট'-এ যেসব টার্গেটের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ট্যাংক, ভারী কামান ও সৈন্যদল নিয়ে রাজারবাগ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী অসম অথচ অসীম সাহসী প্রতিরোধ সূচনা করে এবং সেটাই ছিল বাঙালির প্রতিরোধের প্রথম প্রহর, ইতিহাসের নতুন নির্মাণ।[১]

পাকবাহিনী যখন দেশের ব্যাপক অঞ্চলের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল তখন দেখা গেল পুলিশ বাহিনীর ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের তথ্য-অনুযায়ী ও.আর বা অর্ডিনারি রিজার্ভসহ পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত সদস্য-সংখ্যা ছিল ৩৩,৯৯৬ জন, এর মধ্যে নিয়মিত সদস্য ছিলেন প্রায় ২৪ হাজার। এ. এস. এম সামছুল আরেফিন পরিচালিত প্রকল্প জরিপ থেকে জানা যায় যে, প্রায় ১৩,০০০ পুলিশ সদস্য পাকিস্তানি কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তাঁদের কর্মস্থল পরিত্যাগ করে জনতার কাতারে মিশে যান।[২] সকল জেলার মাস্টার রোল তথ্য পাওয়া গেলে এই সংখ্যা কর্মরত পুলিশ বাহিনীর অর্ধেক সদস্যের বেশি হবে বলে প্রকল্প পরিচালক মনে করেন। পাকিস্তানি পক্ষত্যাগে পুলিশ সদস্যদের এই বিশাল ভূমিকার কারণে পাক-সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামরিক শাসকদপ্তরের নির্দেশে মে-জুন মাসে ১৫০০০ নতুন পুলিশ সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের তাৎক্ষণিকভাবে দক্ষ ও কার্যকর করে তোলার কোনো উপায় তাদের ছিল না। অনোন্যপায় পাক-কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে ৫০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যকে অধিকৃত পূর্ববাংলায় প্রেরণ করে। এই ৫০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ সদস্যের কোনো ধারণা ছিল না পূর্ববাংলার জল-মাটি-হাওয়া এবং রাজনৈতিক আবহ সম্পর্কে। পশ্চিম পাকিস্তানি এই পুলিশ সদস্যদের ছোট ছোট দলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়েছিল এবং তারা কায়েম করেছিল তাণ্ডবের রাজত্ব, হত্যা-ধর্ষণ-লুটপাটের নিষ্ঠুর সব উদাহরণ। কিন্তু পীড়ণ ও তাণ্ডব দিয়ে রক্তক্ষয় ও দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়া যায়, বাঙালিকে অবদমিত করা যায় না। সে ইতিহাসই রচিত হয়েছিল একাত্তরে বাংলার মাটিতে এবং এই ইতিহাস রচনায় পুলিশ বাহিনী রেখেছে বহুমাত্রিক ও অনন্য ভূমিকা।[৩]

Criminal Justice System Administration গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরও উল্লেখ আছে–

> In 1971 the police force took an active part in the liberation war against the Pakistan Army. In fact, on the night of March, 25, 1971 when the liberation was started it was the police force which put up the first organized resistance at Rajarbagh Police Lines, Dhaka. During the war of liberation of large number of police officers and other ranks including one Deputy Inspector-

১. এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, বিশেষ সংখ্যা, পুলিশ সপ্তাহ-১৫, পৃ. ৩১

২. এ এসএম সামছুল আরেফিন, মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. xvii

৩. এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

General. Some Senior Superintendents and many others gave their lives for the cause of liberation."[১]

এইচটি ইমাম তাঁর বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ গ্রন্থে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন– পুলিশবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এ কথা সর্বজনবিদিত। পুলিশবাহিনীর সদস্য এবং অফিসারদের সাহসিকতা এবং ত্যাগ জাতি কখনও ভুলবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের আকস্মিক এবং ঘৃণ্যতম আক্রমণ যুগপৎ শুরু করে পিলখানায়, ই.পি.আর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে গোলাবর্ষণ করে। ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ভাইয়েরা শহিদ এবং আহত হন। যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন। যে সমস্ত জেলায় ভালো এবং সুবিধাজনক অবস্থান ছিল সেসব জায়গায় পুলিশ ভাইয়েরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মুজিবনগরে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম ছিলেন এম. এ. খালেক, রাজশাহীর সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি পরে বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম ডি.জি এবং স্বরাষ্ট্র সচিব পদে নিযুক্ত হন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বজলুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এসপি। বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।[২]

উল্লেখ যে, আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সমগ্র বাংলাদেশের রনাঙ্গণকে ১১ সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া এসময় তিনটি বিগ্রেড গঠন করা হয়। যথা-[৩]

১. এস ফোর্স-অধিনায়ক-মেজর কে. এম শফিউল্লাহ
২. জেড ফোর্স-মেজর জিয়াউর রহমান
৩. কে ফোর্স-মেজর খালেদ মোশাররফ

আরও উল্লেখ যে, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সংক্ষিপ্ত সাংগঠনিক কাঠামো ছিল: [৪]
সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর-মুজিবনগর
প্রধান সেনাপতি: কর্নেল (অব) এম.এ.জি. ওসমানী
চিফ অব স্টাফ : লে. কর্নেল আব্দুর রব
ডিপুটি চিফ অব স্টাফ : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

স্বাধীনতা যুদ্ধে পুলিশের অংশগ্রহণের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

পাকিস্তানের স্বৈরশাসকগোষ্ঠি কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধ সংগ্রাম হিসেবে রাজারবাগের পুলিশ সদস্যগণ সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ ও পাক হানাদার বাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি ছিল এক ভয়ংকর সম্মুখ যুদ্ধ। এজন্য নিঃসন্দেহে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হল আমাদের গৌরবময় মহান স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম যুদ্ধ ক্ষেত্র। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন "পঁচিশে মার্চের সেই কাল রাতে হানাদাররা প্রচণ্ড বাধা পায়। পিলখানার ইপিআর ব্যারাক ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স এর বীর বাঙালি পুলিশ ও

১. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administraion*, Ibid, p. 13; এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
২. এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩. মুহাম্মদ নূরুল কাদির, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩
৪. এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ইপিআর বাহিনী হানাদারদের আক্রমণের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়। বলতে গেলে পিলখানা ও রাজারবাগে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়" ।[১] এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন–

> "The Military had been unable to disarm the Rajarbag Police lines. They wear first to engage in actual battle. After suffering a lot of damaged the Pakistan army retreated to bring in tanks, Motars, heavy arms and machinegun with which they managed to overpower Rajarbag police line".[২]

বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন স্বাধীনতার প্রথম রক্তক্ষয়ী ও সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা হয়েছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন্‌স থেকেই। পাক হানাদারদের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের কথা জেনেই বঙ্গবন্ধুর আহক্ষানে-'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর' মহান চেতনা ধারণ পূর্বক বুকের রক্ত ঢেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে লেঃ জেঃ নাসিম বলেন, "At about middle of the night 32 Punjab Regiment attacked the Rajarbag Police lines and as result a fierce fight continued till 0300 am of 26 March 1971. Most of the police personnel were killed and few could escape".[৩]

১৪ মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণায় দফা ৩(খ)-তে উল্লিখিত ছিল পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সঙ্গে যোগ দিবেন।[৪]

২৫ মার্চ ১৯৭১ সেই রাত্রিতে বাঙালি পুলিশ সদস্যগণ পাক হানাদারদের রুখে দেয়ার প্রতিরোধের মাধ্যমে পুলিশ সদস্য ও জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও সাহসের যোগান দিয়েছিলেন। বারুদের মত মুহূর্তের মধ্যে সে অনুপ্রেরণা ও সাহসের সংবাদ বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সে দিনই চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মেহেরপুর, রাজশাহী, যশোরসহ অনেক পুলিশ লাইন্‌সের অকুতোভয় পুলিশ সদস্যগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। আর বাংলার জনগণও বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালি পুলিশ সদস্যগণ তাদের সাথে আছেন এ মুক্তির সংগ্রামে। মাহবুব উদ্দিন আহমদ (বীরবিক্রম) বলেন–

> "On 25th March, 1971, at 11:30 P.M. we have got information from the Wireless Baseline of Rajarbag Police Line that the Pakistan Army has attacked the Rajarbag Police Line. One Police Constable has informed me about the matter. Instantly I have gone to the Police Station and called the local people and the politicians. The Government Officers of Jheenaidoh were also present there. We all have decided that we will fight against the attack of Pakistan Army. 400 three-zero-three rifles were there at the Jheenaidoh Armory. I have distributed those to the interested people and formed MuktiBahini."[৫]

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক খাতে সাম্য প্রতিষ্ঠা না করে ও পূর্ব পাকিস্তানিদের (বর্তমান বাংলাদেশ) ন্যায্য প্রাপ্য না দিয়ে অন্যায়-অবিচার ও

---

১. কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৮
২. Muhammad Zafar Iqbal, trns. Yeshim Iqbal, *History of Liberation War,* Dhaka : Proteeti, 2008, p. 8
৩. Lieutenant General A S M Nasim (rtd) Bir Bikram, *Bangladesh Fight for Independence*, Dhaka: Columbia Prokasoni, Feb. 2002, p. 61
৪. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪০; সম্পাদনা পরিষদ, *মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৫. http://bangladeshwarcrimes.blogspot.com/2012/11/15-jul-2012-azam-2nd-witness-testimony.html, visited on: 20.05.2014

Dhaka University Institutional Repository

শোষণ-নিপীড়ণের যে ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল, তা বাঙালি পুলিশ সদস্যগণ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এ বিষয়গুলো তাদেরকে মর্মাহত ও বিচলিত করে তুলে। তাই মার্চের সে মহেন্দ্রক্ষণে অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলে রাজারবাগ পুলিশের বীর সদস্যগণ।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ

পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম সবসময় মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম ও সুষম উন্নয়ন ভিত্তিক ন্যায়বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করে। আর এরূপ হক ও ইনসাফ ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় যারা অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের সংগ্রামকেও ইসলাম সমর্থন করে। স্বাধীনতা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জনগোষ্ঠির জন্য এক বিশেষ উপহার ও প্রশান্তির বার্তা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ধরনের পরাধীনতা ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষকে কোনো প্রকার দাসত্ব বা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করা যাবে না– পবিত্র কুরআন থেকে এ চেতনা লাভ করা যায়।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ الوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَاج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّاج لا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

অনু: “তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ–যার অধিবাসী জালিম, তা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর।”[১]

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন–

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهج وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِج لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَاج وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىج وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوْاط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

অনু: “আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। ইয়াতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে– স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”[২]

১. আল কুরআন, ৪ : ৭৫
২. আল কুরআন, ৬ : ১৫১-১৫২

Dhaka University Institutional Repository

ধন-সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার আল-কুরআন স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার। একজনের সম্পদ অন্যে অন্যায়ভাবে নেবে এবং ভোগ করবে তা হতে পারে না। একের সম্পদ অন্যায়ভাবে অপরের ভোগ করার কোনো অধিকার নেই। এ মর্মে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

অনু: "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[১]

মাওলানা ভাসানী বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) যুলুমের প্রতিশোধ নিতে বলেছেন। যালিমের অত্যাচার যে সহ্য করে এবং যে অত্যাচার করে উভয়ে মহাপাপী।"[২]

হাদিস শরিফে অত্যাচারী ও অত্যাচারীত উভয়কে সাহায্য করার জন্য মহানবী (স.) নির্দেশ দিয়েছেন-

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالِما أو مظلوما، قالوا يا
رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالِما قال تأخذ فوق يديه.

অনু: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। তিনি (আনাস) বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ মাজলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে কি করে সাহায্য করব? রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে। (অর্থাৎ তাকে যুলুম করতে দিবে না)।[৩]

স্বাধীনতা একজন মানুষের সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার প্রথম অধিকার। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে শুরু করে সব ধরনের স্বাধীনতাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। মুহাম্মদ (স.)-এর সারা জীবনের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম ছিল মজলুম মানুষের স্বাধীনতা অর্জন ও প্রভূর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (স.) বলেন–

عن عبيد الله ابن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب.

অনু: "জারির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপকার্য সংঘটিত হয় এবং তাদের নেককার ব্যক্তির তাদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ও সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও তারা পাপকার্য থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখে না, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করেন।"[৪]

হাদিসে আরও উল্লেখ রয়েছে–

১. আল কুরআন, ৪ : ২৯
২. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২
৩. বুখারী শরীফ, ঢাকা: ইফাবা, অষ্টম সংস্করন, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮
৪. আবু আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী, সম্পাদনা: ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১৪, পৃ. ৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر.

অনু : "আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যালিম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলাই উত্তম জিহাদ।"[১]

প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজ থেকে অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আহব্বান। সকল প্রকার শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের মূলে রয়েছে জুলুম। পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ করা হয়। পরাধীনতা জুলুমের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অথচ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের অবসান ঘটানো ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের একটি বাণী এখানে প্রণিধানযোগ্য। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْاط إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অনু: "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[২]

হাদিসে আরও উল্লেখ রয়েছে–

عن طارق بن شهاب ... قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم تستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

অনু: "তারিক ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত। .... আবু সাঈদ (রা.) বলেন– আমি রসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), এর এটাই ইমানের নিম্নতম স্তর।"[৩]

জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা' পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয় যে, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দু'টি পৃথক ইসলামি রাষ্ট্র গঠণ না করায় পাকিস্তান জন্মের পর দুই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। (ক) পশ্চিম পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উপর একচেটিয়া শাসন, শোষণ ও নির্যাতন (খ) ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর অবিরাম নিপীড়ণের ফল স্বরূপ এক শ্রেণির মুসলিমদের আদর্শিক মৃত্যু হয়।[4]

ইবনে খালদূন বলেন, "জুলুম ব্যাপক অর্থবহ, যারা কোনো অধিকার ছাড়া সম্পদ আহরণ করে তারা জালিম। যারা অন্যের সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে তারা জালিম এবং যারা মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে তারাও জালিম। মালিকানা হরণকারীরাও সাধারণত জালিম। এসবের খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে রাষ্ট্রের উপর সামাজিক বিকৃতির আকারে। সর্বস্তরের জনগণের সম্পদ

১. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪
২. আল কুরআন, ২ : ১৯০
৩. মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৪. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০০

Dhaka University Institutional Repository

লোপাট ও সর্বাবস্থায় জনগণকে শোষণ করার অনিবার্য পরিণতি থেকে উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকৃতি।"[১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে অত্যাচারী শাসকের শাসন বা খিলাফত আইনত অবৈধ। তাই এই ধরনের রাষ্ট্র প্রধানকে বল পূর্বক অপসারণ করাই কর্তব্য। তাঁর মতে এরূপ রাষ্ট্র প্রধানকে বল পূর্বক অপসারণ জনসাধারণের যে শুধুমাত্র অধিকার আছে, তাই নয়; সশস্ত্র বিদ্রোহ করা জনগণের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহ শুধুমাত্র সঙ্গত নয়, ফরজ।[২]

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন মুসলিম। এদেশকে ইসলাম থেকে আলাদা করা যায় না। ইসলামের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং এ অঞ্চলের মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য সত্তা রক্ষার একমাত্র উপায় হলো বাংলাদেশ। সারা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি জীবনাদর্শন ভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন ছিল পৃথক রাষ্ট্রের। এ অঞ্চলের ৯ কোটি মুসলিমের স্বতন্ত্র সত্তা এবং অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন বাংলাদেশের। যার ভিত্তি ছিল শেরে বাংলা ফজলুল হক আনীত লাহোর প্রস্তাবে।[৩]

উপরে বর্ণিত কুরআন, হাদিস ও ইসলামি গবেষকদের বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনী পাকিস্তান সরকারের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল তা একটি মহৎ কাজ ও জিহাদের পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম সবসময় সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে উৎসাহিত করে। শোষণ-নিপীড়ণ, জুলুম ও অগ্নিসংযোগকে গর্হিত ও ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। অন্যায়ভাবে নরহত্যা ও সম্পদ হরণকে নিষিদ্ধ করা হলেও পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পূর্ব বাংলার মুসলিমসহ সকল জনগোষ্ঠীর উপর যে বর্বোরোচিত গণহত্যা, লুন্ঠণ ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে তা ইসলামের দৃষ্টিতে কখনও সমর্থন যোগ্য হতে পারে না। এ প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাথে রাজারবাগে বাঙালি পুলিশ সদস্যরা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রহরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলে তা ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থন যোগ্য ও বৈধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের শামিল।

ইসলাম মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জোরালো তাগিদ দিয়েছে। রসুলুল্লাহ (স.) হিজরত করার পর মদিনাকে নিজের মাতৃভূমি হিসেবে গণ্য করেন এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের অনেক প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মদিনা রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য। মদিনায় হিজরতের পরেও কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী ও শিশু মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হন, যাদের হিজরত বা দেশত্যাগ করার কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তারা মূলত মক্কায় পরাধীন অবস্থায় নির্যাতিত জীবন থেকে মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করছিলেন। অতঃপর ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে মক্কা বিজয় হয়। স্বাধীনতাকামী মজলুমদের আকুল প্রার্থনা মক্কা বিজয়ের মধ্যদিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সত্য-সুন্দরের বোধ তৈরি করে এবং তাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে সমর্পিত হওয়ার প্রেরণা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজ থেকে অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা ইসলামের গুরুত্ব আহক্ষান। সকল প্রকার শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের মূলে রয়েছে জুলুম। পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও

---

১. আব্দুর রহমান ইবন খালদুন, *আল মুকাদ্দিমাহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ৪১৫

২. এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ৩য় সংস্করন, ডিসেম্বর-১৯৯৬, পৃ. ১০৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীনতার শৃঙ্খল অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ করা হয়। পরাধীনতা জুলুমের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অথচ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের অবসান ঘটানো ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই মানব জীবনে সার্বভৌম রাষ্ট্র অতীব প্রয়োজনীয়। স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত সমাজ বা জনগোষ্ঠী তৈরি করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ইতিহাসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ মুক্তিসংগ্রাম, গণআন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম কর্মের মধ্যে আত্মদানকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান নেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মর্যাদা অতি মহান, অতি উচ্চে। তাঁরা দেশ ও জাতির গৌরব। ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁরা শহিদ, শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনে স্বাধীনতা মহান আল্লাহর অপূর্ব দান। স্বাধীনতার জন্য শোকর আদায় করে শেষ করা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে সুসংহত করা ও সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।[১]

১. তাসমিমা হোসেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা : ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ২০ মার্চ, ২০১৫, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাস এই দেশের সামাজিক জীবনের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। তবে বর্তমানের পেশাদারি পুলিশি ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াইশ' বৎসর আগে। আইরিশ কনস্ট্যাবুলারির আদলে ১৭৫০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে পুলিশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়া পুলিশ সদস্যসহ লাখো প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে বর্তমান পুলিশ বাহিনী। অধুনালুপ্ত পাকিস্তান পুলিশের বাঙালী সদস্যরাই ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম সদস্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরল শৌর্য গাঁথা ও আত্মোৎসর্গের মহিমার অধিকারী স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশবাহিনী জনগণের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আর এ কাজটি করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অপরিহার্য। নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানে রাষ্ট্রে পুলিশ বাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের পবিত্র সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে,

> "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"[১]

জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধানের জন্য অপরাধ দমন, অপরাধ উদ্ঘাটন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, অপরাধীদের শাস্তিপ্রদানের জন্য বিচারের সম্মুখীন করা, জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ-এক কথায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই পুলিশের প্রধান কাজ। সমাজে পুলিশের দৃশ্যমান উপস্থিতি অনেক অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে এবং জনমনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে। সেজন্য সমাজের সর্বত্র দৃশ্যমান পুলিশের চৌকস অবস্থান অতীব জরুরি।[২]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি আর্মি মুক্তি-বাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। পুলিশবাহিনীর যেসকল সদস্য মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল এবং যারা পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদের সকলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী গঠন করেন। প্রাদেশিক পুলিশবাহিনী স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় পুলিশের মর্যাদা লাভ করে।[৩]

দেশের উন্নয়ন, মর্যাদা ও সার্বভৌমতা রক্ষার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু দেশের মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য দক্ষ পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক দেশের সামাজিক মঙ্গলের জন্য পুলিশের ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন যে,

> æA strong army and efficient police, are likely to do more for Indian self-esteem and independence than any result that could possibly emerge from planning. The major problem in India is that of development, we must never

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

২. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

lose sight of this objective. The army and police only provide the background because they create the condition in which that development is possible. In India there is a hangover of old days when the police was distrusted and considered as something apart from the citizen.This may be the attitude of suspicion, which has influenced the pattern of national planning in which the police does not fit in.All the countries hold strong views on the fact that a strong and efficient police service is necessary for the well-being of the community to a greater degree than another public service in peace time.” [১]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী একটি সফল পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার তাগিদ অনুভূত হয়। এজন্য জনবল, যানবাহন ও লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। এ সম্পর্কে Police Administration in Bangladesh গ্রন্থের লেখক A.B.M. Kibria উল্লেখ করেন–

"With the liberation of Bangladesh on Decemder 16, 1971, the police Organisation had to be re-activated the people demanded effective service which was difficult to render in view of the shortage of manpower, transport and equipment. The force was considerably augmented by recruitment in 1972. The demand for service was so acute the police officers had to be fielded without much consideration for their training. The duties and responsibilities of the police have increased considerably since independence and they are, no doubt, discharged in difficult citcumstances."[২]

(ক) বাংলাদেশ পুলিশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য (VISION): দক্ষতা, যথোপযুক্ততা ও নিঃস্বার্থ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে নাগরিকদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনপূর্বক একটি সমৃদ্ধ ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য উন্নতমানের সেবা প্রদান করা।

উদ্দেশ্য (MISSION): বাংলাদেশ পুলিশ আইনের প্রয়োগ, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধের ভীতি হ্রাস, জনগণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থনে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বাংলাদেশ পুলিশের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction)

(ক) বাংলাদেশ পুলিশ হল বাংলাদেশের জাতীয় সংস্থা (Bangladesh Police is the National Police Organization of Bangladesh)

(খ) এটি সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত (It is spread all over the country)

(গ) এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে থাকে (It works under the administrative control of the Ministry of Home Affairs)

(ঘ) অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক এর অধিক্ষেত্রকে বাঁধা দেয়া যাবে না (Its jurisdiction is not barred by the presence of any designated Agency)

---

১. Joginder Signh, Inside Indian Police, New Delhi: Gyan Publishing House, 2002, p. 104-105

২. A.B.M.G. Kibria, *Police Administration in Bangladesh,* Ibid, p. 15

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত ধারনা ও পুলিশি মানসিকতার প্রয়োগ[১]

পুলিশকে বলা হয়ে থাকে, রাষ্ট্রের দৃশ্যমান অবয়ব (Visible Face of the State) এবং গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদান (Vital element of democracy)। তাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পুলিশকে আরও ন্যায়পরায়ণ, পরার্থবাদী, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন, সহযোগিতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। জনবান্ধব পুলিশ সম্পর্কে বলা হয়-"Policing as an institution reflectes the physique and anatomy of its social fabric and empowered by the state to enforce the law, protect life and property, and control civil disorder."। তাই পুলিশকে নিম্নলিখত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক–

(১) টেকনোলজি নির্ভর, বুদ্ধিপ্রবণ, নিরোধমূলক এবং সৃষ্টিশীল পুলিশিং-এর উপর বেশি জোর দিতে হবে।

(২) মান উন্নয়নের পদ্ধতি প্রচলন করা।

(৩) কমিউনিটি পুলিশের দর্শনকে সারা দেশব্যাপী নিবিড়ভাবে কাজ করা উচিত।

(৪) ন্যায়বিচারের জন্য তদন্ত,অপারেশন ও প্রসিকিউশন ব্যবস্থায় আরও গতিশীলতা আনয়ন প্রয়োজন।

বিভিন্ন দেশের পুলিশ-জনতার গড়: [২]

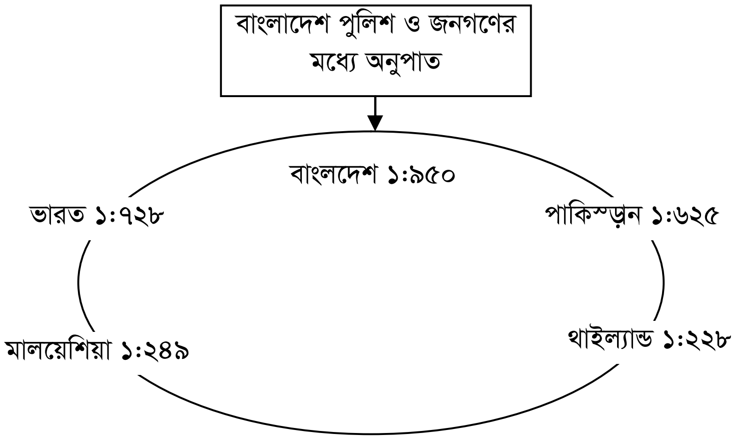

UN Standard অনুযায়ী পুলিশ এবং জনতার অনুপাত হলো ১:৪০০।

---

১. AFWC এর প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক পুলিশ হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনকালীন সময়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত উপস্থাপনা ২৫/৮/২০১৫ খ্রি.

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে প্রতি ১০৩০ মানুষের বিপরীতে রয়েছেন একজন পুলিশ সদস্য। জাপানে প্রতি ২৫০ মানুষের বিপরীতে রয়েছেন একজন পুলিশ সদস্য। পাশের দেশ ভারতে রয়েছে প্রতি ৭৩০ জনে একজন পুলিশ সদস্য। এসব বিবেচনা করে পুলিশি সেবা বাড়াতে বাহিনীতে আরো সদস্য নিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বর্তমানে পুলিশে জনবল ১ লাখ ৫৫ হাজার।[১]

(খ) বাংলাদেশ পুলিশের সাংগনিক কাঠামো:[২]

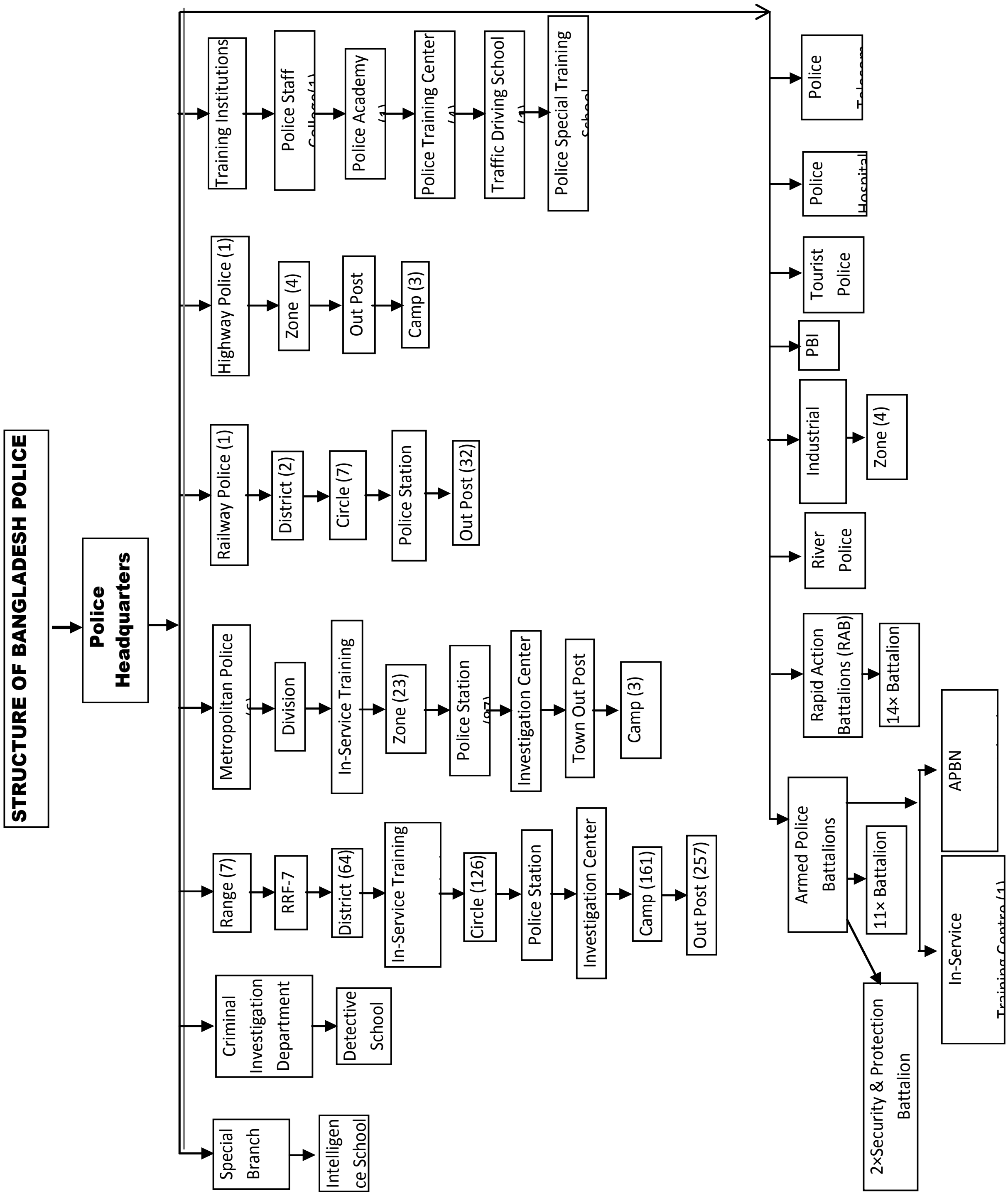

১. দৈনিক ইত্তেফাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, পৃ. ২
২. ওএন্ডএম শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা-ডিসেম্বর ২০১৫

পুলিশের কার্যাবলী (Police Activities)

"দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" পুলিশের ধর্ম। এ-কাজ খুবই কঠিন এবং দুরূহ। একজন পুলিশ অফিসারকে একই সাথে শিষ্টের সাথে নম্র এবং অপরাধীর সাথে কঠোর আচরণ করতে হয়। পুলিশকে আইন মোতাবেক কাজ করতে হয় আবার জনপ্রত্যাশার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। অর্থাৎ একই সাথে আইন ও জনপ্রত্যাশাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। পুলিশকে প্রায় সময়ই উত্তেজনাকর সংকটময় পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হয়। অনেক সময় এসব সিদ্ধান্ত জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে।

August Vollamer মতে জনগণ প্রত্যাশা করে যে, একজন পুলিশ অফিসারকে সর্বগুণে গুনান্বিত হতে হবে। একজন পুলিশ অফিসারের থাকবে "The wisdom of Solomon, the courage of David, the strength of Samson, the patience of Jacob, the leadership of Moses, the kindness of the good Samaritan, the strategy of Alexander, the faith of Deniel, the diplomacy of Lincoln, the tolerance of the Carpenter of Nazareth, and finally, an intime knowledge of every branch of the natural, biological and social science."[১]

বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত। আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারিদের কর্তব্যের কথা উল্লেখ রয়েছে, ২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।[২]

নিরবিচ্ছিন্নভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করাই এ সংস্থার কাজ। বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শান্তি রক্ষা করে চলছে। বাংলাদেশ পুলিশের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো–

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ (Crime Control)

১. অপরাধ দমন ও উদ্ঘাটন।

২. আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ ও নাগরিকদের জান-মাল রক্ষা করা।

৩. শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা।

৪. নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ করা।

৫. সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষা করা।

৬. ঘটনার তদন্ত করা।

৭. নিরাপত্তামূলক বুদ্ধিবৃত্তি লালন করে নাগরিকদের মানসম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তি ও সমাজের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।[৩]

---

১. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Dhaka: Jatiya Mudran, 1st publication, Jun-2014, p. 53-54

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security)

(১) টহল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (২) বিশেষ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (৩) ভিআইপি ও ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (৪) বিশেষ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (৫) জাতীয় অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

সামাজিক সম্পৃক্ততা (Social Integration)

(১) জনসচেতনতা গড়ে তোলা (২) কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা চালু (৩) মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনসেবা (৪) সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ (৫) জনগণের জন্য ওপেন হাউজ ডে পালন (৬) ভুক্তভোগীদের সহায়তায় কেন্দ্র স্থাপন ।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের দায়িত্বপালন **(Performing internationally)**

(১) আন্তদেশিয় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সাড়া দেয়া (Addressing Transnational Crimes (Interpol, SAARCPol সহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে)

(২) জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (Participating in UN Peacekeeping Missions)

বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক প্রকাশিত ডিটেকটিভ গ্রন্থে পুলিশের নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে–[১]

(১) দেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা (২) জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা (৩) অপরাধের দমন ও শনাক্তকরণ এবং অপরাধীদের আইনের আশ্রয়ে সমর্পণ করা (৪) জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান (৫) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (৬) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ (৭) রাজনৈতিক ও অপরাধ তথ্য সংগ্রহ (৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণকে সাহায্য করা (১০) অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতাকরণ (১১) সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোনো নির্দেশনা (Any other task assigned by the government from time to time the traditional role of police in)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সিটিজেন চার্টারে পুলিশের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো–[২]

১. বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের সেবা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।

২. জাতি ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক/সামাজিক/অর্থনৈতিক শ্রেণি নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি থানায় সকল নাগরিকের সমান আইনগত অধিকার লাভের সুযোগ রয়েছে।

৩. থানায় আগত সাহায্যপ্রার্থীদের আগে আসা ব্যক্তিকে আগে সেবা প্রদান করা হবে।

৪. থানায় সাহায্যপ্রার্থী সকল ব্যক্তিকে থানা পুলিশ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সম্মানসূচক সম্বোধন করবে।

৫. থানায় জিডি করতে আসা ব্যক্তির আবেদনকৃত বিষয়ে ডিউটি অফিসার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং আবেদনের ২য় কপিতে জিডি নম্বর, তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর তা আবেদনকারীকে প্রদান করতে হবে। বর্ণিত জিডি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা পুনরায় আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে।

---

১. এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, প্রাগুক্ত, মার্চ-২০১৪, পৃ. ৬০; Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administraion*, Ibid, p. 14

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সিটিজেন চার্টার*, ঢাকা : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়ল, ২০০৭, পৃ. ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

৬. থানায় মামলা করতে আসা ব্যক্তির মৌখিক/লিখিত বক্তব্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এজাহারভুক্ত করবে এবং আগত ব্যক্তিকে মামলার নম্বর, তারিখ ও ধারা এবং তদন্তকারী অফিসারের নাম ও পদবি অবহিত করবে। তদন্তকারী অফিসার এজাহারকারীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তদন্ত সমাপ্ত হলে তাঁকে ফলাফল লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে।

৭. আহত ভিকটিমকে থানা থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে থানা সকল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবে।

৮. শিশু/কিশোর অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়ে শিশু আইন, ১৯৭৪ এর বিধান অনুসরণ করা হবে এবং তাঁরা যাতে কোনোভাবেই বয়স্ক অপরাধীর সংস্পর্শে না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে কিশোর হাজতখানার ব্যবস্থা করা হবে।

৯. মহিলা আসামি/ভিকটিমের জন্য যথাসম্ভব মহিলা পুলিশের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১০. থানার পুলিশ সদস্যগণ কমিউনিটির সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড পুলিশ সার্ভিস চালু করবেন।

১১. উধর্ক্ষতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কমিউনিটির সহিত অপরাধ দমনমূলক/জনসংযোগমূলক সভা করবেন এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের আইনগত সমাধানের প্রয়াস চালাবেন।

১২. বিদেশে চাকুরী/উচ্চ শিক্ষার জন্য গমনেচ্ছু প্রার্থীদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

বাংলাদেশ পুলিশ প্রধানত নিম্নলিখিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়

১। পুলিশ আইন, ১৮৬১ (Police Act, 1861)

২। পুলিশ রেগুলেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৪৩ (The Police Regulation of Bengal, 1943)

৩। মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশ/আইন (Metropolitan Police Ordinance/Acts)

৪। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান অর্ডিনেন্স, ১৯৭৯ (The Armed Police Battalion Ordinance, 1979)

৫। আর্মড পুলিশ অর্ডিনেন্স (সংশোধিত), ২০০৩ (The Armed Police (Amendment) Act, 2003)

এ ছাড়া বাংলাদেশ পুলিশকে আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রধান আইনগুলো অনুসরণ করতে হয়–

ফৌজদারি কার্যবিধিঃ এ আইন ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি নামে অভিহিত হবে এবং এটা ১৮৯৮ সালের ১ জুলাই হতে কার্যকরী হবে।

এটা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হবে, তবে বিপরীত কোনো সুস্পষ্ট বিধান না থাকলে ইহা বর্তমানে বলবৎ কোনো বিশেষ আইন, কোনো বিশেষ এখতিয়ার অথবা ক্ষমতা অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা নির্ধারিত কোনো বিশেষ কার্যবিধি প্রভাবিত করবে না।[১]

১৮৩৩ সনের চার্টার এ্যাক্টের সুপারিশক্রমে স্থাপিত প্রথম “ল” কমিশন, ১৮৪১ সনে ফৌজদারি কার্যক্রমের নিরিখে একটি খসড়া উপস্থাপন করেছিল যা পরবর্তীতে ২য় “ল” কমিশন বিবেচনায় এনে তারা অঞ্চলভেদে সর্বমোট চারটি ফৌজদারি কার্যবিধির খসড়া বিল তৈরি করেছিল। অঞ্চলগুলো

---

১. The Code of Criminal Procedure-1898, Section-1, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-IV, p. 38

Dhaka University Institutional Repository

ছিল– (১) বাংলা, (২) মাদ্রাজ, (৩) মুম্বাই ও (৪) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। পরবর্তীতে এ চারটি খসড়াকে একত্রিত করে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য একটি খসড়া তৈরি করা হয় যা ১৮৬১ সনে ফৌজদারি কার্যবিধি আইন হিসেবে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৮৭২, ১৮৮২ এবং সর্বশেষ ১৮৯৮ সালে ও সংশোধিত আকারে বর্তমানরূপ নেয়। যা এদেশে এখনো কার্যকর আছে। ১৯৭৮ সনে স্বাধীন বাংলাদেশে আইন সংস্কার আদেশ LRO (Law Reforms Ordinance)-এর মাধ্যমে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালেও ফৌজদারি কার্যবিধি আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। যা বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যকরী রয়েছে।[১]

দণ্ডবিধি

ধারা-২। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধসমূহের শাস্তি: প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই বিধির বিধানসমূহের পরিপন্থী যে কার্য বা বিচ্যুতির জন্য দোষী গণ্য হবে, তার প্রত্যেক কার্য বা বিচ্যুতির জন্য এই বিধির অধীনে এবং প্রকারান্তরে নয়–দণ্ডনীয় হবে।[২]

ধারা-৩। বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত কিন্তু আইন বলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিচারযোগ্য অপরাধসমূহের শাস্তি: বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত যে কোনো কার্যের জন্য এই বিধির বিধানসমূহ অনুসারে বিচার করা হবে যেন অনুরূপ কার্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে।[৩]

১৮৩৩ সনের চার্টার এ্যাক্ট এর ক্ষমতাবলে ১৮৩৪ সনে প্রথম "ল" কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড ম্যাকুলে। সদস্য ছিলেন মিঃ ম্যাকলিয়র্ড, মিঃ এন্ডারসন ও মিঃ মিলেট, তারা ১৮৩৭ সালের ১৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল-এর কাছে দণ্ডবিধির একটি খসড়া পেশ করেছিলেন যা ম্যাকুলে কোড নামেও অবিহিত ছিল। ১৮৬০ সনের পূর্ব পর্যন্ত ম্যাকুলে কোড আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। এই কমিশন দণ্ডবিধির খসড়া প্রণয়নকালে ব্রিটিশ ও ভারত উপমহাদেশীয় আইন, লিভিং স্টোনের কোড অব লুসিয়ানা, কোড অব নেপোলিয়ানের ধারাসমূহ পর্যালোচনা করেছিলেন। এই খসড়া আইনটিকে পর্যালোচনা করার জন্য কলকাতার তদানীন্তন বিচারপতি স্যার বার্নেস পিকক-এর নেতৃত্বে এবং বিধান সভার কয়েকজন সদস্য নিয়ে আরেকটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে দণ্ডবিধির খস্ড়া বিল বিধানসভায় উপস্থাপনা করা হলে দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত বিতর্ক ও বিশ্লেষণের পর ১৮৬০ সনের ৬ অক্টোবর খসড়াটি বিধানসভা কর্তৃক আইনে পরিণত হয় এবং এর মাধ্যমে উপমহাদেশে অতীতে জারিকৃত সমস্ত ফৌজদারি আইনের বিধি, রেগুলেশন ও আদেশ বাতিল ঘোষিত হয়। ১৮৬২ সনের ১ জানুয়ারি থেকে Indian Penal Code নামে এই আইনটি কার্যকরী হয়। যা ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পাকিস্তান পেনাল কোড এবং ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের জন্মের পর ১৯৭২ সনের ২২ মে প্রেসিডেন্টের ৪৮ আদেশবলে দণ্ডবিধি একটি স্থায়ী আইন হিসাবে বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে।[৪]

সাক্ষ্য আইন (Evidence)

এ আইন ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন নামে অভিহিত হবে। এটা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে এবং ১৯৫২ সালে সেনাবাহিনী আইন অথবা ১৯৬১ সালের নৌ-শৃঙ্খলা আইন অথবা ১৯৫৩ সালের বিমান বাহিনী আইন অনুসারে গঠিত সামরিক আদালত ব্যতীত সকল আদালত ও সামরিক আদালতে সকল

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা, খোশরোজ কিতাব মহল-২০১১, পৃ. ৫৪
২. Penal Code-1860, Section-2, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-I, p. 68
৩. Penal Code-1860, Section-3, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-I, p. 68
৪. আহমেদ আমিন চৌধুরী, বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১১, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার বিচার কার্যে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এ আদালতে কিংবা অফিসারের নিকট উপস্থাপিত এফিডেবিট বা সালিশের কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে না। এ আইন ১৮৭২ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর তারিখে বলবৎ হবে।[১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসিত পাক-ভারত উপমহাদেশে বিচারকার্যে ব্রিটিশ সাক্ষ্য আইন অনুসরণ করা হলেও কদাচিৎ স্থান, সময়, পরিবেশ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে আইন পরিষদ কর্তৃক ব্রিটিশ সাক্ষ্য আইনে সংশোধনী এনে এ দেশে বিচারকার্য পরিচালিত হত। ১৮৭২ সনে স্যার জেএফ স্টিফেন কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য আইনের খসড়াটি ১নং আইন হিসেবে পাস হয়। সাক্ষ্য আইনের জন্ম ১৮৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে আজ অবধি একশত আটত্রিশ বছর অনেক আবর্তন-বিবর্তন, উত্থান-পতন নবরাষ্ট্রের সূচনা, শতাব্দীর অগ্রগতি সত্ত্বেও অতি সামান্য সংশোধনী নিয়ে এখনো সাক্ষ্য আইন এই শতাব্দীতেও বীরদর্পে টিকে রয়েছে। এ আইনের মূল উৎস ব্রিটিশ সাক্ষ্য আইন। মূলত ১৮৩৫ থেকে ১৮৫২ সন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে সাক্ষ্য আইনের কিছু কিছু অংশ এদেশের বিচার পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছিল। ১৯৫২ সালের সেনাবাহিনী আইন, ১৯৬১ সনের নৌ শৃঙ্খলা আইন এবং ১৯৫৩ সালের বিমান বাহিনী আইন অনুসারে গঠিত সামরিক আদালত ছাড়া সকল আদালত ও সামরিক আদালতে এই আইন এখনও বলবৎ রয়েছে।[২]

বাংলাদেশ পুলিশ প্রবিধান ১৯৪৬

প্রবিধি-২। এ নিয়মসমূহ কেবলমাত্র বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৩]

প্রবিধি-৩। এ প্রবিধান কেবলমাত্র বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৪]

১৮৬১ সনের ৫ নম্বর আইন (পাঁচ আইন) হিসেবে পরিচিত পুলিশ আইনের ১২ ধারায় দেয় ক্ষমতাবলে মহাপুলিশ পরিদর্শক তৎকালীন সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশ বাহিনীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকল্পে যে বিধিমালা প্রণয়ন করেছিলেন তাই পিআরবি বা পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল নামে পরিচিত। পিআরবি-এর খসড়া প্রথম প্রণীত হয় ১৯২৭ সনে। ১৯৪৬ সনের ১ জানুয়ারি থেকে এ বিধিমালা সামান্য সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে আজও টিকে আছে। এই প্রবিধান গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯৩৫ (সংবিধান) ২৪১ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত হয়। ১৮৬১ সনের পুলিশ আইনের ২, ৩, ৭ ও ১২ ধারা অনুযায়ী এই প্রবিধান গঠিত হয়। এটা সাংবিধানিক আইন এবং সংসদীয় আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রণীত ও অনুমোদিত বলে এটা মূল আইনের মতই শক্তিশালী। এটা পুলিশের সম্পূর্ণ আচরণবিধি, ক্ষমতা, প্রয়োগ ও কার্যক্রম সম্পৃক্ততা নির্দেশক বহি। সম্পূর্ণ আচরণবিধি বই আকারে ইংরেজিতে AE PORTER তৎকালীন এডিশনাল সেক্রেটারী টু দি গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, হোম ডিপার্টমেন্ট ক্যালকাটা থেকে ২১ জানুয়ারি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। যা ১ জানুয়ারি ১৯৪৬ থেকে কার্যকারিতা লাভ করে।[৫]

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচিতি

১. The Evidence Act, 1872, Section-1 *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-I, p. 439
২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৩. গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের পুলিশ প্রবিধানের ভাষ্য*, ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, মে ২০০৫, পৃ. ৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৫. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম ডিআইজি'র দায়িত্ব সম্পাদন করেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি স্যার নর্টন জোন্স এবং প্রথম বাঙালি আইজি ছিলেন জনাব জাকির হোসাইন। বর্তমান সময়ে পাক-বাংলা ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ উদ্ভাবিত আইরিশ কনস্টেবিউলারি পুলিশ পদ্ধতিই চালু রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হলেন পূর্বের ন্যায় 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ' (আইজিপি)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে তিনি দেশের সকল পুলিশ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাকে পুলিশ সদর দপ্তরে সহযোগিতা করেন কয়েকজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশ প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য সিভিল প্রশাসনিক ইউনিট প্রত্যেক রেঞ্জে একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি তার রেঞ্জের অধীনস্থ জেলার পুলিশ প্রশাসন খবরদারি করেন। বাংলাদেশে ছয়টি সিভিল রেঞ্জ ও একটি রেলওয়ে রেঞ্জ রয়েছে। প্রতিটি রেঞ্জে রয়েছেন একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল। এছাড়া ঢাকা মহানগর ব্যতিত তিনটি মহানগর পুলিশ কমিশনার, সিআইপি'র প্রশাসনিক প্রধান, এসবি এবং সারদা একাডেমীর প্রধানের পদবি হল অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ।

জেলা পর্যায়ে সকল পুলিশের প্রশাসন পরিচালক হলেন জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট। জেলা পুলিশ সুপারকে প্রশাসনিক কার্যে সহযোগিতা করেন একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং আরও ক'জন সহকারী পুলিশ সুপার আর তার দাপ্তরিক স্টাফ। সার্কেলের প্রশাসন পরিচালনা করেন একজন সহকারী পুলিশ সুপার। সার্কেলের অধীনস্থ প্রতিটি থানায় পুলিশ প্রশাসন পরিচালনা করেন একজন ইন্সপেক্টর বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও.সি)। জেলা পুলিশ সুপারের অধীনে জেলা সদরে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ স্পেশাল আমর্ড ফোর্স রিজার্ভ থাকে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে জরুরি ভিত্তিতে এ ফোর্স রিজার্ভ থাকে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে জরুরি ভিত্তিতে এ ফোর্স মোতায়েন করা হয়। সিআইডি ও এসবি পুলিশ কেন্দ্রীয় দপ্তর ছাড়া জেলা পুলিশের সমান্তরাল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে রেঞ্জের অধীনস্থ দুটি রেলওয়ে জেলায় রেলওয়ে পুলিশের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন দুজন পুলিশ সুপার। পুলিশ সুপারকে প্রশাসনিক কার্যে সহযোগিতা করেন একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী পুলিশ সুপার। রেলওয়ে স্পেশাল আমর্ড ফোর্স নামে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ তার অধীনে ন্যস্ত থাকে।[১]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পুলিশের কর্মতৎপরতা সম্প্রসারণের জন্য চারদিক থেকে গণদাবি উত্থাপিত হয়। অপরদিকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থায় অসংখ্য অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়িতে জনজীবন ছিল এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত। অপরাধপ্রবণতায় দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকবল ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির অভাবে পুলিশ বাহিনী এ অবস্থায় যথোপযুক্ত মোকাবেলা করে উঠতে পারছিল না।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পুলিশ বিধি-বিধান অপরিবর্তিত রেখে এবং বৃহত্তর পুলিশ ইউনিটগুলো পূর্বাবস্থায় রেখেই পুলিশি ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রথম দশকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য আলাদা মহানগর পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ,

১. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ-মার্চ-২০০৯, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৯৯২ সালে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ এর যাত্রা শুরু হয়।[১] যার ফলে নাগরিক জীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এসেছিল। মহানগর পুলিশ ছিল নগর জীবনের আর্শীবাদস্বরূপ। এ বিভাগের উন্নত প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা, অপরাধ ও প্রতিরোধে ক্ষিপ্রতা, সর্বোপরি এ বিভাগে নিয়োজিত লোকদের সেবাধর্মী মনোভাব পুলিশ বিভাগের এক সাফল্যের নজির স্থাপন করে।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত একটি পুলিশ কমিশনের নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে সরকারের মনোনীত না হওয়ায় উল্লিখিত নীতিমালা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে একটি নীতিমালা প্রণীত হয়। এ নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করেন তৎকালীন আইজিপি জনাব এ.আর.খন্দকার, অতিরিক্ত আইজিপি, জনাব তৈয়ব উদ্দিন আহম্মেদ ও আরো অনেক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে এ প্রতিবেদনটি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকারের পতন ঘটলে এ নীতিমালা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

তবে এ সরকারের আমলে পুরাতন বৃহত্তর ১৯টি জেলাকে ভেঙ্গে ৬৪টি বড় জেলার সৃষ্টি করা হয়। থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করে এবং অনেকগুলো নতুন থানা ও ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নতুন নতুন প্রশাসনিক ইউনিট সৃষ্টির ফলে বাংলাদেশে অনেকগুলো ছোট-বড় পুলিশ ইউনিট স্থাপিত হয়। এর ফলে কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত পুলিশি ব্যবস্থা প্রসারিত হয়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অধীন বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিটগুলো নিম্নলিখিত বিভিন্নভাগে বিভক্ত। এরমধ্যে ১০টি রেঞ্জ যথা-(১) ঢাকা রেঞ্জ (২) চট্টগ্রাম রেঞ্জ (৩) খুলনা রেঞ্জ (৪) বরিশাল রেঞ্জ (৫) রংপুর রেঞ্জ (৬) সিলেট রেঞ্জ (৭) রাজশাহী রেঞ্জ (৮) ময়মনসিংহ রেঞ্জ, (৯) হাইওয়ে রেঞ্জ ও (১০) রেলওয়ে রেঞ্জ।

বর্তমানে দেশের মেট্রোপলিটনগুলো হল: (১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (২) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (৩) খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (৪) বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ (৫) সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (৬) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ।[২]

প্রত্যেকটি রেঞ্জের পুলিশ প্রধান ছিলেন একজন ডিআইজি। বরিশাল জেলার ৬টি জেলা নিয়ে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই থেকে বরিশাল রেঞ্জ এবং ১৯৯৫ সালে ১ জুলাই থেকে বৃহত্তর সিলেট জেলার নবগঠিত ৪টি জেলা নিয়ে রেঞ্জ গঠিত হয় এবং ২০১১ সালে রংপুর রেঞ্জ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে দেশে বিভাগের সংখ্যা ০৮টি। প্রতিটি রেঞ্জের দায়িত্বে থাকেন একজন ডিআইজি।

মহকুমা বিলুপ্তি ও নতুন জেলা গঠন

মহকুমা প্রশাসনে শাসন ধারা ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পার হয়েই ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরশাদ সরকারের সময়ে প্রতিটি মহকুমা বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে পুলিশ সুপার পদবির অফিসারদের পদায়ন হতে থাকে।

সার্কেল এএসপি

---

১. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Dhaka: Sumi Printing Press & Packing 2001, p. 16

২. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On : 3/12/2015

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ আমল থেকে পুলিশ সার্কেলে ইন্সপেক্টর/সিআই পদায়নের ধারা পাকিস্তান আমল পার হয়ে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৮৪ সাল থেকে পুলিশের প্রতিটি সার্কেলে সিআইদের বদলে সহকারী পুলিশ সুপার/এএসপি'দের পদায়ন হতে থাকে।[১]

থানার ইনচার্জ

১৮৬১ সাল থেকে এদেশে পুলিশি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট ছিল থানা। থানা অফিসার ইনচার্জ হিসেবে তখন থেকে দায়িত্বপালন করত সাব-ইন্সপেক্টর পদবির একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তা। এই ধারা ব্রিটিশ আমল শেষে পাকিস্তান আমল পার হয়ে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত টিকে থাকে। ১৯৮৪ সাল থেকে থানার দায়িত্বে পদায়ন করা হয় ইন্সপেক্টর পদবির/আন-আমর্ড অফিসারদেরকে।[২] থানা হল অপরাধ দমন, অনুসন্ধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মৌলিক ইউনিট (Basic Unit)।[৩]

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পুলিশ সুপার ঢাকার অধীনে কোতোয়ালি, সূত্রাপুর, রমনা, লালবাগ, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, তেজগাঁও ও গুলশান এই ৮টি থানার মাধ্যমে রাজধানী ঢাকা মহানগর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা হত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ঢাকা লাল সবুজ পতাকা খচিত লাখ শহীদের আত্মাহুতির মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকা মহানগরী হয়ে ওঠে শিল্পকলা, শিক্ষা, বিনোদন, পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, মিডিয়া, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবহনসহ হাজারো বিষয়ের প্রাণকেন্দ্র, রাতদিন কর্মচঞ্চল। এ পরিসরে প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান রাজধানী শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সুকঠিন হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরীকে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার কাঙ্খিতমানে রাখার বাস্তবতার অনিবার্য প্রয়োজনে একটি স্বতন্ত্র মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯৭৬ সালে অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে ১২টি থানা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ঢাকা মহানগর পুলিশ।

এর ধারাবাহিকতায় জানমালের নিরাপত্তা ও জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা সুনিশ্চিতসহ ঢাকা শহর ও শহরতলীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ প্রয়োজনে বিদ্যমান কোতয়ালী, সূত্রাপুর, রমনা, লালবাগ, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, তেজগাঁও ও গুলশান এই ৮টি থানাকে বিভক্ত করে-১৯৭৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মতিঝিল, ধানমন্ডি, ক্যান্টনমেন্ট ও ডেমরাসহ মোট ১২টি থানা, ৩৯টি পুলিশ ফাঁড়ি, ১১টি পুলিশ বক্স ও ৭টি বিভাগ এবং ৬২০৮ জন জনবলের সমন্বয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং-পি৩পি-২৮/৭৫(১)স্বঃমঃ(পুঃ-১)/৯০ তারিখ-২-৭৬ এর মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার সরকারি আদেশ জারি করা হয়।[৪]

শান্তি শপথে বলীয়ান হয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গত ২০১১ সালের পুরো বছরেই নগরবারসীকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখতে চেষ্টা করেছে। নাগরিক জীবনকে সংঘাতহীন, নির্ভয় ও নিশ্চিত করতে ডিএমপি'র ২৫ হাজারেরও বেশি সদস্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দমন ও উদ্ঘাটনে ছিলেন বদ্ধপরিকর।[৫]

ব্যস্ততম ঢাকা নগরী, যার জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং তার অর্ধেক আবার নারী। নারীর প্রতি সহিংসতা রাতারাতি কমানো খুব সহজ নয়। কিন্তু এটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বর্তমান বিশ্বজুড়ে

১. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Ibid, p. 18
২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৩. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Ibid, p. 18
৪. *ডিএমপি নিউজ*, ঢাকা: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বি.এস.এ প্রিন্টিং প্রেস, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, পৃ. ৩
৫. *ডিএমপি নিউজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অধিকার এবং কল্যাণ সম্পর্কিত সচেনতার অংশ হিসেবে ডিএমপি তার ওমেন ডিভিশনের মাধ্যমে নির্যাতিত ভিকটিমদের আইনি সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই বিভাগের সদস্যরা এই ডিভিশনকে একটি আদর্শ নারীবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।[১] বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে মঞ্জুরীকৃত জনবল ৩২৯১২ জন।[২]

চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি)

চট্টগ্রাম বন্দন নগরীর অপরাধ প্রবণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, সমুদ্র পথে আন্তর্জাতিক চোরাচালানী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ জেলা পুলিশের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। সরকার বন্দর নগরীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন চট্টগ্রামের ডিআইজি ই.এ.চৌধুরী চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ প্রতিষ্ঠায় সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জুন ডিআইজি এম.এ.শরীফ আলীর কাছে দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৩] বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীতে মঞ্জুরীকৃত জনবল ৬৭৬৫ জন।[৪]

খুলনা মহানগর পুলিশ (কেএমপি)

১৯৮৬ সালে খুলনা মহানগর পুলিশের যাত্রা শুরু। খুলনা একটি বৃহত্তর নদী বন্দর, শিল্পসমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু শহর। এ শহরের নিরাপত্তা বিধান ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার খুলনাকে মহানগর ঘোষণা করে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে মহানগর পুলিশের কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রথম পুলিশ কমিশনার মীর হাসমত উল্লাহ।[৫] বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে মঞ্জুরীকৃত জনবল ৩০১৩ জন।[৬]

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি)

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ ১৯৯২ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ১৪ জুন ১৯৯২ খ্রি. “রাজশাহী মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং-৪, ১৯৯২)” মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী জেলার কাঁটাখালি ও নওহাটা পৌরসভার আংশিক, পবা উপজেলার হরিয়ান, পারিলা, হরিপুর, হড়গ্রাম, দামকুড়া, বড়গাছি ইউনিয়নসমুহের আংশিক এবং চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নের আংশিক রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের এলাকাভুক্ত। রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকার আয়তন প্রায় ২০৩ বর্গকিলোমিটার।[৭] বর্তমানে রাজশাহী মহানগরীতে মঞ্জুরীকৃত জনবল ২১২১ জন।[৮]

সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি)

১. *ডিএমপি নিউজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২. ওএন্ডএম শাখা-ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৩. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৪. ওএন্ডএম শাখা-ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৫. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
৬. ওএন্ডএম শাখা-ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৭. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৮. ওএন্ডএম শাখা-ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬ সালে সিলেট মহানগর পুলিশের যাত্রা শুরু হয়। এর আয়তন প্রায় ৪৯৯.৮৭ কি.মি.। সিলেট মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এটি দুইটি বিভাগে বিভক্ত। সিলেট মহানগরীর প্রধান থানাগুলো হলো (১) কোতোয়ালী মডেল থানা (২) জালালাবাদ থানা (৩) বিমানবন্দর থানা (৪) শাহ্‌পরাণ থানা (৫) দক্ষিণ সুরমা থানা ও (৬) মুগলাবাজার থানা। সিলেট মহানগরীর প্রথম কমিশনার হলেন সৈয়দ শাহজামান রাজ।

(১) প্রতিষ্ঠাকাল: ২৬-১০-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ; (২) এলাকা: ৪৯৯.৮৭ কি. মি.।[১] বর্তমানে সিলেট মহানগরীতে মঞ্জুরীকৃত জনবল ২৯৫৩ জন।[২]

বরিশাল মেট্রোপলিটান পুলিশ (বিএমপি)

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল জেলার প্রাক্তন কোতোয়ালি থানা ও বাবুগঞ্জ থানার একাংশ নিয়ে বিএমপি'র কার্যক্রম শুরু হয়। তখন বিভিন্ন পদে জনবল ছিল মোট ৪৬ জন। বিএমপি, বরিশালকে গত ০১-৬-২০১০খ্রিঃ তারিখ ০৪ (চার) টি থানায় ভাগ করা হয় এবং জনবলও বৃদ্ধি করা হয়। এতে করে পুলিশের কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। পুলিশি টহল, নজরদারি ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের কারণে অত্র এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পূর্বের তুলনায় বিশেষ করে মাদক ও ইভটিজিংসহ অন্যান্য অপরাধ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

শান্তি শপথে বলীয়ান হয়ে দেশের মেট্রোপলিটনসমূহ নগরবাসীদের নিরাপদে ও শান্তিতে রাখতে চেষ্টা করেছে। নাগরিক জীবনকে সংঘাতহীন, নির্ভয় ও নিশ্চিত করতে মেট্রোপলিটনের পুলিশ সদস্যগণ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দমন ও উদ্ঘাটনে ছিলেন বদ্ধপরিকর। উল্লেখ্য যে, মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রশাসনের উপর ম্যাজিস্ট্রেটদের কোনো অধিক্ষেত্র নেই।[৩] মেট্রোপলিটন অডিনেন্স অনুযায়ী মেট্রোপলিটন পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বরিশাল মহানগরীতে মঞ্জুরীকৃত জনবল ২০০৪ জন।[৪]

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন (সিআইডি পুলিশ)

বাংলাদেশে গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ কাঠামো থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উত্তরণের সময় থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত একদল গোয়েন্দা কর্মচারীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের 'খোল' নামক এক প্রকার কর্মচারী ও তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ রয়েছে। পরবর্তীকালে গুপ্ত আমলে গুঢ় পুরুষ নামক এক প্রকার রাজকর্মচারী ও তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পর্যালোচনা করে তাদের আধুনিক গোয়েন্দার পূর্বসুরী বলে মনে করা হয়। মধ্যযুগীয় মুসলিম ভারতে সুলতানি ও মোগল আমলে 'জাসুছ' নামক এক প্রকার গোয়েন্দা কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ওয়াকানবিস নামক এক প্রকার রাজকর্মচারী মোগল সম্রাটদের সঙ্গে সরাসরি গোপন সংবাদ আদান-প্রদান করতেন।

উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে ঠগ ও ডাকাতদের তৎপরতা অত্যধিক বেড়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদারদের খাজনা ও সরকারি কোষাগার পর্যন্ত লুণ্ঠিত হতে থাকে। ডাকাতদের হস্তে ইংরেজ কুঠিগুলো পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়। এ অবস্থার নিরসনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ ভারত তথা বাংলাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে 'ঠগি ও

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
২. ওএন্ডএম শাখা-ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৩. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Ibid, p. 19
৪. ওএন্ডএম শাখা-ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ডাকাতি' নামে একটি বিভাগ স্থাপন করেন। মি. স্লীম্যান নামক জনৈক দুঃসাহসী ইংরেজ কর্নেল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্লীম্যান দক্ষতার সাথে ঠগিদের নির্মূল করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে কঠোর হস্তে ডাকাতদের দমন করেন। ব্রিটিশ শাসনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দেশে একটি নতুন পুলিশ বাহিনী গঠিত হয় এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

এ সময়ের কিছু পূর্বে ভারত সরকারের অংশ হিসেবে 'সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স' নামে একটি গোয়েন্দা বিভাগ পরিচালিত হয়ে আসছিল। প্রত্যেক প্রদেশে স্থাপিত এ সংস্থাটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত অপরাধ ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত তথ্য রেকর্ড করত আর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরবরাহ করত। এ সংস্থাটি ছিল সম্পূর্ণ প্রশাসনের বাইরে এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে আন্ত:দেশীয় ডাকাত দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, নোট ও মুদ্রা জালিয়াতি, বেআইনী অস্ত্র ব্যবসা, আন্তঃদেশীয় কালোবাজারী, বণিক ও পথচারীদের দূর-দূরান্তে যাতায়াত এবং রাজনৈতিক দলসমূহের গোপন তৎপরতা ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়। এ সময় সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতকারীদের কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বৃহৎ নগরগুলোয় পুলিশের গোয়েন্দা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি 'সেন্ট্রাল এজেন্সী অব ইনফরমেশন' নামে পরিচিত ছিল।

আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে বৃহৎ শহরগুলোয় অত্যন্ত সীমিত আকারে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা গঠিত হলে এদের কার্যক্রম মোটামুটি কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বাংলার লেঃ গভর্নর ভারত সরকারের নিকট লিখিত এক পত্রের এক জায়গায় লিখেছিলেন: অনুসন্ধান বিভাগের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, তারা অসৎ ও স্বেচ্ছাচারী।

১৯০২–১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত পুলিশ কমিশন বিস্ময় প্রকাশ করেন এ ভেবে যে, জেলায় কর্তব্যরত একজন পুলিশ সুপার পাশ্ববর্তী জেলার অপরাধ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অনভিজ্ঞ। এ কমিশন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা গঠনের সুপারিশ করেন, যে শাখা অল্প সংখ্যক গোয়েন্দা অফিসার দ্বারা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে। অপরাধ অনুসন্ধান ও তার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তখন পুলিশি গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যার ফলে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট।

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট-এর প্রধান কর্তব্যের মধ্যে ছিল–

(ক) ডাকাতি, সড়ক ও রেলপথ ডাকাতি তদন্ত করা।
(খ) ডাক ডাকাতি অনুসন্ধান করা।
(গ) মুদ্রা, স্ট্যাম্প ও নোট জাতিয়াতির অনুসন্ধান করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(ঘ) মাদক ও পেশাদার বিস্ফোরক, প্রতারণা ও পেশাদার প্রতারণাকারী অনুসন্ধান করা।
(ঙ) কোনো প্রাপ্তির লক্ষ্যে খুন, ডাকাত ও চোরের দল অনুসন্ধান করা। অপরাধীকে আশ্রয়দানকারী এবং অপরাধী চক্রের অনুসন্ধান ও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(চ) ফৌজদারি মোকদ্দমার রাজসাক্ষীদের তালিকা সংরক্ষণ করা, তারা নিজ বাড়িতে সৎ জীবনযাপন করছে কিনা এবং পূর্ববর্তী সময়ে তাদেরকে সন্দেহ করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা, আর এলাকায় বসবাসরত রাজসাক্ষী ও ডাকাত দলনেতাদের উপর সার্বিক দৃষ্টি রাখা।

সিআইডি বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত তদন্ত ইউনিট। যাকে ইংরেজিতে Criminal Investigation Department (CID) বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তান আমল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে চলে আসা সিআইডি ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ পুলিশের অঙ্গ হিসেবে কাজ শুরু করে। বর্তমানে এর প্রধান হল অতিরিক্ত আইজিপি।[১] বাংলাদেশ রেগুলেশন (পিআরবি)-এ চুরি, খুন, ডাকাতি ও প্রতারণা ইত্যাদি ধরনের যেসব পেশাদার অপরাধীর উল্লেখ রয়েছে, তাদের মোকাবেলা করাই গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কাজ বলে মনে করা যায়। অপরাধী ও অপরাধকে সণাক্তকরণের জন্য সিআইডি বিভাগের নিম্নলিখিত শাখাগুলো সংযুক্ত রয়েছে: (১) ফিংগার প্রিন্ট ব্যুরো (২) ফুট প্রিন্ট ব্যুরো (৩) হ্যান্ড রাইটিং ব্যুরো (৪) বেলাস্টিক ব্যুরো (৫) মাইক্রো-এনালাইসেস ব্যুরো (৬) কেমিক্যাল এনালাইসেস ব্যুরো (৭) জাল নোট সেকশন (৮) ফটোগ্রাফিক ব্যুরো (৯) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো।[২]

স্পেশাল ব্রাঞ্চ (পুলিশের বিশেষ শাখা)

স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ বিভাগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সিআইডি পুলিশের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনাকালে প্রাচীনকালের গোয়েন্দা পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত ছিল। এ সংস্থাটির মুখ্য কাজ ছিল রাজদ্রোহ তৎপরতার সংবাদ সংগ্রহ করে সরাসরি কেন্দ্রে সরবরাহ করা। ভারতের সুলতানি আমলে এ সংস্থাটির নামকরণ করা হয় দিওয়ন-ই-বারিদ। এ সংস্থার প্রধানকে বলা হত বরিদ-ই-মুমালিক। তিনি রাষ্ট্রের সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এবং রাজকীয় ডাক বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। রাষ্ট্রের সর্বত্র কোথায় কি ঘটছে, সব সংবাদ সংগ্রহ করে জ্ঞাত হওয়া ছিল তার কর্তব্য। রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক সদর দফতরে একজন করে বারিদ নিয়োজিত থেকে কেন্দ্রে নিয়োজিত বারিদ-ই-মুমালিককে সকল সংবাদ প্রেরণ করত।

দিওয়ান-ই-বারিদ সংস্থাটির যোগাযোগ ছিল দিওয়ান-ই-ইনশা নামে সুলতানের একটি কেন্দ্রীয় বিভাগের সঙ্গে। এ বিভাগের প্রধানকে বলা হত দবির-ই-খাস। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ বিভাগকে রাজকীয় গোপন তথ্যের সংরক্ষণাগার বলেও আখ্যায়িত করেন। দবির ছিলেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। তাকে গোপনীয় জটিল কাজে সহযোগিতা করত অনেক ক'জন সহকারী দবির।

সুলতানি আমল অবসানের পর মোগল আমলে এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। পরবর্তী ব্রিটিশ আমলেও এ ব্যবস্থার অনুকরণে স্থাপিত হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চ। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় স্পেশাল পুলিশ ব্রাঞ্চ ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ বিদ্রোহের পর পাকিস্তান সরকারের টনক নড়ে উঠে। ঢাকা ব্রাঞ্চের জন্য একজন পুলিশ সুপার, তার নিয়ন্ত্রণাধীনে একজন ডেপুটি পুলিশ সুপার ঢাকা স্টেট ব্যাংক ব্রাঞ্চের জন্য এবং ঢাকার জন্য আরো একজন ডেপুটি পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হয়েছিল।

৬০-এর দশকে শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়। এসব তৎপরতা পর্যবেক্ষণ ও সরকারকে অবহিত করার জন্য প্রতিটি জেলায় স্পেশাল পুলিশ ব্রাঞ্চ-এর শাখা স্থাপন করে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মালিবাগে এর সদর দফতর স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এ সংস্থাটি আরো সুগঠিত করা হয় এবং ভিআইপি বা

১. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Ibid, p. 20
২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

রাজকীয় অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য এ সংস্থার সাথে যুক্ত করা হয় কিছু সংখ্যক প্রটেকশন ফোর্স। এ ফোর্স বাংলাদেশের প্রত্যেক মহানগর পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ স্পেশাল পুলিশ সংস্থার দায়িত্বে রয়েছেন: কেন্দ্রে অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।[১]

স্পেশাল ব্রাঞ্চের কার্যাবলী : স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রধানত নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে–

ক. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কার্যাবলী ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিকারক কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ, যাচাই ও প্রয়োজনীয় প্রতিব্যবস্থার জন্য ত্বরিত যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। নিরাপত্তা পরীক্ষণ (Security Vetting) ।

খ. রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন কৃষক, শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র আন্দোলন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যা দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে ঐ সকল বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রতিবিধানকল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

গ. রাজনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দৈনিক প্রতিবেদন (DR) সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদন (WCR) ইত্যাদি প্রণয়নও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

ঘ. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন। পাসপোর্ট, ভিসা, নাগরিকত্ব ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন।

ঙ. দেশি/বিদেশি অতি গুরুত্বপূর্ণ (VVIP) এবং গুরুত্বপূর্ণ (VIP) ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা প্রদান।

চ. কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের জরিপ, পরিদর্শন ও তার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

ছ. সীমান্তে উত্তেজনার বিষয় এবং উপজাতীয়দের রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ ও গতিবিধি সম্পর্কে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ।

এসবি-এর কার্যক্রম সম্পর্কে মিনিস্ট্রি অব কেবিনেট এফেয়ার্স-এর স্মারক নং ৪/৮/৭২-রুলস, তাং ২৯-১২-৭২ এর বক্তব্য ছিল–

> "The Special Branch will have the responsibility to collect, collate and disseminate information and intelligence relating to the law and order problems in the country. It will prepare daily and periodical situation reports on political and subversive activities, primarily affecting law and order situation and remain responsible for protection of VIP's, Verification of character and antecedents, administration of laws dealing with crime against the security of the state, and in general, carry out the functions which devolved on the erstwhile Special Branch of the Government of East Pakistan."[২]

রেলওয়ে পুলিশ

১. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Ibid, p. 20
২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫০

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের দিকে মোটামুটিভাবে আসাম বেঙ্গল, ইস্টার্ন বেঙ্গল, স্টেট রেলওয়ে এবং ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে স্থাপিত হওয়ার ফলে রেলপথে ডাকাতি, চুরি ও আন্ত:দেশীয় চোরাচালান বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রেলওয়ে পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। রেলওয়ে পুলিশ প্রতিষ্ঠার মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম প্রদেশ।

রেলওয়ে পুলিশ প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সিআইডি'র ডিআইজি'র অধীনে এ বাহিনী ন্যস্ত করা হয়। তিনি প্রতি বছর একবার রেলওয়ে পুলিশ স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করতেন। অন্যদিকে সিআইডি'র বিভাগীয় দায়িত্বে নিযুক্ত একজন পুলিশ সুপার একটি রেলওয়ে সার্কেল প্রতি দুই বছর একবার পরিদর্শন করতেন। বড় বড় রেলওয়ে জংশনগুলোতে রেলওয়ে পুলিশের থানা স্থাপিত হয়। রেলওয়ে পুলিশ সর্বদাই জেলা পুলিশের সহযোগিতায় কাজ করত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সকল রেলওয়ে পুলিশকে একটি রেঞ্জের আওতাভুক্ত করে একজন ডিআইজি'র অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এ পুলিশ রেঞ্জকে দুটি জেলায় বিভক্ত করে উত্তর ও দক্ষিণ, পশ্চিম অঞ্চলকে একটি জেলায় পরিণত করে সৈয়দপুরে রেলওয়ে জেলা সদর স্থাপন করা হয় এবং যমুনা নদীর পূর্বতীরের সমগ্র অঞ্চলকে একটি জেলায় পরিণত করে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে জেলার সদর দফতর স্থাপন করা হয়। এ দুটি জেলায় দুজন পুলিশ সুপার পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।[১] রেল পুলিশের অধিক্ষেত্র হল রেললাইনের উভয় পার্শ্বে ১০ ফিট পর্যন্ত।[২]

হাইওয়ে পুলিশ

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সর্বত্র মহাসড়কের সম্প্রসারণ দেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বর্তমানে দেশের যেকোনো প্রান্তে গাড়িযোগে গমনাগমন করা কোনো চিন্তার বিষয় নয়। এ সুযোগে জনগণের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে মহাসড়কে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্যতম। মহাসড়কের জন্য ভিন্ন পুলিশি ব্যবস্থা, টহল ব্যবস্থা, তদন্ত ও বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে 'হাইওয়ে পুলিশ' বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩] প্রাথমিকভাবে এ নতুন ইউনিটটি পরিচালনার জন্য ৫৫৭টি পদ মঞ্জুর করা হয়।[৪]

হাইওয়ে পুলিশ নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে– (১) হাইওয়ে পেট্রোল। (২) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা। (৩) ট্রাফিক আইন বলবৎ ও প্রয়োগ। (৪) মহাসড়ক, বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পেট্রোল পাম্প, টোল প্লাজা, যাত্রী বিরতি স্থান এবং পার্কিং লট-এর শৃঙ্খলা রক্ষা ও মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ। সড়ক ব্যবহারকারীদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের উপর ট্রাফিক আইন বলবৎ। (৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও মহাসড়কে অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ। (৬) মোটর ভেহিকেল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ এর আওতায় কৃত অপরাধ সংঘটন-এর ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন দাখিল।[৫]

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

২. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Ibid, p. 21

৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On : 3/12/2015

৪. গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৩)/পদ-১৫/২০০৪/১৯০ তারিখ: ১২/৩/২০০৫ খ্রি.।

৫. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশ পুলিশের একটি অন্যতম সংগঠন। সমতল জেলায় অবস্থানকালীন ভিভিআইপি, ভিআইপি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সরকারের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য পালন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন পার্বত্য এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সেনাবাহিনীর সহিত বিভিন্ন অপারেশনাল ডিউটিসহ পাহাড়ী বাঙালি সম্প্রীতি রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। এটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এর রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে পরিচিত যা সেনাবাহিনীর পদাতিক ব্যাটালিয়ানের আদলে গঠিত হয়েছে।[১] এডিশনাল আইজি আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার্সের অধীনে ১১টি ব্যাটালিয়ন ও ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, যা পিএসটিএস নামে পরিচিত।

দায়িত্ব ও কার্যক্রমঃ এম.এল কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ- [২]

(i) শান্তিপূর্ণ অবস্থা

(১) দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক দায়িত্বপালন।

(২) অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি উদ্ধারকরণ এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(৩) উপদ্রুত এলাকায় সমাজবিরোধী এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা।

(৪) অস্ত্রধারী অপরাধীদের গ্রেফতার করা।

(৫) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান।

(ii) যুদ্ধাবস্থা

(১) দ্বিতীয় সারির ফোর্সের ভূমিকা পালন।

(২) প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

(৩) দেশের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান করা।

(৪) প্রয়োজনে অন্যান্য কর্তব্যও পালন করা।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে।[৩] উক্ত ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অস্থায়ীভাবে ৫৫২১টি পদ সৃষ্টি করা হয়।[৪] সন্ত্রাস দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমনার্থে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে উক্ত ব্যাটালিয়ান গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে একটি এয়ার উইং। র‍্যাবের নির্বাহী প্রধান ডিজি র‍্যাব নামেই পরিচিত। আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নের নীতিমালা বা অধ্যাদেশ সংশোধন করে সামরিক বাহিনী থেকে ৪৪%, পুলিশ বাহিনী থেকে ৪৪%, বিডিআর থেকে ৬%, আনসার থেকে ৪%, কোস্ট

---

১. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration,* Ibid, p. 21

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ পুলিশের ২০১০ খ্রি. সালের বাৎসরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন*, ঢাকাঃ ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ, পৃ. ১২-১৩

৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On : 3/12/2015

৪. গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৩)/পদ-১৭/২০০৩/২৯৪ তারিখঃ ৩০/৩/২০০৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

গার্ড থেকে ১% এবং সিভিল স্টাফ থেকে ১% নিয়ে র‍্যাব গঠিত হয়েছে। এ নিয়মে র‍্যাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী থেকে আগত অফিসারের সংখ্যা ৫০% + ৫০% থাকার কথা থাকলেও ব্যাটালিয়ান পর্যায়ে লেঃ কর্ণেল মর্যাদার অফিসারদের নেতৃত্বদান এবং কোম্পানি পর্যায়ে পুলিশ সুপারদের নেতৃত্বদানের সৃষ্ট সংকটে পুলিশ সুপারদের র‍্যাবে যোগদানে অনীহা থাকাতে বর্তমানে র‍্যাবে সামরিক বিভাগের অফিসারদের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। ২০০৪ ইং সালের ১০ জানুয়ারি পুলিশ সপ্তাহ-২০০৪ উদযাপনের দিনই র‍্যাবের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম ডিজি হিসেবে যোগদান করেন জনাব আনোয়ারুল ইকবাল, বিপিএম (বার)। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বল্প দিনে র‍্যাব দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করণে অতি প্রশংসিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৪টি র‍্যাব ব্যাটালিয়ান রয়েছে। র‍্যাবের সদর দপ্তর এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত।[১]

ট্রাফিক পুলিশ

বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রা ও সভ্যতার বিকাশ এবং বিশাল ব্যাপ্তির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে, নির্মিত হয় অসংখ্য জনপথ। মাল পরিবহন ও যান চলাচলে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে সড়কগুলো। তাই দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য তৈরি হয় ট্রাফিক আইন আর এ আইন বাস্তবায়নের জন্য গঠিত হয়, ট্রাফিক পুলিশ।

মৌর্য আমলে রাজধানী, বড় বড় শহর ও বন্দরগুলোতে এক ধরনের প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। তাদের কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের যানগুলোর পরিবাহিত মালামালের বৈধ মালিকানার প্রত্যয়ন করা এবং বহনকৃত মালের রাজকীয় রাজস্ব প্রদান নিশ্চিত করা। প্রত্যেকটি যানের রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত পরিবহন ক্ষমতার ঊর্ধ্বে পরিবহনকৃত মালের জন্য শাস্তি প্রদান করা। কর্তব্যের দিক থেকে এদের আমরা আধুনিক ট্রাফিক পুলিশের পূর্বসূরী বলে মনে করতে পারি। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ট্রাফিক পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। বাংলাদেশে ট্রাফিক পুলিশ বলতে স্বতন্ত্র কোনো সংগঠন নেই। আইজিপির অধীনস্থ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে অস্থায়ীভাবে গঠিত ট্রাফিক পুলিশ নামে একটি অঙ্গ-সংগঠন যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে।

জেলাগুলোর জেলা পুলিশ সুপারের নিয়ন্ত্রণের একজন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর/সার্জেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে জেলা ট্রাফিক পুলিশ শাখা পরিচালিত হয়। এরা জেলার ব্যস্ততম সড়কগুলোর যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। মহানগরগুলোতে একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে মহানগর ট্রাফিক পুলিশ পরিচালিত হয়।

নৌ-পুলিশ

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে নৌ-পুলিশের শাখা ভাসমান থানাগুলো সংশ্লিষ্ট থানার নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় এবং জেলা পুলিশ সুপারের আয়ত্তাধীন করা হয়। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর, চট্টগ্রাম, মংলা ও নদী তীরবর্তী বড় শহর, খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মত বৃহৎ নদীবন্দরগুলোর অপরাধ দমন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য গঠিত নৌ-পুলিশ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। করাচিতে এ সদর দফতর স্থাপিত হয়েছিল। নদী ও সমুদ্র বন্দরগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌ-পুলিশ মোতায়েন থাকত, বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জেলা পুলিশের সহযোগিতায় তারা কর্তব্য পালন করত।

---

১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে নৌ-পুলিশকে আমর্ড পুলিশ রিভার ব্যাটালিয়নের সঙ্গে একীভূত করা হয়। আর এর সদর দফতর স্থাপিত হয় বরিশাল শহরে। নৌ-পথের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ খ্রি. বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে নৌ-পুলিশের অনুমোদন প্রদান করে। প্রাথমিকভাবে নতুন এ ইউনিটের জন্য ৭০৬টি জনবল সৃজন করা হয়।[১]

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠানসহ শিল্প-কারখানার বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। জনবান্ধব বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিষয়টিকে মাথায় রেখে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বন্ধ কলকারাখানা চালু ও নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য যেমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন তেমনি বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্য যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মালিক শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, স্থাপিত শিল্প কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, উৎপাদন ও রপ্তানী প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে জনহিতৈষী সরকারের পরিকল্পনায় আসে যে, দেশের উন্নয়নের প্রধান সহায়ক শিল্প কারখানার জন্য প্রচলিত পুলিশি ব্যবস্থার উপর একক ভাবে নির্ভরশীল না হয়ে শিল্পাঞ্চলের জন্য বিশেষায়িত পুলিশ বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন। তারই ধারা বাহিকতায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখার অভিষ্টলক্ষ্যে গত ৩১ অক্টোবর ২০১০ খ্রিঃ শিল্পাঞ্চল পুলিশের যাত্রা শুরু করে।[২] প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৩টি শিল্পাঞ্চল পুলিশ জোন গঠন ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৫৮০টি পদ সৃজন করা হয়।[৩]

ট্যুরিস্ট পুলিশ

সবুজ-শ্যামল বাংলার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিবছর এদেশে ছুটে আসে বিশ্বের নানা দেশের প্রকৃতিপ্রেমিরা। শুধু বিদেশি পর্যটকই নয় দেশিয় পর্যটকরাও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবকাশ যাপনসহ ছুটি কাটাতে বেরিয়ে পড়েন সুযোগ পেলেই। কিন্তু দেশি-বিদেশি এসব পর্যটক নতুন জায়গায় অচেনা মানুষের কাছে গিয়ে পড়েন নানা বিড়ম্বনায়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০১৩ খ্রি. প্রাথমিকভাবে ৬২১জন জনবল নিয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ নামে নতুন এ ইউনিটের যাত্রা শুরু হয়।[৪] এটি নিয়মিত পুলিশেরই একটি অংশ হিসেবে ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট হিসেবে কাজ শুরু করে। কিন্তু এদের সকল তৎপরতা পর্যটকদের ঘিরে। শুধু নিরাপত্তাই নয় পর্যটকদের রাত যাপন তথা আবাসন সমস্যাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও এই পুলিশ কাজ করবে। ট্যুরিস্ট পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন একজন ডিআইজি। সদর দফতর রাজধানীর বনশ্রী এলাকায়।[৫]

পর্যটন পয়েন্টগুলোকে চিহ্নিত করে জোন ভাগ করে কার্যক্রম চলছে। এগুলো হচ্ছে ঢাকা জোন, চট্টগ্রাম জোন, কক্সবাজার জোন ও টেকনাফ, কুয়াকাটা জোন, সিলেট জোন ও মৌলভীবাজার। প্রত্যেক জোনের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।[৬]

---

১. গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০৫.০১৮-৮৪৮, তারিখ: ১২/১১/২০১৩ খ্রি.
২. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, visited on: 3/12/2015
৩. গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৩)/পদ-৭/২০০৭/৫৯৪ তারিখ: ১০/১০/২০১০ খ্রি.
৪. গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০৫.০০৯.১১(অংশ)-৩৮৪, তারিখ: ৬/১১/২০১৩ খ্রি.
৫. দৈনিক ইত্তেফাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৭ জুন, ২০১৫, পৃ. ২০
৬. প্রাগুক্ত, ২৭ জুন, ২০১৫, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

ইন্টারপোল

বাংলাদেশ ১৯৭৬ ইং সালের ১৪ অক্টোবর International Criminal Police Organization (INTERPOL) এর সদস্যভুক্ত হয় এবং তখন থেকে এ দেশে INTERPOL এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। INTERPOL এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের Lyon শহরে অবস্থিত। এই সংস্থা আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে INTERPOL সদস্যভূক্ত দেশের সংখ্যা ১৯০টি। প্রত্যেক সদস্যভূক্ত দেশে National Central Bureau (NCB) আছে। বাংলাদেশ পুলিশের NCB-Dhaka, INTERPOL-এর কার্যালয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশু পাচার, মানব পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মুদ্রা জালিয়াতি, পর্নোগ্রাফি ও যৌন অপরাধ, আর্ন্তজাতিক অপরাধ চক্রসহ অন্যান্য অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অভিবাসী ও প্রবাসীদের বহুবিধ সেবা প্রদানের জন্য NCB-DHAKA, INTERPOL ঢাকা কাজ করছে।

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী সারদা

১৯১২ সালে সারদায় পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এটি পুলিশ কলেজ ও সর্বশেষ পুলিশ একাডেমি হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ভারত ও পাকিস্তানে এটিই ছিল উধর্ক্ষতন পুলিশ অফিসারদের একমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে মর্যাদাশীল এই একাডেমি লাভ করে। পাকিস্তান আমলে পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষকদের অধিকাংশ পদে অবাঙালি নিয়োজিত ছিল। স্বাধীনতার পর তারা পাকিস্তানে ফিরে যায়।[১] একজন অতিরিক্ত আইজিপি একাডেমির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। সারদা পুলিশ একাডেমির প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন মেজর এইচ. চিমন (১৯১২-১৯১৯)।[২]

পিবিআই

সরকার অপরাধ তদন্তে গুনগত মান বৃদ্ধি ও সংঘটিত অপরাধের দ্রুত তদন্তের স্বার্থে শুধু তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পিবিআই (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) ইউনিটটি ২০১২ সালে সৃজন করে।[৩] এ ইউনিটের প্রধান হলেন একজন ডিআইজি। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় পিবিআই এর কার্যক্রম রয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ পুলিশের জনবল নিয়োগ তিনটি পদশ্রেণির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা: (১) সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) (২) সহকারী পুলিশ পরিদর্শক/সার্জেন্ট (এসআই/সার্জেন্ট) (৩) কন্সস্টেবল। নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যগণ ও কর্মরত পুলিশ সদস্যগণ যেসকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে তা নিম্নরূপ: (১) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা (২) পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা (৩) পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, টাঙ্গাইল (৪) পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, রংপুর (৫) পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা (৬) পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, নোয়াখালি (৭) ডিটেকভিট ট্রেনিং স্কুল, ঢাকা (ডিটিএস) (৮) ফরেনসিক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকা (৯) স্পেশাল ব্রাঞ্চ ট্রেনিং স্কুল, ঢাকা (১০) পুলিশ পিস-ক্রিপার ট্রেনিং স্কুল, ঢাকা

১. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯
২. সম্পাদন পরিষদ, বাংলা পিডিয়া, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ-২০০৯, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬
৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On : 3/12/2015

Dhaka University Institutional Repository

(১১) পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল (পিএসটিএস), রাঙ্গামাটি (১২) ট্রাফি এন্ড ড্রাইভিং স্কুল (টিডিএস), ঢাকা (১৩) মোটর ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল, জামালপুর, (১৪) টেলিকমিউনিকেশন ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা। (১৫) ঢাকা মেট্রোপলিটান ট্রেনিং একাডেমি, ডিএমপি, ঢাকা। (১৬) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল, গাজীপুর এবং (১৭) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান ট্রেনিং স্কুল,খাগড়াছড়ি।[১]

গ্রাম পুলিশ

সরকার ইউনিয়ন পরিষদের আবশ্যক কাজ হিসেবে পাহারা, টহলদান ও গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য চৌকিদার/দফাদার বা গ্রাম পুলিশের ব্যবস্থা রেখেছেন। গ্রাম পুলিশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এটা ছাড়াও আদালতে সাক্ষী হাজিরকরণ, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিল, অপরাধীদের সম্পর্কে অগ্রিম সংবাদ প্রদান ইত্যাদি পুলিশকে সহায়তা করে থাকে। গ্রাম পুলিশ তার ইউনিয়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ১৫ দিন পর পর অবহিত করে থাকে।[২]

হেনরি কটন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ প্রথার কিছু সংশোধন করেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ধারার, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত প্রথায় মোটামুটি সংশোধন করা হয়। এ আইন গ্রাম পুলিশের উপর থেকে গ্রাম্য সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিত করে এবং মিউনিসিপাল প্রশাসনে গ্রামবাসীদের কোনো রকম হস্তক্ষেপ বন্ধ হয় এমনকি গ্রামের উপর থেকে গ্রাম পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও রহিত করা হয়। এ আইনের পাশাপাশি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিম্নযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে পুলিশ প্রশাসনে বাছাই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু চৌকিদারি প্রথা বলবৎ থেকে যায়। চৌকিদারদের মনোনয়ন ক্ষমতা পঞ্চায়েতের উপর থাকলেও তাদের সংখ্যা নিয়োগ ও বেতন দান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর উপর ন্যস্ত ছিল।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের 'পুলিশ আইন' বাংলায় একটি একক, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংনির্ভর পুলিশিব্যবস্থা ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাভাবিকভাবে এই আইন প্রবর্তনের পরে পুলিশের উচ্চ পদগুলোতে একদিকে যেমন নিজস্ব লোক নিয়োগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি যুগের প্রয়োজনে পুলিশের বিদ্যমান কাঠামোয় নতুন নতুন উপবিভাগ বা শাখা খোলা হচ্ছিল। প্রসঙ্গত ১৮৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দ 'বঙ্গীয় পুলিশ' (Bengal Police) যেসব শাখা বা পুলিশ দল নিয়ে বা সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, তা এরকম (১) নিয়মিত জেলা পুলিশ (Regular Disrict Police) সরকারি কোষাগার বা রাজস্ব খাত থেকে সম্পূর্ণ বেতন-ভাতা পেতেন (২) পৌরপুলিশ (Municipal Police) যাদের বেতন-ভাতার আংশিক আসত সরকার এবং আংশিক সংশ্লিষ্ট পৌর-তহবিল থেকে এবং (৩) গ্রাম পুলিশ (Village Police) এরা যে যৎসামান্য ভাতা বা বৃত্তি পেত তা হয়ত দিত জমিদার-তালুকদারেরা নতুবা দিত সংশ্লিষ্ট গ্রামসমাজ বা সম্প্রদায় (Village Community)।[৩]

চৌকিদারদের কার্যাবলী

(১) স্থানীয় তথা নিয়মিত পুলিশকে গোপন খবর সরবরাহ (২) ঘোষিত (Proclaimed) আসামি, অথবা কোনো ব্যক্তি অপরাধ করছে এমন দেখা মাত্র তাকে ধরা ও (জেল) পলাতক আসামিকে ধরে

১. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On: 3/12/2015; ট্রেনিং এ্যান্ড স্পোর্টর্স শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২. *বাংলাদেশ পুলিশের ২০১০ খ্রি. সালের বাৎসরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

৩. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় থানায় হাজির করা (৩) অপরাধ দমন (৪) আইনানুগভাবে যদি কেউ কোনো আসামিকে ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করতে চায়, সেরূপ ব্যক্তিকে সহায়তা করা (৫) দুষ্কৃতকারী ও দাগীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে নজর রাখা এবং তাদের সম্পর্কে খবরাখবর পুলিশকে দেয়া (৬) তার নিজ অধিক্ষেত্রে তথা গ্রামে আগত কোনো ব্যক্তিকে যদি সন্দেহজনক মনে হয়, তবে সে খবর পুলিশকে জানানো (৭) জন্ম-মৃত্যুর খবর রাখা (৮) 'পঞ্চায়েত' এর অনুপস্থিতিতে মৃত্যুর খবর সরবরাহ (৯) প্রহরার বিষয়ে পঞ্চায়েতের আদেশ মানা (১০) পঞ্চায়েত কর্তৃক ধার্য কর, চাঁদা প্রভৃতি আদায়ে সাহায্য করা (১১) এছাড়া অন্য যে কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ স্থানীয় তথ্য পঞ্চায়েত ও পুলিশকে দেয়া বা জানানো।[১]

একনজরে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও এর সংখ্যাভিত্তিক বিবরণ:[২]

ক্র. নং	ইউনিটের নাম	ইউনিটের সংখ্যা
১.	এসবি (বিশেষ শাখা)	১
২.	সিআইডি	১
৩.	মেট্রোপলিটান পুলিশ	৬
৪.	পুলিশ রেঞ্জ	৭
৫.	হাইওয়ে রেঞ্জ	১
৬.	রেলওয়ে রেঞ্জ	১
৭.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ রেঞ্জ	১
৮.	এপিবিএনস্	২
৯.	এসপিবিএনস্	১১
১০.	নৌ-পুলিশ	১
১১.	র‍্যাব	১২
১২.	ট্যুরিস্ট পুলিশ	১
১৩.	পিবিআই	১
১৪.	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা	১
১৫.	পুলিশ স্টাফ কলেজ	১
১৬.	পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (পিপিসি)	৪
১৭.	ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার	৩০
১৮.	পুলিশ টেলিকম	১
১৯.	জেলা পুলিশ	৬৪
২০.	রেলওয়ে জেলা	২
২১.	হাইওয়ে জেলা	৪
২২.	সার্কেল/জোন	১৬০
২৩.	সাধারন থানা	৫১৯
২৪.	রেলওয়ে থানা	২৪
২৫.	মেট্রোপলিটান থানা	৮৭
২৬.	তদন্ত কেন্দ্র	১৮৯
২৭.	সাধারণ ফাঁড়ি (জেনারেল আউটপোস্ট)	২২৬

১. কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫
২. ওএন্ডএম শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্র. নং	ইউনিটের নাম	ইউনিটের সংখ্যা
২৮.	নৌ ফাঁড়ি (রিভার আউটপোস্ট)	৫২
২৯.	রেলওয়ে ফাঁড়ি (রেলওয়ে আউটপোস্ট)	৩২
৩০.	হাইওয়ে ফাঁড়ি (হাইওয়ে আউটপোস্ট)	৪৮
৩১.	শহর ফাঁড়ি (টাউন আউটপোস্ট)	১১০
৩২.	ক্যাম্প	১৬৭
৩৩.	বোম্ব ইউনিট	২

পুলিশের পদবি পরিচিতি

রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর এমন কিছু অংশ রয়েছে যে, জনগণ থেকে তাঁদের আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। আর এ কারণে রাজকীয় শাসন-অনুশাসনের ধারক-বাহক হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে নির্দিষ্ট পোশাক (ইউনিফর্ম) পরিধান প্রবর্তিত হয়েছিল সুদূর অতীতকাল থেকে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে এসব পোশাকের মনোজ্ঞ বর্ণনাও পাওয়া যায়।

পুলিশের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা, 'কোতোয়াল-ই-বাকালি' থেকে কোতোয়াল, হাওলাদার, দারোগা থানাদার, জমাদার, হাবিলদার এমনকি বরকন্দাজ পর্যন্ত প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পোশাক ও পদবি-চিহ্ন ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিশ্বের অনেক অঞ্চলেই রাজকীয় পদবি-চিহ্ন ব্যবহারের প্রবণতা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিল।

আমাদের দেশে মোগল আমলের পুলিশি পদবি-চিহ্ন প্রবর্তিত ছিল ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পুলিশি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে ভারতীয় তথা বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ব্রিটিশ ডিজাইনের পরিচ্ছেদ ও পুলিশি পদবি প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে যথা সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে ব্রিটিশ অনুকরণেই পদবি প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

পুলিশের বিভিন্ন পদবি (Police Ranks)[১]

(১) Inspector-General (মহা-পুলিশ পরিদর্শক)
(২) Additional Inspector-General (অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক)
(৩) Deputy Inspector-General (উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক)
(৪) Additional Deputy Inspector-General (অতিরিক্ত উপ মহা-পুলিশ পরিদর্শক)
(৫) Superintendent/ A.I.G/ S.S/ C.O. (পুলিশ সুপার)
(৬) Additional Superintendent (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার)
(৭) Senior Assistant Superintendent/Sr. Asstt. Commissioner (সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার/সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার)
(৮) Assistant Superintendent/Assistant Commissioner (সহকারী পুলিশ সুপার/সহকারী পুলিশ কমিশনার)
(৯) Inspector (পুলিশ পরিদর্শক)
(১০) Sub-Inspector/Sergeants/Subedars (উপ-পুলিশ পরিদর্শক)
(১১) Assistant Sub-Inspector (সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক)
(১২) Head constable (হাবিলদার)
(১৩) Naik (নায়েক)
(১৪) Constable (কনস্টেবল)

---

১. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administraion*, Ibid, pp. 22-23

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পুলিশের জনবল[১]

ক্র. নং	পদবি	পদ সংখ্যা
১.	আইজিপি	১
২.	এডিশনাল আইজিপি গ্রেড-১	২
৩.	এডিশনাল আইজিপি গ্রেড-২	১১
৪.	ডিআইজি	৫৬
৫.	এডিশনাল ডিআইজি	৮৬
৬.	এসপি/এআইজি	৩০৮
৭.	এডিশনাল এসপি	৬৮৩
৮.	সিনিয়র এ.এস.পি	২৭১
৯.	এএসপি	১১৯২
১০.	ইন্সপেক্টর	৪৩৯৯
১১.	এসআই/টিএসআই (২৮৯) জন সহ	১৭৪৪৫
১২.	সার্জেন্ট	১৯৫২
১৩.	এএসআই (নিরস্ত্র)	১২৩০৭
১৪.	এএসআই (সশস্ত্র)	৫৯৭৩
১৫.	এসিসটেন্ট টিএসআই	১৬৭৩
১৬.	নায়েক	৬৭২৭
১৭.	কনস্টেবল	১১৫৯৭২
	সর্বমোট পুলিশ সদস্য সংখ্যা =	**১,৬৯,০৫৮**
১৮.	নন-পুলিশ (সিভিল) পদ	৮১৫৪
	সর্বমোট পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্য (সিভিল) =	**১৭৭২১২**

জনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র

জনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো হলো: (১) ১২ বোর সর্টগান (২) হাতকড়া (৩) স্টেনগান (৪) ৯ এমএম এসএমজি (৫) পিস্তল (৬) রিভলবার (৭) হ্যান্ড গ্রেনেড (৮) রায়ট ব্যাটন (৯) লম্বা বেতের লাঠি (১০) ঢাল (১১) হ্যান্ড গ্যাস গ্রেনেড (১২) বেতের ঢাল (১৩) হেলমেট (১৪) গ্যাস শেল (১৫) বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট (১৬) রায়ট হেলমেট (১৭) গ্যাস মাস্ক (১৮) রায়ট কমান্ড ভেহিকেল (১৯) ওয়াটার ক্যানন।[২]

এছাড়া জননিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ পুলিশ এলএমজি, ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেল, ৭.৬২ সাব মেশিন গান, এলএমজি, পিপার স্প্রে ব্যবহার করে থাকে।[৩]

---

১. ওএন্ডএম শাখা, ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।
২. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৮
৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, visited on: 3/12/2015

Dhaka University Institutional Repository

আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশনা

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার (১৮৬১ সালের ৫ নং আইনের ১২ ধারা): (ক) কেবলমাত্র নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়: (১) ব্যক্তির আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ব্যবহার করার জন্য। (দণ্ডবিধির ৯৬-১০৬ ধারা) (২) বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য। ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৭-১২৮ ধারা) (৩) কতিপয় পরিস্থিতিতে গ্রেফতার কার্যকরী করার জন্য। (ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ ধারা)

(১) ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার : পুলিশ নিজেদেরকে এবং সরকারি সম্পত্তি, যেমন অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, মোটরগাড়ি, যানবাহন প্রভৃতি হামলার হাত হতে রক্ষা করার আইনানুগ আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উক্ত শক্তি ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি প্রয়োগ করা উচিত নয় বটে, তবে এজন্য প্রয়োজন হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যাইতে পারে। উপরোক্ত পরিস্থিতি পূরণ করার পরেও যেকোনো শ্রেণির পুলিশ অফিসার এমনকি একজন কনস্টেবলও গুলি চালানোর অধিকারী। কিন্তু পুলিশের শুধু যে নিজেকে ও সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় অধিকার আছে তাই নয়, এমনকি আক্রমনের কবল থেকে অন্য লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার এবং দায়িত্বও তার আছে। এখানেও পুলিশ মৃত্যুর কারণ ঘটানো অবাধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার অধিকারী যদি সে দেখতে পায় যে, কোনো বেসরকারি লোকের জীবন রক্ষা বা বেআইনিভাবে অপহরণ বা আটকের হাত থেকে রক্ষার জন্য তা করা প্রয়োজন। একইভাবে যদি দেখা যায় যে, কারও প্রাণহানি বা মারাত্মক আঘাত প্রাপ্তির আশংকা আছে তা হলে ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, চুরি, বেআইনি গৃহে প্রবেশ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার জন্যও পুলিশ অনুরূপভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রেও পুলিশ মৃত্যুর কারণ ঘটানো পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অধিকারী।

(২) বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার: একদল জনতার উপর গুলিবর্ষণের নির্দেশকে একটি চরম ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং কেবলমাত্র জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে তবেই এটা করা যায় অথবা যখন একজন ম্যাজিস্ট্রেট, থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অথবা তার চাইতেও উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার যখন মনে করবেন যে, অন্য কোনোভাবে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা সম্ভবপর নয় কেবল তখনই বেআইনি জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

(৩) গ্রেফতার কার্যকরী করার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার: ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ ধারার অধীনে কোনো ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগের দ্বারা গ্রেফতার প্রতিরোধ করলে অথবা গ্রেফতার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভের যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত নয় এমন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘটানোর অধিকার উক্ত ধারায় দেয়া হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, গ্রেফতার কার্যকরী করার জন্য পুলিশ অফিসার গুলিবর্ষণসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।[১]

পিআরবি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন

(১) দণ্ডবিধির ৯৬ হতে ১০৬ ধারার বিধান অনুযায়ী নিজের জানমাল, অপরের জানমাল বা সরকারি মালামাল অন্যায়ভাবে আক্রমণ করলে সেই আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করার জন্য পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহর করতে পারেন।

---

১. *Police Regulations Bengal*, 1943, Dhaka: Bangladesh Government Press, 1997, Vol-I, Regulation: 135, p. 153-154

Dhaka University Institutional Repository

(২) ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৭ ও ১২৮ ধারার বিধান অনুসারে বেআইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন।

(৩) ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ (৩) ধারার বিধানমতে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় আসামীকে গ্রেফতারের সময় সে যদি গ্রেফতারে বাধা দেয় বা পালাতে চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পরে।

(৪) পুলিশ আইনের ৩০-ক ধারার বিধান মোতাবেক শহরের বিশেষ কোন রাস্তায় শোভাযাত্রা, মিছিল নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তানুযায়ী অনুমতি দেওয়ার পর যদি তারা লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘন করে, তবে পুলিশ অফিসার মিছিলকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন এবং নির্দেশ অমান্যকারী মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রয়োজনে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন।

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার: পিআরবি নিয়ম ১৫৩ ও ১৫৬ অনুযায়ী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পর করণীয়:

(১) আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পর পুলিশের কর্তব্য হইতেছে, যারা আহত হয়েছে, তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাবেন এবং যারা নিহত হয়েছে, তাদেরকে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।

(২) আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার পর গুলির খোসা সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন এবং কত রাউন্ড গুলি করা হয়েছে তা নির্ণয় করবেন।

(৩) পার্টি কমাণ্ডার ঘটনার একটি নির্ভুল রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং এতে সকল খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করবেন।

(৪) পরিচালক পুলিশ অফিসার উক্ত রিপোর্ট টেলিফোন ব্যতীত অন্য যেকোন পন্থায় ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পুলিশ সুপার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

যে ক্ষেত্রে দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য[১]

দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লিখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে আক্রমণকারীর ইচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটান বা তার অন্য কোন ক্ষতির প্রতি প্রযোজ্য হবে, যদি যে অপরাধের জন্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেই অপরাধ অতঃপর উল্লিখিত বর্ণনাধীন হয়, যথা-

প্রথমত: এইরূপ আক্রমন যা এমন যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে মৃত্যুই হবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি।

দ্বিতীয়ত: এইরূপ আক্রমণ যা এমন যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে গুরুতর আঘাত হবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি।

তৃতীয়ত: ধর্ষণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

চতুর্থত: অপ্রকৃত কামলালসা চরিতার্থকরণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

পঞ্চমত: মনুষ্যহরণ বা অপহরণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

---

১. The Penal Code, 1860, *The Bangladesh Code*-2007, Vol-I, Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affirs, Sec: 100, p. 95-96

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠত: এরূপ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করে রাখবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ যে পরিস্থিতির জন্য এরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে যে, তার মুক্তির জন্য সে সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহের আশ্রয় নিতে সমর্থন হবে।

দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের আরম্ভ ও স্থিতিকাল[১]

দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, অপরাধ সংঘটিত না হয়ে থাকলেও উক্ত অপরাধ সংগঠনে উদ্যোগ বা ভীতি হতে দেহ বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ আতঙ্ক অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত অধিকার অব্যাহত থাকে।

যে ক্ষেত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটাইবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়:[২]

সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধকারীর মৃত্যু বা তৎপ্রতি অন্য কোন ক্ষতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হবে, যদি যে অপরাধ সংঘটন বা যে অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগের জন্য উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সেই অপরাধ অতঃপর উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের যেকোন একটি অপরাধরূপে গণ্য হয়; যথা–

প্রথমত: দস্যুতা।

দ্বিতীয়ত: রাত্রিবেলায় অপথে গৃহে প্রবেশ।

তৃতীয়ত: বাসগৃহ বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এমন ইমারত, তাবু, জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি।

চতুর্থত: এইরূপ অবস্থায় চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহপ্রবেশ, যা যুক্তিযুক্তভাবে এইরূপ ভয়ের সৃষ্টি করতে পারে যে অনুরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করা না হলে মৃত্যু বা গুরতর জখমই হবে উহার পরিণতি।

বাংলাদেশ পুলিশের ভাল কাজে স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত পদক

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার পদক প্রদান করা হয়। গুরুত্বরপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য (১) বাংলাদেশ পুলিশ পদক (সাহসিকতা) (২) বাংলাদেশ পুলিশ পদক (সেবা) (৩) রাষ্ট্রপ্রতি পুলিশ পদক (সাহসিকতা) (৪) রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (সেবা) প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত পুলিশ সপ্তাহে সরকার প্রধান এ পদক প্রদান করে থাকেন।

নিম্নে পদকের নাম, এককালীন অনুদান, মাসিক ভাতা উল্লেখ করা হল–[৩]

ক্রমিক	পদকের নাম	এককালীন অনুদান (টাকা)	মাসিক ভাতা (টাকা)
১।	বাংলাদেশ পুলিশ পদক	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
২।	প্রেসিডেন্ট পুলিশ পদক	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৩।	বাংলাদেশ পুলিশ পদক (সেবা)	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৪।	প্রেসিডেন্ট পুলিশ পদক (সেবা)	৫০,০০০/-	১,০০০/-

এছাড়াও ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আইজিপি ব্যাচ প্রদান করা হয়ে থাকে।

১. The Penal Code, 1860, *The Bangladesh Code*-2007, Vol-I, Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affirs, Sec: 102, p. 96

২. The Penal Code, 1860, *The Bangladesh Code*-2007, Vol-I, Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affirs, Sec: 103, p. 96-97

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সীমান্ড় অধিশাখা-১, নং-৪৪.০০.০০০০.১১৬.০৪.০০২.১২-৫৮, তারিখ: ২২-০২-২০১২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুলিশের ভূমিকা

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা হলো অপরাধী এবং দুষ্কৃতিকারীদের আইনের আওতায় আনা। অন্যভাবে বলা যায়, আইন ভঙ্গকারী ও অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি হলো– ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা (criminal justice system)। এ সম্পর্কে POLICE AND COMMUNITY WITH CONCEPT OF COMMUNITY POLICING গ্রন্থের লেখক বলেন–

> æThe Ciminal Justice System means the system of bringing a criminal or offender to justice. In other words, the procedure of awarding punishment to a law violator or a criminal is known as criminal justice system.”[১]

মূলতঃ Criminal Justice System এর প্রধান তিনটি উপাদান হলো-

(১) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা-বিশেষ করে পুলিশ (Law Enforcing Agency: Specially Police) (২) আদালত (Courts) (৩) সংশোধনকারী সংস্থা (Correctional Agencies)

বিচারপদ্ধতির শেষ উপাদান জেল বা সংশোধনাগার। বিচারে কোনো আসামির শাস্তি হলে সে অপরাধী হিসাবে গণ্য হয়। কাউকে কারাদণ্ড প্রদান করা হলে তাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য জেলে পাঠানো হয়। কারাগারকে সংশোধনাগারও বলা হয়।[২]

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বর্তমান আইন ও বিচার ব্যবস্থা পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রায় ২০০ বছর ধরে প্রচলিত বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার কাছে বহুলাংশে ঋণী যদিও বৃটিশ আদালত ব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ প্রাচীন হিন্দু এবং মুঘল শাসন ব্যবস্থা থেকে এসেছে। ইহা বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে একটি চলমান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রূপ লাভ করেছে। এ বিবর্তন প্রক্রিয়াটি আংশিকভাবে প্রাচীন এবং আংশিকভাবে বিদেশী। বর্তমান আইন ব্যবস্থা একটি মিশ্র পদ্ধতি থেকে উৎসারিত যা ইন্দো-মুঘল এবং ইংলিশ আইন ব্যবস্থা গঠন, আইনগত মূলনীতি এবং মতবাদের দ্বারা ঢেলে সাজানো হয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম আমল এবং পরবর্তীতে বৃটিশ আমলসহ পাক-ভারত উপমহাদেশের পাঁচশ বছরেরও অধিক সময়ের ইতিহাস বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি শাসনামলের একটি স্বতন্ত্র আইন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো খুব সহজে অনুধাবনের জন্য এগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা: হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ তথা সুলতানীয় ও মুঘল যুগ, বৃটিশ যুগ, পাকিস্তান যুগ এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ আমল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ৯ ধারার বিধান অনুসারে প্রাণীত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে High Court (Bengal) Order দ্বারা ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। নবপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট পূর্ববঙ্গ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে কলিকাতা হাইকোর্টের যাবতীয় আদি ও আপীল ক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকারী হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি জনাব আক্রাম ও জনাব ওরমন্ড, অতিরিক্ত বিচারপতি জনাব টি.এইচ, এলিস ও জনাব আমিরউদ্দিন এবং অস্থায়ী বিচারপতি জনাব আমিন আহমেদকে নিয়ে তখন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট গঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও দেশে বিচার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

---

১. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Ibid, p. 94
২. কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালতগুলি পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মহকুমা ও জেলাগুলিতে চালু থাকে। ঐ সকল অধস্তন আদালত নবপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের অধীনস্থ ছিল।[১]

Ciminal Justice System-এ পুলিশ হলো সবচেয়ে দৃশ্যমান (visible component) উপাদান। অন্য দুটি উপাদান হলো, কোর্ট বা বিচার বিভাগ এবং সংশোধনী সংস্থাসহ কারা কর্তৃপক্ষ এছাড়া বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য ও আলামত প্রমাণের জন্য ডাক্তারসহ বিশেষজ্ঞদের প্রামাণ্য সত্যায়ন পত্র ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় বিবেচ্য বিষয়। যেহেতু, পুলিশ বিভাগ হলো ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রথম প্রবেশপথ বা (Gateway)। এজন্য জনগণের দৃষ্টিতে পুলিশ হলো ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দৃশ্যমান প্রতিনিধি। পুলিশের যথাযথ ভূমিকার মাধ্যমে অনেক অপরাধ সংঘটন নিবারণ করা বা অপরাধের মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব।

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশের প্রধান ভূমিকা হলো– আইন ভঙ্গকারী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে বিচারের জন্য আদালতের আওতায় নিয়ে আসা। পুলিশ আদালতের সম্মুখে ঘটনার সাক্ষী ও বস্তুগত সাক্ষ্য হাজির করে। এছাড়া পুলিশ (Prosecution Side) এর পক্ষ হতেও অপরাধ প্রমাণে আদালতকে সহায়তা করে।[২]

Objectives of Criminal Justice System (ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য): ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সমাজে বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও উন্নয়নের পরিবেশকে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। পুলিশ, আদালত, মামলা পরিচালনাকারী পক্ষ (Prosecutor) এবং জেল বা সংশোধন কেন্দ্র ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ বা (Piller)। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হলো-(১) সমাজে অপরাধের নিয়ন্ত্রণ (২) সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা ও সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। (৩) বাদী ও বিবাদীসহ সাক্ষীর অধিকার রক্ষা করা।

Criminal Justice System হলো-সমাজে সভ্যতার ব্যারোমিটার। একটি সমাজ কতটুকু সভ্য তা নির্ভর করে তার বিচার ব্যবস্থার উপর। এই পদ্ধতিটি তিনটি বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি আরেকটির সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। এই তিনটি অঙ্গ বা Limbs হলো আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনপ্রয়োগকারী বিভাগ। পুলিশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্যতম। বিচার বিভাগ আইন বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় শক্তি ও নির্দেশনা সঞ্চার করে থাকে।[৩]

পুলিশ হলো Criminal Justice System ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধের তদন্ত ও অপরাধের অনুসন্ধান, অপরাধীকে গ্রেফতার করা, সাক্ষ্য সংগ্রহ করা এবং শাস্তি প্রদানে সহযোগিতা করা। এছাড়া কিশোর অপরাধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণও পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। সুতরাং সংগত কারণেই পুলিশ যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে সঠিক বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।[৪]

---

১. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫২

২. "In criminal justice process, the role of law enforcement members law violators or suspects and bring them before a Court of law for trial. Police officers help the Court providing evidence and putting up the witnesses. A police officer concering a particular case may also be a witness in the Court. Police also play an important role assisting the Court from the prosecution side to prove the offence of the under trial accused. The merit of justice mostly depends on the quality of investigation carried by police and presentation of evidence and witnesses by the prosecution." see. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Ibid, p. 94

৩. Muhammad Nurul Huda, *Bangaldesh Police Issued and Challenges*, Ibid, pp. 73-74

৪. "The functions of the police are largely enforcement of laws, maintenance of order, investigation of crime, detection and arrested of criminals, collection of evidence and getting conviction. On the preventive front, the

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে দারোগা আদালত-আল-আলিয়া, ডেপুটি নাজিম নাজিমের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। দেওয়ানি কোর্ট প্রদেশের সর্বোচ্চ আপিল কোর্ট হিসেবে প্রদেশের ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিবাদের বিষয়ের মীমাংসা করতেন। Daroga Adalat-al-Alia, deputy of the Nazim also exercised judicial functions of the Nazim. Diwan's Court decided civil disputes concerning land and revenue as the highest court of apeal in the province in those matters.

কাযি উত্তরাধিকার, সম্পদের অংশ নির্ধারণ ও বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংস করতেন। মুফতি কাযিকে তার মতামত প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করতেন। ফৌজদার মৃত্যুদণ্ড ব্যতিত সকল অপরাধের বিচার করতেন। কোতোয়াল শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং অপরাধ সনাক্তকরণ ও শাস্তি প্রদানে সহায়তা করতেন। মুহতাসিব মাতাল ব্যক্তি, মাদকদ্রব্য বিক্রি, ত্রুটিপূর্ণ ওজোন ও পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমলে নিতেন। ঐ সময়ে জেলাগুলোতে কাযি, জমিদার, ফৌজদার, কোতোয়াল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং বিচার পরিচালনা করতেন।[১]

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ, আদালত, আইনজীবী, জেল প্রভৃতির সমন্বয়ে বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। Police set the judicial system in motion বিচার পদ্ধতির প্রাথমিক কাজ পুলিশই শুরু করে। পুলিশ বাদির কাছ থেকে মামলা গ্রহণ করে তা তদন্ত করে, আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং বিধি মোতাবেক তা লিপিবদ্ধ করে। তদন্ত শেষে যেসব মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হয় সেসব মামলার অভিযোগপত্র (Charge Sheet) দাখিল করা হয়। যেসব মামলা তদন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হয় না সেগুলোর চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) দাখিল করা হয়। যেসব মামলার তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না সেগুলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) সত্য বলা হয়। যেসব মামলা তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় না সেগুলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা অভিযোগ দাখিলের জন্য বা পুলিশ এবং অন্য কাউকে হয়রানি করার মানসে মামলা করা হলে বাদির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তদন্তে অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হয় বা যে-আইনের অধীনে মামলা করা হয়েছে তা ভুল প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে সেটাকে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে আইনগত বা বস্তুগত ভুল বলা হয়ে থাকে। আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final memo) গৃহীত হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারযোগ্য মামলাগুলো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারের জন্য রেখে অন্য অভিযোগপত্রগুলো জজ আদালতে বিচারের জন্য সরকারি কৌসুলির নিকট প্রেরণ করা হয়। যেসব মামলার ফাইনাল রিপোর্ট (Final Report) দাখিল করা সেগুলো ম্যাজিস্ট্রেট যাচাই করে নথিভুক্ত করার আদেশ দিয়ে থাকেন। রেকর্ডপত্র যাচাই করার সময় যদি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অনুমিত হয় যে, মামলার সঠিক তদন্ত হয়নি তা হলে ম্যাজিস্ট্রেট পুনঃতদন্তের জন্য পুলিশের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন।

আদালতে পুলিশের একটা ইউনিট কাজ করে। তারা কোর্ট-পুলিশ হিসেবে পরিচিত। প্রত্যেক জেলায় কোর্টে একজন পুলিশ পরিদর্শক, কয়েকজন এসআই/এএসআই ও ২০-৩০ জন পুলিশ কনস্টেবল

---

police has to keep strict surveillance on juvenile delinquents and enforce the preventive laws." see. Muhammad Nurul Huda, *Bangaldesh Police Issued and Challenges*, Ibid, pp. 74-75

১. "Quazi decied cases relating to inheritance, succession, marriage etc. Mufti assisted the Quazi with his opinion. Fauzdar tried criminal cases except those punishable with death. Kotwal maintained law and order in the town and detected criminals and prosecuted them. Mohtasib took cognizance of drunkenness, selling of liquors and defective weights and measures. In those days in the districts Quazi, Zamindar, Fouzdar, Quannangoe, Kotwal etc. Mainained law and order and administered justice." see. Kazi Ebadul Hoque, *Administration of Justice In Bangladesh*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh-2003, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত থাকে। থানা থেকে অভিযোগপত্র পাওয়ার পর কোর্ট-পুলিশের দায়িত্ব সেগুলো যাচাই করে দেখা যে, তদন্তে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে কি-না বা কেইস ডকেটে সকল রেকর্ডপত্র সঠিকভাবে সন্নিবেশিত আছে কি-না। তদন্তে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তা থেকে যে-সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ও রেকর্ডপত্রের ঘাটতির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব সেগুলো ঠিক করে দেয়া। থানা থেকে প্রেরিত কেইস রেকর্ড ও আলামতসমূহ কোর্ট-পুলিশ রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং বিচারের সময় সেগুলো বিচারকের নিকট উপস্থাপন করে। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কম গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা এবং জামিনের শুনানিতে এসআই ও কোর্ট-পুলিশ পরিদর্শক রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। বাকি মামলাগুলো সরকারি কৌঁসুলি পরিচালনা করেন।

সরকারি কৌসুলির সাথে পুলিশের সহযোগিতা সম্পর্কে PRB তে উল্লেখ আছে যে, সরকারি কৌঁসুলির সাথে সরকারি উকিলের সহিত সম্পর্ক: (ক) পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকারি উকিলের সাথে সুপারিনটেনডেন্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং পুলিশ বিভাগের সহিত সম্পর্কিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সমস্যার উদ্ভব হওয়ামাত্রই তিনি তার সহিত খোলাখুলিভাবে সমস্ত কিছু আলোচনা করবেন।[১]

সরকারি সংস্থা হিসেবে পুলিশ বিভাগের প্রধান কাজ হলো জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষা করা। কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পুলিশের পক্ষে সহজে বোঝা সম্ভব যে, অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি-না হয়ে থাকলে কে বা কারা অপরাধ করেছে। আসমি শনাক্ত করা সম্ভব হলে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। কিন্তু আদালতে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে না পারলে পুলিশ যে বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। পুলিশের সকল কর্মকাণ্ড বিফলে যায়। আদালতও একটি সরকারি সংস্থা। সরকার জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ও আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে। আসামির অধিকার যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আসামির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ভিকটিমের অধিকারও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ তা ছাড়া সার্বিকভাবে আসামির শাস্তির সাথে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। বিচারের সময় আসামির অধিকারের সাথে এই বিষয়গুলো বিচারকদের বিবেচনায় থাকলে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষা করতে সহায়ক হয়।

অপরাধের ধরন: অপরাধ সাধারণত দু'প্রকার। (১) ধর্তব্য (cognizable) (২) অধর্তব্য (non-congnizable)। ধর্তব্য অপরাধে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু অধর্তব্য অপরাধে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে না। ধর্তব্য অপরাধ সাধারণত স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে বাদী কর্তৃক FIR-এর মাধ্যমে শুরু হয়।[২]

---

১. "Relations with public prosecutor of Government Pleader: (a) The Superintendent shall keep in close touch with the Public Prosecutor of Government Pleader whom he shall consult freely whenever an important of difficult legal questions arises which affects the Police Department. (b) A sub-divisional Police Officer (or a Circle Inspector in a Sub-division where their is no Sub-divisional Police Officer) shall similarly consult the Public Prosecutor of Government Pleader (if any) of the Sub-division. (c) No fee is payable for his advice to a Public Prosecutor or Government Pleader thus consulted." see. PRB-1943, Section-31

২. "Offences are either cognizable or non-congnizable. A cognizable offence is one in which case police may arrest the offender without a warrant of arrest and a non-cognizable offence is one in which case police can not arrest the offender without such warrant. A criminal case is initiated either by lodging a first information report (F.I.R) of a cognizable offence with the local police station (Thana)" see. Kazi Ebadul Hoque, *Administration of Justice In Bangladesh*, Ibid, p. 74

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ এরূপ FIR প্রাপ্তির পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং মামলার তদন্তের স্বার্থে সাক্ষ্য বা আলামত সংগ্রহ করে। যদি তিনি তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা পান তবে অধিক্ষেত্রভুক্ত আদালতে চার্জশিট প্রদান করেন। আর যদি ঘটনার তদন্তের মাধ্যমে সত্যতা না পান তবে অধিক্ষেত্রে আদালতে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করেন।[১]

ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা তার স্বজ্ঞানে অথবা সন্দেহবশত যদি বিশ্বাস করেন যে, অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তবে তিনি ধর্তব্য-অধর্তব্য উভয় অপরাধ আমলে নিতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ধর্তব্য অপরাধের ক্ষেত্রে তিনি নিজে বা অধীনস্ত কোনো বিচারক দ্বারা বা অন্য কোনো ব্যক্তিদের দ্বারা অথবা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে তদন্তের জন্য প্রেরণ করতে পারেন।[২]

FIR, Charge sheet and Final Report সম্পর্কে PRB তে উল্লেখ আছে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারার অধীনে তথ্য রেকর্ড: ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারায় উল্লিখিত আদালতগ্রাহ্য অপরাধের প্রাথমিক তথ্য ওসি বিপি ফরম ২৭ এ লিখবেন। নিজ হাতে তথ্য লিখে অফিসার এফআইআর লিখবেন এবং তাতে স্বাক্ষর ও সীলমোহর দিবেন।

FIR বা এজাহারের বৈশিষ্ট্য হল

(১) এজাহার একটি আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ। (২) এটা অবশ্যই লিখিত হতে হবে। (৩) এতে সংবাদদাতার স্বাক্ষর থাকতে হবে। (৪) মৌখিক হলে এটা লিখে নিতে হবে। (৫) এটিতে থানার মাসিক ও বাৎসরিক ক্রমিক নম্বর থাকবে। (৬) এজাহারের লিপিবদ্ধকারী অফিসারের স্বাক্ষর থাকতে হবে। (৭) এজাহার সংগঠিত হবার স্থান, সময় অপরাধজনক কাজের বিবরণ ও আইনের ধারা উল্লেখ থাকবে।

আদালতগ্রাহ্য অপরাধের যে খবর মুখে বা কাগজে-কলমে পুলিশের কাছে আসে তাকে এফআইআর হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ঘটনার সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি এ খবর দিতে পারেন অথবা শুনেও দিতে পারেন, যেভাবেই হোক তা এফআইআর এবং তার উপর ভিত্তি করেই ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৭ ধারার অধীনে তদন্ত আরম্ভ করতে হবে। কানে শুনে কোনো খবর দেয়া হলে ওসি প্রকৃত অভিযোগকারী বা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতির জন্য অপেক্ষা করে এফআইআর লেখা হতে বিরত থাকতে পারবেন না।

---

১. "Police after receipt of the F.I.R goes to the locality and investigates into the offence alleged and gathers evidence and if, prima facie, satisfied that an offence alleged has been committed apprehends the offenders and submits a report called charge sheet to the Magistrate of the area under whose jurisdiction the Thana falls and the Thana Magistrate takes cognizance of the offence on the basis of such report. On the other hand, if after investigation police finds that no such offence has been committed or it could not gather any evidence in support of the alleed offence then it submits a report called final report to the Magistrate stating the above facts." see. Kazi Ebadul Hoque, *Administration of Justice In Bangladesh*, Ibid, p. 74

২. "The Magistrate can take cognizance of both cognizable and non-cognizable offences on the basis of a petition of complaint or upon his own knowledge or on suspicion that such offence has been committed. A Magistrate is required to examine on oath the complainant and his witnesses present in court for prima facie satisfaction that an offence has been committed before taking such cognizance on the basis of a petition of complaint. A Magistrate having power to take cognizance of an offence, before taking cognizance, may inquire into the case himself or thorugh another Magistrate subordinate to him or by any other person to assertain the truth or falsehood of the complaint or may send the complaint to the local police for investigation." see. Kazi Ebadul Hoque, *Administration of Justice In Bangladesh*, Ibid, p. 75

Dhaka University Institutional Repository

সরেজমিনে তদন্ত: যদি কোনো থানার ওসি কোনো বিষয় তদন্ত করা প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে একটা এফআইআর পাঠিয়ে দেয়ার পর তিনি নিজে ঘটনাস্থলে রওয়ানা হবেন অথবা তার একজন অধঃস্তন অফিসারকে তদন্ত করতে পাঠাবেন।

চার্জশিট: একটা থানার ওসি যখন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪ অধ্যায়ের অধীনে একটা মামলার তদন্ত শেষ করে অভিযোগ প্রমাণিত দেখতে পান এবং কোনো একজনকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলেও সঙ্গে সঙ্গে বিপি ফরম ৩৯-এ চার্জশিট পেশ করবেন। চার্জশিট হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় বর্ণিত রিপোর্ট। অভিযুক্ত পলাতক অথবা বিচারের জন্য পুলিশি হেফাজতে উপরে প্রেরিত বা শপথনামা স্বাক্ষর করে অবস্থানরত যা হোক না কেন (ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭০) তার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে হবে। অভিযুক্ত পলাতক হলে তদন্তকারী অফিসার পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তির একটি তালিকাসহ চার্জশিট পেশ করবেন যাতে আদালত ক্রোক আদেশ পাঠাতে পারেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করার জন্য দ্রুততম উপায়ে চার্জশিট কোর্ট অফিসারের নিকট পাঠাতে হবে। কোনো মামলার দ্রব্য রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট লাভ করা পর্যন্ত চার্জশিট প্রেরণে বিলম্ব করা যাবে না। কোনো মামলার প্রথমেই চূড়ান্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়ে থাকলে পরে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা অন্য কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারে সোপর্দ করা হয়ে থাকলে চূড়ান্ত রিপোর্ট বাতিল করে চার্জশিট দাখিল করতে হবে। থানা হতে কোর্টে যাওয়ার সময় কোনো অপরাধী পালিয়ে গেলে চার্জশিট বলবৎ থাকবে।

চার্জশিট পেশ করার সময় থানার ওসি যার দ্বারা অপরাধ সংঘটনের খবর প্রথম পাওয়া গিয়েছে তাকে কি করা হয়েছে সে বিষয়েও একটি রিপোর্ট বিপি ফরম ৪০ অথবা ৪০-ক-তে দিবেন।

চার্জশিটের সাথে চুরি যাওয়া মাল ও গ্রেফতারকৃতদের নিকট পাওয়া মালের একটি তালিকা, পূর্বে কোনো শাস্তি হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট, জামিন এবং ফৌজধারি কার্যবিধির ১৭০ ধারার অধীনে কার্যকর স্বীকৃতি বন্ড (বিধির ৫ম তফসিলের ২৫ ও ২৬ ফরম) এবং যে সমস্ত জায়গার মানচিত্র মামলার জন্য প্রয়োজন সে মানচিত্র জমা দিতে হবে। যে সমস্ত বিষয় জানতে চাওয়া হচ্ছে চার্জশিটে কেবল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হবে।

কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণের সময় পুলিশ অফিসারকে চার্জশিটের পিছনের পাতায় এ মর্মে সার্টিফিকেট দিতে হবে যে, তিনি অপরাধী ব্যক্তিদের তালিকা (গ্রাম, সাজা পেয়েছে কিনা তার সমস্ত দিকই খাতায় দেখেছেন। চার্জশিট প্রমাণিত হয়েছে এমন লোকের চার্জশিটের সাথে পাঠাতে হবে, যাতে কোর্ট অফিসার ফৌজদারি কার্যবিধির ৫১১ ধারা অনুযায়ী তাদের প্রমাণিত করতে সক্ষম হন। উল্লিখিত সার্টিফিকেট ছাড়াও, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এমন কোনো অপরাধ করে থাকে যে জন্য বর্ধিত শাস্তি দেওয়া সম্ভব, তা হলে তদন্তকারী অফিসার চার্জশিটের পিছনে লিখবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এলাকার ১০ বৎসরের বেশি বা কম সময় অবস্থান করেছে কি-না।

চার্জশিটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লাল কালি দিয়ে শাস্তির পাতা এবং খণ্ড (গ্রাম অপরাধ নোটবুক দ্বিতীয় খণ্ড) অভিযুক্তের নাম যে রেজিস্টারে লেখা রয়েছে সেই পর্যবেক্ষণ রেজিস্টার, শাস্তি হোক বা না হোক যে সমস্ত মামলা সত্য ঘোষণা করা হয়েছে তা এবং সম্পত্তির তালিকায় লেখা নম্বর নোট করতে হবে।[১]

১. *Police Regulations Bengal*, 1943, Dhaka: Bangladesh Government Press, 1997, Vol-I, Regulation: 272, p. 271-272; The Code Of Criminal Procedure, 1898, *The Bangladesh Code*, Vol-IV, Dhaka: Ministry Of Law, Justice and Parliamentary Affirs, Sec: 154-161, p. 111– 114

Dhaka University Institutional Repository

চূড়ান্ত রিপোর্ট

(ক) যে সমস্ত মামলার তদন্ত করা হয় কিন্তু চার্জশিট ইস্যু করা হয় না তদন্তকারী অফিসার পি ফরম ৪২-এ সেগুলোর ব্যাপার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন। ৮নং কলামে মামলার একটি সুস্পষ্ট বিবরণ সাক্ষ্য এবং বিচারের জন্য অভিযুক্তদের উপরে না পাঠানোর কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। মামলাটি কিভাবে পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে জেনারেল রেজিস্টারে ম্যাজিস্ট্রেট উঠাতে পারেন তদন্তকারী অফিসার একই কলামে সেই কারণগুলো দিবেন। মামলাটি "সত্য" "উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা" "ঘটনার ভুল" বা "আদালত অগ্রাহ্য" কি হবে তাও বলতে হবে। (খ) প্রত্যেকটি চূড়ান্ত রিপোর্টের ফরম তিন কপি করতে হবে এবং বাৎসরিক ক্রমিক নম্বর দিতে হবে। এক কপি থানায় থাকবে এবং কেস ডায়েরি ও চূড়ান্ত স্মারকের রসিদের সাথে নথিভুক্ত হবে এবং অপর দুই কপি সার্কেল সহকারি সুপারিনটেনডেন্টের নিকট পাঠাতে হবে এবং প্রত্যেকটি কপিতে পাঠাবার প্রকৃত তারিখ ও সময় লিখে রাখতে হবে। সার্কেল সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট কপি কেস ডায়েরির সহিত সংযুক্ত রাখবেন এবং অপর কপি মন্তব্য ও সুপারিশসহ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাবেন। (গ) চূড়ান্ত রিপোর্ট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির মুক্তির অথবা অঙ্গীকারপত্র হতে রেহাই-এর আবেদন থাকতে হবে। জামিন ও স্বীকৃতি বন্ড চূড়ান্ত রিপোর্টের সহিত যুক্ত থাকবে।[১]

১. *Police Regulations Bengal*, 1943, Dhaka: Bangladesh Government Press, 1997, Vol-I, Regulation: 275, p. 276

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং ও ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা

কমিউনিটি হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগণের সমষ্টি। এক কথায় কমিউনিটি হলো একটি সামাজিক গোষ্ঠি যারা একই ধরনের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও স্বার্থ লালন করে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে। মূল কথা কোনো এলাকায় বসবাসকারী জনগণ ও সমাজকে কমিউনিটি বলা হয়। কমিউনিটি দ্বারা সাধারণত বহু ব্যক্তি বা ব্যাপক সংখ্যক সংগঠনকে বুঝায়।[১]

অনেকের মতে, কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণাটি আধুনিক মনে হলেও এর ভিত্তি খুবই প্রাচীন। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ পরিবার, গোত্র বা সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এজন্য গোত্রপতি বা সমাজপতিরা নিজ নিজ গোত্র বা সমাজের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেন। এ ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে যেমন গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো ঠিক তেমনি আরবের সমাজব্যবস্থায় 'মালা পরিষদ' এর মাধ্যমে নিজেদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার বিষয়গুলো দেখ-ভাল করা হতো। হাদিস শরিফে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

মহানবী (স.) সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি সৃষ্টজীব তাঁর পরিবারভুক্ত। আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিজনের (সৃষ্টির) প্রতি অনুগ্রহ করে।-(বায়হাকি)

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন–

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته۔

অনু:, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল; সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২]

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাথমিক সভ্যতায় আর্থ-সামাজিক ও নিরাপত্তা প্রশাসন সামগ্রিকভাবে গ্রামবাসীদের উপর ন্যস্ত ছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হত গ্রাম প্রধান বা পরিবার প্রধানের দ্বারা যাকে 'গ্রামীনি' বলা হত। Pre-vedic যুগে গ্রামীনি ব্যবস্থা এত শক্তিশালী যে, রাজা গ্রামীনিদের

১. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Ibid, p. 13
২. *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, ৬ষ্ঠ সংস্করন-২০১০, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজা শক্তিশালী হওয়ায় গ্রামীনিদের প্রভাবে ভাটা পড়ে।[১]

প্রাক ইসলামি যুগে আরবেও সম্প্রদায় বা গোত্র কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও গোত্রের নিরাপত্তা স্ব-স্ব গোত্রপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। Reuen Levy তার The Social Structure of Islam গ্রন্থে বলেন–

> "Before Islam, law and order had been maintained within each tribe by the power which it possessed of expelling members who offended its canons of morality and by the practice of the talio. As protection aginst outside aggression, there was the recognized understanding that the tribe avenged a wrong done to any of its members, and thus men hesitated to shed blood when the whole of their immediate society might be involved."[২]

আবক্ষাসীয় যুগে গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি গ্রাম প্রধান ও গোত্রপতিদের উপর ন্যস্ত ছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে প্রহরী মোতায়েন করা হত। শহরের আবর্জনা দূরীকরণ এবং রাস্তাঘাট, হাটবাজার ও পার্কে আলো সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল।

শহরের বসবাসকারী প্রতিটি জাতির অধিবাসীরা তাদের পৃথক জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্য হতে একজন প্রতিনিধি (রইস) নির্বাচিত করত। রইস তাঁর জনগণের স্বার্থ রক্ষা ব্যতীত তাদের আচরণের জন্যও সরকারের নিকট দায়ী থাকিতেন।

গ্রাম অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, বিচার পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রাম প্রধান ও গোত্র প্রধানদের উপর ন্যস্ত ছিল। সরকারি কর্মচারীরা প্রয়োজন হলে গ্রাম প্রধান ও গোত্র প্রধানদের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ করতেন।[৩]

মুসলিম শাসকগণ গ্রাম্য ব্যবস্থায় ঐহিত্য ও সংহতিকে ভঙ্গ করেননি; পক্ষান্তরে গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেছেন এবং এগুলোর দেখভাল করেছেন। অনুষ্ঠান পার্বনে গ্রাম প্রধান ও মোকাদ্দামদের শ্রেয় কাজে পুরস্কৃত করা হত।[৪]

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে স্থানিক নামের পদবিটির কার্যকলাপ বিশেষণ করলে আজকের 'কমিউনিটি পুলিশিং' শব্দের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। মৌর্য শাসনব্যবস্থায় রাজকীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীকে স্থানীয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হত। প্রত্যেক উপ-বিভাগে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একজন সর্দার থাকত, তাকে বলা হত স্থানিক। যেসব স্থানিক নগরে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকত, তারা রাজকোষ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করত। আর গ্রামাঞ্চলে যারা খণ্ডকালীন নিয়োজিত থাকত তারা ছিল অবৈতনিক। কিন্তু মফস্বল এলাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অনেক ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে, সুচতুর চানকা স্থানীয়

---

১. Tehzeeb-ul-Hassan, *Examining The Role of Community Policing in Japan: Lessons For Pakistan*, Ph.D. Thesis, University of Sindh, 2011, p. 13

২. Reuen Levy, *The Social Structure of Islam*, Ibid, p. 329

৩. ড. আজগর আলী খান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৪. "The Muslim Government did not break up the solidarity of the Village Community. On the contrary, they encouraged the village panchayati system and looked upon it with favour. On ceremonial occasions, the authorities bestowed upon the Muqadam or the headman of the village reward and robe of honour (Khila't) for his good services." see. Wahed Husain, *Administration of Justice During the Muslim Rule in India*, Ibid, p. 85

Dhaka University Institutional Repository

চেতনাবোধে উজ্জীবিত করার জন্য অথবা শান্তি রক্ষায় স্থানীয়ভাবে সংগঠিত করায় এ পদটির নাম দিয়েছিলেন স্থানিক। অবশ্য পরবর্তী প্রায় হাজার বছরের মধ্যে এ পদ্ধতির পুলিশি ব্যবস্থার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাধের্ক্ষ শেরশাহের শাসনব্যবস্থায় সমাজপতিদের সহযোগিতায় স্থানীয় দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা হয় এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সাহায্যে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধ দমনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুসন্ধানে যতটুকু জানা যায়, উপমহাদেশের ইতিহাসে শেরশাহই প্রথম সামাজিক পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলন করেন। পরবর্তী মোগল আমলে এ ব্যবস্থার আরো প্রসার ঘটে এবং জোরালো হয়। সমাজপতিদের নিয়ে বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েত সভা গঠিত হয়। ছোট-খাটো গ্রাম সালিশ, শান্তি-শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এরা কোতোয়ালকে সহযোগিতা প্রদান করত। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সভার প্রধান নিযুক্তি লাভ করতেন রাজকর্মচারিদের নির্দেশ মোতাবেক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটিশ আমলে নিয়োগের পরিবর্তে প্রত্যেক মহলায় মহলাবাসীদের ভোটে একজন পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং পাঁচ বা সাতজন পঞ্চায়েতের ভোটে একজন পঞ্চায়েত প্রধান মনোনীত হওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। পঞ্চায়েত প্রধানের উপাধি ছিল সর-ই-পাঞ্চ, স্থানীয়ভাবে তাকে সর্দারও বলা হত। সর্দার নির্বাচিত হওয়ার পর, তার নির্বাহ কার্য গ্রহণের পূর্বে অঞ্চলের প্রধান প্রশাসনিক কর্তা ও সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। সর্দারকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাথায় সর্দার পাগড়ী পরিয়ে অভিসিক্ত করা হত।

ঢাকায় দীর্ঘদিন মোগল প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকায় এ শহরের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় সরাসরি ছিল রাজকীয় ব্যবস্থার উত্তরাধিকার। সর্দারদের শান শওকত, জাঁকজমক আর দুর্দান্ত প্রতাপ ছিল রাজা নওয়াবদের মত। পঞ্চায়েত সভার কাজ ছিল: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সরকারকে সহযোগিতা করা। ছোট-খাট সালিশি নিষ্পত্তি করা, কল্যাণধর্মী সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যেমন ঈদ উৎসবে নামাজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, মহরম উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা। মহলার মৃত ব্যক্তির সৎকারে সহযোগিতা করা, জন্ম-মৃত্যু রেকর্ড সংরক্ষণ করা। মহলার মসজিদ নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ, পানীয়জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকেও এই পঞ্চায়েতী প্রথা ঢাকা শহরে প্রবর্তিত ছিল। ঢাকা শহরের পঞ্চায়েত সর্দারের একটি অভিষেক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, তৎকালীন ঢাকার জিওসি মোহাম্মদ আইয়ূব খান ও ঢাকার নওয়াব খাজা হাবিবুলার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না।

কমিউনিটি পুলিশের ধারণাটি প্রাচীন সমাজে নিজ কর্তৃক সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শুরু হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন গ্রাম ও শহর কাউন্সিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষমতাভোগ করতো। এ ব্যবস্থার অস্তিত্ব গ্রাম্য পুলিশের মাধ্যমে এখনও ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়টি নিয়ে ইংল্যান্ডে ব্যাপক গবেষণা হয়। J. Anderson, T. Bowden, T.A.Critchly and J.A.Brown সাধারণত তিন ধরনের কমিউনিটি পুলিশের কথা উলেখ করেন। (১) Primative Community Policing (যা প্রাচীন উপজাতি ও অনগ্রসর সমাজে বিরাজিত আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা সমাধান নিয়ে কাজ করতো)। (২) Totalitarian Community Policing (রাজনৈতিক উগ্রবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে কাজ করে থাকতো) (৩) Unofficial Community Policing (প্রচলিত পুলিশ ব্যবস্থার বহুবিধ কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক পুলিশের কার্যক্রম সম্পাদন ও পুলিশকে সহযোগিতা করাই এ ধরনের কমিউনিটি পুলিশের বৈশিষ্ট্য।[১]

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, জাপান, কানাডাসহ বিশ্বের উন্নত এবং অনুন্নত অনেক দেশের কমিউনিটি পুলিশ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সফলতার সাক্ষর রেখে চলেছে। জাপানে কমিউনিটি পুলিশকে 'Koban' বলা হয়। 'Koban' হল জাপানের সবচেয়ে ছোট কমিউনিটি পুলিশ ইউনিট। যেখান থেকে সাধারণত অপরাধ দমন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখাশুনা করা হয়। সাধারণত 'Koban' ইউনিটে Policeman, Sergent & Assistant Police Inspector দায়িত্বপালন করে থাকে।

'Koban' পুলিশ তার অধিক্ষেত্রের প্রতিটি গৃহ বছরে অন্তত দু'বার পরিদর্শন করে থাকেন। এ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হল তাদের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, পরিবারের সদস্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। এতে স্থানীয় কমিউনিটি জনগণের সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়। জাপানে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে কমিউনিটি পুলিশের 'Koban' চিত্র নিম্নরূপ:[২]

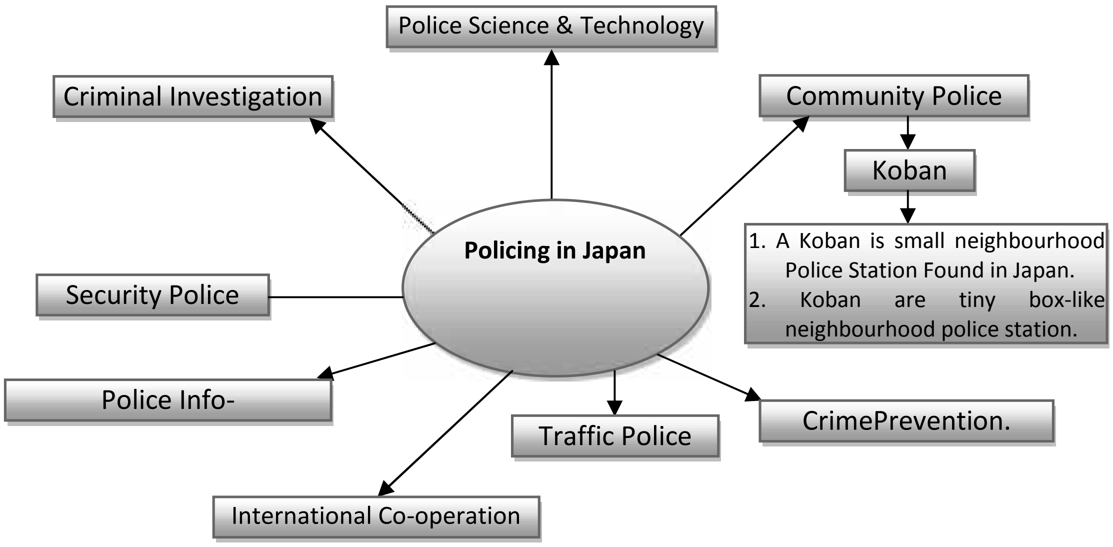

১. Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Ibid, pp. 30-31
২. Tehzeeb-ul-Hassan, *Examining The Role of Community Policing in Japan: Lessons For Pakistan*, Ph.D. Thesis, University of Sindh, 2011, p. 89

কমিউনিটি পুলিশিং-এর স্বরূপ

কোনো ভৌগলিক এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সাধারণ অর্থে কমিউনিটি বলে। বৃহৎ অর্থে কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানও কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত। কমিউনিটি পুলিশিং অর্থ কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত পুলিশি ব্যবস্থা (Community Driven Policing System)।

অন্য ভাষায় বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় অপরাধ দমন ও অপরাধ উদ্‌ঘাটন, অপরাধীদের গ্রেফতার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পুলিশ ও ঐ এলাকার জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্‌ঘাটন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতিই কমিউনিটি পুলিশিং।

কমিউনিটি পুলিশিং নতুন এক দর্শন যা পুলিশ অফিসার ও সাধারণ নাগরিকগণের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। এই পুলিশি ব্যবস্থা যা প্রতিনিয়ত সৃজনশীলভাবে কমিউনিটির সমসাময়িক অপরাধ সংক্রান্ত সমস্যা, অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার ভয় কিংবা সামাজিক অবক্ষয় কিংবা অস্থিরতার হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে চলতে পারে।

কমিউনিটি পুলিশিং সেই ধরনের দর্শন যা নিজ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে অগ্রগতির কৌশলগত দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যা পুলিশকে ক্রমান্বয়ে গণমুখী করতে থাকে। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সহজকৃত, নতুন মানসিক ধারার পুলিশ অফিসার সৃষ্টি হতে থাকে যারা চাকরির শুরু থেকে সরাসরি সাধারণ নাগরিকবৃন্দের সাথে সংযুক্ত হন। পুলিশ জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্যার আশু সমাধানের কৌশল উদ্ভাবন ঘটে, জননিরাপত্তার বিষয়গুলোতে ঘটনা ঘটার আগেই হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় এবং অপরাধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জোরদার করা যায়।[১]

অপরাধ, আইন-শৃঙ্খলার প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক সমস্যা এবং এ সকল সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে জনগণের মতামত ও পরামর্শ আমলে এনে পুলিশ ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তথা বহুবিধ সমস্যার সমাধান করে জনগণের অপরাধ ভীতি হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পুলিশ-জনতা যৌথভাবে কাজ করাই কমিউনিটি পুলিশিং।

এ কে এম শহিদুল হকের মতে, কমিউনিটি পুলিশিং হলো–

The way of performing policing through police-community partnership strategy for effective crime control, crime prevention, maintaining order and dealing with other social issues is community policing.[২]

Frazier এর মতে, কমিউনিটি পুলিশিং হলো একটি গণমুখী (Community Oriented), প্রতিরোধমূলক (Proactive) এবং সমস্যার সমাধানমূলক (Solution based) পুলিশি ব্যবস্থা যা

---

১. "Community Policing is a new philosophy stands upon the inter co-operation between public and police. This system can protect people creatively from contemporary offences of the community, fear for victimization and social degeneration or unrest. Community Policing is the philosophy directs strategic development of organizational structure of police that makes it gradually people oriented. It simplifies the decentralization process and creates the officers of a new ideological era, directly connected to people from the very beginning of their service. Thus, police-public relationship is established. Newer strategies are innovated to solve the newest problem. For public safety, interference happened before the occurrence and deterrence is strengthened." see. The Daily Star, 6 March, 2014, p. 12; দৈনিক সমকাল, ৬ মার্চ-২০১৪, পৃ. ৩২

২. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Ibid, p. 1

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত। এটি তখনই সংঘটিত হয় যখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আইন মান্যকারী জনগণ নিম্নলিখিত চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে।

১. অপরাধীকে গ্রেফতার করা (Arrest offenders)

২. অপরাধ দমন (Prevent crime)

৩. চলমান সমস্যার সমাধান (Solve ongoing problems) এবং

৪. সার্বিকভাবে জীবনের মানোন্নয়ন করা (Improve the overall quality to life)।

O'Connor এর মতে, কমিউনিটি পুলিশিং হলো জনবান্ধব ও বিকেন্দ্রকৃত পুলিশ ব্যবস্থা যার সামগ্রিক দর্শন হলো পূর্ণ সেবা প্রদান করা। যেখানে জনগণ অপরাধমূলক সমস্যা, অপরাধ ভীতি, বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়মূলক সমস্যায় নিজেদেরকে ক্ষমতাবান মনে করে সমস্যা সমাধানে পুলিশের সাথে অংশীদারমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এতে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।[১]

সরকারের বিধিবদ্ধ যে সংস্থাটি অপরাধ দমন, অপরাধ উদ্ঘাটন, বিচারের জন্য অপরাধীদের গ্রেফতার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সর্বোপরি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেখাশুনার দায়িত্বপালন করে তাকেই প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলে। পুলিশই মূলতঃ মৌলিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। পুলিশের ইতিহাস সনাতনী ইতিহাস। যুগের বিবর্তনে পুলিশের সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রেরও বিবর্তন এসেছে। বৃটেন ও আমেরিকার পুলিশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ঐ সকল দেশের পুলিশ অনেক বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপে আবর্তিত হয়েছে। লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট পিল আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থারও জনক। তিনি সনাতনি পুলিশিং ব্যবস্থাকে গণমুখী (Community Oriented) পুলিশিং ব্যবস্থায় রূপান্তরের পক্ষে দর্শন দিয়েছেন। তার আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থার মূল কথা হল, "পুলিশই জনতা এবং জনতাই পুলিশ" (The Police are Public and the Public are Police)। রবার্ট পিলের পুলিশিং-এর মূলনীতি হতেই মূলতঃ কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণা আসে।

The Upper Midwest Community Policing Institute কমিউনিটি পুলিশিংকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছে: অর্থাৎ কমিউনিটি পুলিশিং একটি সংগঠনভিত্তিক দর্শন ও ব্যবস্থাপনা যা জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনগণ, সরকার ও পুলিশের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন ও সমস্যার সমাধানকল্পে অপরাধের কারণ দূরীকরণ, অপরাধ ভীতি হ্রাস ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়।

কমিউনিটি পুলিশিং অর্থ জনগণকে পুলিশের কাজে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদি যা থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয় তা সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে কমিউনিটি পুলিশিং এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সকল সংজ্ঞারই মূলকথা জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত জীবনের লক্ষ্যে কাজ করা।

১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Community Policing এর উপর ব্যাপক গবেষণা হয়। গবেষকগণ কমিউনিটি পুলিশিংয়ের উপর গবেষণা করে এর নিম্নোক্ত

১. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Ibid, p. 14

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপের বিবরণ তুলে ধরেন- (১) গণমুখী অপরাধ নিবারণ ব্যবস্থা (Community based crime prevention) (২) সমস্যা সমাধানমূলক ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক (Problem solving & Partnership) (৩) দর্শনমূলক (Philosophical) (৪) সংগঠনভিত্তিক (Organizational approach) (৫) পরামর্শমূলক (Consultation) (৬) অভিযোজনমূলক (Adaptation) (৭) সংহতিমূলক (Mobilisation) (৮) পুলিশের জবাবদিহিতমূলক (Increased police accountability)[১]

বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং

বাংলাদেশের আধুনিক আদলের কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের অনুশীলন প্রথম লক্ষ্য করা যায় ১৯৯০ এর দশকে ময়মনসিংহ জেলায়। জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলা শহরে স্থানীয় অধিবাসিদের প্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলা শহরে প্রতিরক্ষা দল (Town Defence Party)। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে পাড়ায় মহলায় কমিটি গঠন করে সে সব স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তহবিল থেকেই পরিচালিত হওয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই শহর প্রতিরক্ষা দল। অপরাধ প্রতিরোধ ও বিরাজমান অপরাধ-সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে পুলিশ ও জনগণের যৌথ অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শহর প্রতিরক্ষা দলের কার্যক্রম যেমন-পুলিশের সাথে যৌথভাবে রাত্রিকালীন পাহারাদান অদ্যাবধি ময়মনসিংহ শহরে চালু রয়েছে।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কয়েকটি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা বগুড়া, যশোর ও মাদারিপুর জেলায় কমিউনিটি পুলিশ কার্যক্রমের উপর কিছু পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই সব প্রকল্পের অধীন সংশিষ্ট জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পেশা গোষ্ঠীর মানুষের অংশগ্রহণে কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম গঠন করার কথা শোনা যায়। এইসব প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে এনজিও অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এতে পুলিশ বিভাগের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। অন্যদিকে এনজিও অর্থায়ন বন্ধ হলে এসব কীভাবে পরিচালিত হবে তারও কোনো দিক নির্দেশনা নেই। একদিকে পুলিশের সাথে সংশিষ্টহীনতা ও অন্যদিকে আইনি বৈধতার অভাব-এই দ্বিবিধ কারণে এসব কার্যক্রম স্থায়ীত্ব পাবে না বলে মনে হয়।

কমিউনিটি পুলিশিং দর্শনের ব্যাপক অনুশীলনের উদাহরণ স্থাপিত হয়েছে রাজশাহী রেঞ্জে ২০০৭ সালে। রাজশাহী পুলিশ রেঞ্জের তৎকালীন উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক জনাব এ.কে.এম শহিদুল হক এর দিকে নির্দেশনায় ২০০৭ সালে রাজশাহী রেঞ্জের ১৬টি জেলায় কমিউনিটি পুলিশিং চালু করা হয়। পরবর্তীতে এই উদ্যোগ খুলনা রেঞ্জে সহ বাংলাদেশের অন্যান্য পুলিশ ইউনিটে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত: বাংলাদেশে আধুনিক কমিউনিটি পুলিশিং আন্দোলন বর্তমান গতি লাভ করে রাজশাহী রেঞ্জ মডেলের মাধ্যমে।[২]

বাংলাদেশের কমিউনিটি পুলিশিং সম্পর্কে Professional Journal of Police Staff College Bangladesh এ উল্লেখ করা হয়েছে–

> "In 1993, a Town Defence Party, similar to Community Policing, was introduced in Mamensingh by the then Superintendent of Police A.T. Ahmedul Hoque Chowdhury. It brought tremendous success in crime control and

১. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Ibid, po. 19-20

২. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, *কমিউনিটি পুলিশিং, দর্শন নীতি ও বাস্ড্রায়ন*, চট্টগ্রাম: সাফা'স ষ্টুডিও, ১ম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

lessended the fear of crime. Following the example of Mymensingh, Community Policing was introduced in Chandpur, Habiganj, Moulovibazar, Jamalpur, Thakurgaon, Sirajgonj districts and some parts of the DMPs. After 2007, the former Caretaker Government expanded community policing through the Police Ranges of Dhaka, Rajshahi, Khulna and Chittagong. Nowadays, the necessity of Community of Community Policing is also felt by the civil society and the Government of Bangladesh. Based on years of experience in community policing this paper intends to examine the expections and reflections, problems and prospects and overall effectiveness of Community Policing and provide some recommendation in this regard. The paper also reviews the feelings of the community as well as officers concerning this subject."[১]

কমিউনিটি পুলিশিং-এর বৈশিষ্ট্য (Features of Community Policing)

কমিউনিটি পুলিশিং সার্বিকভাবে পুলিশি তৎপরতার অংশবিশেষ। প্রথাগত আইন প্রয়োগ করে অপরাধ নিবারণের ক্ষেত্রে সাময়িক উপশম পাওয়া সম্ভব কিন্তু আরো প্রোথিত-এর অন্তর্নিহিত কারণ উদঘাটিত করা কিংবা উৎপাটন করার জন্য সমাজ-মানুষের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহের সাথে ওয়াকিবহাল হয়ে উপশমের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের আশায় প্রথার বাইরে এই পুলিশিং ব্যবস্থা প্রয়োগ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে প্রতিনিয়ত মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাসমূহের সমাধানই এই পুলিশিংয়ের জাদুমন্ত্র।

এজন্য পুলিশকে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হয়, তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমস্যাগুলোর একটি প্রাথমিক ধারণা নিতে হয়। এজন্য সবাইকে মন খুলে কথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ মানুষ প্রথম পর্যায়ে ইতস্তত বোধের দ্বারা তাড়িত হতে পারে। বন্ধুভাবাপন্ন পরিমণ্ডলে জড়তা কেটে যাওয়ার পর সাধারণ নাগরিক খোলামেলাভাবে তাদের মতামত দিতে শুরু করেন। অনেক সময় অভিযোগের তীর পুলিশের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে পুলিশের ধৈর্য্য ধারণ অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, কোথায় পুলিশের সীমাবদ্ধতা নিহিত কোথায় যৌথভাবে কাজ করে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।[২]

কমিউনিটি পুলিশিং-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম কিংবা কমিটি গঠিত হওয়ার পরপরই সংশিষ্ট এলাকায় প্রাথমিক একটি বার্তা প্রেরণ করা যায় যে, অপরাধীরা সামাজিক পর্যবেক্ষণের অধীন। এলাকাবাসী নিজেরা বসে ঠিক করে নিতে পারেন কোনো সমস্যার দিকে আশু নজর দেয়া প্রয়োজন এবং সেই সাথে কতখানি পুলিশি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সমাজে বা কমিউনিটিতে অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

---

১. Edited by Md. Motiur Rahman Sheikh, *PSC Journal*, Dhaka : Police Staff College Bangladesh, 2000, p. 52

২. দৈনিক সমকাল, ঢাকা: ৬ মার্চ ২০১৪, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

অনু: "তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।"[১]

বিপজ্জনক কাজে নিজেরা সংযুক্ত না হয়ে তথ্য উপাত্ত দিয়ে পুলিশকে সহায়তা প্রদান ফোরামের অন্যতম কাজ হতে পারে।

সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের ভিত্তিতে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া। যেখানে নারী নির্যাতনের উপদ্রব বেশি কিংবা শিশু পাচারের বা বাল্যবিবাহের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে সেই সমস্যা অনুযায়ী কমিউনিটি পুলিশিং পরিচালনা করা। একইভাবে মাদকবিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে উঠতি বয়সীদের অপরাধ জগতে প্রবেশে বাধা প্রদান, আশ্রয়হীন মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে সম্প্রীতি স্থাপন, ছাত্র কিংবা টুরিস্টদের জন্য প্যাকেজ প্রোগ্রাম কমিউনিটি পুলিশিংয়ের আওতাভুক্ত হতে পরে। উঠোন বৈঠক কিংবা নারীদের জন্য আলাদা ফোরাম গঠন, স্কুলে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, গাড়ি চালকদের জন্য প্রোগ্রাম ইত্যাদি নানাভাবে নানা উপায়ে কমিউনিটি পুলিশিং তৎপরতার পদক্ষেপ নেয়া যায়।

সংঘবদ্ধ অপরাধ কিংবা সিরিয়াস ক্রাইম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কমিউনিটি পুলিশিং যথাযথভাবে কার্যকর নয়। সেক্ষেত্রে সংবাদ কিংবা তথ্য দিয়ে অপরাধীদের গ্রেফতারে কিংবা অপরাধের আস্তানায় যাতে পোশাকী পুলিশ তৎপরতা চালাতে পারে কমিউনিটি পুলিশের সদস্যগণ সেভাবে সহযোগী ভূমিকা রাখতে পারে।

(ক) অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশকে সহায়তা করার দর্শন ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং পুলিশের কাজে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। যাতে পুলিশই জনতা এবং জনতাই পুলিশ (The Police are Public and the Public are Police) এ শ্লোগানটি বাস্তবে রূপায়িত হয়।

(খ) জনগণকে অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খশ্া রক্ষা এবং সমাজের বহুবিধ সমস্যা সমাধানে সম্পৃক্ত করে পুলিশ ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কার্যকর ও টেকসই গণমুখী পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(গ) অপরাধ ও সামাজিক অবিচার, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। জনগণের মধ্যে নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

(ঘ) পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করা এবং একটি সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(ঙ) অপরাধ দমন ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানে জনগণকে ক্ষমতায়ন করা এবং জনকল্যাণে কমিউনিটির সম্পদের (Community resource) সদ্ব্যবহার ও জনগণের মেধাকে কাজে লাগানো।

(চ) পুলিশ ও জনগণের ঐকান্তিক ও যৌথ প্রচেষ্টায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে একটি নিরাপদ, অপরাধমুক্ত ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে আইনের শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

জনশৃঙ্খলা রক্ষায় কমিউনিটি পুলিশিং-এর ভূমিকা

১. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিটি পুলিশিং প্রয়োগ করে সমাজে শান্তি বজায় রাখা মূলত পুলিশের দায়িত্ব। সমাজের মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে কাজে লাগানোর কৌশল পুলিশকেই উদ্ভাবন করতে হবে। পুলিশকেই কমিউনিটিতে গিয়ে অনুরোধ জানাতে হবে জনসাধারণকে এগিয়ে আসার জন্য।

সবাইকে এই ম্যাসেজ দিতে হবে যে কমিউনিটি পুলিশিং এক ধরনের স্বেচ্ছাসেবার বিষয়। বেতন কিংবা বস্তুগত লাভ এই পদ্ধতিতে নেই। সমাজে গ্রহণযোগ্য মানুষকে এই ফোরামের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। সন্দেহভাজন, অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিবর্গ যেন এখানে আসতে না পারে তার বিহিত ব্যবস্থা রাখতে হবে। কমিউনিটির সদস্যদের কোনোমতেই বিপজ্জনক কাজের দিকে ঠেলে দেয়া যাবে না বরং তারা যাতে অতি উৎসাহিত হয়ে সে পথ না মাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

থানায় থানায় পুলিশ সদস্যদের মধ্য থেকে কমিউনিটি পুলিশ অফিসার নিয়োগ দানের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। কমিউনিটি পুলিশ অফিসারগণ সময় সময় ফোরামগুলো পরিদর্শন করবেন এবং মতবিনিময়ের দরজা সবসময় খোলা রাখবেন। সময়মত সভা বা মিটিং আহক্ষান করবেন।

কমিউনিটির শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষার্থে নিম্নলিখিত প্রদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে−

জনসম্মুখে বা প্রকাশ্যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধীদের গ্রেফতার করে পুলিশে সোপর্দ করতে পারে। অপরাধ পরিস্থিতির নিয়মিত পর্যালোচনা করে বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির করণীয় সম্বন্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে এবং থানা পুলিশকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারে। ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, গরু চুরি ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশের পরামর্শ ও জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অপরাধীদের উপস্থিতি, গোপন আস্তানা এবং অপরাধীদের অপরাধ কার্যাবলী বা অপরাধ সংগঠনের প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে গোপনে পুলিশকে সংবাদ দিতে পারে।[১]

চুরির মতো অপরাধ দমনে পবিত্র আল কুরআনে কঠোরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে−

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অনু: "পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২]

মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা ও অপব্যবহার রোধে মাদকবিরোধী প্রচারণা এবং অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে এলাকাকে মাদকমুক্ত করার কর্মসূচী নিতে পারে। চোরাচালান, খাদ্যে ভেজাল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী নিতে পারে।

কিশোর অপরাধ, বখাটে ছেলেদের উৎপাত, স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রী ও যুবতী মেয়েদের রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করা বন্ধ করার জন্য বখাটেদের চিহ্নিত করে তাদের অভিভাবক ও সমাজের মুরবক্ষীদের দ্বারা চাপ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধানের কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

যৌন অপরাধ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণ এবং এইডস, অনিয়ন্ত্রিত যৌন মেলামেশা ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। নারী

---

১. এ কে এম শহীদুল হক, *কমিউনিটি পুলিশিং কি এবং কেন?*, রাজশাহীঃ পপুলার প্রেস, আগস্ট-২০০৭, পৃ. ৬
২. আল-কুরআন, ৫ : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, শিশুশ্রম, নারী ও শিশু পাচার ও নারীর প্রতি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার কর্মসূচী নেয়া যায়। এছাড়া কিশোর অপরাধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিশু অধিকার ও শিশুর প্রতি পিতা-মাতা, পরিবারের সদস্য ও সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।[১]

সমাজে সংঘটিত ছোট-খাট অধর্তব্য অপরাধ যেমন– পারিবারিক বিরোধ, দাম্পত্য কলহ, জমি-জমা বা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগ, বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বিবাদ ইত্যাদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপোষ-মীমাংসা করার দায়িত্ব নেয়া যায়। সাধারণত জমিজমা নিয়ে কমিউনিটিতে বেশি সংখ্যক লোকের মাঝে বিবাদ সংঘটিত হতে থাকে।

এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে–

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين.

অনু: সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত জমি জোর দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গলায় সাত স্তর যমীন হতে বেড়িরূপে পরিয়ে দেবেন।[২]

পবিত্র আল কুরআনে বিচার মীমাংসা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا.

অনু: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৩]

(জ) ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অপব্যাখ্যা, বিতর্কিত ফতোয়া, হিল্লা বিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলামি শিক্ষায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহায়তায় জনমত সৃষ্টি করা যায়।

(ঝ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও দৈব দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে এসে সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবা প্রদানের কর্মসূচী রাখা যায়।

(ঞ) এলাকায় অপরাধ বৃদ্ধি পেলে কমিউনিটির উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে নৈশকালীন এবং ক্ষেত্রমতে দিবা প্রহরার জন্য প্রহরী নিয়োগ করে পেট্রোল স্কীম চালু করা যায়। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা যায়।

(ত) গণমাধ্যমের সাথে পুলিশের সহযোগিতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ।

(থ) মামলার বাদী, সাক্ষী ও ভিকটিমকে বিশেষ আইনি সহায়তা, ভীতি দূর করে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি এবং মনস্তাত্বিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। মিথ্যা মামলা এবং নিরীহ লোককে

---

১. এ কেএম শহীদুল হক, *কমিউনিটি পুলিশিং কি এবং কেন?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২. মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা-৪র্থ সংস্করন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৩. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

হয়রানি করার ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা ও তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া। সাক্ষ্য সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ ..... وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ......

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

অনু: "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়; ...... সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমরা রাযি তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। সাক্ষীদেরকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। এটা ছোট হোক অথবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনোরূপ বিরক্ত হয়ো না। ....

তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।"[১]

কমিউনিটি পুলিশের দায়িত্ব সম্পর্কে এ. কে. এম শহীদুল হক বলেন, কমিউনিটি পুলিশিং একটি স্বেচ্ছাসেবি কার্যক্রম। এতে কোনো পার্থিব লাভ নেই। সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের কমিউনিটি পুলিশে অংশগ্রহণ করা উচিত বিপরীতে সমাজের সন্দিগ্ধ ও অপরাধী ব্যক্তিদের কমিউনিটি পুলিশে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।[২]

পুলিশ ও জনগণের যুগপৎ সম্পর্কের বিষয়ে জি. অ্যান্ডারসন উল্লেখ করেন–

> "In olden time's people, both in England and India, were held responsible for keeping the peace. A citizen was bound not merely to abstain from criminal actions himself, but also to assist in bringing offenders to justice; he was indeed his æbrother's keeper". The old system, dependent entirely on the village organizaton, is obviously out of date to day, but the present system needs for its success the active support rather than the passive opposition of the people for whose benefit the force is maintained."[৩]

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও কমিউনিটি পুলিশিং

---

১. আল-কুরআন, ২ : ২৮২-২৮৩

২. "The message should be disseminated that-community policing is a voluntary work. It will not help any earthly gain. Socially accepted people should be attracted in this forum. There should have barrier so that suspected or crime-prone people cannot enter into the system. Police cannot indulge public in risky job rather it should be observed so that people can not involved themselves in this type of work over enthusiastically." see. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Ibid, p. 94

৩. G. Anderson, *British Administration in India*, Delhi: Gian Publishing House, Reprint–1988, p. 102

Dhaka University Institutional Repository

কোনো অধ্যাদেশ বা আইনের মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশের উদ্ভাবন না হলেও প্রচলিত আইনে স্থানীয়ভাবে কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রমে কোনো বাধা নেই। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ ধারা মোতাবেক জনসাধারণের কতিপয় ক্ষেত্রে পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করার বাধ্যবাধকতা আছে। পুলিশ রেগুলেশনের ৩২ প্রবিধি মোতাবেক জনসাধারণের প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের পুলিশি কাজে সহায়তা চাওয়ার বিধান আছে।[১] ফৌজদারি কার্যবিধি এবং পুলিশ রেগুলেশনের উল্লেখিত ধারার মর্মানুসারে পুলিশি কাজে জনগণের সহায়তা একটি সংগঠিত শক্তি। কাজেই প্রচলিত আইনেই কমিউনিটি পুলিশের সমর্থন আছে। আমাদের দেশের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গ্রামের গণ্যমান্য ও মাতবক্ষর কর্তৃক শালিসির মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা প্রকারান্তে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থারই জনস্বীকৃত নিদর্শন। এছাড়া জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার বিষয়ে PRB তে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা ব্যতীত পুলিশের পক্ষে কোনো কাজে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নহে। অতএব, যেকোন পুলিশকে কর্তব্য পালনের সময় সকল শ্রেণির লোকের সাথে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করতে হবে। উচ্চপদস্থ অফিসারগণ নিম্নপদস্থদের উপর সকল সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন তারা এই নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলে এবং দায়িত্বপালনের সময় তারা যাতে যতদূর সম্ভব কম বিবাদের সৃষ্টি করে।[২]

ধারা-৪২। জনসাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে সাহায্য করবেন: ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসার যুক্তিসঙ্গতভাবে সাহায্য দাবি করলে, প্রত্যেক ব্যক্তি:

(ক) অপর যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে গ্রেফতার করতে অথবা তার পলায়ন প্রতিরোধ করতে।

(খ) শান্তিভঙ্গের আশংকা প্রতিরোধ অথবা শান্তিভঙ্গ দমন করতে অথবা রেলপথ, খাল, টেলিগ্রাফ অথবা সরকারি সম্পত্তি প্রতি ক্ষতির প্রচেষ্টা প্রতিরোধের ব্যাপারে সাহায্য করতে বাধ্য।

(গ) পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্য যে ব্যক্তি পরোয়ানা কার্যকরী করছেন, তাকে সাহায্য দান:[৩]

ধারা-৪৩। পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা কার্যকরী করার নির্দেশ দেয়া হলে এবং তিনি নিকটে থেকে উক্ত পরোয়ানা কার্যকরী করলে অপর কোনো ব্যক্তি তাকে পরোয়ানা কার্যকরী করতে সাহায্য করতে পারেন।[৪]

জনসাধারণ কতিপয় অপরাধ সম্পর্কে সংবাদ দিবেন:

ধারা-৪৪। (১) কোনো ব্যক্তি দণ্ডবিধি ১২১, ১২১-ক, ১২৩, ১২৪, ১২৪-ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করেছে অথবা করার সংকল্প করেছে বলে জানতে পারলে প্রত্যেকটি লোক যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে এবং এরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব তার,

---

১. Police Regulation of Bangladesh-1943, Vol-I, Regulation-32, Dhaka: BG Press, 1997, p. 32
২. Police Regulation of Bangladesh-1943, Vol-I, Regulation-33, Dhaka: BG Press, 1997, p. 33
৩. The Code of Criminal Procedure-1898, Section-42, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-IV, p. 57-58
৪. The Code of Criminal Procedure-1898, Section-43, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-IV, p. 58

Dhaka University Institutional Repository

অবিলম্বে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারকে এইরূপ অপরাধ করার অথবা অপরাধ করার সংকল্পের কথা তৎক্ষণাৎ জানাবেন।

(২) এ ধারার উদ্দেশ্যে 'অপরাধ' বলতে বাংলাদেশের বাইরে কোনো স্থানে কৃত কোনো কার্য, যা বাংলাদেশে করা হলে অপরাধ বলে গণ্য হত, তাও বুঝাবে।

গ্রাম-প্রধান, হিসাবনবিস, জমির মালিক ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতে বাধ্য:

এই ধারার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গ্রাম-প্রধান নিয়োগ:[১]

ধারা-৪৫। (১) প্রত্যেক গ্রাম-প্রধান গ্রামের হিসাবনবিস, গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের পুলিশ অফিসার, জমির মালিক অথবা দখলকারের এবং এরূপ জমির পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত উক্ত মালিক অথবা দখলকারের এজেন্ট এবং সরকার অথবা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ হতে জমির রাজস্ব অথবা খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেকটি অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে, যদি তিনি জানেন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে, দুইটির মধ্যে যেইটি সর্বাপেক্ষা নিকট, তৎক্ষণাৎ জানাবেন যে,-(ক) তিনি যেই গ্রামের গ্রাম প্রধান, হিসাবনবিস, চৌকিদার অথবা পুলিশ অফিসার অথবা জমির মালিক অথবা দখলকার, অথবা এজেন্ট অথবা অস্থায়ী বাসস্থান।

(খ) এরূপ গ্রামের মধ্য দিয়া যাতায়াতকারী কোনো ব্যক্তি, যাকে তিনি ঠগ, ডাকাত, পলাতক আসামি অথবা অপরাধী ঘোষিত বলে জানেন অথবা তাকে তার এইরূপ ব্যক্তি বলে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

(গ) এরূপ গ্রামে অথবা গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে কোনো জামিনের অযোগ্য অপরাধ অথবা দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৪ অথবা ১৪৮ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটন অথবা এরূপ অপরাধ করার সংকল্প আছে।

(ঘ) এরূপ গ্রাম অথবা গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে কোনো আকস্মিক অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যু অথবা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে কোনো মৃত্যু অথবা এরূপ গ্রামে অথবা গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে এমন পরিস্থিতিতে কোনো লাশ অথবা লাশের অংশবিশেষ আবিষ্কার, যার ফলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হতে পারে যে, এরূপ মৃত্যু ঘটিয়াছে অথবা এইরূপ গ্রাম হতে এমন পরিস্থিতিতে কোনো লোকের নিখোঁজ হওয়া, যার ফলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হতে পারে যে, উক্ত লোকটি সম্পর্কে কোনো জামিনের অযোগ্য অপরাধ করা হয়েছে।

(ঙ) বাংলাদেশের বাইরে কোনো স্থানে এরূপ কোনো কার্য সংঘটন অথবা সংঘটনের সংকল্প, যেই কার্য বাংলাদেশে করা হলে দণ্ডবিধির ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ৩০০, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৮৯-ক, ৪৮৯-খ, ৪৮৯-গ, ৪৮৯-ঘ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য হত।

---

১. The Code of Criminal Procedure-1898, Section-44, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-IV, p. 58

Dhaka University Institutional Repository

(চ) শৃঙ্খলা রক্ষা অথবা অপরাধ প্রতিরোধ অথবা ব্যক্তি বা সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যাহত করতে পারে, এরূপ কোনো বিষয়, যে সম্পর্কে সরকারের পূর্ব-অনুমোদনক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাঁহাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

কমিউনিটি পুলিশিং-এর মূল প্রতিপাদ্য

(ক) পুলিশই জনতা এবং জনতাই পুলিশ (The Police are the public and the public are the police) কমিউনিটি পুলিশিং এর নীতি এবং Prevention is better than cure-এ প্রবাদ বাক্যের মূল কথাই কমিউনিটি পুলিশিং এর মূল কথা। কমিউনিটি পুলিশিং প্রতিরোধমূলক পুলিশি ব্যবস্থা (Proactive Policing) নীতি অনুসরণ করে।

(খ) কমিউনিটি পুলিশিং একটি অরাজনৈতিক সেবাধর্মী কার্যক্রম। জনগণ ও পুলিশের পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা (Mutual Confidence, Understanding & Respect) কমিউনিটি পুলিশিং-এর সাফল্যের চাবিকাঠি।

কমিউনিটি পুলিশিং একটি গণমুখী (Community Oriented), প্রতিরোধমূলক (Proactive) এবং সমস্যার সমাধানমূলক (Solution based) পুলিশি ব্যবস্থা ও দর্শন যা জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনগণের প্রত্যাশা ও মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

পুলিশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলেও স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের কাজ সেবামুখী (Service Oriented) হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং এটা পুলিশ ও জনতা উভয়েরই প্রত্যাশা।

জনগণ পুলিশের সেবার সেবাভোগী গোষ্ঠী (Target Group)। পুলিশের সেবা জনগণ কিভাবে নিচ্ছে এবং জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী পুলিশ সেবা দিতে পারছে কিনা তা জানার জন্য পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন ও সম্প্রীতি স্থাপন অপরিহার্য। জনগণ সকল কাজেই পুলিশের উপস্থিতি ও সহায়তা চায়। পুলিশের কাজ না হলেও জনগণ পুলিশের নিকটই অভিযোগ করে তাৎক্ষণিক সেবা বা প্রতিকার পাওয়ার জন্য। সমাজে অপরাধের ধরন, কৌশল ও মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন দিন নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে পুলিশের কাজ এবং পুলিশের উপর জনগণের প্রত্যাশাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুলিশের আছে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা। লোকবলের স্বল্পতা প্রকট। প্রায় প্রতি ৯৫০ জন লোকের জন্য ১ জন পুলিশ। দায়িত্বপালনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট, পরিবহণ, সাজ-সরঞ্জাম, কাজের পরিবেশ, বাসস্থান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে ঘাটতি ও প্রতিবন্ধকতা। পুলিশের মধ্যেও রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের মনমানসিকতা। পুলিশের বিরুদ্ধে আছে ক্ষমতার অপব্যবহার, মানুষকে হয়রানি, অসদাচরণ ও দূর্নীতির অভিযোগ। এ সকল কারণে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করতে হলে পুলিশের মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন আনতে হবে এবং জনগণকে পুলিশের কাজে সম্পৃক্ত করে জনগণের প্রত্যাশা, মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে জনগণের সহায়তায় পুলিশি কার্যক্রম চালাতে হবে। আর এ ব্যবস্থাই হবে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা। পুলিশের কাজের সফলতা

১. The Code of Criminal Procedure-1898, Section-45, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-IV, p. 58-59

Dhaka University Institutional Repository

এবং জনগণের নিকট পুলিশের কাজের অনুমোদন ও সমর্থন পেতে হলে কমিউনিটি পুলিশিং এর বিকল্প নেই। পুলিশকে হতে হবে গণমুখী, সেবাধর্মী ও পেশাদার এবং একই সাথে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন তৈরী করতে হবে যার সুফল জনগণ ও পুলিশ উভয়েই পাবে। একটি স্বাধীন দেশে ও গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণ পুলিশের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে।

যথাযথ আইন শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজে শান্তি ও উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়। শুধু শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব। দেশের উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। পুলিশ অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাদের স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। Inside Indian Police গ্রন্থাকার উল্লেখ করেন-

> æThere cannot be any peace stability and development, in the society without proper law and order. It is only in a peaceful atmosphere that development, and progress of the country is possible. Cooperation between the police and the people is essential for an efficient criminal administration system in the country. The police perform many of their duties at great personal risk to themselves.”[১]

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অনুসরণের ধারাবাহিকতায় এ যাবৎকাল সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনে পুলিশমুখী হয়েছে, পুলিশের কাছে ধর্না দিয়েছে। অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে পুলিশকে এখন গণমুখী হতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পুলিশকে হাজির হয়ে জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

কমিউনিটি পুলিশিং ঐতিহ্যগত পুলিশি কার্যক্রমের সাথে কোনোমতেই সাংঘর্ষিক নয়, একটি আরেকটিকে প্রতিস্থাপিত করে না। ঐতিহ্যগতভাবে আইনপ্রয়োগের পদ্ধতির সাথে সামাজিকভাবে আইনপ্রয়োগের ধারণা যুক্ত হলে মানুষের নিরাপত্তাবোধের বলয়টি আরও শক্তিশালী হতে পারে। এতে পুলিশের প্রতি কমিউনিটির বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি পায়, কমিউনিটির মানুষ নিজেদেরকে বেশি নিরাপদবোধ করে।

কমিউনিটি বা সমাজের নিরাপত্তায় ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাকে পূর্ণ বিবরণসহ নিজের সামনে বর্তমান রেখেছে। ব্যক্তি এবং তার সত্তা, ব্যক্তি ও তার নিকটতম পরিবার, ব্যক্তি ও সমাজ একজাতির সাথে অপর জাতি এবং একটি বংশ ও ভবিষ্যতে আগমনকারী বংশের সকলের মধ্যে সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআনে মানবজাতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে–

يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوْاط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْط إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অনু: “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।

১. Joginder Signh, Inside Indian Police, New Delhi: Gyan Publishing House, 2002, p. 105

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[১]

দায়িত্বশীলতার এহেন মিলিত সামাজিক নীতিমালা ব্যক্তি ও তার সত্তার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির দায়িত্ব হলো যে নফসকে লাগামহীন কামনার দৌরাত্ম্য থেকে বিরত রাখা। তাকে সর্বপ্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখে তার পরিচর্যা সাধন করা এবং তাকে নিয়ে কল্যাণ, মুক্তি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে ধক্ষংসের হাত থেকে রক্ষা করা; এ সকল কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব থাকে একমাত্র ব্যক্তির উপরই। ব্যক্তি নিজেই এ সফল কাজ সম্পাদন করে সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوْا اللهَ ط إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অনু: "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"[২]

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে তার উপর পরিবার ও প্রতিবেশীর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। পরিবার ও প্রতিবেশীর ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সমাজে অন্যায় প্রতিরোধ ও দুর্বল অসহায়দের রক্ষার বিষয়ে পবিত্র আল-কুরআনে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج لا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

অনু: "তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ–যার অধিবাসী জালিম, তা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর'।"[৩]

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে যে, রসুল (সা.) বলেছেন–

"যে ব্যক্তির ক্ষতি হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে যাবে না।"[৪]

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে জান্নাতে একা থাকতে দেয়া হয়নি। বরং মা হাওয়া (আ.)-কেও সৃষ্টি করে তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করতে দেয়া হয়েছিল। হযরত আদম (আ.)-এর জোড়া সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেছিলেন–

يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অনু: "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১]

---

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩
২. আল-কুরআন, ৫ : ২
৩. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫
৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ-২০১৪, পৃ. ১০২

মানব ইতিহাসের শুরুতেই সমাজের মূলভিত্তি পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন তামাদ্দুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি, তখনো মানুষ পরিবারবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বাস করত। পরবর্তী পর্যায়ে এই পারিবারিক এককসূত্র গোত্রে এবং গোত্রসমূহ সমাজে পরিণত হয়। অর্থাৎ মানুষের স্বভাব হলো অন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা-তথা সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা। এর দুটো কারণ দেখা যায়। (১) স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। (২) জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন।

স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, এর অর্থ মনস্তাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বজাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগের অধিকারী। স্বজাতির সঙ্গসুখে সে আত্মিক ও মানসিক শান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে, স্বজাতির সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন হলে তার মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। আর নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকালীন নির্জনতা তাকে আতংকগ্রস্ত করে তোলে।

জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন, এর অর্থ মানুষের একক ব্যক্তিগত শক্তি একেবারেই সীমাবদ্ধ। অথচ সে তুলনায় তার পার্থিব প্রয়োজন বিপুল ও ব্যাপক। সুতরাং তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তার ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। সেজন্য তাকে সহযোগিতা নিতে হয় অন্য মানুষের। সে অন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না এক মুহূর্তের জন্যও।

নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সাধন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামে ‘হুকুকুল ইবাদ’ তথা অপরের প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বস্ততার সাথে ‘হুকুকুল ইবাদ’ আদায় করা ইসলামি সমাজ জীবনযাপনের অপরিহার্য শর্তবিশেষ। শুধু নিজের বা নিজ পরিবারের আরাম-আয়েশ করার অধিকার কোনো মুসলিমকে দেওয়া হয়নি; বরং তার আনন্দ-বেদনা, সুখানুভূতি ও সম্পদে রয়েছে তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখী মানুষের অংশ ও অধিকার।[২]

প্রতিবেশীরা আত্মীয়-স্বজনের চাইতেও অধিক কাজে আসে। আত্মীয়-স্বজন তো সবাই কাছে থাকে না। প্রতিবেশীরাই বিপদে-আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় প্রথমে এগিয়ে আসে। বিপদের সময় প্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর নেয় ও সেবাযত্ন করে থাকে। বিয়েশাদী এবং অনুরূপ সামাজিক কাজকর্মে প্রতিবেশীর ভূমিকা থাকে উল্লেখযোগ্য। কুরআন মাজিদে সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

অনু: “তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর শরিক করবে না; এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চযই আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”[৩]

---

১. আল-কুরআন, ২ : ৩৫
২. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইফাবা, ৮ম সংস্করণ, জুন-২০০৯, পৃ. ৪২৯-৪৩০
৩. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ সকল প্রকারের ও সকল পর্যায়ের প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ইমানের পরিপন্থী কাজ।

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের কোনো প্রকার কষ্ট-যন্ত্রণা না দেয়া, তাদের উপকার করা, গরীব প্রতিবেশীকে দান করা এবং অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেয়া প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। নবী করীম (স.) বলেছেন– "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে পরে থাকে অভুক্ত অবস্থায়।"

প্রতিবেশীর হক্ সম্পর্কে আলাহর নবী (স.) মুমিনদের দয়া প্রদর্শনের তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি সামর্থ্যানুসারে তাদের জন্যও কিছু অংশ নির্ধারণ করার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি হুকুম করেছেন– যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে কিছু পানি অতিরিক্ত দিবে; আর তোমার প্রতিবেশীদের পর্যন্ত তা পৌঁছাবে।[১]

মহানবী (স.) বলেছেন–

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে সদা-সর্বদা প্রতিবেশীর সাথে (সদাচারণের) উপদেশ দিয়েই যাচ্ছিলেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, তিনি তাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করবেন।[২]

প্রতিবেশী যে কোনো ধর্মের, যে কোনো বর্ণের এবং যে কোনো আদর্শের অনুসারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি ইসলাম প্রত্যেক মুমিনকে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামেরই শিক্ষা। আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিবেশীর সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ ঈমানদারগণের ঈমানের দাবী।[৩]

পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ভ্রাতৃত্ব রক্ষার জন্য ইসলামে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) ইরশাদ করেন–

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুল (স.) বলেন, তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করবে না, পরস্পরের গুপ্তদোষ তালাশ করবে না এবং পরস্পরের সাথে প্রতারণা করবে না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাইরূপে থাকবে।"[৪]

এছাড়া আন্দাজ-অনুমান, দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, লোভ-লালসা এবং প্রতারণার বিষয়টি ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রসুল (সা.) ইরশাদ করেন–

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুল (স.) বলেন, তোমরা আন্দাজ-অনুমান থেকে বিরত থাক। কেননা, আন্দাজ-অনুমান সত্য নয়। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না, লোভ-লিপ্সা বর্জন কর। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না। একে অপরের পশ্চাতে হত্যা করো না বরং তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করে চলো।[৫]

---

১. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
২. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫
৩. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫-৪৩৭
৪. *মুসলিম শরীফ*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, (সকল খণ্ড একত্রে), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩১
৫. *মুসলিম শরীফ*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, (সকল খণ্ড একত্রে), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩১

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে সাধারণত ঠাট্টা বিদ্রুপ ও অপরকে হেয় করা বিষয়কে কেন্দ্র করে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সম্বোধন করে বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অনু: “হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ইমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে তারাই জালিম।”[১]

সামাজিক সহাবস্থান

মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যকে একে অন্যের সাথে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। সে তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অভাব পূরণ করে দিবেন। বিপদে-আপদে সাহায্য করবে এবং কেউ কারো প্রতি যুলুম নির্যাতন করবে না। এভাবে মুসলমানকে অন্য মুসলমানের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করে সহাবস্থান করার জন্য নবী করীম (স.) নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

হাদীস শরিফে এসেছে–

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.

অনু: “হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন– তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাই-এর জন্য, অন্য বর্ণনায় তার প্রতিবেশীর জন্যও তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।”[৩]

ইসলামি রাষ্ট্রে যে সব অমুসলিম বাস করে তাদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। তাদের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মনে রেখ যে ব্যক্তি কোনো মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানি করে অথবা তার কোনো সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করব।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ নবী অমুসলিম নাগরিকদের উপর অত্যাচার করা এবং মালসম্পদ কেড়ে নেয়াকে কত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। অমুসলিমদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে।

---

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১
২. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২
৩. মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র সেখানকার মুসলিম নাগরিকদের উপর যতই অবিচার, অত্যাচার করুক না কেন, ইসলামি রাষ্ট্র তার কোনো অমুসলিম নাগরিকের প্রতি প্রতিশোধ নিতে পারবেনা। সকলকে সামাজিক সম্প্রীতি অর্জন করতে হবে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করতে হবে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সবাইকে বসবাস করতে হবে।[১]

সমাজের মাদকের প্রভাব

সমাজ জীবনে মাদকের প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। মাদক ক্যান্সারের মত সমাজকে ধক্ষংসের দিকে নিয়ে যায়। জনগণকে বিশেষ করে যুবসমাজকে মাদকের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা করতে কমিউনিটির সদস্যদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য মাদকমুক্ত সমাজের কোন বিকল্প নেই। মাদককে ইসলামে সমস্ত পাপের দরজা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস শরিফে এসেছে−

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রসুলুল্লাহ (স.) আমাকে উপদেশ দিয়েছেনঃ শরাব পান কর না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের দরজাস্বরূপ।[২]

হাদীস শরিফে আরও উল্লেখ রয়েছে−

ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস শরাবের অন্তর্ভুক্ত এবং যেকোন শরাবই হারাম।[৩]

জনজীবনে দুর্ভোগ লাঘব ও পাবলিক ন্যুইসেন্স বন্ধ

জনজীবনের জন্য বিরক্তিমূলক কাজ বন্ধের জন্য যেমন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, ঠিক তেমনি জনকল্যাণমূলক কাজ করার প্রতি ইসলামে বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। হাদিসে তাই উল্লেখ রয়েছে−

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমরা বড় রাস্তায় অবস্থান করবে না এর উপর পেশাব পায়খানা করবে না।[৪]

এ বিষয়ে হাদিসে আরও উল্লেখ রয়েছে−

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী রসুলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাস্তার উপর একটি গাছের ডাল পড়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছিল, তখন এক ব্যক্তি তা সরিয়ে দিল ফলে, তাকে জান্নাতে দাখিল করা হল।[৫]

অপরাধ দমন ও জননিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি বিধান এবং পুলিশের ভূমিকা

প্রতিটি মানুষ সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। সমাজের কোনো মানুষ যেন অপরাধ করে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট না করে এটাই সকলের কাম্য। তবুও সমাজের কিছু মানুষ অন্যের অধিকার খর্ব করে অপরাধ করে বসে। ফলে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। সমাজে যাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় সে লক্ষ্যে ইসলাম সমাজকে কলুষমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, যেসব পরিস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা থেকে সমাজকে মুক্ত

১. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩
২. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৩. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১
৪. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭
৫. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

রাখা। যেমন সম্পদের ইনসাফ সম্মত বণ্টন, যাতে অভাবের তাড়নায় কাউকে চুরি, ডাকাতি করতে না হয়। প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজ পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজগুলো ইসলামিক দৃষ্টিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সুস্থ ও কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কার্যকলাপের সাথে পুলিশ বিভাগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অপরাধ দমনে ইসলামি বিধানের বৈশিষ্ট্যঃ অপরাধ দমনে ইসলামি বিধানের কতকগুলো অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

(১) প্রতিরোধমূলক : ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পথ খোলা রেখে মানুষকে অপরাধ করার সুযোগ দেয় না বরং অপরাধের কারণসমূহ যাতে সংঘটিত না হয়, তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবূ সাঈদ (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি তো (তার) কর্তব্য পালন করেছেন।

আমি রসুলুলাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, তবে সে যেন হাত দ্বারা তার সংশোধন করে। যদি এর ক্ষমতা না থাকে তবে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা (ঐ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে)। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়।[১]

হাদিস শরিফে আরও উল্লেখ রয়েছে–

"গুনাহের দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গুনাহে লিপ্ত থাকাবস্থায় ঈমান থাকে না অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণতা থাকে না রসুলুলাহ (সা.) বলেছেন, ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকাকালে মুমিন থাকে না। চোর চুরি করাকালে মুমিন থাকে না। শরাবি ব্যক্তি শরাব পান করাকালে মুমিন থাকে না। আবু হুরায়রা (রা.) অন্য সূত্রে তার সাথে আরও বলেছেন, মানুষের সামনে লুণ্ঠনকারী মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করাকালে মুমিন থাকে না।"[২]

হাদিস শরিফে আরও উল্লেখ রয়েছে–

عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته وأخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.

অনুঃ "রসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবিদের কিছু ছেলে তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা পরস্পরে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা রসুলুল্লাহ (সা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের যে কেউ কোনো যিম্মির উপর অত্যাচার করবে, যা তার হক নষ্ট করবে, কিংবা তার সামর্থের বাইরে তাকে কষ্ট দিবে, অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জোরপূর্বক) তার কোনো জিনিস নিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।"[৩]

হাদিস শরিফে আরও এসেছে–

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়, তখন সে যেন তাকে (সঠিক) পরামর্শ দেয়।[৪]

---

১. *মুসলিম শরীফ*, ঢাকাঃ ইফাবা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করন, পৃ. ১১১
২. *মুসলিম শরীফ*, ঢাকাঃ ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
৩. আবু দাউদ শরীফ, ঢাকাঃ ইফাবা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭
৪. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

(২) ইনসাফভিত্তিক : ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে। অপরাধী ও যে সমাজের বিরুদ্ধে সে অপরাধ করেছে, এ উভয়ের পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে। ইসলাম চোরের হাত কেটে দিতে বলে কিন্তু যেখানে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, চোর ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করেছিল, সেখানে কিছুতেই এ শাস্তি দেয়া হয় না। সামান্য জিনিস চুরির জন্য চোরের হাত কাটা হয় না। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা লাঘব করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا
تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

অনু: "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[১]

হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে যে–
আলি (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) আমাকে ইয়ামানের কাযি নিযুক্ত করে পাঠান। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ইয়া রসুলুল্লাহ (স.) আপনি তো আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক মাত্র এবং বিচার করার মত কোন জ্ঞানই আমার নেই। তখন নবী (স.) বলেন-নিশ্চয় আল্লাহ তোমার দিলকে হিদায়াত দেবেন এবং তোমার যবানকে সঠিক রাখবেন। কাজেই যখন দু'ব্যক্তি তোমার নিকট কোন মোকদ্দমা নিয়ে আসবে, তখন তুমি ততক্ষণ কোন ফয়সালা দেবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করবে। কেননা, দু'ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পর, তাদের ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আলি (রা.) বলেন-এরপর আমি কাযি হিসেবে কর্তব্যরত থাকি এবং এ সময়ে কোন মোকদ্দমা ফয়সালার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে আপতিত হই নাই।[২]
হাদিসে আরও উল্লেখ রয়েছে–
সিরিয় দেশিয় ফাসিলা নাম্নী এক মহিলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপন গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখা কি পক্ষপাতিত্ব? তিনি বললেন: না, তবে আপন গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করাই হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব।[৩]

(৩) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান: ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সকলের জন্য ইসলাম একই শাস্তির বিধান দেয়। দেশের কোনো ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়।

(৪) সংশোধন ও মীমাংসামূলক: আল্লাহর হক সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ইসলাম অপরাধীকে তওবা করার সুযোগ দেয়। খাস নিয়্যতে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেন। ফলে সে নিজে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ
فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ.

---

১. আল-কুরআন, ৫ : ৮
২. আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫
৩. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, ২য় প্রকাশ-২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

Dhaka University Institutional Repository

অনু: "মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে-যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"[১]

বিবাদের মীমাংসা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে–

কাবাবাসীরা পরস্পর বিবাদলিপ্ত হল এবং একে-অপরের প্রতি পাথর মারতে শুরু করল। এ খবর পেয়ে হুজুর (সা.) লোকদেরকে বললেন, চল, তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই।[২]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

তাদের উভয়ের মধ্যে যদি তোমরা বিরোধের আশঙ্কা কর তাহলে তোমরা তার (অর্থাৎ পুরুষটির) পক্ষ থেকে একজন এবং ঐ মহিলাটির পক্ষ থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"[৩]

আপোস-মীমাংসা সম্পর্কে উমর (রা.) বলেন–

> "আরও মুসলমানদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা জায়েয আছে, তবে সে আপোস যা হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করে দেয়, তা নয়। যে বিচারের তুমি রায় দিয়ে দিয়েছ, তারপর সে ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ। তাথেকে ফিরে এসে বিশুদ্ধ রায় প্রকাশে বিরত থেকো না। কেননা সত্য হচ্ছে চিরন্তন আর বাতিলের উপর অটল থাকার চেয়ে সত্যের দিকে ফিরে আসাটাই উত্তম।"[৪]

৫) কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি: ইসলাম অপরাধের ক্ষেত্রভেদে বেত্রাঘাত, রজম ও শিরচ্ছেদের বিধান দেয়। এগুলো কঠোর ও কঠিন শাস্তি। কিন্তু এ শাস্তি জনসমক্ষে দিতে হবে, যেন সাধারণভাবে মানুষ শাস্তির কঠোরতা দেখে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্যে এরূপ শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[৫]

পবিত্র কুরআনে ইরাশাদ হয়েছে–

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰأُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অনু: "হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[৬]

হাদিসে আরও উল্লেখ রয়েছে–

---

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ৯
২. বোখারী শরীফ (সকল খন্ড একত্রে), বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩
৩. আল-কুরআন, ৪:৩৫
৪. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৮
৫. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫-৪৫৮
৬. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين.

অনু: আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম রসুলুল্লাহ (স.) শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবু বকর সিদ্দিক (রা.) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।[১]

(৬) জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা : ইসলামে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ط ذَّلِكُمْ وَصَّكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অনু: "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর।"[২]

এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন–

"নিশ্চয় তোমাদের ধন-প্রাণ এবং মান-সম্মান বিনষ্ট করা তোমাদের উপর এরূপ নিষিদ্ধ, যেরূপ তোমাদের জন্য আজকের দিন, এ মাস এবং এ শহরের পবিত্রতা বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ। তোমাদের উপস্থিতি লোকগণ অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার এ বক্তব্য অবশ্যই পৌঁছিয়ে দিবে।"[৩]

হাদিসে লুটতরাজ ও জীবকে বিকলাঙ্গ করা নিষেধ করা হয়েছে–

عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة.

অনু: আদি ইবন সাবিত (রা.)-এর নানা আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী রসুলুল্লাহ (স.) লুটতরাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।[৪]

হাদিসে সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহিদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد.

অনু: আবুদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহিদ।[৫]

হাদিসে আরও এসেছে–

আনাস ইবন মালিক (রা.) সূত্রে নবী রসুলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন দুইজন মুসলমান একে-অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে লড়াই করবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।[৬]

(৭) অত্যাচার, নির্যাতন ও ধোঁকাবাজি নিষিদ্ধ

---

১. বুখারী শরীফ, ১০ম খণ্ড, ঢাকা: ইফাব-২০১০, ষষ্ঠ সংস্করন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
২. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১
৩. *মুসলিম শরীফ*, (সকল খন্ড একত্রে), বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০
৪. বুখারী শরীফ, ঢাকা: ইফাবা-অষ্টম সংস্করন, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
৫. বুখারী শরীফ, ঢাকা: ইফাবা-অষ্টম সংস্করন, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-২৭১
৬. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে অন্যায়ভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হুযুর (সা.) বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না; কিংবা (অত্যাচারের জন্য) তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না। যে কেউ তার ভ্রাতার অভাব পূরণে (সক্রিয়) থাকবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন। যে ব্যক্তি (দুনিয়ায়) কোনো মুসলিমের কোনো বিপদ দূর করবে, আল্লাহ রোজ কিয়ামতে তার বিপদসমূহের মধ্যে বড় কোনো বিপদ দূর করবেন।

রসুল (সা.) আরও উল্লেখ করেন–

রসুল (সা.) আরও উল্লেখ করেন, "যে ব্যক্তি কাজ কারবারে ধোঁকাবাজি করে সে আমার অনুগামী নয়।"[১]

প্রতারণা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে–

عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس.

অনু: ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) প্রতারণামূলক দালালী থেকে নিষেধ করেছেন।[২]

(৮) পাপাচার ও অশ্লীল কাজ নিষিদ্ধকরণ: ইসলামে পাপাচার ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল-কুরআনে ইরাশাদ হয়েছে–

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর-যাতে তোমারা সফলকাম হতে পার।"[৩]

হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে–

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا

أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.

অনু: আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফিক অথবা যার মধ্যে, এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকে, তার মধ্যেও মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে (৩) যখন চুক্তি করে তা লংঘন করে (৪) যখন ঝগড়া করে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।[৪]

হাদিসে এসেছে–

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.

অনু: আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হল যে, সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে।[৫]

মহানবী (স.) উল্লেখ করেন–

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

অনু: "হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– মুসলমানকে গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তার সাথে মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরি।"[৬]

---

১. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯
২. বুখারী শরীফ, ঢাকা: ইফাবা-অষ্টম সংস্করন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩. আল-কুরআন, ৫ : ৯০
৪. বুখারী শরীফ, অষ্টম সংস্করন, ঢাকা: ইফাবা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৫৬
৫. *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১
৬. মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) উল্লেখ করেন–

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.

অনু: "হযরত আনাস (রা.) নবী কারিম (সা.) থেকে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– তা হলো, আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা; কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা।"[১]

(৯) অপরাধের দায় ব্যক্তিগত: ইসলামে ব্যক্তির অপরাধের দায় ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। ব্যক্তি কোনো কোনো পাপকার্যে লিপ্ত হয়, তবে তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে অপরকে নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল-কুরআনে ইরাশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُه عَلٰى نَفْسِه ط وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অনু: "কেউ পাপ কাজ করলে সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২]

পবিত্র আল-কুরআনে আরো ইরাশাদ হয়েছে–

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط

অনু: "আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই।"[৩]

নারী ও ইয়াতীমদের প্রতি সদাচরণ ও জুলুম নিষিদ্ধ

মহানবী (স.) নারী ও শিশু ও ইয়াতিমদের প্রতি উত্তম ব্যবহার ও তাদের হক যথাযথভাবে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। হাদিস শরিফে এসেছে–

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (স.) বলেছেন: হে আল্লাহ! আমি দুই প্রকার দুর্বল লোকের হক (নষ্ট করা) নিষিদ্ধ করেছি, তারা হলো ইয়াতীম এবং মহিলা।[৪]

হাদিস শরিফে আরও এসেছে–

সুরাকাহ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সাদাকার পথ বলে দেব না? তোমার কন্যা যে তোমার কাছে ফিরে এসেছে, আর তুমি ছাড়া তার অন্য কোন উপার্জনকারী নেই।[৫]

হাদিস শরিফে আরও উল্লেখ রয়েছে–

ইয়ালা আমেরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ও হুসায়ন (রা.) দৌড়ে নবী (স.) এর কাছে আসলেন। তখন তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন: সন্তান মানুষের দুর্বলতার কারণ।[৬]

মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে কোনো ভূখণ্ড বা কমিউনিটিতে বাস করে, সমগোত্রীয় মনোভাব পোষণ করে একই সংস্কৃতি লালন করে এবং কমিউনিটির কিছু সংখ্যক মানুষ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে জনগণের জান-মাল ও নিরাপত্তার রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে। কাজেই পুলিশে যোগদানকারী সদস্যরা কমিউনিটি বা সমাজে বসবাসকারী মানুষগুলোর মনের গতি প্রকৃতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রেষণা প্রভাবক,

---

১. মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
২. আল-কুরআন, ৪ : ১১১
৩. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬
৪. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, ২য় প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭
৫. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩
৬. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সর্বোপরি ব্যক্তিগত সাংগঠনিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়। কমিউনিটি ও পুলিশবাহিনীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে কতটুকু সহায়তা করবে, অপরাধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে কিভাবে একত্রে কাজ করবে তার সংস্কৃতিচর্চা করা প্রয়োজন।

কমিউনিটি পুলিশের ধারণা ও কার্যক্রম ইসলামের রীতি-নীতি ও অনুশাসন দ্বারা সমর্থিত। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) খলিফাদের সময়ে কমিউনিটির নিরাপত্তা ও জনজীবনের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত ও এর অনুশীলন করা হয়েছে। ইসলামসহ সকল ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ, সর্বোপরি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশের কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসতে পারে। যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এ ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর তৎপরতা, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মান্ধ ও উগ্রমৌলবাদের ভূমিকাওহ্রাস পাবে।

পরিবেশে বলা যায় যে, সমাজের জনগণ ও পুলিশকে পারস্পরিক সমযোতা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। জনগণকে আইন মান্য করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এবং তার চর্চা করতে হবে। আমাদের পবিত্র সংবিধানে সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্বপালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] পুলিশ সমাজেরই অংশ এবং সমাজের কিছু সদস্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে থাকে। তাই রাষ্ট্রের জনসাধারণকে ন্যায় ও সৎগুণের অধিকারী হতে হবে। তবেই একটি উত্তম পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠতে পারে।

Syedur Rahman তাঁর *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy* গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন, ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন বিরোধী প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং এভাবে মানসিক শান্তি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি অর্জন ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ব্যক্তি জীবনে শান্তি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অভিষ্ট লক্ষ্য। ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন বিবদমান শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি সত্তাকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সাহায্যে আত্মশৃঙ্খলা অর্জনই ইসলাম।[২]

রবার্ট মার্কের ভাষায় পুলিশ সামাজিক আচরণের উৎকৃষ্ট প্রতিফলন। সমাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় পুলিশও উচ্ছৃঙ্খল হবে; সমাজ যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় পুলিশও দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে সমাজ যদি সহনশীল, শিক্ষিত ও মানবিক আচরণে অভ্যস্থ হয় পুলিশও একইরকম সহনশীল ও মানবিক আচরণে অভ্যস্থ হয়ে পড়বে।[৩]

---

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ-২১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

২. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইফাবা-জানু-২০১৫, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২০-৩২১

৩. "The Police is the best reflection of a society. If the society is violent, so are the police, if the soceity is corrupt, so are the police, but if the society is tolerant, literate, human, the police will act accodringly." see: Joginder Signh, Inside Indian Police, New Delhi: Gyan Publishing House, 2002, p. 119

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১:

মহানবী (স.) এর সচিব[১]

মহানবী (স.) (ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি)	
দপ্তরসমূহ	সচিবালয় (মসজিদ-ই-নববি) সচিবগণ
আলণ্ঢাহর ওহি (প্রত্যাদেশ) সমূহ লিপিবদ্ধকরণ	হযরত আলি (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) (তাঁদের অনুপস্থিতিতে উবাই-বিন-ক'াব ও যায়দ-বিন-সাবিত)
জাকাত ও সদকা হতে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণ	আল জুহাইম-বিন-আল-সাত এবং আল-জুবাইর বিন আল-আওয়া'ম
খেজুর হতে সম্ভাব্য আয়ের হিসাব তৈরী	হুদ'ইফা বিন-আল-ইয়ামন
জনগণের মধ্যকার যোগাযোগ রেকর্ড	আল-মুগিরাহ বিন-শুআইব এবং আল-হাছান-বিন-নামির
বিভিন্ন গোত্র ও তাদের পানির হিসাব সংরক্ষণ (এছাড়াও এই দপ্তরে আনছার, পুর ষ ও মহিলাদের রেকর্ড রাখা হত)	আবদুলণ্ঢাহ-বিন-আল-আরকাম এবং আলা বিন-উকবাহ্
রাজন্যবর্গ ও গোত্র প্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠির খসড়া তৈরী	যায়দ-বিন-সাবিত এবং আবদুলণ্ঢাহ- ইবনে আল-আকরাম
রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব সংরক্ষণ	মুআয়কিব-বিন-আবি ফাতিমাহ
সিলমোহর সংরক্ষণ	হানজালাহ-বিন-রাবি

পরিশিষ্ট-২ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দেহরক্ষীবৃন্দের তালিকা[২]

ক্র. নং	নাম	গোত্র/বংশ	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	সাদ ইবন মু'আয	আওস/আশহাল	মহানবী (সা.) এর তাঁবু প্রহরা	বদরের যুদ্ধ	রমযান, ২য় হি./মার্চ, ৬২৪ খ্রি.
২.	ঐ	ঐ	মহানবী (সা.) এর গৃহ প্রহরা	উহুদের যুদ্ধ	শাওয়াল, ৩য় হি./ মার্চ ৬২৫ খ্রি.
৩.	উসায়দ ইবনুল-হুযায়র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১. আবদুন নূর, *লোক প্রশাসন*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃ. ৯৬

২. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর সরকার কাঠামো*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪, পৃ. ৪০৪ ও ৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্র. নং	নাম	গোত্র/বংশ	কাজের প্রকৃতি	অভিযান	তারিখ
৪.	সাদ ইবন উবাদাহ	খাযরাজ/সা'ইদাহ	ঐ	ঐ	ঐ
৫.	যাকওয়ান ইবন আবদ কায়স	" / যুরায়ক	শায়খানে মহানবী (সা.) এর প্রহরা	ঐ	ঐ
৬.	সাদ ইবন উবাদাহ	"/সাইদাহ	অভিযানকালে মহানবী (সা.) এর নিরাপত্তা রক্ষা	হামরাউল আসাদ	ঐ
৭.	আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির	"/সালামাহ্	ঐ	ঐ	ঐ
৮.	আওস ইবন খাউলি	"/সালিম	ঐ	ঐ	ঐ
৯.	সাদ ইবন মুআয	আওস/আশহাল	ঐ	ঐ	
১০.	কাতাদাহ ইবন আল-নুমান	আওস/জাফর	ঐ	ঐ	ঐ
১১.	উবায়দ ইবন আওস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২.	আবক্কাদ ইবন বশির	"/আশহাল	ঐ	আসাদ	ঐ
১৩.	ঐ	ঐ	ঐ	জাবাল রিকা	মুহাররম, ৫ম হি./জুন, ৬২৬ খ্রি.
১৪.	আম্মার ইবন ইয়াসির	মাযহিজ/কুরায়শদের মিত্র	ঐ	ঐ	ঐ
১৫.	আবক্কাদ ইবন বিশর	আওস/আশহাল	ঐ	হুদায়বিয়াহ	যিলকদ, ৬ষ্ঠ হি./মার্চ, ৬২৮ খ্রি.
১৬.	সালামাহ ইবন আসলাম	"/হারিস	ঐ	ঐ	ঐ
১৭.	আবু আয়্যুব আনসারি	খাযরাজ/নাজ্জার	ঐ	খায়বার	সফর, ৭ম হি./জুন, ৬২৮ খ্রি.
১৮.	বিলাল ইবন রিবাহ	আবিসিনিয়ার অধিবাসী	ঐ	ওয়াদি আল কুরা	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২ (ক) : উমাইয়া যুগের পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা

ড. আরসান মুসা রশিদ উমাইয়া যুগের ৬ জন পুলিশ প্রধানের নাম উলেণ্ঢখ করেছেন–[১]

(১) মুসআব বিন আবদুর রহমান (বনু যোহরা)

(২) দাহহাক বিন কায়েস (বনু ফিহর)

(৩) আমর বিন সাইদ (বনু উমাইয়া)

(৪) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (তাহাকিফ)

(৫) বিলাল আল বুরদান (ইয়ামেনি)

(৬) হাফস বিন ওয়ালিদ (মাযুর)

পেট্রিকা কর্ন উমাইয়া যুগের উলেণ্ঢখযোগ্য পুলিশ প্রধানের নাম উলেণ্ঢখ করেছেন–[২]

(১) সুয়াইদ আল মুররি, ওয়াসিতের পুলিশ প্রধান ছিলেন। তার পুত্র যিয়াদ বিন সোয়াইদ ইয়াযিদ বিন উমর বিন হুবায়রা-এর পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(২) বিলাল বিন আবি বুরদা আল আশআরি (ইয়ামেনি)। তিনি বসরার কাযি ও গভর্নর ছিলেন।

(৩) ইসমাইল বিন আওসাত আল বাযালি (ইয়ামেনি)। তিনি কুফার পুলিশ প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর ছিলেন।

(৪) মালিক বিন আল মুনযির আল-আবদি। তিনি বসরার পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(৫) নযর বিন আমর বিন আল মুকরি (ইয়ামেনি)। বসরার গভর্নর ছিলেন। এছাড়া তিনি শুরতা, হারাস ও খারাজ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

(৬) নওফ আল আশআরি (ইয়ামেনি)। তিনি কুফার পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(৭) আমর বিন আব্দুর রহমান আল কারি (মুদার)। কুফার পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(৮) ওবায়দুলণ্ঢাহ বিন আবক্কাস আল কিন্দি (ইয়ামেনি)। তিনি কুফার পুলিশ প্রধান ও গভর্নর ছিলেন।

(৯) আমর বিন ইয়াযিদ আল-হাকামি (ইয়ামেনি)। তিনি আব্দুল মালিক ও ওয়ালিদের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১০) হাজ্জাজ বিন আরতাব আল-নাকবাইল (ইয়ামেনি)। তিনি বসরার পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১১) হাকাম বিন উতাইবা আল আসআদি (মুদার)। তিনি কুফার পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১২) ওয়ালিদ বিন মাসআদ। তিনি হারাস ও পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১৩) মিসওয়ার বিন আবদুল হাবাতি (মুদার)। তিনি বসরার শুরতা ও আহদাস প্রধান ছিলেন।

(১৪) ওয়ালিদ বিন হাসসান গাসসানি (ইয়ামেনি)। তিনি কুফার পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১৫) ইয়াযিদ বিন আল আক্কার আল কালবি (ইয়ামেনি)। তিনি ইয়াযিদের পুলিশ প্রধান ছিলেন এবং মারওয়ানের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

(১৬) ইয়াযিদ বিন ইয়ারা বিন ডাকহম। তিনি হিশানের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১৭) আনস কাব বিন হামিদ। তিনি খলিফা আব্দুল মালিক, ওয়ালিদ ও সুলায়মানের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১৮) আব্দুর রহমান বিন বশির। তিনি কুফার গভর্নর ও পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(১৯) কাউসার বিন আল আসওয়াদ। তিনি মারওয়ানের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।

(২০) রুমাবিস বিন আব্দুল আযি আল-কিনাবি। তিনি মারওয়ানের শুরতা বাহিনীর একজন

---

১. Arssan Mussa Rashid, *The Role of The Shurta in Early Islam*, Ibid, p. 166

২. Petrica Crone, *Salves on Horses*, London : Cambridge University Press, 1980, p. 145-163

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা ছিলেন।

পরিশিষ্ট-২ (খ) : উমাইয়া যুগে বসরা প্রদেশের পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা

মিখাইল ইবস্টাইনের সূত্রে উমাইয়া যুগে বসরা প্রদেশের ৪৬ জন পুলিশ প্রধানের নাম উলেণ্ডখ করেছেন–[১]

(১) যায়দ বিন যুলবা (বনু আমির), তিনি উসমান (রা.) এর সময় বসরার পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(২) আতআব আবি আসওয়াদ (বনু আল দুয়িল), তিনি হযরত আলি (রা.) এর সময় বসরার গভর্নর ছিলেন।
(৩) হাবিব বিন শিহাব (বনু নাজিয়া), মুয়াবিয়ার সময় বসরার গভর্নরও ছিলেন।
(৪) কায়স বিন আল হাশিম (বনু আউফ)
(৫) আব্দুলণ্ঢাহ বিন আমির বিন ঘাইলান (বনু মুয়াত্তিব)
(৬) সামুরা বিন জুনদাদ (ফাজারা)
(৭) আব্দুলণ্ঢাহ বিন হিসান (বনু দিবারি)
(৮) ইয়াহইয়া বিন মুবাসশির (বনু রাবি)
(৯) আল যাদ বিন কায়স (তামিম)
(১০) হুবায়রা বিন দামদাম (বনু মুযাশি)
(১১) নুয়মাইলা বিন মালিক (বনু আমির)
(১২) হেমইয়ান বিন আদি (বনু সাদুস)
(১৩) জুনদুব বিন সিনান (বনু কাব)
(১৪) আবক্ষাদ বিন আল হুসায়ন (বনু আল হারিশ)
(১৫) মুতাররিফ বিন সিদান (বনু যিওয়া/রাহিলা)
(১৬) বিশর বিন ঘিলাব (বনু ওয়ালিবা)
(১৭) খিদাস বিন ইয়াযিদ
(১৮) আবদুর রহমান বিন কায়স বিন নাওফাল (বনু নাশর)
(১৯) আব্দুলণ্ঢাহ বিন আল আশআম (বনু মিনকার)
(২০) আল রাবি বিন যিয়াদ (বনু ইয়াশকুর)
(২১) যিয়াদ বিন আমর (বুন আতিক)
(২২) হাফস বিন যিয়াদ বিন আমর (বনু আতিক)
(২৩) ইকরিমা বিন রিবি (বনু মালিক)
(২৪) মুহাম্মদ বিন রিবাত (বনু জুয়াহির)
(২৫) আবদুর রহমান বিন উবায়েদ বিন তারিক (বনু আবদে শামছ)
(২৬) আব্দুলণ্ঢাহ বিন আমির বিন মিসামা বিন শিহাব (বনু যাহাদার)
(২৭) আব্দুল মালিক বিন আল মুহালণ্ঢাব (বনু আতিক)
(২৮) সুফিয়ান বিন আল জাল (বনু সুলায়ম)
(২৯) ইয়াজিদ বিন উমাইর (বনু উসাইদ)
(৩০) উসমান বিন আল হাকাম (বনু হুনা/আযদ)
(৩১) উমর বিন ইয়াযিদ বিন উমাইর (বনু তামিম)

১. Michael Ebstein, *Al-Qantara*, Jerusalem : enero-junio, XXXl 1, 2010, pp. 132-143; http://www.academia.edu/545802/, visited on 17.06.2014

Dhaka University Institutional Repository

(৩২) শারিক বিন মুয়াবিয়া (বনু কুতায়বা)
(৩৩) উকবা বিন আবদুল আলা (বনু কালা/হিময়ার)
(৩৪) মালিক বিন আল মুনযির আল যারূদ (বনু আনমার)
(৩৫) মিসমা বিন মালিক বিন আল মুনদির বিন যারূদ (বনু আনমার)
(৩৬) বিলাল বিন আবি বুরদা বিন আবি মুসা আশআরি (ইয়ামেনি)
(৩৭) জুরাই বিন ইয়াজিদ বিন আল তাওয়াম (বনু আইস)
(৩৮) আল যাল বিন উরওয়া (বনু তারূদ)
(৩৯) মুহাম্মদ বিন ওয়াসি (বনু যিয়াদ)
(৪০) আল মিসওয়ার বিন উমর বিন আব্বাদ বিন আল হুসায়ন (বনু হারিশ)
(৪১) মুহাম্মদ বিন ওয়াকি বিন আবি সাদ (বনু ঘুদানা)
(৪২) আল মিনহাল বিন হাশিম বিন সোয়াদ বিন মানজুফ (বনু সাদুস)
(৪৩) আল হাকাম বিন ইয়াযিদ বিন উমায়ির (বনু ওসায়িদ/তামিম)
(৪৪) বক্কর বিন হুযায়ির (বনু দাবক্ষা)
(৪৫) ইবনে রালান (বনু মাযিন)
(৪৬) ইয়াযিদ বিন মুসলিম বিন আমর বিন মুসলিম (বনু ওয়ায়িল)

মুসা ইবন নুসায়ের ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। মুসার পিতা মুয়াবির অধীনে পুলিশ প্রধান ছিলেন।[১]

পরিশিষ্ট-৩ : আব্বাসীয় যুগে পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা

পেট্রিকা কর্ন আব্বাসীয় যুগের পুলিশ প্রধানের নাম উল্লেখ করেছেন–[২]

(১) আবদ আল-জব্বার বিন আবদ আল-রহমান আল আযি। তিনি খলিফা মনসুরের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(২) আবু ঘানিম আব্দুল হামিদ বিন রিবি আলতাই। তিনি আবুল আব্বাসের সময় কাতাবা এর শুরতা প্রধান ছিলেন।
(৩) উমর বিন আবদুর রহমান। তিনি খলিফা মনসুরের মৃত্যু পর্যন্ত বাগদাদের পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(৪) আব্দুল্লাহ বিন খোযাইম। তিনি খলিফা মাহদির সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(৫) মালিক বিন আল হাশিম আল খোযায়ি। তিনি খোরাসানের পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(৬) হামজা বিন মালিক। তিনি মনসুর ও মাহদির সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(৭) আব্দুল বিন মালিক। তিনি খলিফা মাহদি, হাদি ও হারূনের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(৮) কাসিম বিন নসর বিন মালিক। তিনি খলিফা হারূনের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(৯) মুসা বিন কাব আল তামিমি। আবুল আব্বাস তাকে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন।
(১০) মুসাইয়াব বিন যুবায়ির আল দাবিক্ষ। তিনি খোরাসানের পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(১১) ইবরাহিম বিন উসমান বিন নাহিক। তিনি খলিফা হারূনের সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন।
(১২) মুহাম্মদ বিন ইসা বিন নাহিক। তিনি খলিফা আমিনের পুত্রের পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন।

---

১. সম্পাদিত: মফীজুল্লাহ কবীর অনূ: শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৭৭
২. Petrica Crone, *Salves on Horses*, Ibid, p. 174-189

Dhaka University Institutional Repository

আবক্ষাসীয় যুগে খোরাসানের কয়েকজন পুলিশ প্রধানের নাম[১]

(১) আবুল আবক্ষাস আল-ফজল বিন সুলায়মান আল তুসি (৭৮২-৭৮৭ খ্রি.) তিনি খোরাসানের হারাস বাহিনীর প্রধান ছিলেন।

(২) আল মুসায়িব বিন যুহায়ির বিন উমর বিন মুসলিম আল-দাবিক্ষ (৭৭৯-৭৮২ খ্রি.) তিনি আবুল আবক্ষাস আল সাফফার সময় হতে খলিফা হারূন-অর-রশিদের সময় পর্যন্ত পুলিশ প্রধান ছিলেন। খলিফা মাহদি ও মুসায়িব এর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। মুসায়িব একজন কাতিবকে পিটিয়ে হত্যা করলে খলিফা মনসুর পুলিশ প্রধানের পদ হতে বরখাস্ত করেন। তাবারির বর্ণনা মতে, মাহদির প্রচেষ্টায় খলিফা পুনরায় তাকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। খলিফা মনসুরের মৃত্যুর পর মাহদিকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করা হলে মুসায়িবের পুত্র আব্দুলণ্চাহ রাজকীয় অভিষেকে বর্শা বহন করেন। মূলত মুসায়িব পরিবার বংশ পরম্পরা পুলিশ প্রধান; ছিল কারণ তারা খলিফার পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

(৩) আব্দুল জবক্ষার বিন আব্দুর রহমান আল আযাদি (৭৫৭-৭৫৮ খ্রি.) তিনি মূলত খোরাসানি ছিলেন। তিনি খোরাসানের গভর্নর, কাযি ছিলেন। আল-সাফার সময় তিনি পুলিশ প্রধান ছিলেন।

আবুল আবক্ষাস আব্দুলণ্চাহ বিন তাহির সোয়াত, খোরাসান, রাই, তাবারিস্থান এবং কিরমানের সংযুক্ত অঞ্চলসমূহের সামরিক, পুলিশ ও প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২]

---

১. http://umijms.um.edu.my/filebank/published_article/6884/Jurnal.Usuluddin.19.2004-08.Hayati.Khurasan.pdf , visited on.1.3.16

২. Zamel Al-Rasheed, *The Reign of the Caliph Al-Wathq* (842-847 A.D), According To Al-Tabari's History: Institute of Islamic Studies-McGill University-1972, p. 43 ; http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1456819198576~797, visited on.28.2.16

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫ : রাউন্ড সিটিতে পুলিশের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫ : পাকিস্তান আমলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা

পাকিস্তান আমলের ১০ জন পুলিশ প্রধানের নাম নিম্নরূপ–[১]

ক্রমিক নং	নাম	মেয়াদকাল
১	জনাব জাকির হোসাইন	(১৫-৮-৪৭ থেকে ১৯-১০-৫২)
২.	এ.এইচ.এম.এস. দোহা	(২০-১০-৫২ থেকে ২৬-০৯-৫৬)
৩.	এ.এইচ.এস.এম. ইসমাঈল	(২৭-০৯-৫৬ থেকে ১১-১০-৫৮)
৪.	কে.এম. হক	(১২-১০-৫৮ থেকে ৩১-১০-৫৮)
৫.	এ. কে.এম. হাফিজ উদ্দিন	(১১-১১-৫৮ থেকে ২৫-০২-৬২)
৬.	এ.এম.এ.কবির	(২৬-০২-৬২ থেকে ২৮-০২-৬৭)
৭.	এ.এস.এম. আহমেদ	(০১-০৩-৬৭ থেকে ২৪-০৩-৬৯)
৮.	মহিউদ্দিন আহমেদ	(২৫-০৩-৬৯ থেকে ২১-০১-৭০)
৯.	তসলীম উদ্দিন আহমেদ	(২২-০১-৭০ থেকে ১৭-০৫-৭১)
১০.	এ.এ. কে. চৌধুরী	(১৮-০৫-৭১ থেকে ১৩-১২-৭১)

পরিশিষ্ট-৬ : বাংলাদেশ আমলে পুলিশ প্রধানদের নামের তালিকা

বাংলাদেশ আমলের ২৭ জন পুলিশ প্রধানের নাম নিম্নরূপ–[২]

ক্রমিক নং	নাম	মেয়াদকাল
১.	এ. খালেক	(১৬-১২-৭১ থেকে ২৩-০৪-৭৩) মুজিবনগর সরকারের আমল থেকে
২.	এ. রহিম	(২৩-০৪-৭৩ থেকে ৩১-১২-৭৩)
৩.	এ.এইচ. নূর‍ুল ইসলাম	(৩১-১২-৭৩ থেকে ২১-১১-৭৫)
৪.	হোসাইন আহমেদ	(২১-১১-১৯৭৫ থেকে ২৬-০৮-৭৮)
৫.	এ.বি.এম.জি. কিবরিয়া	(২৬-০৮-৭৮ থেকে ০৭-০২-৮২)
৬.	এ.এম.এম.আর.খান	(০৮-০২-৮২ থেকে ৩১-০১-৮৪)
৭.	ই.এ. চৌধুরী	(০১-০২-৮৪ থেকে ৩০-১২-৮৫)

১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, বিশেষ সংখ্যা, পুলিশ সপ্তাহ-২০১৫, পৃ. ১৮-১৯

২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, বিশেষ সংখ্যা, পুলিশ সপ্তাহ-২০১৫, পৃ. ১৯-২২; http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On : 3/12/2015

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	মেয়াদকাল
৮.	মোঃ হাবিবুর রহমান	(০৯-০১-৮৬ থেকে ০৯-০১-৮৬)
৯.	এ.আর. খন্দকার	(৩০-১২-৮৫ থেকে ২৮-০২-৯০)
১০.	তৈয়ব উদ্‌দীন আহমেদ	(২৮-০২-৯০ থেকে ০৮-০১-৯১ ও ২০-০৭-৯১ থেকে ১৬-১০-৯১)
১১.	এ.এম. চৌধুরী	(০৮-০১-৯১ থেকে ২০-০৭-৯১)
১২.	ড. এম. এনামুল হক	(১৬-১০-৯১ থেকে ০৮-০৭-৯২)
১৩.	এ.এস.এম. শাহজাহান	(০৯-০৭-৯২ থেকে ২২-০৪-৯৬)
১৪.	এম.আজিজুল হক	(২২-০৮-৯৬ থেকে ১৬-১১-৯৭)
১৫.	মোঃ ইসমাইল হুসেন	(১৬-১১-৯৭ থেকে ২৭-০৯-৯৮)
১৬.	এ.ওয়াই.বি.আই.সিদ্দিকী	(২৭-০৯-৯৮ থেকে ০৭-০৬-২০০০)
১৭.	মুহাম্মদ নূর"ল হুদা	(০৭-০৬-২০০০ থেকে ০৬-১১-২০০১)
১৮.	মোদাবিক্ষর হোসেন চৌধুরী, পিএসসি	(০৬-১১-২০০১ থেকে ২২-০৪-২০০৩)
১৯.	শহুদুল হক	(২২-০৪-২০০৩ থেকে ০৭-১২-২০০৪)
২০.	মোঃ আশরাফুল হুদা, পিপিএম	(১৫-১২-২০০৪ থেকে ০৭-০৪-২০০৫)
২১.	মোহাম্মদ হাদিস উদ্দিন	(০৭-০৪-২০০৫ থেকে ০৭-০৫-২০০৫)
২২.	মোঃ আবদুল কাইয়ুম	(০৭-০৫-২০০৫ থেকে ০৬-০৭-২০০৬)
২৩.	মোঃ আনোয়ার"ল ইকবাল বিপিএম (বার), পিপিএম	(০৬-০৭-২০০৬ থেকে ০২-১১-২০০৬)
২৪.	মোঃ খোদা বখস্ চৌধুরী	(০২-১১-২০০৬ থেকে ২৯-০১-২০০৭)
২৫.	নূর মোহাম্মদ	(২৯-০১-২০০৭ থেকে ৩১-০৮-২০১০)
২৬.	হাসান মাহমুদ খন্দকার বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি	(৩১-০৮-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১৪)
২৭.	এ. কে. এম. শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম	(৩১-১২-২০১৪ থেকে বর্তমান)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটের নাম[১]

ক্র.নং	ইউনিটের নাম	ক্র.নং	ইউনিটের নাম	ক্র.নং	ইউনিটের নাম
১	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	৪৪	ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ	৮৭	মৌলভীবাজার
২	ডিআইজি, ঢাকা	৪৫	হাইওয়ে পুলিশ, পূর্বাঞ্চল	৮৮	সুনামগঞ্জ
৩	ডিআইজি, চট্টগ্রাম	৪৬	হাইওয়ে পুলিশ, পশ্চিমাঞ্চল	৮৯	আরআরএফ, সিলেট
৪	ডিআইজি, খুলনা	৪৭	ডিআইজি, রেলওয়ে	৯০	রাজশাহী
৫	ডিআইজি, রাজশাহী	৪৮	রেলওয়ে, চট্টগ্রাম	৯১	নওগাঁ
৬	ডিআইজি, বরিশাল	৪৯	রেলওয়ে সৈয়দপুর	৯২	নাটোর
৭	ডিআইজি, সিলেট	৫০	ডিআইজি, শিল্পাঞ্চল	৯৩	নবাবগঞ্জ
৮	ডিআইজি, রংপুর	৫১	ডিআইজি, আশুলিয়া	৯৪	বগুড়া
৯	পুলিশ ওয়ারলেস সংস্থা	৫২	শিল্পাঞ্চল, গাজীপুর	৯৫	জয়পুরহাট
১০	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান	৫৩	শিল্পাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৯৬	পাবনা
১১	এসবি	৫৪	শিল্পাঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ	৯৭	সিরাজগঞ্জ
১২	সিআইডি	৫৫	ঢাকা	৯৮	আরআরএফ, রাজশাহী
১৩	পৃথক তদন্ত ইউনিট, ঢাকা	৫৬	নারায়ণগঞ্জ	৯৯	রংপুর
১৪	ডিএমপি, ঢাকা	৫৭	নরসিংদী	১০০	গাইবান্ধা
১৫	সিএমপি, চট্টগ্রাম	৫৮	গাজীপুর	১০১	কুড়িগ্রাম
১৬	কেএমপি, খুলনা	৫৯	মুন্সিগঞ্জ	১০২	লালমনিরহাট
১৭	আরএমপি, রাজশাহী	৬০	মানিকগঞ্জ	১০৩	নীলফামারী
১৮	বিএমপি, বরিশাল	৬১	ময়মনসিংহ	১০৪	দিনাজপুর
১৯	এসএমপি, সিলেট	৬২	কিশোরগঞ্জ	১০৫	ঠাকুরগাও
২০	পুলিশ ষ্টাফ কলেজ	৬৩	নেত্রকোনা	১০৬	পঞ্চগড়
২১	এপিবিনে সদর দপ্তর	৬৪	টাংগাইল	১০৭	আরআরএফ, রংপুর
২২	ডিআইজি, এপিবিএন	৬৫	জামালপুর	১০৮	খুলনা
২৩	১-এপিবিএন উত্তরা, ঢাকা	৬৬	শেরপুর	১০৯	বাগেরহাট
২৪	২- এপিবিএন, ময়মনসিংহ	৬৭	ফরিদপুর	১১০	সাতক্ষীরা
২৫	৩- এপিবিএন, শিরোমনি, খুলনা	৬৮	মাদারীপুর	১১১	যশোর
২৬	৪- এপিবিএন, বগুড়া	৬৯	গোপালগঞ্জ	১১২	ঝিনাইদহ
২৭	৫- এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা	৭০	শরীয়তপুর	১১৩	মাগুরা
২৮	৬- এপিবিএন, বরিশাল	৭১	রাজবাড়ী	১১৪	নড়াইল
২৯	৭- এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা	৭২	আরআরএফ, ঢাকা	১১৫	কুষ্টিয়া
৩০	৮- এপিবিএন, সিলেট	৭৩	চট্টগ্রাম	১১৬	চুয়াডাংগা
৩১	৯- এপিবিএন, চট্টগ্রাম	৭৪	কক্সবাজার	১১৭	মেহেরপুর
৩২	১০- এপিবিএন, মহালছড়ি	৭৫	রাংগামাটি	১১৮	আরআরএফ, খুলনা
৩৩	১১- এপিবিএন (নারী), ঢাকা	৭৬	খাগড়াছড়ি	১১৯	বরিশাল
৩৪	সিকিউরিটি ও প্রটেকশন এপিবিএন-১	৭৭	বান্দরবান	১২০	ভোলা
৩৫	সিকিউরিটি ও প্রটেকশন এপিবিএন-২	৭৮	নোয়াখালী	১২১	পিরোজপুর
৩৬	খাগড়াছড়ি ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার	৭৯	লক্ষীপুর	১২২	ঝালকাঠি
৩৭	পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি	৮০	ফেনী	১২৩	পটুয়াখালী
৩৮	পুলিশ একাডেমী, সারদা	৮১	কুমিলণ্ঢা	১২৪	বরগুনা
৩৯	পিটিসি, টাংগাইল	৮২	বি-বাড়ীয়া	১২৫	আরআরএফ, বরিশাল
৪০	পিটিসি, রংপুর	৮৩	চাঁদপুর	১২৬	পুলিশ হাসপাতাল
৪১	পিটিসি, নোয়াখালী	৮৪	আরআরএফ, চট্টগ্রাম	১২৭	ট্যুরিস্ট পুলিশ
৪২	পিটিসি, খুলনা	৮৫	সিলেট	১২৮	নৌ পুলিশ

১. ওএন্ডএম শাখা-(২৪ ডিসেম্বর-২০১৪), পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩	টিডিএস, ঢাকা	৮৬	হবিগঞ্জ		

Dhaka University Institutional Repository

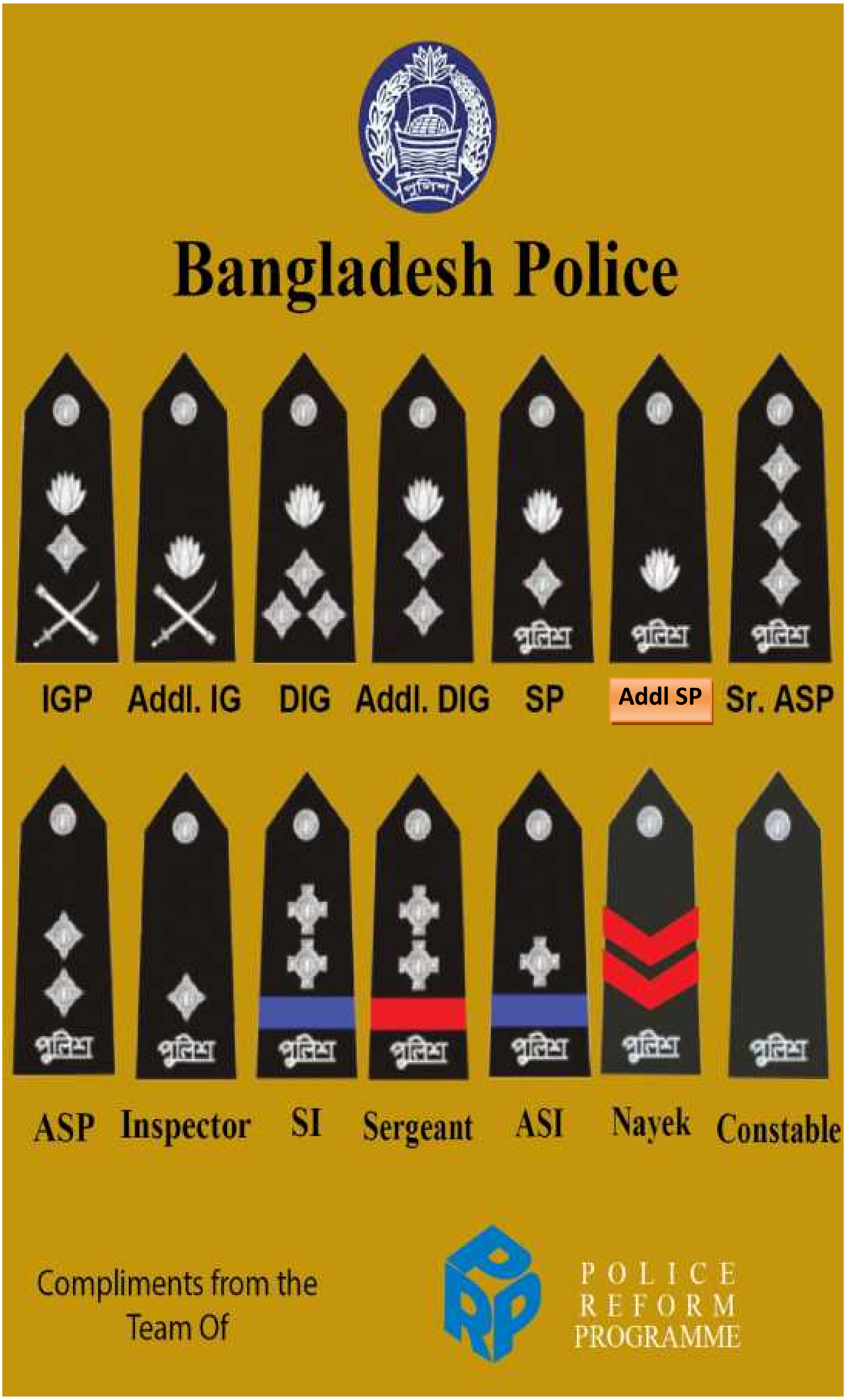

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

- আল-কুরআন, কুরআনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত আল-কুরআনুল করীম, সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর অনুসরণ করা হয়েছে।
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী, সম্পাদনা: ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ঢাকা: ইফাবা, ২য় প্রকাশ-২০১৪, তৃতীয় খণ্ড।
- ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্থানী (র), অনু: ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, আবু দাউদ শরীফ, ঢাকা: ইফাবা, মে-২০১৪, চতুর্থ খণ্ড।
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র.), *সহিহ আল বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবুল হাকিম য়াহকুমু বিল কাতলি*, ঢাকা: ইফাবা, ৩য় সংস্করন, জুন ২০০৩
- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা-অষ্টম সংস্করন-২০১৪, চতুর্থ খণ্ড।
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা-ষষ্ঠ সংস্করন ২০১০, দশম খণ্ড।
- ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা: ষষ্ঠ সংস্করন-২০১৫, প্রথম খণ্ড।
- ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত: মুসলিম শরীফ, ঢাকা: ইফাবা: চতুর্থ সংস্করন-২০১৫, চতুর্থ খণ্ড।
- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (রহ.), সহীহ বোখারী শরীফ (সকল খন্ড একত্রে), ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, চতুর্থ সংস্করন, ২০০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অক্টোবর ২০১১
- কাজী জয়নুল আবেদীন, *পুলিশের কথা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, আগস্ট ২০০৩
- সায়্যিদ মুহাম্মদ মুরতজা আল হুসাইনি আল জাবিদি, *তাজুল আরূস*, কুয়েত: মাতবাতু হুকুমাতু কুয়েত, ১৯৬৯ খ্রি., খ. ৫
- সৈয়দ আমীর আলী, অনূঃ শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: ঢাকা বুকস্ ইন্টারন্যাশনাল, জানুয়ারি ২০০২
- মোঃ আবু তাহের, *স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৮
- প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৬ষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
- শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গলার ইতিহাস: নবাবী আমল, কলকাতা: দে'জ পাবালিশিং-২০০৩*
- আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭
- আবদুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২
- নটরাজন, *ওরা সেই পুলিশ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯
- মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৩য় পূন:মুদ্রণ, জুন-২০০৪
- মাওলানা মুজীবুর রহমান, *হযরত আলী (রা.)*, ঢাকা: ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৮
- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, ঢাকা : বাঁধন পাবলিকেশন, ২০১০
- ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, ঢাকা : নওরোজ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ প্রকাশ, ডিসেম্বর-২০০৯
- শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, সম্পাদনা-ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮
- মুল্লা মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফা*, দিল্লি : মাতবাআ উসমানিয়া 'মা'আরিফ, ১৯৫৭
- সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *সীরাতুন্নবী* 'আ'যমগড় : মাতবা 'মা' আরিফ, ১৯৫১, খ. ৪
- ফখরুদ্দীন রাযী, *আত্তফসীরুল কবীর*, করাচি : মাকতাবা ইস্হাকিয়া, ৩য় সং., খ. ২

Dhaka University Institutional Repository

- আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন জাবির বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, কায়রো : মাত্বাআতুশ্ শরকিল ইসলামিয়া, ১৯৭৭
- হিশাম আল-কালবী, *কিতাবুল আসনাম*, কায়রো : দারুল কুতুব, ১৩৪৩ হি.
- ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, অনু. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৩য় সংস্করণ-২০০৮
- ড. মুহাম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, *বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
- ড. ওসমান গনী, *মহানবী*, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৯৬
- সম্পাদনা পরিষদ, *হযরত রাসূলে করীম (স.) জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ-২০০৪
- আল্লামা শিবলী নোমানী, *সীরাতুন নবী*, সম্পাদনা: মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, ঢাকা: প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১ম খন্ড-১৯৭৪
- ড. মজিদ আলী খান, অনূঃ আবু মুহাম্মাদ, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা), ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫
- সম্পাদিতঃ মফীজুল্লাহ কবীর অনূ: শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮
- ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর সরকার কাঠামো*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪
- আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম, অনূঃ আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
- মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৯
- সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৬, ২০শ খণ্ড
- আবদুন নূর, *লোক প্রশাসন*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, প্রথম প্রকাশ-২০০৬
- মাওলানা মুশাহিদ আলী, অনূঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ উমর আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার*, ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
- মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ৮ম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৫
- মোহাম্মদ মুজাফফার হুসাইন, *ইসলাম ও সামরিক জীবন*, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ১৯৮৩
- আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, মদিনা মুনাওয়ারা : বায়তুল আফকার আদদুয়ালিয়্যা, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি., ২য় খণ্ড
- আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইয়াহয়া আল-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরুত: মুআসসাসাতুল মা'আরিফ, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.
- হাজী মঈন উদ্দীন নদভী, অনূঃ আখতার ফারুক, *সাহাবা চরিত-১*, ঢাকা: ইফাবা, অক্টোবর, ১৯৮০
- সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী, অনূঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, *তারিখে ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫
- মাওলানা সাঈদ আহম্মদ আকবরী, অনূঃ মোহাম্মদ সিরাজুল হক, *হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭
- ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাচ্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাস, ঢাকা: মুক্তচিন্তা প্রকাশনা-২০০৮
- শিবলী নোমানী, অনূঃ মাওলানা মহীউদ্দীন খান, *আল ফারুক*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩য় মুদ্রণ, মে ১৯৮০
- মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, অনূঃ আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, *প্রশাসনিক উন্নয়নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ডিসেম্বর ২০০৭
- ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান, ড. মোছাঃ মনিরা রহমান, *উমর (রা.) এর জীবন ও কর্ম ও শাসন পদ্ধতি*, ঢাকা: আশরাফিয়া বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১৫
- মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *হযরত উসমান*, ঢাকা: আহম্মদ পাবলিশিং, জুন ১৯৭৮
- ডক্টর ওসমান গণী, *শের-ই-খোদা হযরত আলী*, কলকাতা : মল্লিক বাদ্রার্স, ৩য় সং., ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

- মাওলানা মোঃ মাজহার উদ্দীন, *শেরে খোদা হযরত আলী (রা.)*, ঢাকা : বিউটি বুক হাউজ, ২য় প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৯ বাং
- রশীদ আহম্মদ, *হযরত আলী (রা.) এর জীবনী*, ঢাকা : শিরীন পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০০৫
- ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাচ্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাস, ঢাকাঃ মুক্তচিন্তা প্রকাশনা-২০০৮
- মাওলানা মাজহার উদ্দীন, *হায়দারে আকবর হযরত আলী (রা.)*, ঢাকাঃ সালাহউদ্দীন বইঘর, ১৯৯৭
- শামসুল আলম কর্তৃক সম্পাদিত, মঞ্জুর আহসান কর্তৃক অনুদিত, *হযরত আলী (রা.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি*, ঢাকা : ইফাবা, ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৩
- আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : সমাবেশ, ২০০৬, ২য় সংস্করণ।
- আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, আগস্ট-২০১১
- গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামের দন্ডবিধি*, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২
- লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকাঃ ইফাবা-জানু-২০১৫, প্রথম খণ্ড
- লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ইফাবা, ২০১২, ৩য় খণ্ড
- জুরজি যায়দান, *তারিখ তামাদ্দুন আল-ইসলামি*, কায়রোঃ ১৯০২, ১৯০৬, খ. ৪
- সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ৮ম সং., জুন ২০০৯
- কে. এম. রইছ উদ্দীন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৬
- সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
- এ এসএম সামছুল আরেফিন, মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, ঢাকাঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, জুন-২০১২
- অধ্যাপক কে. আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬, পৃ. ৩
- আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০
- সাহাদত হোসেন খান, *মোগল সাম্রাজ্যের সোনালী অধ্যায়*, ঢাকাঃ আফসার ব্রাদার্স, ২০১৩
- আবদুস সালাম মামুন, *উপ-মহাদেশের আইন ও শাসনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৬, ১ম খন্ড
- এ এসএম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, ঢাকাঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, জুন-২০১২
- এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০০৪
- হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০০৯, খ.২
- লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা : চারুলিপি, ১ম প্রকাশ, মে ২০১০
- আব্দুর রহমান ইবন খালদূন, *মুকাদ্দিমাহ ইবন খালদূন*, তিউনেশিয়া : আদ দারুত তিউনেশিয়া লিন নাশরি, ১৯৮৪, খ.২
- এম.এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, মার্চ ১৯৯৩
- সম্পদনা পরিষদ, *অর্জন*, স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১, ঢাকা : বাংলাদেশ পুলিশ, জুন ২০১১
- প্রযোজনা : বাংলাদেশ পুলিশ, প্রামান্য চিত্র '*মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ*' লেজার ভিশন লিঃ, ২০১২
- মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্রি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা : মুক্ত প্রকাশনী, ১৪ আগষ্ট ১৯৯৭, ২য় সংস্করণ
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, সং. ৪, ই-বুক, ৮ ডিসেম্বর ২০১১, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
- সম্পাদনা পরিষদ, *মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ*, ঢাকা : বাংলাদেশ পুলিশ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপপরিষদ, ২৫ মার্চ ২০১০
- নীল কমল বিশ্বাস সম্পাদিত, *যুদ্ধে যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন, ১৯৯৮
- সিরাজউদদীন আহমেদ, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১১
- কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

- সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
- হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, খ. ২
- এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৬
- AFWC এর প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক পুলিশ হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনকালীন সময়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত উপস্থাপনা ২৫/৮/২০১৫ খ্রি.।
- ওএন্ডএম শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা- ডিসেম্বর ২০১৫
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সিটিজেন চার্টার*, ঢাকা : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়ল, ২০০৭
- গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের পুলিশ প্রবিধানের ভাষ্য*, ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, মে ২০০৫
- ওএন্ডএম শাখা-ডিসেম্বর-২০১৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৩)/পদ-১৫/২০০৪/১৯০ তারিখ: ১২/৩/২০০৫ খ্রি.।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ পুলিশের ২০১০ খ্রি. সালের বাৎসরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন*, ঢাকা: ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৩)/পদ-১৭/২০০৩/২৯৪ তারিখ: ৩০/৩/২০০৪ খ্রি.।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০৫.০১৮-৮৪৮, তারিখ: ১২/১১/২০১৩ খ্রি.।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৩)/পদ-৭/২০০৭/৫৯৪ তারিখ: ১০/১০/২০১০ খ্রি.।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ শাখা-৩, স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০৫.০০৯.১১(অংশ)-৩৮৪, তারিখ: ৬/১১/২০১৩ খ্রি.।
- ট্রেনিং এ্যান্ড স্পোর্টর্স শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সীমান্ত অধিশাখা-১, নং-৪৪.০০.০০০০.১১৬.০৪.০০২.১২-৫৮, তারিখ: ২২-০২-২০১২ খ্রি.।
- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, *কমিউনিটি পুলিশিং, দর্শন নীতি ও বাস্তবায়ন*, চট্টগ্রাম : সাফা'স ষ্টুডিও, ১ম প্রকাশ, ২০১০
- সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ৮ম সংস্করণ, জুন ২০০৯
- মোহাম্মদ কামরুল আহসান, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলিম সমাজের ভূমিকা*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮
- ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান, ড. মোছাঃ মনিরা রহমান, *উমর (রা.) এর জীবন ও কর্ম ও শাসন পদ্ধতি*, ঢাকা: আশরাফিয়া বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১৫
- আবদুস সালাম মামুন, *উপ-মহাদেশের আইন ও শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৬, ১ম খন্ড
- সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর-১৯৯৯
- মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: চয়নিকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৭
- মূল: সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (মিসর), অনুবাদ: মাওলানা কারামত আলী নিযামী, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, ঢাকা : এ.এইচ.পি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি-২০১৫
- আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতায়বা, *উয়ূনুল আখবার*, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ২০০৮
- আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকা: ইফাবা, মে ২০০৫, খ. ৯
- মো: শফিকুর রহমান, বাংলাদেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২৫ মে ১৯৯৮
- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

- সম্পাদনা পরিষদ, উদ্দীপন, বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশন, ঢাকাঃ বি.এস.এ প্রিন্টিং প্রেস, পুলিশ সপ্তাহ-২০১৪
- মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় প্রকাশ, অক্টোবর-১৯৭৪
- মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৭
- আহমদ ইব্‌ন আবি ইয়াকুব আল-ইয়াকুবী, *তারীখে ইয়াকুবী*, লিডেন : মাতবাউ ব্রেল, ১৮৮৩, খ. ২
- আবুল ফিদা ইবন কাছীর, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকাঃ ইফাবা, মে-২০০৫, খ. ৯
- আবুল হাসান আলি ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব আল-মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সালতানিয়া*, কুয়েতঃ মাকতাবাতু দার ইব্‌ন কুতায়বা, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৯ হি.
- আবুল হাসান আলি ইবনুল আছীর আল-জাযরী, *আল-কামীল ফিত তারীখ*, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুস জাহশিয়ারী, *কিতাবুল উমারা ওয়াল কুত্তাব*, বৈরুতঃ দারুল ফিকরিল হাদিস, পরিমার্জিত মুদ্রণ, ১৪০৮হি.
- ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, ক্যাসাব্লাঙ্কাঃ বাইতুল ফুনূন ওয়াল উলূম ওয়াল আদাব, পরিমার্জিত ৫ম মুদ্রণ, ২০০৫, খ. ১
- আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমদ কালকাশান্দি, *সুবহুল 'আশা*, কায়রো, মিসরঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, পরিমার্জিত মুদ্রণ, ১৯৮৭, খ.১
- আহমদ ইবন আবি ইয়াকুব, *তারীখে ইয়াকুবি*, লিডেনঃ মাতবাউ ব্রেল, ১৮৮৩, খ. ২
- আবুল আব্বাস আহমদ ইবন ইয়াহিয়া ইবন জাবির আল-বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরুতঃ মুআস্‌সাতুল মা'আরিফ, পরিমার্জিত মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.
- প্রফেসর এস.এম.ইমামউদ্দিন প্রণীত, ড. আয়েশা বেগম সম্পাদিত, *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, জানুয়ারি ১৯৯৯
- প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান, *স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ৬ষ্ঠ সং., মহররম ১৪২৩ হি.
- সৈয়দ আমির আলি প্রণীত, শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনুদিত, ড. মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা : ঢাকা বুকস্‌ ইন্টারন্যাশনাল, জানুয়ারি ২০০২
- মোঃ আবু তাহের, *স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ,জুন ২০০৮
- মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : ইফাবা, ২য় সং, জুন ২০০৮, খ. ১
- মূলঃ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুঃ মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ঢাকাঃ ইফাবা-২০০৩
- আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৫, খ. ৯
- ইবন হিশাম আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক, অনূঃ সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাতুননবী (স.)*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, ১ম খণ্ড
- ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানী, অনু. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৮, তৃতীয় সংস্করণ
- সৈয়দ আমির আলি প্রণীত, শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত, ড. মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা : ঢাকা বুকস্‌ ইন্টারন্যাশনাল, জানু. ২০০২
- মুহাম্মদ ইবন আবদুস আল-জাহশিয়ারী, *কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব*, বৈরুত : দারুল ফিকরিল হাদিস, পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৮ হি

Dhaka University Institutional Repository

- আবুল হাসান আলি ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদি, *কিতাবু দুরারিস সুলূক ওয়া সিয়াসাতিল মুলূক*, রিয়াদ : দারুল ওয়াতান লিন্নাশরি, পরিমার্জিত ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি., ১৯৯৭
- অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, আগষ্ট-১৯৮৭, তৃতীয় খণ্ড
- ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিশ্লেষক: খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, প্রফেসর পি. কে. হিট্টির, দ্যা হিস্ট্রি অব এ্যারাবস্ অবলম্বনে, *আরবের ইতিহাস*, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৩
- নিজাম-উল-মূলক, *সিয়াসতনামা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
- মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী, অনূঃ মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৩, খ. ২
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, আগষ্ট-১৯৮৭, তৃতীয় খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, জুন-১৯৮৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, নভেম্বর-১৯৯০, ৯ম খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামি বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, ১৭শ খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, ২০শ খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, আগষ্ট-১৯৯৮, ২৪শ খণ্ড (১ম ভাগ)
- সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামি বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, ২৫শ খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ-২০০৯, পঞ্চম খণ্ড।
- সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ-২০০৯, ষষ্ঠ খণ্ড।
- ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও ড. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী: আগস্ট-১৯৮৯
- কাবেদুল ইসলাম, *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-২০১২
- A K M Shahidul Hoque, *Police and Community with Concept of Community Policing*, Dhaka: Jatiya Mudran, 1st publication, 23 June 2014
- A. L. Basham, *The Wonder That Was India*, Calcutta: Rupa & Co.-1992
- A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahbad: Central Book Depot, 1976
- A.B.M.G. Kibria, *Police Administration in Bangladesh,* Dacca: Khosroz Kitab Mahal, 1st edt., 1976
- Abd al-Hamid Ibn Hibatallah Ibn Abi'l Hadid, ed. Muhammad A.C.Ibrahim, *Sharh Nahj al-Balagha*, Cairo : 1965-67, vol. 9
- Abd al-Qadir al-Maadidi, *Wasit fil'l Asr al-Umawi*, Baghdad : 1979
- Abd al-Rahman b. Muhammad Ibn Khaldun, *Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada w'aL-Khabar*, Cairo : 1887, vol. 3
- Abdul Halim, *History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra*, University of Dacca, 1961
- Abdul Khalaque, *Peace Police Crime And Violence*, Dhaka : Polwel Printing Press, 1st published, 1999
- Abu Abbas Ahmad b. Ali al-Qalqashandi, *Subh al-Asha fi Sina at al-Insha*, Cairo: 1963, vol. 10
- Abu Abbas Ahmad b. Ali al-Qalqashandi, *Subh al-Asha fi Sinaat al-Insha*, Cairo: 1963, vol. 1
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman al-Dhahabi, ed. Ali b. al-Bijjawi, *Mizan al-Itidal fi Naqd al-Rijal*, Cairo : 1963; vol. 3

Dhaka University Institutional Repository

- Abu Amr Khalifa Ibn Khayyat, *Tarikh Khalifa Ibn Khayyat*, np : Suhyl Zakar, Vol-1, ed. 1967
- Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad wa Madinat al-Salam*, Cairo: 1931, vol. 1
- Abu Jafar Muhammd b. Jarir al-Tabari, Edited: M. J. DeGoeje, *Tarikh al-Rusul wa'l-Muluk*; M. J. DeGoeje, Leiden:1880–1889
- Abu Jafar Muhammd b. Jarir al-Tabari, Edited: Muhammad A. F. Ibrahim, *Tarikh al-Rusul wa'l-Muluk*; Cairo: 1964
- Abu Muhammad Abdallah b. Muslim Ibn Qutayba, ed. Tharwat Ukasha, *Kitab al Maarif*, Cairo: n.d
- Abu Muhammad Abdullah b. Muslim Ibn Qutayba, *Uyun al-Akhbar*, Cairo : n.d., vol. 1
- Abu Muhammad Ahmad b. Ali, Ibn al-Atham al-Kufi, *Kitab al-Futuh*, Hyderabad : 1970-75, vol. 6
- Abu Nuaymal Isfahani, *Hilyat al-Awliya wa Tabaqat al-Asfiya*, Cairo: 1933, vol. 2
- Abu Sadat al-Mubarak b. Muhammad Ibn al Athir, eds M. M. Tinahi and T. Ahmad, *Gharib al-Hadith wa'l Athar*, Cairo: 1963, vol. 2
- Abu Ubayda, *Naqaid Jarirwal Farazdaq*, Leiden : 1905, vol. 2
- Abu Uthman Amr b. Bahr al-Jahiz, *Thalath Rasa'il*, Leiden : 1903
- Abul Fazl, Trans. By Colonel H.S. Jarrett, *The Ain-I-Akbari*, ...: Oriental Books Reprint Corporation, reprint, 1978, vol. II
- Abul Fida Imad al-Din Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, *Al-Bidaya wa'l-Nihaya*, Beirut: vol-6
- Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahi Muslim*, Cairo: 1930, vol. 18
- Ahamad Ibn Abi Yaqub Ibn Jafar al-Yaqubi, *Tarikh al-Yaqubi*, Najaf : 1964, vol. 2
- Ahmad b. Da'ud Abu Hanifa al-Dinwari, ed. V. Guirgass, *Kitab al-Khbar al-Tiwl*, Leiden : 1888
- Ahmad bin Yahya al-Baladhuri, ed. Muhammad Hamidullah, *Ansab al-Ashraf,* Cairo: 1959, vol. 1
- Ahmad Ghabin, *Hisba, Arts and Craft in Islamic*, Wiesbade: Harrassowitz Verlag., 2009
- Ahmad Ghabin, *Hisba, Arts and Craft in Islamic*, Wiesbade: Harrassowitz Verlag., 2009
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, Cairo : 1951, vol. 6
- Ahmad Mubarak Al-Baghdadi, *The Political Thought of Abu Al-Hasan Al-Mawardi*, University of Edinburgh, PHD Thesis, 1981
- Al-Ajjaj, *Diwan al-Ajjaj*, Berlin : 1903
- Albert Hourani, *A History of Arab Peoples, Massachusetts*: The Belknap Press of Harvard University Press-2002
- AL-HAJ MAHOMED ULLAH Ibn S. JUNG, '*THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN ISLAM*', New Delhi : Kitab Bhavan, 3rd ed. 1990
- Ali b. al-Husayn b. Ali al-Masudi, *Kitab Muruj al-Dhahab wa Maadin al-Jawhar*, ed. M.Muhil-Din Abd al-Hamid, n.p, 1967, vol. 3

- Ali Ibn Hasan Ibn Asakir, *Tahdhib al-Tarikh al-Tarikh al-Kabir*, Damascus : 1332 A.H
- Al-Raqiq al-Nadim, *Qutb al-Sarur fi Awsaf al-Khumur*, Damascus : 1969
- al-Tabari, translated by John Alden Williams, *The Early Abbasi Empire*, New York: Cambridge University Press, edt. 1, vol. 1, 1988
- Al-Thaalabi, *Kitab Khas al-Khas*, Beirut: 1966
- Amir Ali, *A short history of the Saracens*, London : 1934
- Amir Ali, *A Short History of the Saracens*, London: Macmillan and Co. Limited, reprint, 1916
- Amira K. Bennison, *The Great Caliphs*, London-New York: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2009
- Anon, ed. A-A- Duri and A.J al-Muttalibi, *Akhbar al-Dawlat al –Abbasiyya*, Beirut : 1971
- Antony Black, *The History of Islamic Political Thought*, Second Edition, Edinburg University Press, 2011
- Aparna Srivastava, *Rule of Police in a Changing Society*, NewDelhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1999
- ARSSAN MUSSA RASHID, *THE ROLE OF THE SHURTA IN EARLY ISLAM*, Phd Thesis, Published: University of Edinburgh, 1983
- B.M. Sharama, *Police Magistracy Relationship*, Jaipur, Printwell, 1991
- Benson Bobrick, *The Caliph's Splendor*, New York: Simon & Schuster-2012, p. 69
- Carl Brockelmann, *History of the Islamic Peoples*, London : 1949
- Daniel J.R. Dennett, *Marwan b. Muhammad : The Passing of The Umayyad Caliphate*, London: 1978
- David Nicolle, Illustrated by Angus Mcbride, *Armies of the Muslim Conquest,* Oxford: Osprey Publishing Ltd. Elms Court, Botley-1993
- David Pearl and Werner Menski, *Muslim Family Law*, London : Sweet & Maxwell, 3rd ed., 1998
- David Pearl and Werner Menski, *Muslim Family Law*, London: Sweet & Maxwell, 3rd edt., 1998
- David Waines, *An Introduction to Islam*, New York: Cambridge University, 2nd edt., 2004
- Dr. Ali Muhammad Muhammad as-Sallabi, *The Righty-Guided Caliph and Great Reviver, Umar bin 'Abd al-Aziz*, Riyadh: Darussalam, nd
- Dr. Atta Mohy-Ud-Din, *Abu Bakar*, Delhi: S. Chand & Co., 1968
- Dr. M. Enamul Haq, *Criminal justice system administration,* Dhaka: Ahsania Mission, Oct., 2001
- Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration*, Dhaka: Sumi Printing Press and Packaging, Oct. 2001
- Dr. Muhammad Munir, *Islam in History,* New Delhi : Kitab Bhavan, Dec-1999
- Dr. S.A.Q Husaini, *Arab Administration,* Lahore : Ashraf Press, reprint, 1948
- E.E. Peters, The Monothesists, Christians and Muslims in Conflict and Competion, Vol-II, Library of Congress- 2003

Dhaka University Institutional Repository

- Edited by Christian Lange and Marible Fierro, *Public Violence In Islamic Societies*, Edinburgh: Edinburgh University Press-2009
- Edited by Christian Lange and Marible Fierro, *Public Violence In Islamic Societies*, Edinburgh: Edinburgh University Press-2009
- Edited by M.S. Asimov and C.E. Bosworth, *History of Civilizations of Central Asia*, UNESCO Publishing-1998
- Edited by Majid Khadduri and Herbert J. Liebesny, *In the Middle East*, New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd-2008
- Edited By Masashi HANEDA and Toru MIURA, *Islamic Urban Studies*, London-New York: Routeledge Taylor & Franis Group, 1994
- Edited by P.J. Vatikiotis, Revulation *In the Middle East*, New York: George Allen & Unwin Ltd-1972
- F. Rosenthal, *The Muslim Concept of Freedom*, Leiden : 1960
- Faruk Aziz Khan, *Spring 1971*, Dhaka : Agronee Prokasoni, February 1993
- Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire,* Translated by Archibald Constable, revised by V.A. Smith, Calcutta: Low Price Publications, 1989
- Frank E. Vogel, *Islamic Law and the legal system,* Boston: Brill-2000
- Ghazi Shamsur Rahman, *Islamic Law*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1981
- H.S. Bhatia, *Studies in Islamic Law, Religion and Society*, New Delhi : Deep & Deep Publications, 1996
- Habib b. Aws Abu Tammam, ed. G.G. Freytag, *al-Hamasa*, Bonn : 1828
- Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan : Canadian Centre of Science and Education, 2013, vol. 5, No. 2,
- Haitham Shirkosh, *Asian Culture and History,* Isfahan: Canadian Centre of Science and Education, March-2013, vol. 5, No. 2
- Huge Kennedy, *The Armies of the Caliphs*, NewYork : 1st published, 2001
- Husari, *Zahr-al-Adab Wa Thamar al-Albab*, Cairo : 1953, vol. 2
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Cairo: 1301 A.H., vol. 9
- Ibn Qutayaba, *Maarif*, p. 107; Ibn Khayyat, vol-1
- Ibn Tiqtaqa, *Al-Fakhri fil-Adab al Sultaniyya wal Duwal al-Islamiyya*, Paris : 1895
- Idris El Hareir and Revne Mbaye edited, *The Differnt Aspects of Islamic Culture*, Paris : UNESCO, 2011, vol. 3
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, London: Cambridge University Press, 3rd Edt.
- Izzal-Din Abu Husayn Ali b. Muhammad, Ibn al-Athir, *al-Kamil Fi'L-Tarikh*, Leiden : 1869-72, vol. 4
- J. Wellhausen, Tr. Margaret Graham Weir, *The Arab Kingdom and its fall*, Calcutta: The Calcutta University Press, 1927
- Jacob Lassner, *The Shaping of Abbasid Rule*, New Jersey : Princeton University Press, 1980
- Jalal al-Din al-Suyuti, ed. Asad Talas, *al-Wasail ila Musamarat al-Awail*, Baghdad : 1950

Dhaka University Institutional Repository

- Jamshid H. Bilimoria, *Ruka' at-Alamgiri or Letters of Aurangzebe*, Delhi: Idarah-I-Adabiyat, 1972
- Jarallah Mahmud b. Umar, Al-Zamakhsahri, *Asas al-Balagha*, Cairo: 1922, vol. 1
- Jawad Ali, *Al-Mufassal Fi tarikh al-Arab Qabl al-Islam*, Beirut: 1970-76, vol. 5
- Joannes De Laet, Translated by J.S Hoyland, *The Empire of the Great Mugal*, Orintal Books Corporation, 1978
- Joginder Singh, Inside Indian Police, Delhi: Gyan Publishing House-2002
- Joset W. Meri, *Medieval Islamic Civilization*, Newyork: Taylor & Francis Group, 2006, vol-2
- Jurji Zaydan, *Tarikh al-Tammadun al-Islam*, Beirut : n.d., vol. 1
- Kamal Hossain, *Road to Bangladesh Series, Banglades Quest for Freedom and Justice*, Dhaka : The University Press Ltd., May 2013
- Kazi Ebadul Hoque, *Administration of Justice In Bangladesh*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh-2003
- Lieutenant General A S M Nasim (rtd) Bir Bikram, *Bangladesh Fight for Independence*, Dhaka: Columbia Prokasoni, Feb. 2002
- M. Shamsuddin Miah, *The Reign of Al-Mutawakkil,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1969
- M. Shamsuddin Miah, *The Reign of al-Mutawakkil,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1969
- M.A. SHABAN, *Islamic History A new Interpretation*, Cambridge University, First Published 1976
- Maqdisi, *al-bad' wa'l Tarikh*, Paris, 1919, Vol-6
- Martin Shapiro, *COURTS A Comparative and Political Analysis*, The University of Chicago Press, 1981
- Mawardi, *Adab al-Dunya wa'l-Din*, Beirut : 1978
- Michael G. Morony, *Iraq after the Muslim conquest*, New Jercy: Gorgias Press, 2005
- Michael G. Morony, *Iraq after the Muslim conquest*, New Jercy: Gorgias Press, 2005
- Michael G. Morony, *Iraq after the Muslim conquest*, New Jercy: Gorgias Press, 2005
- Michael Ursinus, *Grievance Administration (SIKAYET) In An Ottoman Province,* New York: Taylor & Francies e-Library
- Mohsen Zakeri, *Sasanid Soldiers in Early Muslim Societies*, Wiesbaden: Harbard & Company, 1995
- Mohsen Zakeri, *Sasanid Soldiers in Early Muslim Societ*y, Wiesbaden: 1995
- Moudud Ahmed, *Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy*, Dhaka: Universty Press Limited,1979
- Muhammad b. Habib, *Diwan Farazdaq*, Paris : 1870
- Muhammad b. Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Cairo: 1301 A.H., vol. 9
- Muhammad b. Yazid al Mubarrad, ed. M.A.F. Ibrahim and S. Shahata, *al-Kamil,* Cairo: 1956, vol. 3

Dhaka University Institutional Repository

- Muhammad binUmar al-Waqidi, ed. Marsden Jone, *Kitab al-Maghazi,* London : Oxford, 1966, vol. 1
- Muhammad Ibn Habib, *Kitab al-Muhabbar*, Hyderabad : 1942
- Muhammad Ibn Musa Ibn Isa al-Damiri, *Hayat al-Hayawan al-Kubra*, Cairo : 1284 A.H., Vol. 1
- Muhammad Ibn Sad, *Kitab al-Tabaqat al-Kubra*, Beruit : n.d., vol. 4
- Muhammad Ibn Yusuf al-Kindi, ed. Husayn Nassar, *Wulat Misr*, Beirut : 1959
- Muhammad Kurd Ali, *Rasail al-Bulagha*, Cairo : 1913, pp. 165-66; Butros al-Bustani, *Udaba al-Arab*, Beirut : 1979
- Muhammad Nurul Huda, *Bangaldesh Police Issued and Challenges*, Dhaka : The University Press Limited, 1st published, 2009
- Muhammad Zafar Iqbal, trns. Yeshim Iqbal, *History of Liberation War,* Dhaka : Proteeti, 2008
- Musab b. Abdallah al-Zubayri, *Kitab Nasab al-Quraysh*, Cairo : 1953
- Mustafa Jawad, *Majallat al-Shurta Wa'l Amn*, Baghdad: 1963, vol. 1
- Nancy Khalek, *Damascus after the Muslim Conquest*, New York : Oxford University Press, 2011
- Nasr Ibn Muzahim al-Minqari Ibn Muzahim, ed. Abd al-Salam Harun, *Waqat Siffin*, Cairo: 1385 A.H.
- Nasr Ibn Muzahim al-Minqari, ed. Abd al-Salam Harun, *Waqat Siffin*, Cairo : 1385
- Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: 1964
- P.K. Hitti, *History of the Arabs,* London: The Macmillan Press Ltd, 10th edt. 1970
- Padma B. Udgaonkar, *The Political Institution and Administration of Northern India During Mediveval Times*, New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd.-1969
- Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* London: The Macmillan Press Limited, 10th edt. 1970
- *Police Regulations Bengal*, 1943, Dhaka: Bangladesh Government Press, 1997, Vol-I
- Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam, Kitab Bhavan*, New Delhi: 1st edt. 2006
- R. P. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration*, Allahabad : Central Book Depot, 1964
- R.M. Savory, *Introduction Islamic Civilization*, Cambridge University Press-1976
- R.S Sharan, *Aspects of PoliticalIdeas and Institutions in Ancient India*, New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd. 1971
- Radhakumud Mookerji, *The Gupta Empire,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd
- Radhakumud Mookkerji, *The Gupta Empire*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd. 1973
- Ramsay MacMullen, *Soldier and civilian in the later Roman Empire*, Cambridge: Mass, 1963
- *Report of the Indian Police Commission*, 1902-03, Simla : Government Central

Dhaka University Institutional Repository

Printing, 1903

- Reuben Levy, *An Introduction to the Sociology of Islam,* London : Willams and Norgate Ltd, 1933, Vol. 2
- Reuben Levy, *An Introduction to the Sociology of Islam*, London: Williams and Norgate Limited, Vol. II
- Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge : Cambridge University Press, reprint, 1979
- Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, London : Cambridge University Press, reprinted, 1979
- Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems A Comparative Survey*, Waltham: Anderson Publishing-2013, Eight Edition.
- Rom Landau, *Islamic and the Arabs*, New York: Routeledge Library Edtions-2008
- Rom Landau, *Islamic and the Arabs*, New York: Routledge Library Edtions-2008
- S. Athar Husain, *The Glorious Caliphate,* Lucknow : Islamic Research and Publications, 1974
- S. E. FINER, *The History of Government,* New York: OXFORD University Press, 1st Published 1997
- S. Khuda Bukhsh, *The Orient under the Caliphs*, Delhi : Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 1st published, 1920
- S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Dacca: Najmah & Sons Ltd., 1967
- S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, Delhi: Idarah-I-Adabiyat-I Delhi, reprint, 1976
- S.K. Ghosh, *Police Administration*, Calcutta: Eastern Law House, 1st edt., 1973
- S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* Karachi: Nazma & Sons, 1976
- Salahuddin Khuda Bakhsh and D.S. Margoliouth, *The Renaissance of Islam*, Patna : Jubilee Printing & Publishing House, 1st edt., 1937
- Salauddin Khuda Bakhsh and D.S.Margoliouth, *Renaissance of Islam,* Patna: Jubilee Printing Publishing House, 1st edt., 1937
- Sami Zubaida, *Law and Power in the Islamic World*, I.B. New York: Tauris & Co. Ltd, 2003
- Shihab al-Din Ahmad b. Muhammad Ibn Abd Rabbihi, *Kitab Suluk al-Malik fi Tadbid al-Mamalik*, Cairo : 1286 A.H.
- Shihab al-Din Ahmad bin Abdal Wahhab al-Nuwayri, *Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab*, Cairo: 1923-1955, vol-17
- Shihab al-Din Ahmad bin Abdal Wahhab al-Nuwayri, *Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab*, Ibid, vol. 18
- Shihab al-Din Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani, *Isaba fi Tamyiz al-Sahaba*, Calcutta : 1888, vol .2
- Sir Jadunath Sarker, *Mughal Administration,* Calcutta: Sarkar & Sons Ltd. 1935
- Stephan and Nandy Ronart, *Concise Encyclopedia of Arabic Civilization*, Amsterdam: Djambatan, 1959
- Steven C. Judd, Religious Scholars and the ummays. New York: Routledge -2014

Dhaka University Institutional Repository

- Tabiari, Serial-1, Vol-4, 1874, Ibn Miskawayh, Tajarib al-Uman, (Leyden 1909), Vol-1
- Tauqir Mohamad Khan, *Jurisprudence in Islam*, Pentagon Press, First Published-2007
- Tauqir Mohammad Khan, *Jurisprudence in Islam*, New Delhi : New Elegant Printers, 1st Published, 2007
- Tauqir Mohammad Khan, *Law of Governance In Islam*, New Delhi : Pentagon Press, 2007
- Tehzeeb-ul-Hassan, *Examining The Role of Community Policing in Japan: Lessons For Pakistan*, Ph.D. Thesis, University of Sindh, 2011
- The Code of Criminal Procedure-1898, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-IV
- The Evidence Act, 1872, *The Bangladesh Code*, Dhaka: 2007, Vol-I
- The Penal Code, 1860, *The Bangladesh Code*-2007, Vol-I, Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affirs.
- The Police Act V of 1861, The Bangladesh Code, Dhaka : Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, 2007
- *The World Book Encyclopedia*, Chicago: World Book, Inc., vol-15, 1989
- The World Book Encyclopedia, London: World Book, Inc-1989, vol-5
- Upendra Nath Ghoshal, *Contributions to the History of the Hindu Revenue System*, Sarasat Libraray-1972
- V.D. Mahajan, *History Of Medieval India*, New Delhi : S. Chand & Company Ltd, 1st edt., 1991
- W.R. Gourlay, *A Contribution Towards a History of the Police in Bengal*, Calcutta: Secretariat Press, 1916
- WAEL B. HALLAQ, *The Orgins and Evolution of Islamic Law*, New York : Cambridge University Press, 2005
- WAEL B. HALLAQ, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge University Press, 2005
- Wahed Husain, *Administration of Justice During the Muslim Rule in India*, Delhi : reprint, 1977
- Yahya Armajani, *Middle East Past and Present*, Newjersy: Prentice Hall, 1970
- Yassine Essid, *A Critique of The Origins Of Islamic Economic Thought*, New York: E.J. BRILL, 1995
- Yusuf Ali Kha, Trans. Abdus Subhan, The Tarikh-I-Mahabatjangi, Calcutta: The Asiatic Society, 1982
- Yusuf Khalifa, *Dhul Rumma Shair al-hubb wal-sahra*, Cairo : 1970
- Zubayr b. Bahkar, *Jamhara Nasab al-Quraysh wa Akbariha*, Beirut : 1966
- Zamel Al-Rasheed, *The Reign of the Caliph Al-Wathq* (842-847 A.D), According To Al-Tabari's History: Institute of Islamic Studies-McGill University, Published-1972

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল

- তাসমিমা হোসেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ২০ মার্চ, ২০১৫
- ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: গোলাম সারওয়ার, আমাদের সময়.কম: ঢাকা, বাংলাদেশ, ২২.০২.২০১৬
- *ডিএমপি নিউজ*, ঢাকা: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বি.এস.এ প্রিন্টিং প্রেস, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: বাংলাদেশ, ২য় সং., ২৭ জুন, ২০১৫
- গোলাম সারওয়ার, সম্পাদক, দৈনিক সমকাল, ঢাকা: বাংলাদেশ, ৬ মার্চ ২০১৪
- দৈনিক ইত্তেফাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২ জুন, ২০১৫
- এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম সম্পাদিত, *ডিটেকটিভ*, ঢাকা: জ্বালাময়ী প্রকাশনী, মার্চ ২০১৪
- Abdul Hamid, *The Pakistan Police Journal*, Lahore : Well-Wisher Press, October, 1960
- AENSI Journal, Dr. Kamal al-Din Tabatabei and Farshad Bahrami, *History of the police force formation in Iran*, September, 2014
- Edited by Md. Motiur Rahman Sheikh, *PSC Journal*, Dhaka: Police Staff College Bangladesh, 2000
- Michael Ebstein, *Shurta Chiefs in Basra in the Umayyad Period a Prosonpographical Study*, Jerusalem: Al-Qantara, No. XXXI 1, enero-junio, 2010
- The Daily Star, Dhaka: Bangladesh, 6 March, 2014

Internet Source:

- http://www.academia.edu/545802/, visited on 17.06.2014
- www.ccsenet.org/ach, visited on 01.11.2014; URL: http://doi.org/10.5539/ach.v5n2p66
- http://en.wikipedia.org/wiki/shurta, visited on 26.02.2015
- http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached.jhtml? visited on 31.05.2012
- http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml?search Police in Islam, visited on 31.05.2012
- http://en.wikipedia.org/wiki/Rashidun_Caliphate, visited 01.02.2015
- https://en.wikipedia.org/wiki/hud, visited on 2/25/2016
- http://bangladeshwarcrimes.blogspot.com/2012/11/15-jul-2012-azam-2nd-witness-testimony.html, visited on 20.05.2014
- http://www.police.gov.bd/history.php?id=51, visited on 12.07.2014
- http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police, Visited On : 3/12/2015
- http://www.virtualbangladesh.com/history/overview_akram.html visited on 20.05.2014
- http://www.aensiweb.com/AEB/, Visited on : 17/11/2015
- http://alfuthat.com/islamicccivilization/Cities of Islam/Urban.html, Visited on-17/11/2015
- https://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/article/view File/138/116, Visited on: 17/11/15
- https://canadafreepress.com/articles-health/2808, Visited on: 11/24/2015
- https://www.unhabitat.org.jo/en/inp/Upload/1424216 Pages%20from%20StateofArabCities high-4.pdf, Visited on-21/11/2015

Dhaka University Institutional Repository

- http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2012
- http://www.academia.edu/545802/Shurta Chiefs in Basra in the Umayyad Period a Prosonpographical Study Al-Qantara XXX1 1, 2010, pp. 109-112, dated 17.06.14
- http://www.geni.com/people/Imaam-Hussain-bin-Maulana-Ali/600000, visite on: 2/25/2016
- http://archive.org/stream/UmarBinAbdAlAziz/Umar%20bin%20Abd-Aziz#page/n4/mode/1up, visited on 28.12.2014
- http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2012
- http://samlib.ru/a/ahmedow-a-s/theumyyadcaliphsandtheirnon-musli visited on 6/3/2012
- http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?print =5, visited on: 2/25/2016
- http://www.academia.edu/545802/, visited on 17.06.2014
- http://en.wikipedia.org/wiki/Abbasid_Caliphate, visited on: 3/3/2016
- http://bit.ly/copynwin http://muslimarealm.blogspot.com/ 2011_06_01 archive.htm visited on 29.01.2015
- www.ibrarian.net/.../Abdullahi Ahmed An Na im The Future of S, Visited on – 17/11/2015
- http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014
- http://search.mywebsearch.com/mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2012
- Ibn Abi Rabi, *Suluk al-Malik fi-Tadbir al-Mamalik*, Cairo : 1286 A.H.
- http://search.mywebsearch.com/ mywebsearc/GGcached .jhtml? visited on 31.05.2015
- http:// en.wikipedia.org/wiki/Qadi, visited on 07.02.2012
- http://en.wikipedia. Org/wiki/Khuzayma-ibn-khazim, visited on 12.10.2014
- http://dx.doi.org/10.5539/arch.v5n2p66, visited on 01.11.2014
- https://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/article/view File/138/116, Visited on: 17/11/15
- http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1456819198576~797, visited on: 28.2.16

Dhaka University Institutional Repository